নতুন চিঠি

নতুন চিঠি
শারদ সংখ্যা ২০১৮ / ১৪২৫

নতুন চিঠি

২০১৮

সম্পাদক

জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য

প্রকাশক

অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়

সম্পাদনা সহযোগিতায়

অরুণ মজুমদার, জহুর আলম, শিবানন্দ পাল,
কাজি আব্দুল করিম, কিশোর মাকর, মুরারী মণ্ডল,
দিনেশ ঝা, পার্থ চৌধুরী, ফজলুল বারি মিদ্দা

ব্যবস্থাপনা সহযোগিতায়

আবদুস সবুর

প্রচ্ছদ : **শ্যামলবরণ সাহা**

অক্ষরবিন্যাস-পৃষ্ঠাসজ্জা : **মনন শীল**

অলঙ্করণ : **সমর মুখোপাধ্যায়, কুশল বণিক**

মুদ্রক : **নতুন চিঠি প্রেস**, বর্ধমান

মুদ্রণ সহযোগিতায় : **সাধনা প্রেস**, ১১ জে বি মিত্র রোড ও **সত্যযুগ কর্মী শিল্প সমবায় প্রেস**, কলকাতা

মূল্য : ৫০ টাকা

NC/F1

With best compliments of

A
Well
Wisher

সম্পাদকীয়

সোস্যাল মিডিয়ার এই রমরমার কালে স্মার্ট ফোনের দৌলতে সারা বিশ্ব আজ ব্যক্তির হাতের মুঠোয়। মুদ্রণ মাধ্যমের পাঠক কমছে। তাছাড়া এই মাধ্যমও বৃহৎ ধনশক্তির করায়ত্ত। এই পরিস্থিতিতে ছোটো বা মাঝারি পত্রিকার পক্ষে টিকে থাকাটাই এক সুকঠিন সংগ্রাম।

সারা দেশের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক পরিস্থিতিও স্বাধীন মতামত প্রকাশের পরিপন্থী। কেন্দ্রীয় সরকারের ফ্যাসিবাদী চরিত্র ও রাজ্য সরকারের সহিংস আধিপত্যবাদ, সেই সঙ্গে প্রতিযোগিতামূলক সাম্প্রদায়িকতা, সামাজিক জীবন ও মননকে বিষাক্ত করে তোলার প্রক্রিয়াকে তীব্র থেকে তীব্রতর করে তুলছে। সংবাদপত্র এবং সাংবাদিকদের উপরও একের পর এক আক্রমণ, এমনকি প্রাণঘাতী আক্রমণও নেমে আসছে। সামান্য অজুহাতে 'ডেইলি দেশের কথা'-র রেজিস্ট্রেশন পর্যন্ত বাতিল করা হয়েছে। গণতন্ত্রই আজ সার্বিকভাবে বিপন্ন।

সার্বিকভাবে প্রতিকূল এই পরিস্থিতি নিয়মিত পত্রিকা প্রকাশ, বিশেষভাবে শারদসংখ্যার প্রকাশকে ক্রমশ কঠিন থেকে কঠিনতর করে তুলছে। সেই সঙ্গে বিজ্ঞাপনের অপ্রতুলতার কারণেও পত্রিকার আর্থিক সামর্থ্য বিপন্ন। এ সব কিছু সত্ত্বেও নতুন চিঠি তার সংগ্রামী মনোভাবকে অক্ষুণ্ণ রেখে নিয়মিত প্রকাশকে অব্যাহত রাখার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। বিজ্ঞাপনদাতা সহ যাঁরা বিভিন্নভাবে বর্তমান শারদ সংখ্যা প্রকাশের প্রয়াসে সহায়তার হাত প্রসারিত করেছেন, তাঁদের প্রতি নতুন চিঠি কৃতজ্ঞ।

নতুন চিঠির বিশেষ শারদ সংখ্যার মান বরাবরই যে স্বীকৃতি পেয়ে এসেছে, তার জন্য আমরা গর্বিত। বিভিন্ন প্রবন্ধ, গল্প ও কবিতার মধ্য দিয়ে বর্তমান সমাজ সংস্কৃতি ও রাজনীতির বিভিন্ন দিকগুলিকে বিশ্লেষণ ও উপলব্ধির আলোকে তুলে ধরার যথাযোগ্য প্রয়াস গ্রহণ করা হয়েছে। এই বিশেষ সংখ্যার আয়তনকে সীমাবদ্ধ রাখার বাধ্যবাধকতার কারণে অনেক প্রকাশযোগ্য প্রবন্ধ, গল্প ও কবিতা প্রকাশ করতে না পারার জন্য আমরা দুঃখিত।

এই বিশেষ সংখ্যা সম্পর্কে পাঠক-পাঠিকারা তাঁদের মূল্যবান মতামত জানালে তা আমাদের ভবিষ্যতের পাথেয় হবে।

নতুন চিঠি পরিবারের পক্ষ থেকে প্রত্যককে শারদ শুভেচ্ছা জানাই।

With best compliments of

A
Well
Wisher

সূচিপত্র

প্রবন্ধ

১ **শ্রীদীপ ভট্টাচার্য** : 'গ্রুনড্রিসে' ও মার্কস
৩ **অমল হালদার** : সারা দেশে কৃষক আন্দোলন সম্পর্কে কিছু অভিজ্ঞতা
৫ **আভাস রায়চৌধুরী** : দুঃসময়-সুসময়
৯ **হরিহর ভট্টাচার্য** : ভারতে সক্রিয় ও নিষ্ক্রিয় হিন্দুত্বের রাজনীতি
১৩ **সলিল আচার্য** : ওরা দাঙ্গা করে মানুষ মারে
১৭ **রথীন রায়** : যুক্তিবোধ ধ্বংসই লক্ষ্য
২১ **বীরেন ঘোষ** : শতবর্ষে শ্রদ্ধাঞ্জলি : সৈয়দ আবুল মনসুর হবিবুল্লাহ
২৩ **সুকান্ত কোঙার** : শোষকশ্রেণির বিভিন্ন কৌশল ও তার মোকাবিলায় কমিউনিস্টদের কর্তব্য
২৯ **বাবলু মণ্ডল** : বিশিষ্ট চলচ্চিত্রকার তরুণ মজুমদারের সাক্ষাৎকার
৩৩ **শুভপ্রসাদ নন্দী মজুমদার** : আমাদের প্রতিদিনের দ্বিজাতি তত্ত্ব
৩৭ **সুকৃতি ঘোষাল** : ঔচিত্যবাদ : আজকের দিনে

কবিতা ৩৯-৫০

মোহিনীমোহন গঙ্গোপাধ্যায়, পার্থ রাহা, কেষ্ট চট্টোপাধ্যায়, অংশুমান কর ৩৯; সুকমল ঘোষ, জিয়াদ আলী, সঞ্চয়িতা কুণ্ডু, সুনির্মল কুণ্ডু ৪০; মিলনেন্দু জানা, অভিজিৎ দাশগুপ্ত, মলয় রায়, নলিনীরঞ্জন সরকার ৪১; বিশ্বনাথ কয়াল, রথীন্দ্রনাথ ভৌমিক, সতীরঞ্জন আদক, শেখ জয়নাল আবেদীন ৪২; গৌতম সাহা, শ্যামলবরণ সাহা, পরেশ কর্মকার, বিপ্লব গঙ্গোপাধ্যায় ৪৩; পঙ্কজ পাঠক, দেবেশ ঠাকুর, কণিষ্ক আচার্য ৪৪; অজয়রঞ্জন বিশ্বাস, অরুণ মজুমদার, সত্যনারায়ণ মাজিলা, তপন দাস, প্রকাশ দাস ৪৫; অরবিন্দ সরকার, পান্নালাল মল্লিক, বিকাশ বিশ্বাস, পরেশ কর্মকার ৪৬; যযাতি দেবল, কঙ্কণ সরকার, রসুল করিম, বাসুদেব মণ্ডল চট্টোপাধ্যায় ৪৭; সোমনাথ বেনিয়া, অরূপ আচার্য, তপনজ্যোতি চৌধুরী, দিশা চট্টোপাধ্যায় ৪৮; মনামি ঘোষ, কালিদাস ভদ্র, নিলয় মিত্র, পরেশ ঘোষ ৪৯; অমিত বাগল, ঝর্না মুখোপাধ্যায়, নাসের হোসেন ৫০

প্রবন্ধ

৫১ **সেখ সাইদুল হক** : বর্তমানে শিক্ষার হাল হকিকৎ ও কিছু প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন
৫৭ **বিভাস সাহা** : শিক্ষা ও শিক্ষাব্যবস্থা : কিছু অর্থনৈতিক মতামত
৬৩ **কল্যাণ সান্যাল** : ভাষার অপমৃত্যু—এই দেশ, এই বিশ্ব

বিজ্ঞান

৬৫ **অরবিন্দ দাশ** : বিপদে প্রবাল প্রাচীর
৬৭ **শ্যামল চক্রবর্তী** : বিজ্ঞান ঐতিহাসিক ব্রাম পাই-এর একশো বছর
৭১ **কৌশিক লাহিড়ী** : দ্রোহকাল—চিকিৎসায় সংকট : স্বরূপ ও সমাধান

সংস্কৃতি

৭৫ **অশোক দাস** : হিন্দুস্থানী রাগসঙ্গীত ও নজরুল ইসলাম
৮১ **কল্যাণী ভট্টাচার্য** : বঙ্কিমচন্দ্রের দৃষ্টিতে মুসলমান
৮৫ **ভব রায়** : লোকসাহিত্য ও আধুনিক বাংলা সাহিত্য—পরিপূরক, না সমান্তরাল

HOPE NURSING HOME

ISO 9001 : 2015 CERTIFIED HOSPITAL

Ear Nose Throat Diseases medical & surgical services,
All Gynecological medical , surgical & Laparoscopy Services,
Obstetrics A.N.C. Assisted Vaginal Delivery, LUC S Services ,
General Surgery & Laparoscopy Services,
Pediatrics & Neonatology Services.

A/88, N.S.B. ROAD (EAST) RANIGANJ, PIN : 713347, Dist. BURDWAN, WEST BENGAL

CALL : 0341-2440109, 7407403153, 9475745869

Sl. No. 94

সূচিপত্র

৮৯ **বিনয়েন্দ্রকিশোর দাস** : এ-সময়ের বাংলা ছড়ায় দেশ ও সমাজ
৯১ **সুরঞ্জিতা ভট্টাচার্য** : সংস্কৃতি কি শুধুই আবেগ না শিকড়?

প্রবন্ধ

৯৫ **চন্দন সোম** : বেকারির বিরুদ্ধে সংগ্রাম : সংগ্রামের পথেই মিলবে মুক্তি

কবিতা ৯৭-১০৬

সুশীল পাঁজা, মিনতি গোস্বামী, অভিজিৎ ঘোষ, দ্বারকানাথ দাস ৯৭; রণেশ ভট্টাচার্য, প্রভাত ঘোষ, নরেশ মণ্ডল, বিশ্বজিৎ মণ্ডল ৯৮; গৌতম হাজরা, সংঘমিত্রা চক্রবর্তী, মলয়কান্তি মণ্ডল ৯৯; কৃষ্ণপ্রসাদ মাজী, নির্মল নিয়োগী, স্বরাজ ঘোষ ১০০; রাজকুমার রায়চৌধুরী, সূর্য মণ্ডল, ত্রিদিবেশ চৌধুরী, সৌম্য দত্ত, প্রদীপ্ত সামন্ত ১০১; সুকান্ত দে, বিকাশ পণ্ডিত, হৃশিখা ঘোষ, মনোজিৎ কুইতি, দেবব্রত দত্ত ১০২; মৈনাক মুখোপাধ্যায়, তাপস রায়, রবীন বসু, রূপ দাস ১০৩; খেয়া সরকার, অচিন মিত্র, মাধুরী অধিকারী, মাণিক পণ্ডিত, সুস্মেলী দত্ত ১০৪; মানিকলাল অধিকারী, সৌরভ দত্ত ১০৫; কেদারনাথ সিংহ ১০৬

গল্প

১০৭ **রূপক মিত্র** : স্বাধীনতা, উতল হাওয়ায়
১১১ **কার্তিকচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়** : বাড়তি
১১৩ **স্বপন পাঁজা** : হাটে কেনা খেতমজুর
১১৪ **তপোময় ঘোষ** : রাম-ধাক্কা
১১৭ গৌরাঙ্গ চ্যাটার্জি : জীবনের কামারশালা

বিবিধ

১২১ গীষ্পতি চক্রবর্তী : ফেলে আসা পথ
১২৫ সঞ্জীব চক্রবর্তী : হবসন জবসনের বিচিত্র জগৎ

ভ্রমণ

১২৯ **শ্যামসুন্দর বেরা** : হাতের কাছেই 'পুরুল্যে'
১৩৩ **বিলাস চ্যাটার্জি** : পায়ে পায়ে দয়ারা
১৩৭ **মধুছন্দা মিত্র ঘোষ** : ভেলনেশ্বর সৈকতমায়ায়

আঞ্চলিক ইতিহাস চর্চা

১৩৯ **পঙ্কজ রায় সরকার** : দুর্গাপুর : ঐতিহ্য ও তার উত্তরাধিকার
১৪৫ **প্রবাল সেনগুপ্ত** : কালনায় পাশ্চাত্য শিক্ষার বিস্তার ও মহারাজের স্কুল
১৪৯ **সর্বজিৎ যশ** : ৪২-এর বর্ধমান

গল্প

১৫৩ **গৌতম চট্টোপাধ্যায়** : দুর্গের শেষ প্রহরী
১৫৫ **গৌরী সেনগুপ্ত** : স্টোরি রাইটার
১৫৯ **কাকলি ঘোষ** : আয়ুধ
১৬১ **অনিল মাইতি** : আঁধার পেরিয়ে
১৬৫ **স্বপন ঘোষচৌধুরী** : টোটকা

With best compliments of

GIL

‘গ্রুনড্রিসে’ ও মার্কস

শ্রীদীপ ভট্টাচার্য

কার্ল মার্কসের রচনা ‘গ্রুনড্রিসে’ (Outlines of the Critique of Political Economy) দীর্ঘকাল অপ্রকাশিত ছিল। প্রথম পরিপূর্ণ আকারে প্রকাশিত হয় ১৯৫৩ সালে। কার্ল মার্কসের যে সমগ্র রচনাবলী বিশ শতকে প্রথম মুদ্রিত আকারে প্রকাশিত হয় তার মধ্যে নিঃসন্দেহে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ গ্রুনড্রিসে। গ্রুনড্রিসে-তে মোট সাতটি নোট রয়েছে যা কার্ল মার্কসের দ্বারা লিখিত। এই নোটগুলির সময়কাল ১৮৫৭-৫৮। ১৮৪৮-এ প্রকাশিত হয় ‘কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো’। ১৮৬৭-তে ‘ক্যাপিটাল’-এর প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয়। এই দুই রচনার মধ্যবর্তী সময়ে ১৮৫৭-৫৮-তে প্রকাশিত হয় গ্রুনড্রিসে। মার্কসীয় চিন্তাধারার বিকাশের এক গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়ে এই গ্রন্থ। মার্কসীয় চিন্তা ও তাঁর অনুসন্ধান-পদ্ধতির একটি অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন এই গ্রুনড্রিসে। একথা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে যে ‘পুঁজি’-র তিন খণ্ডে কার্ল মার্কস যা উপস্থিত করেছেন তা প্রকৃতপক্ষে গ্রুনড্রিসের আলোচনার প্রসারণ ও বিস্তৃতিকরণ।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, ১৮৫০-এ প্যারিসে শ্রমিকদের অভ্যুত্থানের পরাজয়ের পর মার্কস ও এঙ্গেলস এই মতে উপনীত হলেন যে আশু ভবিষ্যতে বিপ্লবী সংগ্রামের বিষয়টি খুব কঠিন সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে। এহেন পরিস্থিতিতে কমিউনিস্ট লিগের কার্যধারাকে নতুনভাবে সজ্জিত করে বিপ্লবী তত্ত্ব অনুশীলন চর্চা এবং তার বিকাশের কাজকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। এই সময়কালে মার্কস অর্থনৈতিক বিষয় আরও বেশি করে অধ্যয়ন ও চর্চার জন্য ব্রিটিশ মিউজিয়মে (ব্রিটিশ লাইব্রেরি) মনোনিবেশ করেন বেশ কিছু কালের জন্য। তারই ফলশ্রুতি গ্রুনড্রিসে।

‘গ্রুনড্রিসে’-তে কী কী আলোচনা করা হয়েছে

গ্রুনড্রিসের বিষয়গুলি মার্কস নিজেই স্থির করেছিলেন। বিষয়সূচির মধ্যে রয়েছে (১) ভূমিকা, (২) অর্থ (Money) সম্পর্কিত অধ্যায়। এখানে রয়েছে দুটি নোট। ১ ও ২নং নোটের একটা অংশ অধ্যায়ে রয়েছে। (৩) পুঁজি (Capital) সম্পর্কিত অধ্যায়। দ্বিতীয় নোটের কিছু এবং ৩, ৪, ৫, ৬ ও ৭ নম্বর নোট নিয়ে এই অধ্যায়। এই অধ্যায়ের কয়েকটি ভাগ। প্রথমত, পুঁজির উৎপাদন প্রক্রিয়া। দ্বিতীয়ত, পুঁজির সঞ্চালন (Circulation) প্রক্রিয়া। তৃতীয়ত, পুঁজি থেকে উদ্বৃত্ত মূল্য (Surplus value) এবং উদ্বৃত্ত মূল্যের মুনাফায় রূপান্তরিত হওয়া। সর্বশেষে মূল্য নিয়েও আলোচনা করা হয়েছে।

ভূমিকাতে উৎপাদন, ব্যবহার, বন্টন এবং বিনিময় সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। উৎপাদন বলতে বস্তুগত উৎপাদন। উৎপাদনের অর্থ হল সামাজিক বিকাশের একটি নির্দিষ্ট স্তরে উৎপাদন। উৎপাদন সম্পর্কে আলোচনার অর্থ একটি নির্দিষ্ট

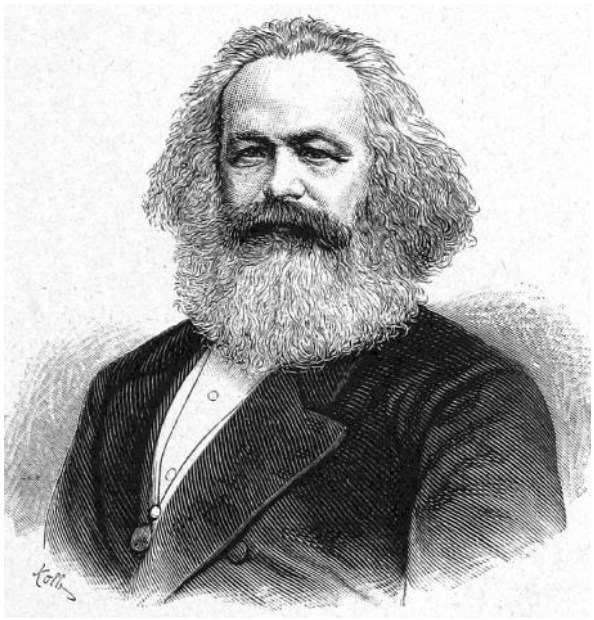

ঐতিহাসিক যুগের সঙ্গে তা সম্পর্কিত, যেমন আধুনিক পুঁজিবাদী উৎপাদন। হাতিয়ার ব্যতিরেকে উৎপাদন সম্ভব নয়। মানুষের হাতও হাতিয়ার হিসেবে বিবেচিত হয়। অতীতের শ্রম (Past Labour) ব্যতিরেকেও উৎপাদন সম্ভব নয়। পুঁজিও তো অতীত শ্রমের বাস্তব রূপ। উৎপাদনের অর্থ যেমন উৎপাদনের নির্দিষ্ট শাখা যেমন, কৃষি, পশুপালন, ম্যানুফ্যাকচারিং প্রভৃতি। আবার উৎপাদনের অর্থ সামগ্রিক উৎপাদন।

উৎপাদন কোনো বিমূর্ত বিষয় নয়। উৎপাদন কখনো লক্ষ্যহীন নয়। ব্যবহারের জন্যই উৎপাদন। উৎপাদন ও ব্যবহারের মধ্যে রয়েছে সম্পর্ক উৎপাদন ও ব্যবহারের মধ্যে রয়েছে ঐক্য। আবার শুধু ঐক্যই নয়, তাদের মধ্যে সংগ্রাম রয়েছে। ব্যবহারের প্রশ্ন না থাকলে উৎপাদনই হয় না। উৎপাদন এবং ব্যবহারের মধ্যে রয়েছে দ্বান্দ্বিক সম্পর্ক। ব্যবহারের প্রশ্ন ছাড়া উৎপাদনের চাহিদা তৈরি হয় না। উৎপাদন যেমন চাহিদা মেটানোর বস্তুই শুধু তৈরি করে না, বিষয়ের জন্য বিষয়ীও তৈরি করে। (Production not only creates object for subjects, but also subjects for object.) উৎপাদন ভোগ (Consumption) সৃষ্টি করে। কীভাবে? (১) ব্যবহারের বস্তু তৈরি করার মধ্য দিয়ে। (২) ব্যবহারের পন্থা নির্ধারণ করে। (৩) ব্যবহারের তাগিদ (Motive) তৈরি করে।

মানব সমাজে বিভিন্ন উৎপাদন-ব্যবস্থার আবির্ভাব ঘটেছে।

উৎপাদন-ব্যবস্থা বলতে কয়েকটি সাধারণ বৈশিষ্ট্যের কথা নিশ্চিতভাবে বোঝায়। আবার প্রতিটি উৎপাদন-ব্যবস্থার মধ্য কিছু বিশেষ বৈশিষ্ট্য রয়েছে বলেই তা একটি নির্দিষ্ট ধরনের উৎপাদন-ব্যবস্থা। যেমন সামন্ততান্ত্রিক উৎপাদন-ব্যবস্থা। পুঁজিবাদী উৎপাদন-ব্যবস্থা। প্রতিটি উৎপাদন-ব্যবস্থার বিশেষ বৈশিষ্ট্যগুলি তাদের পার্থক্য সূচিত করে। উৎপাদন-ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে প্রতিটি ঐতিহাসিক যুগের সামাজিক আইনের দ্বারা নির্ধারিত হয় কে সামাজিক উৎপাদনের কতখানি ভোগ করবে। সমাজের আধিপত্যকারী অংশ কতখানি ভোগ দখল করবে তা সেই নিদিষ্ট যুগের সামাজিক আইনের দ্বারা নির্ধারিত হয়।

উৎপাদন, বন্টন, বিনিময় এবং ব্যবহারের মধ্যে রয়েছে নির্দিষ্ট সম্পর্ক। নির্দিষ্ট চাহিদার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে বস্তু সৃষ্টি হয় উৎপাদনের মাধ্যমে। সামাজিক আইন অনুসারে সেই বস্তুর বিভাজন হয় বন্টনের মাধ্যমে। ব্যক্তিগত চাহিদা অনুসারে বণ্টিত অংশের যথাযথ প্রেরণ সুনিশ্চিত করে বিনিময়। উৎপাদিত বস্তু এই সামাজিক গতির বাইরে চলে যায় এবং প্রত্যক্ষ বস্তুতে রূপান্তরিত হয়। তা ব্যক্তিগত চাহিদার ভৃত্যে পরিণত হয় এবং ব্যবহারের মধ্য দিয়ে ব্যক্তিগত চাহিদা পূরণ হয়।

সমস্ত ধরনের উৎপাদনের অর্থ প্রকৃতিকে আত্মসাৎ করা (appropriation)। প্রতিটি যুগেই মানব সমাজে উৎপাদন-প্রক্রিয়া পরিচালিত হয়েছে। উৎপাদনের রূপের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে আইন ব্যবস্থা, সরকার—এইগুলি গড়ে ওঠে। আবার এটাও ঠিক যে উৎপাদনের উদীয়মান নির্দিষ্ট স্তরের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে যখন নতুন সামাজিক অবস্থার আবির্ভাব ঘটতে থাকে তখন উৎপাদনে বিশৃঙ্খলার পরিবেশ গড়ে ওঠে।

উৎপাদন, বন্টন, বিনিময় এবং ব্যবহারের মধ্যে রয়েছে নির্দিষ্ট সম্পর্ক। নির্দিষ্ট চাহিদার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে বস্তু সৃষ্টি হয় উৎপাদনের মাধ্যমে। সামাজিক আইন অনুসারে সেই বস্তুর বিভাজন হয় বন্টনের মাধ্যমে। ব্যক্তিগত চাহিদা অনুসারে বণ্টিত অংশের যথাযথ প্রেরণ সুনিশ্চিত করে বিনিময়। উৎপাদিত বস্তু এই সামাজিক গতির বাইরে চলে যায় এবং প্রত্যক্ষ বস্তুতে রূপান্তরিত হয়। তা ব্যক্তিগত চাহিদার ভৃত্যে পরিণত হয় এবং ব্যবহারের মধ্য দিয়ে ব্যক্তিগত চাহিদা পূরণ হয়।

সমগ্র প্রক্রিয়ার শুরু উৎপাদনের মধ্য দিয়ে। উৎপাদনের মধ্য দিয়ে পরিবর্তন শুরু এবং ব্যবহারেই তার চূড়ান্ত রূপ। বন্টন ও বিনিময় হল মধ্যবর্তী পর্যায়। বন্টন নির্ধারিত হয় সমাজের দ্বারা, বিনিময় ব্যক্তির মধ্যে নির্ধারিত হয়। উৎপাদন, বন্টন, বিনিময় এবং ব্যবহার পরস্পর-সম্পর্কিত।

উৎপাদন ও ব্যবহারের মধ্যে সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড়। উৎপাদন প্রক্রিয়ায় নতুন বস্তু নির্মিত হওয়ার অর্থ উৎপাদনের উপকরণ ব্যবহার করা ব্যতিরেকে তাদের সমন্বয়ে নতুন বস্তু সৃষ্টি হতে পারে না, আবার বিভিন্ন বস্তু (যেগুলি নতুন বস্তুর উপাদান)-কে ব্যবহার করা। উপকরণগুলির যথাযথ ব্যবহারেই নতুন বস্তু উৎপাদিত হয়। উৎপাদনের সঙ্গে সঙ্গে ব্যবহার আবার ব্যবহারের পরেই উৎপাদন। উৎপাদন ও ব্যবহার পরস্পর বিপরীত হলেও দুইয়ের মধ্যে আন্তঃসম্পর্ক বিরাজ করে।

বিনিময় হল উৎপাদন ও ব্যবহারের মধ্যবর্তী পর্যায়। উৎপাদনের মধ্যে বিভিন্ন কার্যধারা ও সামর্থ্যের বিনিময় হয়। দ্বিতীয়ত, উৎপাদন সম্পূর্ণ করার জন্য বিভিন্ন উপাদানের বিনিময়। তৃতীয়ত, বিনিময় হয় ব্যবহারের লক্ষ্যে। তবে এটা ঠিক যে শ্রমের বিভাজন ব্যতিরেকে বিনিময় সম্ভব নয়। ব্যক্তিগত বিনিময়ের অর্থ ব্যক্তিগত উৎপাদন, উৎপাদনের বিভাগ ও কাঠামোর দ্বারা বিনিময়ের গভীরতা ও প্রসার উপলব্ধি করা সম্ভব।

রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক পদ্ধতি নিয়ে গ্রুনড্রিসের ভূমিকায় আলোচনা করা হয়েছে। কোনো দেশকে রাজনৈতিক- অর্থনৈতিকভাবে বিচার করতে গেলে কোথা থেকে শুরু করতে হবে তা বিবৃত করা হয়েছে। বিশ্লেষণের প্রক্রিয়ায় অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে কীভাবে চিহ্নিত করা যায় তা আলোচনা করা হয়েছে। সরল ব্যবস্থা থেকে ক্রমান্বয়ে উত্তরণ ঘটে। উত্তরণের ধারায় রাষ্ট্র। দেশগুলির মধ্যে বিনিময় এবং বিশ্ববাজার গড়ে ওঠে। বৈচিত্র্যের ঐক্য এবং বহু উৎপাদনের কেন্দ্রীভবনই নির্দিষ্ট (Concrete)-কে প্রতিষ্ঠিত করে।

চিন্তন প্রক্রিয়ায় নির্দিষ্ট চিহ্নিতকরণের অর্থ পর্যবেক্ষণ এবং ধারণার ক্ষেত্রে পরিবর্তন। সম্পর্ক এবং রূপ (Category) বিষয়ে আলোচনা রয়েছে এখানে। অংশ ও সমগ্রর মধ্যেকার দ্বান্দ্বিক সম্পর্ক তুলে ধরা হয়েছে। পুঁজি (Capital)-র পূর্ব অর্থ যে (Money) সে আলোচনা রয়েছে।

শ্রম (Labour) সাধারণ রূপ (Simple Category) হিসেবে বিবেচ্য। সমস্ত সম্পদের মূলে শ্রম। শ্রমকে অবলম্বন করেই উৎপাদন। উৎপাদন সংগঠনের কাঠামোর ক্রমান্বয়ে উন্নয়নের ধারায় পুঁজিবাদ। পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় উৎপাদনের সর্বাপেক্ষা জটিল কাঠামো গড়ে ওঠে। প্রতিটি সমাজ-ব্যবস্থায় উৎপাদনের একটি নির্দিষ্ট রূপের আধিপত্য থাকে।

ক্রম অনুসারে আলোচনা প্রয়োজন বলে পাঁচটি বিষয়ের উল্লেখ করা হয়েছে—(১) প্রতিটি সমাজে কমবেশি প্রত্যক্ষ করা যায় এমন বিমূর্ত সাধারণ উপাদান। (২) বুর্জোয়া সমাজের অভ্যন্তরীণ কাঠামো গড়ে তোলে ভোগের যে রূপ (Category), যার ওপর মৌলিক শ্রেণিগুলি গড়ে ওঠে। পুঁজি, মজুরি শ্রম, জমি সম্পর্ক। তাদের আন্তঃসম্পর্ক। শহর ও গ্রাম। তিনটি প্রধান সামাজিক শ্রেণি। তাদের মধ্যেকার বিনিময়। সঞ্চালন (Circulation)। (৩) ক্রেডিট ব্যবস্থা (ব্যক্তিগত)। (৪) রাষ্ট্র রূপে বুর্জোয়া ব্যবস্থার কেন্দ্রীভবন। অনুৎপাদক শ্রেণি। কর, রাষ্ট্রীয় ঋণ, পাবলিক ক্রেডিট। জনসংখ্যা, উপনিবেশ এবং অভিবাসন (Emigration)। (৫) উৎপাদনের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। শ্রমের আন্তর্জাতিক বিভাজন। আন্তর্জাতিক বিনিময়। রপ্তানি ও আমদানি, বিনিময়ের হার। (৫) বিশ্ববাজার এবং সংকট।

ভূমিকাতেই কীভাবে গ্রুনড্রিসে-তে আলোচনা করা হবে তা বর্ণনা করে বিষয়গুলিকে উপস্থিত করা হয়েছে। গ্রুনড্রিসে নিঃসন্দেহে মার্কসীয় মতাদর্শ গড়ে ওঠার প্রক্রিয়ার একটি ঐতিহাসিক দলিল। কীভাবে মার্কস অর্থনীতির তত্ত্বকে উপস্থিত করলেন যার সাহায্যে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার অভ্যন্তরীণ কার্যধারাকে উপলব্ধি করা সম্ভব হল, গ্রুনড্রিসে সেই ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য দলিল। মার্কসীয় চিন্তন প্রক্রিয়া কীভাবে অগ্রসর হয়েছে যার পরিণতি 'পুঁজি' গ্রন্থ, তা হৃদয়ঙ্গম করার ক্ষেত্রে 'গ্রুনড্রিসে' নিঃসন্দেহে অন্যতম দলিল।

সারা দেশে কৃষক আন্দোলন সম্পর্কে কিছু অভিজ্ঞতা

অমল হালদার

সারা দেশব্যাপী কৃষক আন্দোলন জোরদার হচ্ছে। বিগত ৮ আগস্ট দেশের সমস্ত জেলা শহরে জেলভরো আন্দোলন, ৫ সেপ্টেম্বর দিল্লিতে বিশাল জমায়েত, তারও কিছুকাল আগে মহারাষ্ট্র, রাজস্থানে কৃষকের লংমার্চ সারা দেশে বিপুল সাড়া ফেলেছে। আন্দোলনগুলি যে কেন্দ্রীয় সরকারকে প্রবল ধাক্কা দিয়েছে তা সাম্প্রতিককালে কয়েকটি সিদ্ধান্ত থেকেই বোঝা যায়। কেন্দ্রীয় সরকারের গৃহীত এই সিদ্ধান্তগুলিতে দেশের কৃষকসমাজ বাঁচবে না। আসল রোগকে চিহ্নিত করা দরকার, যা হল কেন্দ্রীয় সরকারের রাজনৈতিক সদিচ্ছার অভাব। ক্যানসার রোগ যেমন আক্রান্তকে আস্তে আস্তে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়, ভারতীয় কৃষক সমাজ বর্তমানে ক্যানসারে আক্রান্ত। তার মৃত্যুও সুনিশ্চিত। এই সহজ সত্য ধারণা অনেকের মধ্যে নেই। একটা বিষয়ের তো আমরা প্রত্যক্ষদর্শী যে কৃষকের সন্তান আর কৃষক হতে চাইছে না—অন্য জীবিকা বা পেশা খুঁজে নিতে চাইছে। যতদিন কৃষি সমস্যা ছিল তখন ছিল এক চিত্র, সংকট যত বাড়ছে তত পরিষ্কার হচ্ছে এই পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় তাঁর পক্ষে টিকে থাকা অসম্ভব। কৃষি সংকট এখন সামাজিক সংকটে পরিণত হয়েছে। সারা দেশে চার লক্ষের মতো কৃষক আত্মহত্যা করেছে—এটা কি ভয়ঙ্কর ঘটনা নয়? চার লক্ষ মানুষের মৃতদেহ যদি সারিসারি পড়ে থাকত তা দেখে হয়ত আমাদের হৃদয় কেঁপে যেত। আসলে এই সম্পর্কে সংবাদমাধ্যমে চার লাইনের খবর কিংবা কোনো কৃষিবিজ্ঞানীর বক্তৃতা আমাদের চেতনাকে স্পর্শ করে না। কৃষক আন্দোলনের অনেক পুরোনো নেদৃত্ব যখন বলতেন গ্যাট চুক্তির বিপদ, উদারীকরণ, বেসরকারিকরণ, বিশ্ববাণিজ্য সংস্থা, আন্তর্জাতিক অর্থ ভাণ্ডার সহ নানা অস্ত্র কীভাবে কৃষক সহ সমাজের অন্যান্য অংশের দিকে নিক্ষেপ হতে যাচ্ছে, তখন কৃষক মুচকি হেসে বক্তাকেই হয়ত পাগল সম্বোধন করে রাস্তায় হাঁটা দিয়েছেন। বিশ বছর আগের কথাগুলি বর্তমানে জীবনের অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিলে যাচ্ছে। আক্ষেপ হল, এখনও সবাই বুঝতে পারছেন না কিংবা না বোঝার ভান করছেন। দেশের সার কারখানাগুলি বন্ধ করে বিদেশ থেকে সার আমদানি হচ্ছে, দেশের বীজ খামারগুলোকে বারোটা বাজিয়ে বিদেশ থেকে চড়া দামে বীজ আসছে, নানা রকমের কীটনাশক সহ। বাড়ছে বহুজাতিক কর্পোরেশনের দেদার ব্যবসা, ডিজেলের দাম প্রায় ১০০ টাকা ছুঁই ছুঁই, উৎপাদন খরচ বাড়বে কয়েকগুণ। এই কথাই আমরা বারে বারে বলতে চেয়েছি। উৎপাদন খরচ বাড়ার সাথে সাথে যদি কৃষক ফসলের দামটা পেত তাহলেও অন্তত বেঁচে যেত—কিন্তু সে গুড়ে বালি। ওপরওয়ালারা যারা দামটা নিয়ন্ত্রণ করেন তাঁরা উৎপাদন খরচ সম্পর্কে কোনো পরোয়া করেন না। উদারীকরণের আগের পর্বে সরকারি সিদ্ধান্ত ছিল যে-খাদ্যশস্য দেশের মাটিতে উৎপন্ন হয় তা বিদেশ থেকে আমদানি করা যাবে না, এখন সেই আইন কবরে গেছে। বর্তমানে বে-সরকারি রাঘববোয়ালেরা এই ব্যবসার সাথে যুক্ত তাদের কাছে মুনাফাই প্রধান। দেশে বিপুল পরিমাণ ডাল শস্য উৎপন্ন হওয়া সত্ত্বেও বিদেশ থেকে সস্তা তলে ডাল আমদানি করতে হিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ নেই। ফলে কৃষক মরছে, ওদের বাণী বাড়ছে। পশ্চিমবাংলায় যেমন ধান, আলু, পাট প্রধান ফসল হিসেবে চিহ্নিত, তেমনি অন্য রাজ্যে ডাল, চাল, সোয়াবিন, পিঁয়াজ, আখ সহ প্রচুর ফসল আছে যার কোনো দাম নেই। কৃষকের এই দুরবস্থা দেখেই সারা দেশে গড়ে উঠেছে সারা ভারত কিষান সংঘর্ষ সমন্বয় কমিটি, যেখানে ২০০টির বেশি সংগঠন যুক্ত হয়েছে। বাম ও গণতান্ত্রিক ঐক্যকে দৃঢ় করতে গড়ে উঠেছে জন একতা জন অধিকার আন্দোলন, যার মধ্যে সমস্ত বামপন্থী গণসংগঠন, সহ একাধিক সংগঠন যুক্ত আছে। দেশের প্রায়

২০ কোটি জনগণের প্রতিনিধিত্ব করে এই সংগঠন। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে লালঝাণ্ডা কাঁধে নিয়ে উদারনীতি ও সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে ধারাবাহিক লড়াইয়ের মাধ্যমে দিল্লির সরকারের ভিতকে কাঁপিয়ে দিচ্ছে।

এই সংগঠনগুলির মূলত দাবি হল— (১) কৃষকের ফসলের ন্যায্য দাম, (২) কৃষি ঋণ মুকুব। উৎপাদন খরচের অনেক নিচে দাম থাকার কারণে ইউপিএ সরকারের আমল থেকে মূলত বামপন্থী সাংসদের জোরালো দাবিকে তৎকালীন সরকার উপেক্ষা করতে পারেনি। বিখ্যাত কৃষিবিজ্ঞানী ড. স্বামীনাথনের নেতৃত্বে কমিশন গঠিত হয়। সবটা বিবেচনা করে ড. স্বামীনাথন ফসলের ন্যূনতম সহায়ক মূল্য কী হওয়া উচিত সে সম্পর্কে সরকারের কাছে কমিশনের রিপোর্ট ৪ অক্টোবর, ২০০৬ পেশ করেন। ইউপিএ সরকারের আমলে এই রিপোর্ট পেশ করলেও কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। কৃষকের এই তুরবস্থা নজরে এনে নরেন্দ্র মোদি ২০১৫ সালে লোকসভা নির্বাচনে কৃষক পরিবেষ্টিত এলাকায় বারংবার প্রতিশ্রুতি দেন—ক্ষমতায় এলে স্বামীনাথন কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী কৃষকের ফসলের ন্যায্য দাম দেওয়া হবে। যন্ত্রণায় ছটফট করা কৃষক নরেন্দ্র মেদিকে ত্রাতা ভেবেছিলেন। আসলে কৃষকের ভোট পাবার স্বার্থে যে এই মিথ্যা প্রতিশ্রুতি তা যন্ত্রণাক্লিষ্ট কৃষকের বোঝার ক্ষমতা ছিল না। অচিরেই নরেন্দ্র মোদির মুখোশ খুলে গেল, শুরু হল কৃষকনিধন নীতির বাস্তবায়ন। কৃষকরা জীবনের অভিজ্ঞতা থেকেই রাজ্যে রাজ্যে, উপনির্বাচনে বিজেপিকে পরাস্ত করার মধ্য দিয়ে জবাব দিতে শুরু করলেন। একদিকে রাজ্যে রাজ্যে বেড়ে ওঠা কৃষক আন্দোলনের ঢেউ, অপর দিকে কৃষক এলাকায় বিজেপির পরাজয়ে মোদি কিছুটা চাপে পড়ে সহায়ক মূল্য কিছুটা বাড়াতে সচেষ্ট হলেন। কুইন্টাল পিছু ২০০ টাকা বৃদ্ধির জন্য প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা যে সমগ্র কৃষক সমাজকে প্রতারণা এটা বুঝতে বাকি থাকে না, যখন স্বামীনাথন কমিশনের সুপারিশের দিকে নজর দেওয়া হয়।

স্বামীনাথন কমিশনের সুপারিশের ফর্মুলা ছিল প্রধানমন্ত্রীর C2+50% অর্থাৎ ধানের ন্যূনতম সহায়ক মূল্য প্রতি কুইন্টাল ২৩৪০ টাকা হতে পারত। আমাদের রাজ্যে প্রধান শস্য ধান। প্রধানমন্ত্রী মাত্র ১৪টি ফসলের সহায়ক মূল্য ঘোষণা করেছেন। সেখানে মাত্র ১০ থেকে ১৪ শতাংশ দাম বেড়েছে। ফল, সবজি, দুধের কোনো সংগ্রহ মূল্য ঘোষণা করা হয়নি। এখন শোনা যাচ্ছে মাঝে বেসরকারি সংগ্রহকারী নিয়োগ করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। অন্য ফসল সম্পর্কে উল্লেখ করছি না। ধানের প্রসঙ্গে ফিরে আসি।

ধানের ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা অনুযায়ী কুইন্টাল প্রতি ১৭৫০ টাকা স্থির হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী তাঁরই দেওয়া প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ফর্মুলা C2+50% অগ্রাহ্য করলেন। এই ফর্মুলায় ধানের দাম হতে পারত কুইন্টাল প্রতি ২৩৪০ টাকা। আমাদের দেশে এই দাম নির্ধারণ করে কমিশন ফর এগ্রিকালচারাল কস্ট অ্যান্ড প্রাইস (CACP)। এরা উৎপাদন খরচ সম্পর্কে তিনটি ভিন্ন ভিন্ন ফর্মুলা তৈরি করেছে। (১) A2—বীজ, সার, মজুরি এবং চাষের উপকরণের খরচ; (২) A2+FL—বীজ, সার, মজুরি, চাষের উপকরণে ব্যয়ের সাথে পরিবারের নিজস্ব শ্রমের মূল্য; (৩) C2—ব্যাপক অর্থে উক্ত খরচগুলির সাথে যুক্ত হবে জমির খাজনা ও ব্যাঙ্কের সুদ। এটা তো নিশ্চিত যে C2 অবশ্যই অন্যান্যগুলির থেকে সঠিক উৎপাদন খরচ নির্ধারণে সহায়ক হবে। সেই C2-র সাথে ৫০ শতাংশ যুক্ত করলে তবেই স্বামীনাথন কমিশনের সুপারিশ কার্যকর হতে পারে। এই মুহূর্তে বন্যায় বিপর্যস্ত কেরল। সে রাজ্যের সরকারও ধানের সংগ্রহ মূল্য কুইন্টাল প্রতি ২৩৫০ টাকা নগদে কৃষককে দিয়েছে, যা স্বামীনাথন কমিশনের থেকেও ১০ টাকা বেশি।

পশ্চিমবঙ্গে এই সমস্যা আরও তীব্র। মমতা ব্যানার্জির সরকারের আমলে ১৮৮ জন কৃষক আত্মহত্যা করেছে। সহায়ক মূল্যে ধান বিক্রি করতে না পেরে ফোড়েদের কাছে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হচ্ছে। অভাবি বিক্রিতে ধান বেচে কৃষক পাচ্ছে কুইন্টালে ৯০০ থেকে ১১০০ টাকা। বাজারি সংবাদপত্র মুখ খোলে না, কৃষিমন্ত্রীর বাগাড়ম্বর বক্তৃতা ছাপে কিন্তু প্রকৃত অবস্থা কী তা একটু গভীরে গিয়ে অনুসন্ধান তো দূরের কথা মন্ত্রীর কথাতেই শিলমোহর দেয়। শুধু কৃষকের সমস্যাই নয়, বেকারদের সমস্যা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রবল নৈরাজ্য, মহিলাদের ওপর প্রদিদিনই আক্রমণ, ব্রিজ ভাঙা থেকে শুরু করে নিত্যনতুন যন্ত্রণা বাড়ছে।

সারদা কর্তা সুদীপ্ত সেন বলছেন, আমি তো সব টাকা ফেরত দিতে চেয়েছিলাম। আমাকে এই কাজ করতে দেওয়া হল না। কার্যত গোটা রাজ্যে চলছে লুম্পেনরাজ। গণতন্ত্র প্রবলভাবে আক্রান্ত, তোলাবাজ দুর্নীতিগ্রস্ত মানুষের সুপরামর্শ ছাড়া রাজত্ব চলবে না! আর সমস্ত অপকীর্তিকে পাহারা দিচ্ছে ঢাউস ঢাউস মুখ্যমন্ত্রীর ছবি। জনগণের করের টাকা তছনছ হয়ে যাচ্ছে। এই ধরনের ঘটনার বিরুদ্ধে মানুষের ক্রোধ ধূমায়িত হচ্ছে, যে কোনো সময়ে তা প্রবল আকার নেবে।

পশ্চিমবঙ্গের প্রসঙ্গেই একটু ফিরে আসি। মহারাষ্ট্র, রাজস্থানে কৃষক আন্দোলন এই মুহূর্তে সারা দেশকে নাড়া দিয়েছে। এই রাজ্যের কৃষকের উৎসাহ উদ্দীপনা বেড়েছে। এই লড়াইগুলির ক্ষেত্রে দুটি দাবি ছিল—প্রধানত ফসলের দর ও কৃষিঋণ মুকুব। এই দাবিতে কৃষকের সমগ্র অংশকে ঐক্যবদ্ধ করা সম্ভব। ধনী কৃষক, মাঝারি কৃষকের একটা বড় স্বার্থ আছে। এটা বোঝা দরকার। পশ্চিমবাংলায় কৃষক আন্দোলনের গতি প্রকৃতিটা ভিন্ন। ষাটের দশকের শেষ থেকে নব্বই দশক পর্যন্ত জমি ও মজুরির দাবি ছিল প্রধান। গ্রামের গরিবরা ছিল কৃষক আন্দোলনের ভিত। শ্রেণি আন্দোলন বলতে যা বুঝি তা সঠিকভাবেই পরিচালনা করছেন আমাদের পূর্বসুরীরা। এই শ্রেণি আন্দোলন সারা দেশে যত বৃদ্ধি পাবে ততই কৃষক আন্দোলন একটা মাত্রা পাবে। ঐক্যকে রক্ষা করে সেই লক্ষ্যেই কৃষক আন্দোলন এগিয়ে যাবার চেষ্টা করছে। পশ্চিমবাংলায় জোতদার জমিদার নেই। বাম-নেতৃত্বে এদের বিরুদ্ধে তীব্র লড়াই গড়ে উঠেছে। বর্তমানে ছবিটা বদলে গেছে। নব্য ধনী গ্রামবাংলায় কর্তৃত্ব করছে। জোতদার-জমিদারদের মতো এই নব্যধনীদের বিরুদ্ধে সেই ধরনের ঘৃণা নেই। জমি চাষ করে কম কিন্তু মহাজনি কারবার, ঠিকেদারি, প্রমোটারি, পেট্রোল পাম্প, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তৈরি করে ব্যবসা সহ নানা কারবারে এরা যুক্ত। এদের বড় অংশই বর্তমান শাসক দলের মদতে কারবারে ফুলে ফেঁপে উঠেছে। প্রতিদিনই গ্রামের সামাজিক ঘটনায় হস্তক্ষেপ করার ক্ষেত্রে এরা ভূমিকা নেয়। পশ্চিমবাংলার কৃষক আন্দোলনের অগ্রগতি ঘটাতে হলে শুধু কেন্দ্রীয় বা রাজ্য সরকারের জনবিরোধী নীতি নিয়ে আন্দোলন করলেই সাফল্য আসবে না, দৃষ্টি দেওয়া দরকার নব্য ধনী, যারা এই মুহূর্তে গ্রামীণ সমাজজীবনে কর্তৃত্ব করছে, তাদের বিরুদ্ধে কী ধরনের আন্দোলন গড়ে তোলা দরকার। পশ্চিমবঙ্গের কৃষক আন্দোলন থেকে অন্য রাজ্য শিক্ষাগ্রহণ করবে। কিন্তু এই রাজ্যে পরম্পরাগত ভাবে শ্রেণি-আন্দোলনের মধ্য দিয়ে কৃষক আন্দোলন শক্তিশালী হয়েছে, তাই নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে, নির্দিষ্ট ইস্যুতে গ্রামীণ শ্রেণি-বিরোধকে নির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করতে না পারলে শ্রেণি আন্দোলন গড়ে তোলা সম্ভব হবে না। এমন কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে যাতে তা গরিব কৃষক সহ খেতমজুর অংশকে প্রভাবিত করতে পারে এবং সংগ্রামে নেতৃত্ব দিতে পারে।

দুঃসময়-সুসময়

আভাস রায়চৌধুরী

একটা সময় ছিল যখন বামপন্থী রাজনীতির কর্মীদের অনেকেই বলতেন, 'ওরা' ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়িয়ে বেড়ায়। সেই সময়ে, নব্বইয়ের দশকে, সম্ভবত ইতিমধ্যে সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে গেছে, তখনকার এক বামপন্থী গায়কের গাওয়া একটা গান আমার মতো রাজনীতি করা তরুণকে অনুপ্রাণিত করত, তাতে একটা লাইন ছিল—'মোষ তাড়ানো সহজ নাকি মোষের শিঙে মৃত্যু বাঁধা...'। তারপর এই কুড়ি বছরে সময় অনেক দূর এগিয়ে গেছে, বদলে গেছে জীবন ও সমাজ সম্পর্কে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি। এ-দেশের সব থেকে বড় কমিউনিস্ট পার্টি সিপিআই(এম)-এর মধ্যে সংশোধনবাদের সন্ধান পেয়ে একসময় সেই সম্মাননীয় গায়ক অতিবিপ্লবীদের হাত ধরে এ-রাজ্যে প্রতিবিপ্লবীদের হাত শক্ত করার কাজে নিজেকে যুক্ত করে ফেললেন। এখন অনেক মানুষ বিশ্বাস করেন সর্বক্ষণের রাজনৈতিক কর্মীদের অন্য কিছু করার ছিল না বলেই রাজনীতিতে যুক্ত অথবা রাজনীতি করছে নিশ্চয় কিছু গুছিয়ে নেওয়ার আছে। শাসকশ্রেণির রাজনৈতিক দলগুলির নেতাদের কাজকর্ম এবং বিশেষত, বর্তমানে এ-রাজ্যের শাসকদলে সর্বস্তরের নেতামন্ত্রী-সাংসদ-বিধায়ক পঞ্চায়েত কিংবা পুরসভার সদস্যদের কাজকর্ম দেখে রাজনীতি সম্পর্কে সাধারণ মানুষের ঘৃণার মনোভাব তৈরি হচ্ছে। বড় অংশের মানুষ দক্ষিণপন্থী রাজনীতি আর বামপন্থী রাজনীতির পার্থক্য করতে পারছেন না। যাই হোক, আজকের দক্ষিণপন্থী আবহাওয়ায় বামপন্থী রাজনীতি সম্পর্কেও মানুষের মন-মানসিকতায় নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি শক্তিশালী হয়েছে। সেই প্রতিবাদী গায়ক তাঁর নিজের স্থান ত্যাগ করতে পারেন কিন্তু তাঁর উচ্চারিত ওই শব্দগুলি আজও অনেকে বিশ্বাস করেন—মোষ তাড়ানো সহজ নাকি মোষের শিঙে মৃত্যু বাঁধা। হ্যাঁ, এটাই সত্য। আজও অনেকেই সমাজ বদলের স্বপ্ন নিয়ে সর্বক্ষণের রাজনৈতিক কর্মী হতে চান, পেশাদার বিপ্লবী হওয়ার স্বপ্ন দেখেন।

আজ কমিউনিস্ট পার্টির কর্মীদের প্রকৃতপক্ষেই নতুন তীব্র প্রতিকূলতার মুখোমুখি হয়ে কাজ করতে হচ্ছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর এমন নজিরবিহীন প্রতিকূল পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়নি। বিশ্বপুঁজিবাদের সংকট কমার কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। সংকট থেকে বেরিয়ে আসতে সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি করার উদ্যোগ নেওয়ার পরিবর্তে সংকটের বোঝা আরো বেশি বেশি করে শ্রমজীবী ও সাধারণ মানুষের ওপর চাপানো হচ্ছে। সংকটের স্রষ্টা সেই নয়া উদারবাদীরাই যন্ত্রণাবিধুর ভুক্তভোগী মানুষের ক্ষোভকে পরিকল্পিতভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে দক্ষিণপন্থার বিকল্প হিসেবে অতিদক্ষিণপন্থাকে তুলে ধরতে সচেষ্ট। অর্থনীতির অতিদক্ষিণপন্থা রাজনীতির অতিদক্ষিণপন্থার প্রবণতাকে বৃদ্ধি করতে চাইছে।

বর্তমানে অতিদক্ষিণপন্থার রাজনৈতিক বৈশিষ্ট্যটি হল স্বৈরাচার, আধিপত্যবাদ এবং জনগণের ঐক্য ভাঙতে জাত-ধর্ম-ভাষার উগ্রতার ভিত্তিতে বিভিন্ন ধরনের সংকীর্ণ মেরুকরণকে তীব্র করা। পৃথিবীর অন্যান্য পুঁজিবাদী দেশের মতোই আমাদের দেশ ও রাজ্যে এই বৈশিষ্ট্য অত্যন্ত স্পষ্ট ও বিপজ্জনকভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। কমিউনিস্টদের রাষ্ট্রশক্তির এবং শাসকশ্রেণির শ্রেণিগত তীব্র আক্রমণের মুখোমুখি হতে হয় এবং তা মোকাবিলার লড়াইয়ে শ্রমিকশ্রেণি ও তাদের নিজস্ব হাতিয়ার কমিউনিস্ট পার্টি অভ্যস্ত। কিন্তু শ্রেণিগত আক্রমণের স্বার্থে ব্যবহৃত মেরুকরণের রাজনীতি শ্রমজীবী মানুষের গর্ব ও শক্তি-শ্রেণি পরিচয়কে ভেঙে দিতে সক্ষম হচ্ছে এবং শাসকশ্রেণিও তার শ্রেণি পরিচয় ও শোষণকে আড়ালে নিয়ে যেতে সক্ষম হচ্ছে। ফলে আজকের সংকটগ্রস্ত পুঁজিবাদের নতুনতর আক্রমণের দিনে শ্রমজীবী মানুষের ঐক্যবদ্ধ লড়াই ভাঙার কৌশল হিসেবে মেরুকরণের বিপদ সামনে চলে আসছে যা অতীতে আজকের মতো সার্বিক সামাজিক আকার নিয়ে উপস্থিত হয়নি। অনেক সীমাবদ্ধতার মধ্যেও আমাদের সমাজের যে গণতান্ত্রিক ও সহনশীল বৈশিষ্ট্য রয়েছে তাকে অসহিষ্ণুতা ও উন্মত্ততার দিকে পরিকল্পিতভাবে নিয়ে যাওয়ার শাসকশ্রেণির উদ্যোগ প্রবলভাবেই ক্রিয়াশীল।

বর্তমানে অতিদক্ষিণপন্থার রাজনৈতিক বৈশিষ্ট্যটি হল স্বৈরাচার, আধিপত্যবাদ এবং জনগণের ঐক্য ভাঙতে জাত-ধর্ম-ভাষার উগ্রতার ভিত্তিতে বিভিন্ন ধরনের সংকীর্ণ মেরুকরণকে তীব্র করা। পৃথিবীর অন্যান্য পুঁজিবাদী দেশের মতোই আমাদের দেশ ও রাজ্যে এই বৈশিষ্ট্য অত্যন্ত স্পষ্ট ও বিপজ্জনকভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। কমিউনিস্টদের রাষ্ট্রশক্তির এবং শাসকশ্রেণির শ্রেণিগত তীব্র আক্রমণের মুখোমুখি হতে হয় এবং তা মোকাবিলার লড়াইয়ে শ্রমিকশ্রেণি ও তাদের নিজস্ব হাতিয়ার কমিউনিস্ট পার্টি অভ্যস্ত।

মোদি সরকারের চার বছরের শাসনকালে আরএসএস ভারতীয় রাষ্ট্রকাঠামোর প্রতিটি স্তর ও প্রতিষ্ঠানে প্রবেশ করে ফেলেছে। এখন যে ওরা কর্পোরেট পুঁজির পাহারাদার তা মোদি সরকারের প্রতিটি পদক্ষেপেই স্পষ্ট। ভারতীয় বৃহৎ বুর্জোয়ারা এবং আঞ্চলিক বুর্জোয়ারা আজকের নয়া উদারবাদী অর্থনীতিতে বেশ অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে। অবশ্যই এই অভ্যাস

একমুখী নয়, বিরোধ-দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়েই চলেছে। সেটাই বিজ্ঞান। এদেশে নয়া-উদারনীতির শুরুর দিনগুলিতে হয়তো রাজনৈতিক স্বার্থে এবং তখনও যেহেতু ভারতীয় কর্পোরেটদের পূর্ণ সমর্থন বিজেপি-র প্রতি ছিল না তাই আরএসএস মঞ্চ তৈরি করে বিশ্বায়নের বিরুদ্ধে স্বদেশিকতার প্রচার করতো। এখন আরএসএস-এর সাথে নয়া-উদারবাদের কোনো বিরোধ নেই। এখন সামাজিক বিভেদ-বিদ্বেষের রাজনীতি কর্পোরেটের লুটের প্রতিবন্ধক হচ্ছে না। ফলে আরএসএস-কে নিয়ে কর্পোরেটেরও কোনো সমস্যা নেই! তাই তাদেরও পূর্ণ সমর্থন মোদি সরকারের প্রতি। এদেশে বর্তমানের তথাকথিত হিন্দুত্ব হল কর্পোরেট হিন্দুত্ব যা ভারতীয় রাষ্ট্রকাঠামোকে স্বৈরাচারের দিকে নিয়ে গিয়ে যুক্তরাষ্ট্রীয় ধারণাকে পঙ্গু করতে চায়। পাশাপাশি বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের পরিবর্তে বৈচিত্র্যের বিকৃতি ঘটিয়ে সমাজ-সংস্কৃতিতে খণ্ড-বোধকেই প্রতিষ্ঠা করতে চায়। খণ্ডচেতনাই সাম্প্রতিক সময়ে আরএসএস-বিজেপিকে নির্বাচনী লাভ দিয়ে চলেছে। অর্থাৎ রাষ্ট্রকাঠামোয় স্বৈরাচারকে চ্যালেঞ্জহীন রাখতে সামাজিক মেরুকরণকে শক্তিশালী করা। এক্ষেত্রে লক্ষ্য গণতন্ত্রের পরিবর্তে স্বৈরশাসন এবং তা অবশ্যই সংকীর্ণতা ও ঘৃণার বুনিয়াদের ওপর প্রতিষ্ঠিত। এটাই হলো আরএসএস-এর মতাদর্শের প্রয়োগ। আইনবিভাগ, শাসনবিভাগ, বিচারবিভাগ, শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে প্রতিটি স্তরেই আজ এই স্বৈরশাসনের চেহারাকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। আমাদের রাজ্যেও ভাষা ও রঙের পার্থক্য থাকলেও এই একই স্বৈরাচারী কায়দাকে আপাত সাফল্যের সাথে প্রয়োগ করছে তৃণমূল কংগ্রেস। এ-বারের পঞ্চায়েত নির্বাচনে প্রশাসন, তৃণমূল কংগ্রেস এবং সমাজবিরোধীদের দুষ্টচক্রের দ্বারা জনগণের এমনকি শাসকদলের কর্মী-সমর্থকদেরও গণতান্ত্রিক অধিকার লুণ্ঠিত হল। দেশব্যাপী আরএসএস যে বিদ্বেষ ও ঘৃণার পরিবেশ তৈরি করছে এরাজ্যে তাকে পূর্ণভাবে ব্যবহার করছে তৃণমূল কংগ্রেস। রাজ্যের সাম্প্রদায়িক মেরুকরণে তা আবার বাড়তি উপাদান তৈরি করছে। এরাজ্যেও স্বৈরচার দাঁড়িয়ে আছে সন্ত্রাস, লুঠ ও সামাজিক মেরুকরণের বুনিয়াদের ওপর। পিছনে চলে যাচ্ছে, আক্রান্ত হচ্ছে কৃষকের ফসলের দাম, বেকারের কাজ, শ্রমিকের ন্যূনতম মজুরি, পেনসন, কাজের নিরাপত্তা, সামাজিক সুরক্ষা, ছাত্রের শিক্ষার অধিকার, নারীর নিরাপত্তা ইত্যাদি ইত্যাদি সাধারণ মানুষের জীবনজীবিকার সমস্যাগুলো।

সত্তরের দশকে এ-দেশে এ-রাজ্যে স্বৈরাচার সমাজ-রাজনীতিকে দখল করেছিল। তা দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। সাধারণ মানুষের মধ্য থেকেই দ্রুত তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছিল। মানুষের প্রতিবাদের ভাষাকে মূর্ত করতে গণতান্ত্রিক শক্তি সক্ষম হয়েছিল। এ-রাজ্যে এ-দেশে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের সংগ্রামে উজ্জ্বল অবদান রেখেছিল বামপন্থীরা, কমিউনিস্ট পার্টি। আজও স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের সংগ্রাম চলছে। কিন্তু বদলে যাওয়া সমাজ-অর্থনীতি-সংস্কৃতিতে এই লড়াইয়ের সামনে প্রতিবন্ধকতার ধরন বদলেছে। নয়া-উদারবাদ বিশ্বব্যাপী ব্যক্তিমানুষকে 'সুপারইন্ডিভিজুয়াল' জৈবিক যন্ত্রে পরিণত করেছে, ব্যক্তির অন্যায়ের প্রতিবাদ করার মন ও সাহসকে এখন প্রতিস্থাপন করতে চাইছে 'ঝামেলায় গিয়ে কী লাভ' গোছের মানসিকতা। আসলে এটা হল কালচারাল জেনোসাইডের পরিণতি। আজকে নয়া-উদারবাদের অন্যতম 'বাফার' উন্নয়ন-তত্ত্বে ইন্ডিভিজুয়াল বেনিফিসিয়ারি তৈরি করা। আমাদের দেশ ও রাজ্যের স্বৈরশাসকেরা খুব দক্ষতার সাথেই একে ব্যবহার করছে। মনে প্রাণে সন্ত্রাস ও স্বৈরাচারকে ঘৃণা করা সুপারইন্ডিভিজুয়াল মানুষেরাও সন্ত্রাসের সামনে একই সাথে অসহায় ও সুযোগসন্ধানী হয়ে উঠছেন।

মানবসমাজে 'সংস্কৃতি'-র সূতিকাগার হল যৌথজীবন। এখন এই যৌথ সামাজিক জীবন, সামাজিক দায়বদ্ধতা প্রবলভাবে আক্রান্ত। মানুষের জীবনবোধের প্রতিটি ক্ষেত্রেই তার প্রতিফলন স্পষ্ট। এ বিষয়টি বহু আলোচিত এবং এই নিবন্ধের মূল আলোচ্য নয়, তাই এ-বিষয়ে ব্যাখ্যার কোনো প্রয়োজন এখানে সম্ভবত নেই। সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকে ব্যক্তি যখন নিজেকে প্রত্যাহার করে, তার প্রধান পরিণতিটা হল রাজনীতি ও রাষ্ট্রকাঠামোয় বেঠিক ও অবাঞ্ছিত লোকেরা প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়।

আমাদের চারপাশে চোখ রাখলেই দেখতে পাওয়া যাচ্ছে এই ক-বছরের মধ্যে আমাদের দেশ ও রাজ্যের শাসকশ্রেণির রাজনীতিতে লুটেরা ও দুর্নীতিগ্রস্ত লোকেরাই ক্রমশ রাজনীতির প্রধান চরিত্র হয়ে উঠছেন। সুপরিকল্পিতভাবে রাজনীতির ধারণাটাকেই ভেঙে ফেলা হচ্ছে। প্রথমত, বিভিন্ন কায়দায় জাত-ধর্ম-ভাষা ইত্যাদি সংকীর্ণ পরিচিতির ভিত্তিতে ক্ষমতার অনুশীলন। দ্বিতীয়, অর্থ কিংবা অন্য কিছু ব্যক্তিগত প্রাপ্তির বিনিময়ে জনমত গঠনের প্রচেষ্টা। এখানে বামপন্থার শ্রেণিভিত্তিক রাজনীতির আবেদনটা লঘু হয়ে যাচ্ছে। অবশ্য রাজনীতি সব সময়েই শ্রেণি সংগ্রাম, তা যে কৌশলেই উপস্থিত করা হোক না কেন। কিন্তু শ্রেণির প্রশ্নটি আপাতত চেতনার বাইরে পাঠিয়ে দিতে পারলে বাম রাজনীতির মূল শক্তি শ্রমিকশ্রেণি ভ্রান্ত চেতনার শিকার হয়ে শ্রেণি-শত্রুর সম্পর্কে বোধটাই হারিয়ে ফেলবে। এবং ফেলছেও তাই। আজকের বামপন্থী রাজনীতির সামনে এটা বড় বিপদ।

আজকের পৃথিবীতে ব্যক্তির চেতনা নির্মাণে মিডিয়ার ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মিডিয়া বলতে শুধু সংবাদ পরিবেশন নয়, মিডিয়া এখন বড় বিনোদন-মাধ্যম। আচ্ছা, আমাদের কি কখনো মনে হয় না যে, মিডিয়া কেন এত বেলাগাম অবক্ষয়ী বিষয়বস্তু উপস্থাপন করে চলেছে, কেন শ্রমিকশ্রেণির দর্শন ও রাজনীতির বিরুদ্ধে এত প্রচার করে চলেছে? এর একটা সহজ উত্তর হল মিডিয়ার মালিক হল দেশি-বিদেশি কর্পোরেটগুলো। এতে উত্তরটা সম্পূর্ণ হয় না। আসলে পুঁজিবাদ আর শাসকশ্রেণির সংকট বাড়ছে তীব্রভাবে। এই সংকট থেকে উদ্ধার পাওয়ার কোনো লক্ষণ নেই। তাই সংকটগ্রস্ত শ্রমজীবী মানুষের প্রতিবাদ, বিক্ষোভ, সক্রিয়তা ও গতিশীলতার অভিমুখকেই সদররাস্তা থেকে কানাগলির দিকে ঘুরিয়ে দিতে চাইছে মিডিয়া। পুঁজিবাদ এক সময় যে আধুনিকতার জন্ম দিয়েছে, তাকে লালন করেছে, সেই আধুনিকতাই এখন তার কাছে বিপদস্বরূপ। আধুনিকতা মানে যুক্তিবাদ, এই যুক্তিবাদ পৃথিবীর মানুষকে শোষণমুক্তির চওড়া রাস্তায় পৌঁছে দিয়েছে। বিংশ শতকের পৃথিবীতে পুঁজিবাদকে পৃথিবীর দেশে দেশে শ্রমিক-বিপ্লবের মুখোমুখি হতে হয়েছে, আবার তার মুখোমুখি হতে সে চায় না। বিশ্ব-পুঁজিবাদের দৈত্যাকার সংকট অদূর ভবিষ্যতে পৃথিবীকে এই মোড়ের দিকে নিয়ে যেতে পারে যেখান থেকে বামপথে গেলে বিপ্লবী আবহাওয়া সৃষ্টি হতে পারে আর বিপরীতে দক্ষিণমুখী হলে দেশে দেশে প্রতিবিপ্লবীরা আরও শক্তিশালী হয়ে উঠবে। আমাদের দেশও পৃথিবীর এই আবর্তের বাইরে নেই।

প্রকৃতিগতভাবে মানুষ সক্রিয়, সমাজ পরিবর্তনের জীবন্ত উপাদান। তাই ব্যক্তিমানুষের সক্রিয়তাকে প্রগতির পথ থেকে সরিয়ে এনে প্রতিক্রিয়ার দিকে টেনে রাখার বিরামহীন প্রচেষ্টা চলছে। একদিকে আধুনিকতার নামে শিকড়হীন জীবনবোধের চাষ করে আধুনিকতার ভিত্তিকে আঘাত করা হচ্ছে, অন্যদিকে জীবনদর্শন ও জীবনচর্যায় মধ্যযুগ ফিরিয়ে এনে আধুনিকতাকে চ্যালেঞ্জ জানানো হচ্ছে। এই উভয়মুখী আক্রমণের লক্ষ্য আধুনিকতা সম্পর্কে বিভ্রান্তি ও সন্দেহের মনোভাব গড়ে তোলা। তার ফলে যুক্তিবাদ আক্রান্ত

হবে, শক্তিশালী হয়ে উঠবে ব্যক্তি মানুষের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকার হরণ আর শোষণ-ব্যবস্থার চিরস্থায়ীকরণের চিন্তাভাবনা ও কাজকর্ম। শ্রমিকশ্রেণি হল আধুনিক যুগের ফসল। আধুনিকতা আক্রান্ত হলে শেষ পর্যন্ত আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু শ্রমিকশ্রেণি ও কমিউনিস্ট পার্টি। সেই জন্যই তো এ-দেশে এ-রাজ্যের ফলিত রাজনীতিচর্চায় বিজেপি ও তৃণমূলের সাধারণ আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু সব ধরনের আধুনিক প্রগতিশীল চিন্তাভাবনা এবং বামপন্থীরা, বিশেষত সিপিআই(এম)।

আসলে কমিউনিস্ট পার্টি করাটা তো এই সমাজের অন্য পাঁচটা শসকশ্রেণির পার্টির মতো নয়। তার মূল লক্ষ্য হল সমাজ থেকে শ্রেণি-শোষণের উচ্ছেদ ঘটানো, যার প্রতিটি পদক্ষেপই হল বিভিন্ন মাত্রায় শ্রেণি-সংগ্রামের প্রকাশ। আমরা এ দাবি করতে পারি না যে আমাদের মধ্যে সব সময় লক্ষ্য সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা গড়ে উঠছে। আজকের পরিস্থিতি কমিউনিস্ট পার্টি করা তাই সহজ নয়, বড় কঠিন কাজ। অথচ বাস্তব পরিস্থিতি তো এখন কমিউনিস্ট পার্টির কাছে সুসময়। একদিকে কোটি কোটি মানুষ নিরন্ন উপবাসী, অন্যদিকে সম্পদের পাহাড়প্রমাণ কেন্দ্রীভবন। একটা দুটো তিনটে চারটে নির্বাচনে কিংবা অসংখ্য দাবি আদায়ের সংগ্রামে শ্রমজীবী মানুষ হেরে যেতে পারে, কিন্তু লড়াইয়ের মধ্যে থাকলে অর্জিত অভিজ্ঞতা তার যে নব নব চেতনার নির্মাণ ঘটাবে তাতে আপাত পরাজয়গুলিতে শ্রমিকশ্রেণি হীনবল হয় না, বরং শক্তিশালী হয়। এটা কোনো স্বপ্নসন্ধানীর ভাবালুতা নয়, সমাজবিকাশের ধারার অনিবার্য অভিমুখ। আজ পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে শ্রমজীবীদের সংগ্রামে আগামীর সম্ভাবনার বার্তা আছে। আমাদের দেশের শ্রমিকশ্রেণি কি তার সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক অনুভব করছে না? মনে তো হয় করছে, কারণ এদেশেও শ্রমিক-কৃষক সহ সাধারণ মানুষের ক্ষোভ আর আন্দোলনের মাত্রা বাড়ছে। যেন কোনো তরল ব্যাখ্যা না করি যে, এই আন্দোলনগুলিই দ্রুত দেশের পরিস্থিতিকে বিপ্লবী অভিমুখে নিয়ে যাবে। না, তার কোনো সম্ভাবনা এখনই নেই, তবে আজকের ছোটোবড়ো আন্দোলনগুলি কি ভবিষ্যতের প্রদীপের সলতে পাকানোর কাজ করবে না? নিশ্চয় করবে। এবং করাতেও হবে। এটাই তো কমিউনিস্ট পার্টির সংগঠকদের কাজ। ভবিষ্যতের সমাজ বদলের সংগ্রামের সাথে আজকের ছোটোবড়ো লড়াইয়ের যোগসূত্র গড়ে তোলাই কমিউনিস্ট এবং কমিউনিস্ট হতে চাওয়া প্রতিটি রাজনৈতিক কর্মীর কাজের মূল লক্ষ্য।

আজকের সংকট, আজকের সামাজিক বিভাজন, আজকের সন্ত্রাস আর স্বৈরাচার আমাদের সামনে বিরাট বড় বাধা বটেই, কিন্তু এ বাধা চিরস্থায়ী নয়। সন্ত্রাস আর স্বৈরাচারের মুঠি আলগা হতে সময় লাগে না। রাজ্যে কিংবা দেশে শ্রমিক-কৃষক আন্দোলনে মানুষের অংশগ্রহণ আর মেজাজ কি স্বৈরাচারীর মুঠি শক্ত হওয়ার না কি দুর্বল হওয়ার ইঙ্গিত? নজিরবিহীন সন্ত্রাসের সামনেও বিগত পঞ্চায়েত নির্বাচনে মানুষের প্রতিরোধী মানসিকতা কিসের ইঙ্গিত দেয়? 'স্বৈরাচার শেষ কথা বলে না, শেষ কথা বলে জনগণ'—কথাগুলি কি আপ্তবাক্য হয়ে থাকবে আমাদের কাছে, না কি উপলব্ধির বিষয়বস্তু হয়ে উঠবে? তীব্র অন্ধকারের মধ্যে সম্ভাবনার যে রুপোলি রেখা দেখা যাচ্ছে তাকে প্রসারিত করাই এই সময়ে অন্যতম বিপ্লবী কাজ। এখানেই কমিউনিস্ট কর্মীদের চিন্তার ও কাজের সক্রিয়তার বিষয়টি নির্ণায়ক হয়ে ওঠে।

সমস্যাটা এখানেই। এক বড় অংশের কর্মী, সংগঠক ও নেতৃত্ব বর্তমান পরিস্থিতিতে যতটা সক্রিয় হওয়া দরকার ততটা সক্রিয় হতে পারছেন না। একাংশ মনে করছেন পরিস্থিতির পরিবর্তন হোক, তারপর বাকিটা। পরিস্থিতি আপনা থেকে পরিবর্তন হয় না, পরিবর্তন করতে হয়। অবশ্যই বাস্তব পরিস্থিতিতে পরিবর্তনের উপাদান ও সম্ভাবনা থাকতে হবে। কিন্তু উপাদান আর সম্ভাবনা থাকলেই পরিস্থিতির পরিবর্তন হয় না, তাকে পরিবর্তন করতে মানুষের সক্রিয় ভূমিকা লাগে। যারা মনে করছেন যে পরিস্থিতি পরিবর্তন তো হতে শুরু করেছে, আর একটু অপেক্ষা করি, মানুষের মধ্যেও পরিবর্তন আপনা থেকেই হবে। না, এটা বস্তুবাদী ভাবনা নয়, যান্ত্রিক বস্তুবাদ। যান্ত্রিক বস্তুবাদের ধারণায় মানুষের কোনো সক্রিয় জীবন্ত ভূমিকা থাকে না, তারা মনে করে মানুষ হল প্রকৃতির নির্দেশপ্রাপ্ত যন্ত্রবিশেষ। যারা মনে করছেন পরিস্থিতির পরিবর্তনের সাথে সাথেই মানুষের পরিবর্তন হবে তারা আসলে সচেতনভাবেই দার্শনিক সীমাবদ্ধতার শিকার। এবং তাদের এই বোধের সীমাবদ্ধতা পরিবর্তনকামী মানুষকে প্রতিবিপ্লবের শিকারবস্তুতে পরিণত করতে সাহায্য করে। আমাদের চেনা পরিবেশেই তো আমাদের অনুপস্থিতি, নিষ্ক্রিয়তা রাজ্যে তৃণমূল কংগ্রেসের শাসনে বিক্ষুব্ধ মানুষকে আরও প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির দিকে ঠেলে দিচ্ছে না কি?

আজকের এ-দেশ এ-রাজ্যের মানুষ স্বৈরশাসন থেকে মুক্তি চাইছেন, জীবন-জীবিকার ওপর নয়া-উদারবাদের আক্রমণের বিরোধিতা করতে চাইছেন। এই পরিস্থিতিতে বামপন্থীদের সক্রিয় ভূমিকাই মানুষের মধ্যে আস্থা সৃষ্টি করবে, মানুষের ক্ষোভ ও পরিবর্তনের আকাঙ্ক্ষাকে গণতান্ত্রিক প্রগতিশীল দিকে নিয়ে যেতে পারবে। এই কাজে নেতৃত্ব দিতে হবে কমিউনিস্ট পার্টিকে, এ-দেশ এ-রাজ্যে সিপিআই(এম)কে। আর এই কাজের পূর্বশর্ত পার্টির সমগ্র কাঠামোয় সাংগঠনিকভাবে নিষ্ক্রিয়তার সমস্যা দূর করা। এই কাজ করতে হলে সাংগঠনিক উদ্যোগের ধারাবাহিকতা দরকার। দরকার পার্টি-সংগঠনকে সুবিন্যস্ত করা। সিপিআই(এম) প্লেনাম সেই আহ্বানই রেখেছে। কমিউনিস্ট পার্টির তৎপরতা নির্ভরশীল ব্যক্তি-বিপ্লবীর একক সক্রিয়তা এবং সক্রিয় বিপ্লবীদের যৌথ চিন্তা ও কর্মকাণ্ডের মেলবন্ধনে। তবেই সামগ্রিক বৈপ্লবিক ঐকতান (রেভলিউশনারি হারমনি) সৃষ্টি হতে পারে। আজ এই কাজের পূর্বশর্ত পার্টি সংগঠক ও কর্মীদের যে অংশ যান্ত্রিক বস্তুবাদের ভ্রান্তচেতনার শিকার হচ্ছেন তাদের চিন্তার সংশোধন ঘটানো। এই প্রকৃতি-জগতে মানুষ তার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করেছে তার সক্রিয়তা দিয়ে। মানুষ প্রকৃতিতে শুধুমাত্র টিকে থাকার সংগ্রাম করে না, তার সাথে সাথে প্রকৃতিকে পরিবর্তনও করে। আবার প্রকৃতিকে পরিবর্তনের প্রক্রিয়ায় মানুষ নিজেকে পরিবর্তন করে নেয়। প্রকৃতিতে মানুষের এই জীবন্ত বৈশিষ্ট্যই হল মার্কসবাদের দার্শনিক ভিত্তি এবং সারমর্ম। আজকের পরিস্থিতি পরিবর্তনের জন্য কমিউনিস্ট পার্টির কর্মীদের পরিবর্তনের কাজে সক্রিয় হতে হবে। এবং তা করার আগে নিজেদেরও পরিবর্তন করে নিতে হবে। অভ্যাসবাদের ছোট্ট কুঠুরি থেকে বেরিয়ে এসে চিন্তা ও কাজের ধারার উন্নত ও বিকাশমান সদর দরজায় দাঁড়াতে হবে। এ-কাজ খুবই কঠিন কিন্তু অসম্ভব নয়। কমিউনিস্ট পার্টি করাটা আসলে নতুন জীবনবোধ গড়ে তোলার সংগ্রাম, যার মূল লক্ষ্যটা হল সমাজ থেকে চিরকালের মতো শোষণের উচ্ছেদের জন্য সংগ্রাম করে যাওয়া। ব্যক্তিবাদকে বিসর্জন দিয়ে সমাজভাবনার বীজ বপন করে যাওয়া। আজকের পৃথিবীতে তা সহজ নয়, শ্রেণিসমাজে কোনো দিনই তা সহজ ছিল না। তাই বাইরের বৃহত্তর শ্রেণি ও গণসংগ্রামের সাথে সাথেই একজন কমিউনিস্ট কর্মীকে নিজের ভিতরেও লড়াই জারি রাখতে হবে। মতাদর্শ ও লক্ষ্যের প্রতি অবিচল থেকে পরিস্থিতি পরিবর্তনের সাথে নিজেকে পরিবর্তন করে পরিস্থিতি পরিবর্তনের গতিমুখে ইতিবাচক হস্তক্ষেপ ও নেতৃত্ব দেওয়ার দক্ষতা অর্জন করতে হবে।

With best compliments of

SRB REFRACTORIES ENTERPRISE LTD.

61, Kankulia Road, Flat No. 202B, 2nd Floor, Kolkata-700 029, WB
Mob. 9832195056, 9647901550, E-mail : sgupta.srbc@gmail.com

Specialist in

MAKING ALL TYPES OF BAKING, RE-BAKING FURNACES, TUNNEL, GRAPHITISATION UNIT, CIVIL, ANNUAL MAINTAINANCE OF ANY TYPES OF FURNACES, CASTING REFRACTORY SPECIALIST.

Sl. No. 84

ভারতে সক্রিয় ও নিষ্ক্রিয় হিন্দুত্বের রাজনীতি

হরিহর ভট্টাচার্য

প্রখ্যাত ভারতীয় মার্কসবাদী তাত্ত্বিক অচিন বিনায়ক ২০১৭ সালে প্রকাশিত তাঁর একটি বইয়ে এদেশের হিন্দুত্বের রাজনীতিকে দুভাগে ভাগ করেছেন—(১) প্রোগ্রামেটিক এবং (২) প্র্যাগমেটিক। প্রথমটি বেশ সুশৃঙ্খল এবং একটি সমগ্র রাজনৈতিক মতাদর্শ—যদিও এক ভ্রান্ত মতাদর্শ। দ্বিতীয়টির চরিত্র 'যখন যেমন তখন তেমন' অর্থাৎ মতাদর্শগতভাবে অসাম্প্রদায়িক এবং ধর্মনিরপেক্ষ কিন্তু ক্ষেত্রবিশেষে ঠিক তার বিপরীত কার্যকলাপ। বলাবাহুল্য, প্রথমটির উদাহরণ ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি) সহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক সংগঠন ও গোষ্ঠী। দ্বিতীয়টির উদাহরণ হল কংগ্রেস দল। দ্বিতীয়টির অন্যান্য নামকরণও দৈনন্দিন পত্রপত্রিকায় পাওয়া যায়। যেমন 'নরম হিন্দুত্ব' এবং 'নিষ্ক্রিয় হিন্দুত্ব'।

তাদের মধ্যে পদ্ধতিগত ভিন্নতা রয়েছে, অর্থাৎ একজন প্রোগ্র্যামেটিক ও অন্যজন প্র্যাগমেটিক। দ্বিতীয়টির অবশ্য নানা ধরনের আঞ্চলিক ও রাজ্যভিত্তিক সংস্করণ আছে।

□

প্রথমটির অর্থাৎ 'পূর্ণ' হিন্দুত্ববাদী সাম্প্রদায়িকতার ইতিহাস এদেশে বেশ পুরোনো এবং বহু দশক ধরে তা হিন্দু সংস্কৃতির একটা মনগড়া, অলীক ধারণার ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের জন্মলগ্ন (১৯২৫) থেকে এই মতাদর্শ ভারতের বিভিন্ন জায়গায় তার শেকড় গেড়েছে। এই বিষয়টি বহুচর্চিত এবং বিতর্কিত। ভারতের মতো একটি বহু সংস্কৃতির দেশে অতি স্বাভাবিক যে বহুস্বর তার প্রাণ। অথচ এই ভ্রান্ত মতাদর্শ তার স্থানে একক স্বর ও সংস্কৃতির ধারণা প্রচার করে। এই কাজটি করতে গিয়ে এই হিন্দুত্ববাদীরা যে কেন্দ্রীয় ধারণাটির ওপর নির্ভর করে সেটি আসলে আধুনিক, ধর্মনিরপেক্ষ ও গণতান্ত্রিক চরিত্রবিশিষ্ট। সে ধারণাটি হল 'নেশন', যেটি পাশ্চাত্য ইতিহাস ও সংস্কৃতি সঞ্জাত। ভারতের ইতিহাসে তার সমতুল কোনো ধারণা গড়ে ওঠেনি। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সেই কারণেই ইংরেজি শব্দ 'Nation'-এর কোনো প্রতিশব্দ ব্যবহার না করে বাংলায় 'নেশন' শব্দটিই ব্যবহার করে গেছেন। ভারতে পাশ্চাত্যের অনুরূপ কোনো নেশনের ধারণা গড়ে না ওঠা বা দেশের শব্দভাণ্ডারে সেটি না থাকা, সেটা দেশের কোনো দুর্বলতার সূচক নয়। এক অর্থে এটাই স্বাভাবিক যে এই বহুসাংস্কৃতিক ও বহু-ইতিহাসের দেশে সে-রকম কোনো একক, একীভূত ও সমজাতীয় ধারণা গড়ে ওঠেনি। রাজনীতি-বিজ্ঞানের ছাত্র-গবেষকরা জানেন, পাশ্চাত্যে যে জাতির ধারণা গড়ে ওঠে (১৭৮৯ সালে ফরাসি বিপ্লবের পর) সেটি ছিল রাজনৈতিক, কেননা একক রাষ্ট্রের ধারণাটিও এর হাত ধরাধরি করে গড়ে ওঠে, জাতির ঠিক উল্টো পিঠ হিসেবে। ওইসব দেশে তাই 'একজাতি এক রাষ্ট্রের' নীতি দানা বাঁধে এবং সার্বিক রূপ পায়। পাশ্চাত্যের অভিজ্ঞতা থেকে এটাও জানা যায় যে, যে আধুনিক সমাজ সেখানে গড়ে ওঠে তা ছিল রাষ্ট্রকেন্দ্রিক। রবীন্দ্রনাথের তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণে ওই ঐতিহ্যে প্রাচীন গ্রীক সভ্যতার অবদান স্বীকার করা হয়েছে। ভারতে তথাকথিত হিন্দুত্ববাদীরা এক কল্পিত হিন্দু নেশনের ধারণার ওপর তাদের মতাদর্শকে দাঁড় করাবার চেষ্টা করেছেন। অথচ ভারতের ইতিহাস ঠিক তার বিপরীত শিক্ষা দেয়। গবেষকরা দেখিয়েছেন এদেশের সমাজ বহুকাল ধরে ছিল স্বয়ংশাসিত। এবং রাষ্ট্রের অবস্থান সেখানে বরাবর ছিল প্রান্তিক। যদিও দৈনন্দিন জীবনে রাষ্ট্রের একটা প্রভাব থাকত তার বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়কে আর্থিক সাহায্য ও অনান্য পৃষ্ঠপোষকতার মাধ্যমে। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক রোমিলা থাপার (২০১৮) বলেছেন, পশ্চিম ভারতের ইতিহাসে এমনও দেখা গেছে যে অ-মুসলিম রাজা মুসলিমদের জন্য মসজিদ তৈরিতে সাহায্য করেছেন। এবং এর উল্টো উদাহরণও কোনো কোনো জায়গায় দেখা গেছে। হিন্দুত্ববাদের আদি ঘরানার তাত্ত্বিকরা (সাভারকার, গোলওয়ালকার প্রমুখ) হিন্দু নেশন কী তার ব্যাখ্যা দেওয়ার কম চেষ্টা করেননি। এঁরা নির্দ্বিধায় নেশনকে একটি ধর্মীয় বর্গ বলে মেনে নিয়েছেন, সেটা সর্বাংশে ভুল। সূক্ষ্ম বিচারে নেশন একটি ধর্মনিরপেক্ষ বর্গ। কিন্তু সরাসরি ধর্মভিত্তিক না হলেও জাতিগত শ্রেষ্ঠত্ববোধও কোন স্তরে পৌঁছাতে পারে, হিটলারের নাৎসিবাদ ও মুসোলিনির ফ্যাসিবাদ তারই ঐতিহাসিক উদাহরণ।

আর একটি প্রশ্ন অত্যন্ত জরুরি। এদের 'হিন্দু'-র সংজ্ঞা অত্যন্ত সংকীর্ণ এবং নঞর্থক বা নেতিবাচক। এরা মুসলমান ও খ্রিস্টান বিরোধী—যেটা সনাতন হিন্দু সমাজবিরোধী। রোমিলা থাপার (২০১৮) দেখিয়েছেন যে প্রাচীন হিন্দু সমাজে, তা সে যে-কোনো অঞ্চলেরই হোক না কেন, একটা বহুত্বের নীতি বা আদর্শের জায়গা ছিল। ভারতের প্রধান যে গ্রামীয় সমাজ সে শত শত বৎসর ধরে বহুত্ব তথা ভিন্নতার সঙ্গে সহবাস করেছে—তাদের দৈনন্দিন জীবনধারাও সেই বহুত্বের মধ্য দিয়েই পালিত হয়েছে। এই সমাজে ভিন্নতার সংস্কৃতি একে অন্যের প্রতি সহনশীল করে রেখেছে। এমনকি মধ্যযুগের ভারতেও কোনো বিশুদ্ধ হিন্দু বা বিশুদ্ধ মুসলিম সমাজ গড়ে ওঠেনি। প্রতিটি স্তরে ভারতীয় সমাজ এই মিশ্র সংস্কৃতির পরিচয় বহন করে। জানা যায় যে, এদেশের বিভিন্ন উপজাতি-অধ্যুষিত এলাকায় মহরম স্থানিক সংস্কৃতির সঙ্গে মিশে এক সমন্বিত রূপ ধারণ করেছে, যেখানে উপজাতিরা তাদের 'মহরম উৎসবে' উৎসাহের সাথে যোগদান করে। তৃণমূল স্তরে এ এক মিশ্র সংস্কৃতির নজির। এই মিশ্র সংস্কৃতিসমূহ ধর্মনিরপেক্ষতা না বুঝলেও, ধর্মীয় সহাবস্থান ও পারস্পরিক আদানপ্রদানকে তাদের প্রাত্যহিক জীবনচর্যার সঙ্গ করে রেখেছেন। হিন্দুবাদীরা যে তথাকথিত

হিন্দুধর্মের কথা বলেন তা রাজসভার ব্রাহ্মণ্যবাদী ধর্ম। রাজসভার ইসলামও ছিল যথেষ্ট গোঁড়া, যদিও মহামতি আকবর ছিলেন এক ব্যতিক্রম। এ-প্রসঙ্গে রোমিলা থাপার অভিযোগ করেন যে এদেশে ধর্মনিরপেক্ষতার চর্চা ইসলামের ইতিবাচক ভূমিকাকে তেমন গুরুত্ব দেয়নি।

এখন দেখা যাক হিন্দু কারা? সাভারকার এ প্রশ্নের সদুত্তর দিতে পারেননি। স্বাধীন ভারতে, যতদূর জানা যায়, ১৯৫৫ সালের হিন্দু বিবাহ আইনে হিন্দু কারা তার একটা 'অফিসিয়াল' ভাষ্য পাওয়া যায়, যদিও সেই ভাষ্যটিও নেতিবাচক : যারা মুসলমান, খ্রিস্টান, পার্সি ও ইহুদি নয় তারাই হিন্দু। এই সংজ্ঞায় শিখ, বৌদ্ধ ও জৈনদের অন্তর্ভুক্ত করা আছে যেটা তাঁরা মানতে পারেননি এবং মানার কথাও নয়। জন্মসূত্রে হিন্দুর সংজ্ঞা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু এখানে তাই করা হয়েছে। জন্মসূত্রে শিখ, জৈন ও বৌদ্ধরা কী করে হিন্দু হন, তা বোঝা যায় না। একথা সকলেই জানেন, মুসলমান বা খ্রিস্টান ধর্মের মতো হিন্দু ধর্মের না আছে কোনো নির্দিষ্ট গ্রন্থ বা প্রতিষ্ঠান; হিন্দু হওয়ার জন্য যা প্রয়োজনীয় তা হল কতকগুলো রীতিনীতি, বা আচার অনুষ্ঠান মেনে চলা। এগুলিরও আবার নানা স্থানিক ও আঞ্চলিক ভিন্নতা আছে।

তত্ত্বের জায়গায় নানা অসঙ্গতি ও পরস্পরবিরোধী নীতি-আদর্শ থাকলেও বাস্তবে হিন্দুত্ব-রাজনীতি করায় কোনো অসুবিধা নেই। রাজশক্তি/রাষ্ট্রক্ষমতা কেন্দ্র বা রাজ্যস্তরে সহায় থাকলে তো সোনায় সোহাগা। ২০১৪-এ বিজেপি কেন্দ্রে ও পরে একাধিক রাজ্যে ক্ষমতায় আসার পর সংখ্যালঘু মুসলমান, খ্রিস্টান ও অন্যদের ওপর আক্রমণ নামিয়ে এনেছে। সে আক্রমণের নানা রূপ। কেন্দ্রীয় গৃহমন্ত্রকের অধীন জাতীয় অপরাধ ব্যুরো (এনসিআরবি)-র তথ্য অনুযায়ী ২০১৪-১৭ এই তিন-চার বছরে এদেশে সাম্প্রদায়িক হিংসাজনিত ঘটনা (দাঙ্গা, পিটিয়ে মারা, ঘর জ্বালিয়ে দেওয়া, গোমাংস বাড়িতে আছে সন্দেহে পিটিয়ে হত্যা করা ইত্যাদি) বেড়েছে ৪১ শতাংশ। বিহারে যেখানে ২০১৬-র আগে পর্যন্ত কোনো এরকম ঘটনা ঘটেনি, সেখানে ২০১৬ সালে ৮০০টি ঘটনা ঘটে, যার হিসেব হচ্ছে ৮০০ শতাংশ। আর এক হিসেব বলছে, মোদি যে বছর ক্ষমতায় আসেন (২০১৪), সে বছরই ৬০০টি এ-রূপ ঘটনা ঘটে। উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র গুজরাট, কর্নাটক ইত্যাদি রাজ্যগুলির সাম্প্রদায়িক হিংসার রেকর্ড অন্য রাজ্যের তুলনায় অনেক বেশি। যখন কংগ্রেসের নেতৃত্বে ইউপিএ সরকার কেন্দ্রে শাসন করে (২০০৪-১৪) তখন অবশ্য স্বর্ণযুগ ছিল না। এক হিসেব অনুযায়ী ২০০৮-এ ৯৪৩টি সাম্প্রদায়িক হিংসার ঘটনা ঘটে যাতে ১৬৭ জন মানুষ মারা যায়। এখানে 'নিষ্ক্রিয়' হিন্দুত্ব বেশ সক্রিয় হয়ে ওঠে।

আজ ভাববার বিষয় ১৯০৬ সালে মুসলিম লীগের জন্মের সঙ্গে কংগ্রেসের হিন্দুয়ানির কী সম্পর্ক ছিল? কেন মুসলিমরা মনে করল যে কংগ্রেস একটি হিন্দুদের দল এবং মুসলমানরা সেখানে থাকবে না—সেটা গবেষণার বিষয়। গোটা বিষয়টি ব্রিটিশ সরকারের খেলা বললে সত্যের অপলাপ হতে পারে। কংগ্রেস পরবর্তীকালে 'যখন যেমন তখন তেমন' হিন্দুত্বের রাজনীতি করেছে তার ঐতিহ্য মেনেই। ১৯৮৪ সালে ইন্দিরা গান্ধী হত্যার পর দিল্লিতে যে ভয়াবহ শিখনিধন দাঙ্গা হয়, তাতে কংগ্রেসের 'নিষ্ক্রিয়' হিন্দুত্ব বেশ সক্রিয় হয়ে ওঠে।

□

এবার 'নিষ্ক্রিয়' বা 'নরম হিন্দুত্ববাদী'-দের কথা বলা যাক্। গোটা দেশের জন্য সক্রিয় হিন্দুত্ববাদীরা একক এক এজেন্ডা ঠিক করে দিয়েছে। যদি রাজনীতি করতে চাও, ভোটে জনসমর্থন আদায় করতে চাও, তাহলে হিন্দু দেবদেবীর শরণাপন্ন হও। মন্দিরে-মন্দিরে (বিশেষ করে যেগুলি বিখ্যাত) পূজা দাও, সঙ্গে যেন মিডিয়া থাকে; মন্দিরের পুরোহিত যেন তোমার কপালে জয়তিলক পরিয়ে দেন। রামকে না পারলে তার ভক্ত হনুমানকে ধরো। সন্ধেয় টিভির 'টক-শো'তে যেন এটাই আলোচ্য বিষয় হয়ে ওঠে। এটাই যেন সাম্প্রতিক রাজনীতির একমাত্র বয়ান হয়ে ওঠে। দেশে যে কত লক্ষ-কোটি শিক্ষিত এবং অল্পশিক্ষিত যুবক-যুবতীর কর্মসংস্থান নেই, লক্ষ লক্ষ শ্রমিক যে বিশ্বায়নের দাপটে কর্মচ্যুত এবং কত লক্ষ লোক দুবেলা পেটপুরে খেতে পায় না এবং পেলেও তার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করতে হয়—এসব যেন এই ভাষ্যের বাইরে এক 'ইতর ভাষ্যের' মর্যাদা পায়। কংগ্রেস দল তথা তাঁর সর্বোচ্চ কর্তা রাহুল গান্ধী এখন এক 'নিষ্ক্রিয়' হিন্দুত্বের ভেক ধরেছেন। তাকে দোষ দেওয়া যায় না। তাঁর দলের ঐতিহ্য এ ব্যাপারে বেশ শক্তিশালী। স্বাধীনতা সংগ্রামে মহাত্মা গান্ধীর আবির্ভাবের পর কংগ্রেস সংগঠনে বিশাল পরিবর্তন ঘটে। তিনি এই সংগঠন তথা আন্দোলনকে জনচরিত্র দেন। কিন্তু গান্ধীজির সনাতনী বর্ণাশ্রম/চতুরাশ্রম হিন্দুত্বের রাজনীতি ছিল কৌশলগত। সে হিন্দুত্ব জনসাধারণের হিন্দুজীবনের সঙ্গে মেলে না। তাঁর কল্পিত হিন্দুত্ব বাস্তব-বর্জিত ছিল। গান্ধীজি জনগণকে সঙ্গে নেন ও ব্যবহার করেন তাদের প্রকৃত সত্তাকে অস্বীকার করে। থাপার (২০১৮) দেখিয়েছেন, সাধারণ গ্রামীণ সমাজে যে 'Pro-secular' জীবনধারা ছিল তা গান্ধীজির নজরে আসেনি বা তিনি তাকে সযত্নে পরিহার করেছেন। জনগণের যে শ্রেণি চরিত্র, অর্থাৎ তারা (হিন্দু, মুসলমান) যে প্রধানত কৃষককুল, সে সত্তাও তাঁর বয়ানে ধরা পড়েনি। যেটাকে আমরা হিন্দু সমাজ বলি, তা আসলে ছিল বহুত্ববাদী : শৌবালিক, বাউলপন্থী, শাক্ত, ভক্তিবাদী, বৌদ্ধ, জৈন—এদের নিয়েই ছিল হিন্দু সমাজ। বৈদিক ব্রাহ্মণ্যবাদী হিন্দুত্ব সে সমাজে অত্যন্ত সীমিত জায়গা পায়। অপরদিকে মুসলিম সমাজও ছিল অনেক বহুত্ববাদী। রাজসভার গোঁড়া মুসলমান ধর্মের অস্তিত্বও ছিল খুব সীমিত। সাধারণ মুসলমান ও সাধারণ হিন্দুর জীবনধারায় অনেক মিল ছিল।

ইতিহাসের পাতা ওল্টালে দেখা যাবে, কংগ্রেস দলের হিন্দুয়ানির ঐতিহ্য বেশ শক্তিশালী। পুরোনো যুগের কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ হিন্দু ধর্ম ও তার প্রতীকগুলি যথেচ্ছ ব্যবহার করেছেন। এ-ব্যাপারে মারাঠি নেতৃবৃন্দ বেশি সক্রিয় ছিলেন। গণপতি/গণেশ পুজো ও উৎসব এবং শিবাজী উৎসব মাত্র দুটি উদাহরণ। জওহরলাল নেহরু তার থেকে মুক্ত ছিলেন। ১৯৫১ সালে কে.টি. শাহ (নেহরু ক্যাবিনেটের সদস্য এবং তার আগে গণপরিষদের সদস্য) ক্যাবিনেটে প্রস্তাব আনেন যে, সরকার সোমনাথ মন্দির (যেটি গজনীর সুলতান মহম্মদ ঘোরী প্রায় ধ্বংস করেন লুটপাটের মাধ্যমে) সংস্কারের উদ্যোগ নিক এবং অর্থ সাহায্য করুক। নেহরু তাতে রাজি হননি এই কারণ দেখিয়ে যে ভারত এক ধর্মনিরপেক্ষ

দেশ এবং সরকারও ধর্মনিরপেক্ষ। ইতিহাসের পাতা আর একবার ওলটাতে হবে। আজ ভাববার বিষয় ১৯০৬ সালে মুসলিম লীগের জন্মের সঙ্গে কংগ্রেসের হিন্দুয়ানির কী সম্পর্ক ছিল? কেন মুসলিমরা মনে করল যে কংগ্রেস একটি হিন্দুদের দল এবং মুসলমানরা সেখানে থাকবে না—সেটা গবেষণার বিষয়। গোটা বিষয়টি ব্রিটিশ সরকারের খেলা বললে সত্যের অপলাপ হতে পারে। কংগ্রেস পরবর্তীকালে 'যখন যেমন তখন তেমন' হিন্দুত্বের রাজনীতি করেছে তার ঐতিহ্য মেনেই। ১৯৮৪ সালে ইন্দিরা গান্ধী হত্যার পর দিল্লিতে যে ভয়াবহ শিখনিধন দাঙ্গা হয়, তাতে কংগ্রেসের 'নিষ্ক্রিয়' হিন্দুত্ব বেশ সক্রিয় হয়ে ওঠে। এমন অভিযোগও করা হয়েছে, ওই দাঙ্গায় প্রয়াত রাজীব গান্ধী আরএসএস-এর ক্যাডার বাহিনী ব্যবহার করেছেন। কংগ্রেস সময় সময় ঠিক বিপরীত হিন্দুত্ব বা মুসলমান তোষণ (সব মুসলমান নয়, যারা মৌলবাদী এবং নিজেদের ওই সমাজের কর্তা মনে করেন তাদের) বরাবর করেছে। ১৯৮৬-৮৯ শাহ বানুর ঘটনা আজ কে না জানে? তৃণমূল কংগ্রেসও একই পথের পথিক।

উপরের আলোচনা থেকে কয়েকটি শিক্ষা নেওয়া যায়। প্রথমত, হিন্দুত্বের রাজনীতি আসলে সাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক। হিন্দুত্ব বলতে যদিও সুনির্দিষ্ট কিছু বোঝায় না, কিন্তু হিন্দুত্বের রাজনীতি এক তীব্র সংখ্যালঘু-বিরোধী, বিশেষ করে মুসলমান-বিরোধী সাম্প্রদায়িক রাজনীতি। হিন্দু জাতীয়তাবাদের ধারণাটি ভ্রান্ত। দ্বিতীয়ত, এই রাজনীতি গণতান্ত্রিক নয়—এগুলো জনবিরোধী। সাধারণ মানুষ তার দৈনন্দিন জীবনে তথাকথিত হিন্দুত্ববাদীরা মৌলবাদী (হিন্দু/মুসলমান) রাজনীতিকে স্থান দেয় না। উভয় রাজনীতির মাসুল কিন্তু দেয় উভয় সম্প্রদায়ের শ্রমজীবী মানুষ, যাদের দাঙ্গায় উস্কে দিলেও তারা চারপাঁচ ঘণ্টা সময়ও ব্যয় করতে পারবে না ওই হাঙ্গামায়; তাদের রুজি-রোজগারের যে দৈনন্দিনতা তার দাবি অনেক বেশি যে।

□

আজকের ভারতের বাম-গণতান্ত্রিক শক্তির সামনে হিন্দুত্ব-সাম্প্রদায়িক রাজনীতি একটা বাড়তি ও ভীষণ শক্তিশালী চ্যালেঞ্জ নিয়ে হাজির হয়েছে। হিন্দুত্ববাদীরা একটা কাজে ভীষণ সফল হয়েছে। এদেশে রাজনীতির এক একক এজেন্ডা দাঁড় করিয়ে ফেলেছে। কংগ্রেস বা অন্য দল যখন হিন্দুত্বের রাজনীতি করে, সেটা বিজেপির পাল্লাই ভারি করে এবং হিন্দুত্ববাদকে বৈধতা দান করে। বাম-গণতান্ত্রিক শক্তিকে এই ভ্রান্ত এজেন্ডা ও বয়ানকে আস্তাকুঁড়ে ফেলে এক বিকল্প এজেন্ডাকে সামনে তুলে ধরতে হবে। যে এজেন্ডা হবে বেকার যুবক-যুবতীর জন্য কর্মসংস্থান, কৃষকের জমির ওপর অধিকার রক্ষা করা এবং সাধারণ শ্রমজীবী মানুষের সঠিক ভাবে বেঁচে থাকার অধিকার সুনিশ্চিত করা। উপজাতিদের যেন তাদের বাসস্থান থেকে উৎখাত করা না হয় তা দেখা। পাশ্চাত্যের গণতান্ত্রিক দেশে মাসিক কর্মসংস্থানের তথ্য নাগরিকদের তীক্ষ্ণ নজরে থাকে; সরকার সেখানে তটস্থ থাকে এই কারণে। এটাই শিক্ষণীয়।

সূত্রনির্দেশ

১. অচিন বিনায়ক (২০১৭), *হিন্দু অথরিটারিয়ানইজ়ম: সেক্যুলার ক্লেমস কম্যুনাল রিয়েলিটিজ* (লন্ডন : ভার্সো)

২. রোমিলা থাপার (২০১৮), *ইজ সেক্যুলারিজ়ম এলিয়েন টু ইন্ডিয়ান সিভিলাইজেশন?* সিং, আকাশ ও মহাপাত্র, সইকিয়া (সম্পা.) ইন্ডিয়ান পলিটিক্যাল থটস্ : এ রিডার (অ্যাবিংডন : রুটলেজ)

With best compliments of

SRMB

Leadership
through innovation

SRMB SRIJAN LIMITED

DURGAPUR WORKS
Sagarbhanga, Durgapur 713211, Dist. Paschim Bardhaman
Phone + 91(0343) 6450788 / 645 0877
Fascimile : +91 (0343) 255 9206 / 255 9205

Sl. No. 85

With best compliments of

M/s TIWARI CONSTRUCTION

Fabricators, Erectors, Mechanical Engineers, Civil Contractors

Specialist in :
Stainless Steel & Pipeline Job, Dealing with Earth Moving Machine,
JCB & Hydraulic Crane Etc.

ESBY Industrial Estate
Sanjib Sarani, Durgapur-713201, Dist. Paschim Bardhaman, E-mail : vinodtiwarig@gmail.com
Phone : 0343-2554757 (R), G.T. : 9002390791
V.T. : 9333950979, R.T. : 9333907643 / 9932697055

WORKS SITE
(1) Graphite India Ltd., (2) Ganga Rasayanie (P) Ltd. (3) Jai Balaji Group, (4) Ultratech

Sl. No. 101

ওরা দাঙ্গা করে মানুষ মারে

সলিল আচার্য

এখন সময়টা ভালো নয়। একটা কালো মেঘে সমাচ্ছন্ন। একটা বৈরী বাতাস বহমান আমাদের নিকেতনে, আশপাশে, সমাজে। দিগন্তে বিভেদের বলিরেখা, সন্তর্পণে যেন সেঁটে দেওয়া হয়ছে। বিভেদের বাদ্যি শোনা যাচ্ছে রামমোহন, বিদ্যাসাগরের দেশে। 'রবীন্দ্রভূমি' জুড়ে আঁকিবুঁকি চলছে অ-রাবীন্দ্রিক শিল্পকলায়। এ যেন এক মারণ ব্যাধি বয়ে বেড়াচ্ছে আমাদের 'জটিল-সময়', যার ভাষা বোঝা ভার। ইশারা সাধারণ মানুষের বোধগম্যের বাইরে। জটিল তেকে জটিলতর এক রোগাক্রান্ত সময়ই যেন সময়কে টেনে নিয়ে চলেছে, এক মৃত্যুপুরীর গভীর গহ্বরের নিগুঢ় অন্ধকারে। ওরা দাঙ্গা করে মানুষ মারে।

না, ধর্ম নয়। ধর্মান্ধতার জাবর-কাটা কন্টকাকীর্ণতা আমাদের চারপাশে এলোমেলো খেলে বেড়াচ্ছে। মাথা তুলে দাঁড়াচ্ছে পৌরাণিক কাহিনি ইতিহাসের চরিত্র হিসেবে চিত্রিত হয়ে। বিষয়টি সামান্য নয়। যার সূচনা বিগত শতাব্দীর ত্রিশের দশকে হিটলার, মুসোলিনির দেশে-দেশে। আজ সে-সবের পুনরুত্থানবাদ, উগ্র জাত্যভিমানের ঝোড়ো বাতাসে সম্প্রীতি বৃক্ষের পাতা উড়িয়ে নিয়ে যেতে চাইছে। সম্প্রীতি বৃক্ষের মূল উৎপাটনের দিকে হাত বাড়াচ্ছে, চরম ঔদ্ধত্যে। মুখে রামের নাম। মুখে রামরাজত্ব প্রতিষ্ঠার জেহাদি কণ্ঠস্বর। কর্কশ শব্দের ধাক্কায় খুন হতে হচ্ছে অধ্যাপক নরেন্দ্র দাভোলকার, অধ্যাপক কালবুর্গী, আইনজীবী সাহিত্যিক গোবিন্দ পানসারে, সাংবাদিক-সমাজকর্মী গৌরী লঙ্কেশ-দের। আত্মহত্যা করতে বাধ্য করা হল দলিত ঘরের সন্তান রোহিত ভেমুলাকে। এটা চলছে। এটা আরও বাড়বে সময়ের টানেই। তা ক্রমশ একটু একটু করে পরিস্ফুট হচ্ছে। বিপদ যে আরও ঘনীভূত হচ্ছে তা বোঝা যাচ্ছে—উত্তরসত্যের সুতোর টানে। সত্যকে মিথ্যা হিসাবে, মিথ্যাটাকেই প্রকৃত সত্য হিসেবে মানুষের পাতে পরিবেশন করা হচ্ছে কর্পোরেট মালিকানার গণমাধ্যমের মধ্যবর্তিতায়। বিভ্রান্ত মানুষের সংখ্যা স্বাভাবিক কারণেই বাড়ছে। পাল্টা দেবার শক্তি দৃঢ় হয়ে যদি না ওঠে তবে এসব প্রতিক্রিয়াশীলতা বাড়বেই। তাতে করে সম্প্রীতির বাতাবরণ বারে বারে ক্লেদাক্ত হয়ে উঠবেই। প্রতিকারহীন এক চরম নৈরাজ্য ডালপালা মেলে ধরবে আকাশে। এমন এক পরিবেশ-পরিস্থিতিতে মিডিয়ার তোলা 'রব' সাধারণ গরিব অংশের মানুষের মধ্যেও বিভ্রান্তি ছড়িয়ে দিচ্ছে। তোতাপাখিরা শেখানো বুলি আওড়াচ্ছে... তোমাদের দ্বারা হবে না। তোমরা পারবে না অমুকদের শিক্ষা দিতে, তাই আমরা প্রতিশোধ নেবার জন্য তৈরি হচ্ছি। চলে যাবো যারা শক্তিধর তাদের শিবিরে। পরে, কাজ শেষে ফের ঘর-ওয়াপসি হবে। বোঝো ঠ্যালা! এবার সামলাও! দাঙ্গা করে মানুষ (মুসলমান) মারাই যাদের একমাত্র ধ্যানজ্ঞান তাদের ঘাটে নৌকো ভেড়ানো? বিপদের আঁচ করতে পারছেন? যারা জন্মের সময় থেকেই মুসলিম, খ্রিস্টান ও কমিউনিস্ট বিদ্বেষী এবং প্রশিক্ষিত ঘাতকবাহিনী, তাদের দরজায় টোকা দেওয়া চলছে নজরুল ইসলামের বাংলায়, রবি ঠাকুরের বাংলায়। আসলে বিভ্রান্ত মানুষকে দিয়ে যা যা করানো সম্ভব তার অনেকটাই করাবার কাজ চলছে এবং সে প্রক্রিয়া দীর্ঘমেয়াদি। আসলে 'জাত-শত্রু' কমিউনিস্টদের শ্রেণি-সংগ্রামকে দুর্বল করে দিয়ে, মানুষকে বেঁচে থাকার সংগ্রাম থেকে নিরাপদ দূরত্বে নিয়ে যাবার জন্য, গণসংগ্রাম

যাতে আরও সঙ্কুচিত হয়ে যেতে পারে তার ব্যবস্থা করতে, সামাজিক ক্ষেত্রে সুস্থ বোধের মানুষের গতিবিধি স্থগিত করে দিয়ে তথাকথিত ধর্মজীবীদের এ এক মহান কার্যক্রম চলছে আর এস এস-এর পৌরোহিত্যে নামে-বেনামে। শিক্ষা-স্বাস্থ্য-গবেষণা-সমাজসেবা-সাধারণ ধর্মাচরণ সবেতেই পরিকল্পনার পদচিহ্ন আঁকছে এই মহামারির সংগঠক আরএসএস-রা। বামপন্থী শক্তির সাংগঠনিক দুর্বলতার সুযোগকে ওরা পরিপূর্ণভাবে সদ্ব্যবহারে লিপ্ত। কারণ হিন্দু-হিন্দি-হিন্দুস্থানের মোহ সৃষ্টির চরম বিরোধী বাম ও প্রকৃত ধর্মনিরপেক্ষ শক্তি, গণতান্ত্রিক শক্তি। যারা সমাজকে সুস্থ ভাবনার দ্বারা উপকৃত করতে দায়বদ্ধ তাদের উপযুক্ত শিক্ষা দিতে মরিয়া হয়ে ওঠা শক্তিই দেশ চালাচ্ছে এবং তাতে বাড়ছে সামাজিক-আর্থ-রাজনৈতিক সংকটের করাল ছায়াপাত।

এ দেশের বাম আন্দোলনের অন্যতম প্রধান শক্তি তাদের কর্মসূচির ৩.১৫-এ বলেছে : ''কৃষিসমস্যা ভারতের জনগণের সামনে সর্বপ্রধান জাতীয় সমস্যা হিসেবে রয়ে গেছে। এর সমাধান সম্ভব বৈপ্লবিক পরিবর্তনের মাধ্যমে, যার মধ্যে পড়বে আমূল ও সর্বব্যাপ্ত কৃষি সংস্কার যা জমিদারতন্ত্রকে, মহাজন-ব্যবসায়ীর শোষণকে, গ্রামাঞ্চলে জাতপাত ও লিঙ্গভিত্তিক অত্যাচারকে উৎখাত করার লক্ষ্যে কাজ করবে। কৃষিসমস্যাকে সমাধান করা দূরে থাক, অন্তত প্রগতিশীল, গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে বিবেচনার ক্ষেত্রে ভারতে বুর্জোয়া-ভূস্বামী শাসনের ব্যর্থতা এই শাসনের দেউলিয়াপনাকে সবচেয়ে প্রকটভাবে প্রমাণ করেছে।'' যথার্থই গোটা দেশে কৃষক সমাজের ক্ষোভ বিক্ষোভ বাড়ছে। ক্রিয়ার প্রতিক্রিয়াও আজকের সময়ে বারে বারে নজরে আসছে। আক্রান্ত দেশবাসীকে রক্ষা করার কোনো দায় নেই প্রতিশ্রুতিদাতাদের। বরং বিভেদ তৈরিতে তারা ব্যবহার করছে বিভিন্ন সরকারি বেসরকারি উপাদানকে। সমস্যা বাড়ছে। সংকটের চেহারা নিয়ে নিচ্ছে। জনজীবন জেরবার হচ্ছে।

সঙ্গত কারণেই প্রশ্ন উঠছে কেন এই পরিণতি স্বাধীনতার ৭২তম বছরে এসেও? জবাবে উপলব্ধির বিষয় আছে—৩.২০ ধারায় : ''বুর্জোয়া-ভূস্বামী কৃষিনীতির কারণে... কৃষক সমাজের ৭০ শতাংশই গরিব কৃষক ও খেতমজুর। যাদের উৎপাদিকা সম্পদের অভাব, নিম্ন আয়, দুর্দশাগ্রস্ত জীবন গণদারিদ্র্যের বৈশিষ্ট্য। ভারতে গ্রামীণ দারিদ্র্যের হিমালয়প্রমাণ মাত্রা গোটা পৃথিবীতে তুলনাহীন। ...দারিদ্র্যের বহুমাত্রা আছে, তা কেবল আয়ের অভাব নয়। হাজারো ভাবে এই দারিদ্র্য প্রকট হয়ে ওঠে। গ্রামীণ গরিবদের জমি বা উৎপাদনের অন্য উপকরণের ওপর হয় কোনো অধিকার নেই অথবা থাকলেও নামমাত্র। জমির কেন্দ্রীভবন ও মালিকানার বৈষম্য কোনো বড় পরিবর্তন ছাড়াই অব্যাহত আছে। এরই সঙ্গে একই রকমভাবে সেচের জলের উৎসের কেন্দ্রীভবন রয়ে গেছে মূলত গ্রামের ধনীদের হাতে। কৃষক ও খেতমজুররা ন্যায্য হারে ঋণের কোনো সুযোগ পান না, মহাজনি সুদের হারে ঋণের গভীর ফাঁদে তাঁরা পড়ে আছেন। কম মজুরি ও মহিলাদের ক্ষেত্রে মজুরি বৈষম্য একটি উল্লেখ্য বৈশিষ্ট্য। গড়ে একজন কৃষি-মজুর বছরে ১৮০ দিনেরও কম কাজ পান। গ্রামীণ জনসংখ্যার ৫০ শতাংশ অপুষ্টিতে ভোগেন। গ্রামীণ সাক্ষরতার হার শোচনীয়ভাবে কম, গ্রামের গরিব মানুষ বাস করেন পানীয় জলের সুযোগহীন, চিকিৎসার সুযোগহীন অস্বাস্থ্যকর বাসস্থানে।''

ভারতের এই যে 'চোখে দেখা হাল' উল্লিখিত হল, সেখানে বলতেই হয় ওইসব সমস্যা সমাধান যারা করতে চায় না বা করে না শ্রেণিস্বার্থজনিত কারণে তাদের হাত ধরে এই রাজ্যে বা কোনো রাজ্যে, এই দেশে অত্যাচারীদের, জুলুমবাজদের গণতন্ত্র-হত্যাকারীদের, নৈরাজ্য আমদানিকারীদের 'উপযুক্ত শিক্ষা' দেওয়া সম্ভব নয়, কখনোই। একই সাথে ভুলে গেলে চলবে না দেশের আজকের আর্থ-সামাজিক চালচিত্র। মানুষে মানুষে ব্যাপক হয়েছে বৈষম্য। দেশের সম্পদের ৭৩ শতাংশই মাত্র এক শতাংশ ধনপতিদের মুঠোয় চলে গেছে। তা থেকে দারিদ্র্য বৃদ্ধির বিষয়টি বোঝা যায় বৈকি! 'উদারীকরণ এবং সেরকারিকরণের পথ বুর্জোয়াশ্রেণির প্রভূত উপকারে এসেছে'। মানুষ ক্ষোভে ফুঁসে উঠছেন যত্রতত্র।

কারণ এদেশে স্বাধীনতার পর ৭১টি বছর পেরিয়ে গেলেও এখনও যেমন ভারতীয় কৃষিতে ধনতান্ত্রিক বিকাশ পুরোনো কাঠামোকে দৃঢ়তার সঙ্গে ভেঙে দিয়ে হয়নি, প্রাক্‌ধনতান্ত্রিক উৎপাদন ও সামাজিক সংগঠনের এক বদ্ধজলার ওপরেই তাকে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। ফলশ্রুতিতে কৃষিতে ধনতান্ত্রিক সম্পর্কের বিকাশ যদিও লক্ষণীয়, তথাপি আজও রয়েছে—গোটা দেশেই জাতপাতের বিভাজন, জাতপাতের নামে নিপীড়ন। তৈরি হচ্ছে রোহিত ভেমুলার মৃত্যুর মতো অজস্র ঘটনা। কিছু প্রকাশ্যে এলেও না-আসার সংখ্যাই বিশাল। মহিলাদের বিরুদ্ধে নিকৃষ্টতম অত্যাচার সংঘটিত হয়েই চলেছে। প্রতিবাদ কিছু কিছু হলেও চেপে দেবার প্রবণতাই এদেশে বেশি। মহাজন ও তেজারতি পুঁজির হাতে গরিবদের শোষণ বাড়ছে। ফলে ২৫-২৬ বছরে ঋণগ্রস্ত কৃষক ঋণ শোধ করার পথ হারিয়ে ফেলে আত্মহত্যাকেই বেছে নিয়েছেন মুক্তির পথ ভেবে। এই সংখ্যা ৩.২০ কোটি ছাড়িয়েছে। রোজ বাড়ছে এই সংখ্যা। এই মৃত্যুর সংখ্যাকে চাপা দেবার প্রশ্নে কী কেন্দ্রীয় সরকার, কী রাজ্য সরকার—সবাই একই পদক্ষেপ নিচ্ছে। অস্বীকার করছে এই আত্মহত্যাকে। ঘৃণাভরে মানুষ তা লক্ষ করছেন। ক্ষোভ বাড়ছে। প্রতিবাদের কর্মসূচিতে তার প্রতিফলন তৈরি হতে দেখা যাচ্ছে।

শিল্পের চুল্লিতে ধোঁয়া ওঠে না। দরজায় তালা। বেকারির লাইন লম্বা হচ্ছে। সংক্ষুব্ধ ভারত ড্যাবড্যাব করে তাকিয়ে আছে সামাজিকভাবে দায়বদ্ধদের প্রতি, রাজনৈতিকভাবে দায়বদ্ধদের প্রতি। এদিক-সেদিকে প্রতিবাদ ধ্বনি তুলছে বাঁচার জন্য। মৃত্যুকে পরাভূত করে দিতে সংগ্রামে নতুন নতুন সরণি খুলে যাচ্ছে।

চারদিকে যখন হাহাকার, লড়াইয়ের জন্য 'আজান', তখন এই মানুষদের বিভাজিত করার কাজ চলছে অত্যন্ত পরিপাটি করে। ধর্ম। ধর্মের নামে রাজনীতি হচ্ছে। তথাকথিত 'হিন্দুত্ব' দাপিয়ে বেড়াচ্ছে রাজ্যে রাজ্যে। এই রাজ্যের শাসকদলের কূটকৌশলে এবং রাজনৈতিক-বোঝাপড়ার ফল হিসেবে আরএসএস-এর এই রাজ্যে বৃদ্ধি ঘটেছে ১১/১২ গুণ। রামমোহন-বিদ্যাসাগর-রবিঠাকুরের দেশে 'ওরা' বাড়ছে, মানুষ-মারার নীতি নিয়েই। মানুষকে মারছে প্রতিদিন প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে। যুক্তিবাদীরা, সমাজতন্ত্রীরা, সাম্যবাদীরা, প্রগতিধর্মীরা এই হিন্দুত্ববাদীদের কাছে অতি বড় শত্রু। সুতরাং নিধন-আয়োজনের বৃত্ত পূর্ণ করতে যখন যাকে প্রয়োজন তখন তারই হাত ধরছে, অবশ্যই সমমনোভাবাপন্নদের মধ্য থেকে। আবার প্রতিক্রিয়ায় দূরে সরে যাচ্ছেন শরিকরা তেমন দৃষ্টান্তও তো তৈরি হচ্ছে এই দেশে। ফলে, সবটা মিলিয়েই ভাবা দরকার, এদের গতিবিধি কী কী ভাবে ক্ষতির কারণ হচ্ছে! মোহভঙ্গ ঘটানো ছাড়া গত্যন্তর নেই এই সময়ে। আদর্শগত ভাবেই এই কাজে আরও অনেক অনেক 'মগ্নতা' আবশ্যিক।

ওরা যত বড় বড় কথাই বলুক না কেন সেই জন্মলগ্ন থেকে, তাতে জল গলছিল না। গলে না। সাম্প্রতিক সময়ে বিভিন্ন রাজ্যে রাজ্য বিধানসভার নির্বাচন, বেশ কিছু লোকসভার আসনে উপনির্বাচন ইত্যাদি বলে দিচ্ছে মানুষ ওদের মোহজাল ছিঁড়তে চেষ্টা করছেন। তথ্যই সেকথা বলে দিচ্ছে। যেমন—সম্প্রতি অনুষ্ঠিত

কর্নাটকের বিধানসভা নির্বাচনে মন্ত্রিসভা হাতছাড়া হল বিজেপি-র। ১৪টি আসনের মধ্যে মাত্র ২টি তারা পেয়েছে। মে মাসে অনুষ্ঠিত ৪টি লোকসভা আসনের উপনির্বাচনে তারা মাত্র একটি আসনে জয়ী হয়েছে। তাও পঞ্চমুখী প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল মহারাষ্ট্রের এই পালঘার আসনে। বিধানসভার ১০টি কেন্দ্রে উপনির্বাচনে মাত্র একটিতে কোনোক্রমে জয় পেয়েছে। উত্তরপ্রদেশের ফুলপুর (যে রাজ্যে ওরাই ক্ষমতাসীন) এবং গোরক্ষপুর লোকসভা আসন হাতছাড়া হয়েছে। কৈরানা আসনেও বিজেপি-র পরাজয় তাৎপর্য বহন করছে। হিন্দুত্বের আওয়াজ ক্রমে ক্রমে ফাঁকা আওয়াজে পরিণত করতে সচেতন মানুষের নড়াচড়া দেশজুড়েই অসংখ্য মানুষের সংগ্রামে প্রতিভাত হচ্ছে।

চারদিকে যখন হাহাকার, লড়াইয়ের জন্য ‘আজান’, তখন এই মানুষদের বিভাজিত করার কাজ চলছে অত্যন্ত পরিপাটি করে। ধর্ম। ধর্মের নামে রাজনীতি হচ্ছে। তথাকথিত ‘হিন্দুত্ব’ দাপিয়ে বেড়াচ্ছে রাজ্যে রাজ্যে। এই রাজ্যের শাসকদলের কূটকৌশলে এবং রাজনৈতিক-বোঝাপড়ার ফল হিসেবে আরএসএস-এর এই রাজ্যে বৃদ্ধি ঘটেছে ১১/১২ গুণ। রামমোহন-বিদ্যাসাগর-রবিঠাকুরের দেশে ‘ওরা’ বাড়ছে, মানুষ-মারার নীতি নিয়েই। মানুষকে মারছে প্রতিদিন প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে। যুক্তিবাদীরা, সমাজতন্ত্রীরা, সাম্যবাদীরা, প্রগতিধর্মীরা এই হিন্দুত্ববাদীদের কাছে অতি বড় শত্রু।

দলটির পূর্বপুরুষরা ১৯২৫-এ আরএসএস নামক বিষবৃক্ষটি ব্রিটিশের পরামর্শে প্রতিষ্ঠা করে—এমন অভিমত সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন রাজনৈতিক মহল থেকে পাওয়া যায়। আমরা সাধারণ মানুষ কী চাইব? শান্তি-স্বস্তি-স্বাভাবিক পরিবেশ—এই তো। সেখানে মানুষের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে বিপদ গভীরতর করে দিচ্ছে আজকের সরকার। দক্ষিণায়নের ধাক্কা জীবনে যন্ত্রণা বাড়াচ্ছে সর্বত্র।

আমাদের পরম্পরা, আমাদের সংস্কৃতি, আমাদের ঐতিহ্যে ব্যাপক ‘ক্ষত’ তৈরি করার কাজ চলছে। ভারতে ধর্মনিরপেক্ষতা, গণতন্ত্র এবং মিশ্র সংস্কৃতি অর্থাৎ যে ‘বহুত্ববাদ’ বিদ্যমান তাকেই আঘাত করছে ১৯২৫-এর ‘বিষাক্ততা’ দিয়ে। আমরা সকলেই নিজ নিজ অঞ্চলের বিভিন্ন সংস্কৃতির সম্মিলনে একই জাতি, ভারতের প্রতি বিশ্বস্ততার অটুট বন্ধনে আমরা পরস্পরের সঙ্গে বাঁধা পড়েছি। আমরা একটু পিছিয়ে গেলে দেখতে পাই ওদের বিপরীতধর্মিতা। অযোধ্যার প্রচারপর্বে, ভারতের গোটা রাজনীতিটাকেই নতুন ছাঁচে আগাগোড়া ঢেলে সাজানো এবং ভারতীয় জাতীয়তাবাদের ভাবধারা অর্থাৎ আমাদের পরম্পরা আর নৈতিকতার স্থলে হিন্দুত্বের একচেটিয়া ও বিষাক্ত বিশ্বাসকে তুলে আনা। অমনটা কেন করে? যার উত্তরে বলতে হয়—অবশ্যই ভারতকে হিন্দুরাষ্ট্রে পরিণত করার প্রক্রিয়াকে জোরালো করবার জন্যই। যে মতাদর্শকে ঘিরে এই প্রবণতা তা আমদানি করা হয়েছে সাভারকার সাহেবের তত্ত্ব থেকে, আর হিটলার-মুসোলিনির শিষ্যত্ব গ্রহণের দ্বারা।

সাভারকার বলেছেন : ‘‘একখণ্ড জমি যার নাম ভারতবর্ষ, তারই নিছক ভৌগোলিক স্বাধীনতার সঙ্গে কখনও প্রকৃত ‘স্বরাজ্য’কে মিলিয়ে মিশিয়ে একাকার করে ফেলা উচিত নয়। শিশুদের কাছে হিন্দুস্থানের স্বাধীনতা কেবলমাত্র তখনি মূল্যবান হয়ে উঠবে যদি সেখানে ‘তাদের হিন্দুত্ব’—তদের ধর্মীয়, জাতীয় এবং সাংস্কৃতিক পরিচয়ের নিশ্চয়তা থাকে। হিন্দুত্বের কাছে স্বরাজ্যের অর্থ অবশ্যই কেবলমাত্র সেই রাজ্য যেখানে তাদের সত্য, তাদের হিন্দুত্ব নিজেদের অধিকারেই কায়েম রাখতে পারা যাবে; অ-হিন্দু জনগণ, তারা ভারতীয় ভূখণ্ডের বাসিন্দা হোক বা না হোক, তাদের বাড়তি চাপ সইতে হবে না।’’

তাঁর অনুগামীদের একজন বললেন যে, নিজেদের দেশ থেকে পালিয়ে এসে এদেশে আশ্রয় চেয়েছিল যারা কিংবা ভয়ে বা অর্থ ও ক্ষমতার লোভে নিজেদের মহান পথ পরিত্যাগ করে যারা একদিন ধর্মান্তরিত হয়েছিল (বিবেচনায় থাকবে না ব্রাহ্মণ্যবাদের নিপীড়নের ইতিহাস) তাদের বংশধর অথবা বর্বর অনুপ্রবেশকারীদের উত্তরসূরী যারা, যাদের পূর্বপুরুষ আমাদের পবিত্র ভূমিকে কলুষিত করেছে, পবিত্র মন্দির ধ্বংস করেছে, হিন্দুরা কখনোই সেই সব মানুষের সঙ্গে যৌথভাবে দেশের মালিকানা গ্রহণ করতে পারে না...‘এ দেশ কখনো তাদের দেশ হতে পারে না। যদি তাদের এ দেশে বাস করতে হয়, তবে হিন্দুস্থান যে শুধুমাত্র হিন্দুদের, আর কারোর নয়, এই কথা স্বতঃসিদ্ধ বলে মেনে নিয়েই তাদের থাকতে হবে।’ গান্ধী হত্যার অন্যতম কারণ আরএসএস-এর ভাবাদর্শ যা কংগ্রেসের কাছে গ্রহণযোগ্য ছিল না। তাই হত্যা! তাতেই শুধু ওরা খুশি ছিল তা নয়। বরং কী করে চরম দক্ষিণপন্থী হওয়া সত্ত্বেও অন্য একটি দক্ষিণমার্গীদের নীতি যে অনেক নিম্নমানের তার জন্য দায়দায়িত্ব পালন করতে চেয়েছে, চাইছে। বাজপেয়ীও ২০০২ সালের ২৭ মার্চ পরিস্থিতি দেখেশুনে বলতে বাধ্য হয়েছিলেন যে, ‘স্বামী বিবেকানন্দ যখন হিন্দুত্বের কথা বলেন, তখন কেউ তাঁকে সাম্প্রদায়িক বলতে পারে না। কিন্তু কেউ কেউ ‘এমন ভাবে হিন্দুত্বের সংজ্ঞা দেন যে মনে হয় এর থেকে দূরে থাকাই ভালো।’ এর পরেও সেই বছরেই আবার ৬মে তিনি বললেন : ‘আমি স্বামী বিবেকানন্দের হিন্দুত্বকে মানি। কিন্তু আজকাল যে ধরনের হিন্দুত্বের প্রচার চলছে সেটি ভুল এবং এতে উদ্বিগ্ন হবারই কথা।’ আসল কথাটি ভুলে গেলে চলবে না, ঘৃণাকে শ্রদ্ধার আসনে বসাবার জন্য যিনি ‘হিন্দুত্ব’ শব্দটিকে ‘উদ্ভাবন’ করেছিলেন, ইতিহাস বলে তার স্রষ্টা স্বয়ং সাভারকার। কাজেই ২০১৮ সালে এসেও আমরা উদ্বেগ প্রকাশ না করে পারি না যার প্রতিষ্ঠা ১৯২৫ সালে।

নতুন যে বিপদ এই রাজ্যে দানা বাঁধতে শুরু করেছে তা হলো ধর্মীয় মেরুকরণের রাজনীতি, জাতপাতের মেরুকরণের রাজনীতি। কেন্দ্রের শাসকদল এবং এই রাজ্যের শাসকদল এখন প্রতিযোগিতামূলক সাম্প্রদায়িকতার বিস্তার ঘটিয়ে, গরিব মানুষের রুটি-রুজিতে, গণতন্ত্রে, গণতান্ত্রিক কাঠামোতে, সংহতির ক্ষেত্রটিতে, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির উঠোনেও কাঁটা বিছিয়ে দিতে চাইছে। গণতন্ত্রহীনতার এক নৈরাজ্য প্রতিষ্ঠায় নেমেছে। স্বৈরাচার মাথা চাড়া দেবে এর থেকেই। অতএব, ধর্ম, বর্ণ, জাতপাত, ভাষা-বিভাষার নামে বিভাজিকা সৃষ্টিকারীদের পায়ের তলার মাটি পরিকল্পিত সংগ্রামের মারফৎ সরিয়ে দিতে হবে। ‘ঐক্যের বনেদ’ সুদৃঢ় করতে হবে। সংগ্রাম চলবে ‘মাথায়-আক্রমণের’ বিরুদ্ধে এবং লাগাতার ভাবে।

রথযাত্রা, বিজয়া দশমী, রামনবমী, হনুমান জয়ন্তী ইত্যাদি ঘিরেও বিভাজিকা রচিত হচ্ছে। এমনকি জন্মশতবর্ষে এক বাঙালি বিশিষ্টজন শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, যিনি হিন্দুমহাসভার স্থপতি—তাঁকে নিয়েও রাজ্যের শাসকদল আরএসএস-এর সাথে গোপন বোঝাপড়া করে নিয়েই কর্মসূচি পালন করছে। আমরা এখন

কোন বাংলায় বসবাস করছি তা ভাবতে গেলে ভিরমি খেতে হয়। রামমোহন-বিদ্যাসাগর- বিবেকানন্দ-শ্রীচৈতন্য... সবাই হবেন একেবারে অচ্ছুৎ। থাকবেন কেবল গোলওয়ালকার, সাভারকার প্রমুখেরা! ১১/১২ গুণ বৃদ্ধি ঘটেছে আরএসএস-এর এই বাংলায়! ভাববেন না? পথে নেমেই মানুষের কাছে এই বহুমাত্রিক বিপদের কথা বলাটাই হোক এ-সময়ের অগ্রাধিকার। এটা একটা মতাদর্শগত চ্যালেঞ্জও বটে আজকের সময়ে। পরিষ্কার করে যুক্তিনিষ্ঠভাবে মানুষের সামনে উত্থাপন করতে হবে, আমাদের ভারতে সাভারকারদের 'হিন্দুত্ব' অচল। মিলেমিশে থাকার যে পরম্পরা তাকে ক্ষয়ে যেতে দেব না—এই প্রতিজ্ঞা নিয়েই এ বিপদ থেকে গোটা সমাজকে ভারমুক্ত করতে হবে। কারণ—

একটা আগমনী ভোরের জন্যে...
ঝিল্লির একটানা শব্দের শরীরে পাথর কেটে কেটে
স্নেহমাখা দুরন্ত ভালোবাসার স্রোতে পাগলামো।

সেই আগমনী ভোরের জন্যে...
কুয়াশার প্রলেপ সরিয়ে একরাশ ক্লান্তি মোছা।
পৃথিবীর সোঁদা মাটির গন্ধ এখনো ডাকছে,
কালবোশেখির আসন্ন ঝড়ের পাহারাদর হই।

—গোপালচন্দ্র চন্দ্র

যে কথাটি দিয়ে এই প্রসঙ্গের ইতি টানতে চাইছি তা হল—''আমরা বাংলার মানুষ। রাত শেষে ভোরের বাতাসে ঘুমের মেঘাচ্ছন্নতায় শুনি ভালোবাসার গান মসজিদের আজানের ধ্বনিতে। দিনভর কাজকর্ম। সন্ধ্যায় মন্দিরের ঢাক-কাঁসরঘণ্টা- উলুধ্বনিতে, ধূপের ধোঁয়ায় সেই ভোরের পেলব সুরের ভালোবাসারা যেন গান ধরে হৃদয়ের তন্ত্রী ছুঁয়ে ছুঁয়ে। তারপর রাতে বিশ্রামে যাবার আগে আবারও সেই ভালোবাসার পবিত্রতা ভেসে আসে বাতাসে ভর করে করে, গির্জার ঘণ্টার ঢং ঢং ঢং ধ্বনি থেকে। এটাই তো আমার দেশ। না কোনো দ্বেষ, বিদ্বেষ এখানে নয়, এই বাংলায় নয়। এই দেশে নয়। কারণ ঘৃণার কোনো ঠাঁই নেই এই মাটিতে। মিলনের পরশে এখানে তৈরি হয়েছে ঐতিহ্য, তাকে ঐতিহ্যহীনতায় ভরিয়ে দেবে ওরা?—না সে সুযোগ কারো জন্যেই এখানে অপেক্ষায় নেই। আছে লড়াই মিলনের জন্য। এ লড়াই ভাবাদর্শের। এ লড়াই উন্নত মতাদর্শের জন্য। এ লড়াই মানুষে মানুষে এক সুরে গেয়ে ওঠবার জন্য—'মানুষ মানুষের জন্যে... জীবন জীবনের জন্যে...।"

কৃতজ্ঞতা

১. 'প্রবাহ' শারদ সংখ্যা, ২০১৭
২. 'ধর্মের উৎস সন্ধানে', ভবানীপ্রসাদ সাহু
৩. 'বেদ, হিন্দুধর্ম, হিন্দুত্ব', শর্মিষ্ঠা দাশগুপ্ত (সম্পাদক)
৪. 'সাভারকার ও হিন্দুত্ব', এ জি নুরানী
৫. 'রাজনৈতিক প্রস্তাব ২২তম কংগ্রেস', সি পি আই (এম)
৬. 'কর্মসূচি', সি পি আই (এম)
৭. 'সাম্প্রদায়িকতাবাদ নিপাত যাক', অনিল দাশগুপ্ত
৮. 'রামজন্মভূমি-বাবরি মসজিদ বিতর্ক : অযোধ্যার রায়', নির্মল বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পাদিত)
৯. 'নির্বাচিত রচনা সংকলন' (৩য় খণ্ড), অনিল বিশ্বাস
১০. 'দেশহিতৈষী' শারদ, ১৯৯৮, সুধাংশু দাশগুপ্ত (সম্পাদিত)

With best compliments of

Ratan Dutta

ASSOCIATED ENGINEERS

MECHANICAL CONTRACTOR & GENERAL ORDER SUPPLIER

Specialist in

Tool Room, Gear, Penion Shaft & Maintenance Works

Sagarbhanga Colony, Durgapur-713211, Dist. Paschim Bardhaman

Phone : 9932244082, 8001762157

Sl. No. 86

যুক্তিবোধ ধ্বংসই লক্ষ্য

রথীন রায়

সোভিয়েত ইউনিয়নে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিপর্যয়ের পর সাম্রাজ্যবাদ সহ দেশে দেশে পুঁজিপতিরা পরম উল্লসিত হয়েছিল এই ভেবে যে শক্তির ভারসাম্য নিশ্চিত ভাবেই সাম্রাজ্যবাদের অনুকূলে যায়। সম্পদ, বাজার এবং কাঁচা মালের উৎস চলে যায় সাম্রাজ্যবাদের দখলে। সদম্ভে ঘোষিত হয়েছিল—একমেরুর বিশ্ব, পুঁজিবাদের কোনো বিকল্প নেই, সমাজতন্ত্রের ভবিষ্যৎ নেই ইত্যাদি। অল্পদিনেই দম্ভের ফানুস ফেঁসে গেছে। যা প্রচার করেছিল সবই অবৈজ্ঞানিক এবং যুক্তিগ্রাহ্য নয়।

পুঁজিপতিরা পুঁজির শক্তিকে ব্যক্তিগত মনে করে। একেবারেই ভুল। কমিউনিস্ট ইস্তাহারে মার্কস-এঙ্গেলস্-এর বৈজ্ঞানিক বীক্ষা হল পুঁজি ব্যক্তিগত নয়, সামাজিক শক্তি। বর্তমান সময়ে পুঁজির বিপুল সামাজিক শক্তির কারণে পুঁজিবাদই দিশেহারা, কোনো যুক্তিসঙ্গত সমাধান-পথ খুঁজে পাচ্ছে না। পুঁজিবাদী পথে সমাধান হবার নয়। দশকের পর দশক বিভিন্ন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে আরও সংকটে জড়িয়ে পড়ছে। পুঁজিবাদ তার ক্ল্যাসিক ফর্ম হারিয়ে প্রাক্-ধনতান্ত্রিক পথ গ্রহণ করে মুনাফা অক্ষুণ্ণ রাখতে বেপরোয়া চেষ্টা চালাচ্ছে। তাই ধনতন্ত্র শেষ অবস্থায় পৌঁছেছে—এখন ধান্দার ধনতন্ত্রে পরিণত হয়েছে।

□

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী পর্বে সোভিয়েতে সমাজতন্ত্রের বিপুল নির্মাণ বিশ্বকে চমৎকৃত করেছিল। যুদ্ধের ধ্বংসকে অতি দ্রুত অতিক্রম করে বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, পরমাণু-বিজ্ঞান, মহাকাশ-বিজ্ঞান, শিক্ষা, সংস্কৃতি, কর্মসংস্থান, ক্রীড়া—সবক্ষেত্রে উন্নয়ন উচ্চশিখরে উন্নীত হয়। মনে হয় কোনো এক জাদুদণ্ডে এই অসাধ্য সাধন হয়েছে। সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাই সেই জাদুদণ্ড। কিছু নেতৃত্বের মার্কসীয় বিজ্ঞানের ভুল প্রয়াগে সেই সমাজতন্ত্রিক ব্যবস্থার বিপর্যয় ঘটলো, যা সভ্যতার ইতিহাসে সব থেকে দুঃখজনক ঘটনা।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী ঘটনাক্রমে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হল এশিয়া আফ্রিকা লাতিন আমেরিকার পরাধীন দেশগুলির উপনিবেশ-বিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামগুলির সাফল্য। এর মধ্যে দুটি প্রাচীন সভ্যতার বিশাল দেশ স্বাধীন হয়। অবশ্যই পৃথক বৈশিষ্ট্য নিয়ে। চীনে জাতীয় মুক্তিসংগ্রামে নেতৃত্ব দেয় শ্রমিক শ্রেণির পার্টি—কমিউনিস্ট পার্টি। সমস্ত প্রতিবিপ্লবের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিপ্লব। ঘোষিত হয় জনগণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংকল্প। মানব ইতিহাসে শ্রমজীবী মানুষের পক্ষে ইতিবাচক ঘটনা।

ভিয়েতনামের জনগণ দুটি বৃহৎ সাম্রাজ্যবাদী শক্তির সাথে মরণপণ সংগ্রাম করে দেশকে মুক্ত করতে সক্ষম হয়েছিল। দিয়েনবিয়েন ফু-র ঐতিহাসিক যুদ্ধে ফরাসি সাম্রাজ্যবাদকে হারানোর পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দানবীয় আক্রমণকে পরাস্ত করেই দক্ষিণ ভিয়েতনামকে মুক্ত করতে হয়েছিল। জনযুদ্ধ ও গণপ্রতিরোধের এক বীরগাথা। এক্ষেত্রেও নেতৃত্ব দিয়েছে শ্রমিকশ্রেণির পার্টি কমিউনিস্ট পার্টি। ভিয়েতনাম হয়ে উঠেছিল সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে তৃতীয় বিশ্বের জনগণের দ্বন্দ্বের কেন্দ্রবিন্দু—ফোকাল পয়েন্ট।

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামকে শাসকশ্রেণি চিত্রিত করে শুধুমাত্র গান্ধির নেতৃত্বে পরিচালিত অসহযোগ, অনশন সহ শান্তিপূর্ণ পদ্ধতি হিসেবে। জাতীয় কংগ্রেসই যেন কৃতিত্বের একমাত্র দাবিদার। পলাশির যুদ্ধের পাঁচ বছর পর থেকেই বাংলা সহ সমগ্র ভারতে প্রতিদিনই কোথাও না কোথাও কৃষক বিদ্রোহ হয়েছে। এবং ইংরেজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহগুলি সবই সশস্ত্র। খিলাফৎ আন্দোলন, গদর পার্টির সংগ্রাম, আজাদ হিন্দ ফৌজ, চট্টগ্রাম যুব বিদ্রোহ, ক্ষুদিরাম-প্রফুল্ল চাকী, অলিন্দ যুদ্ধ, ভগৎ সিংদের প্রচেষ্টা, পুন্নাপ্রা-ভায়লার, চৌরিচৌরা, মুম্বইয়ের নৌবিদ্রোহ সমর্থনে শ্রমিকদের ভূমিকা, কমিউনিস্ট পার্টি ও ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের ভূমিকা প্রায় উহ্যই থাকে।

স্বাধীনতা সংগ্রামে নেতৃত্ব থাকে কংগ্রেসের হাতে। উঠতি বুর্জোয়া ও সামন্তপ্রভুদের পার্টি। রাষ্ট্রক্ষমতা হাতে পাবার পর কংগ্রেস ভারতে পুঁজিবাদ গড়ে তোলার উদ্যোগ নেয়, ভূমিসংস্কার না করেই। পুঁজি সঞ্চয়ে প্রধানত ঘাটতি বাজেট, মুদ্রাস্ফীতি, মূল্যবৃদ্ধি প্রভৃতির ওপর, সদ্যস্বাধীন দেশে জনগণের ওপর বিপুল বোঝা চাপিয়ে। দেশীয় বুর্জোয়াদের বেশি পরিমাণ মূলধনের অপ্রতুলতার কারণে বুনিয়াদি ক্ষেত্র—যেমন ইস্পাত, বিদ্যুৎ, ভারী যন্ত্রপাতি, প্রকল্প নির্মাণ ইত্যাদি রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা গড়ে তোলা হয় জনগণের করের টাকায়। দ্রুত মুনাফা আসে এমন ভোগ্যপণ্য শিল্প তুলে দেওয়া হয় দেশীয় পুঁজিপতিদের হাতে। প্রথম দিকে অবশ্য সোভিয়েতের পরিকল্পিত অর্থনীতির অনুপ্রেরণা ছিল। আত্মনির্ভর অর্থনীতি গড়ার স্বপ্ন ছিল সে-সময়। কিন্তু আস্তিনের আড়ালে পুঁজিবাদ গড়ার পরিকল্পনা। নেহরু ছিলেন, জোটনিরপেক্ষ নীতির অন্যতম নেতা। জোটনিরপেক্ষতাকে ব্যবহার করা হয় সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে দরকষাকষির খেলায়। সাম্রাজ্যবাদী শিবির থেকে আরও সহায়তা আদায়ের জন্য।

পুঁজি বিশ্বময় সংকটের গর্ভে গভীর অসুখে দীর্ণ। ভারতের ধনতন্ত্র ততোধিক সংকটগ্রস্ত। কেউ কেউ বুকে চাপড় মেরে বলতে পারেন রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প তৈরি হয়েছিল তুলে দেবার জন্যই। একদম ঠিক। এখন দেশের সম্পদের ৭১ শতাংশ মাত্র ১ শতাংশ মানুষের হাতে কেন্দ্রীভূত। সুতরাং প্রয়োজন ফুরিয়েছে। ধান্দার ধনতন্ত্রে এসবের আর দরকার পড়ে না।

□

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তীকালে সাম্রাজ্যবাদ সাময়িকভাবে পিছু পঠতে বাধ্য হয়েছিল। শান্তির জন্য আন্দোলন তাদের অন্দরমহলেও ঢুকে পড়েছিল। সমাজতান্ত্রিক নির্মাণ ছিল চমকপ্রদ। হিরোসিমা-নাগাসাকিতে যুদ্ধ থেমে যাবার পরও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বোমা নিক্ষেপ করল—ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি, জীবনহানি। বিশ্ব ভয়ে শিহরিত হল। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ সেটাই চাইছিল। সকলেই ভয়ে নতজানু হয় যেন। কিছুদিনের মধ্যেই স্টালিন পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটিয়ে বিশ্বের শ্রমজীবী মানুষকে আস্বস্ত করল। ভয় পাওয়ার কিছু নেই—আমরা আছি তোমাদেরই পাশে। এইরকম ইতিবাচক পরিস্থিতিতে বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলনের নেতৃত্ব সাম্রাজ্যবাদের মূল্যায়ন করলেন। কেউ সাম্রাজ্যবাদকে কোটের বোতামের সাথে তুলনা করলেন, কেউ বললেন কাগুজে বাঘ। ভুল মূল্যায়ন হল।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের কোনো ক্ষতি হয়নি—পার্লহারবারে জাপানিদের বোমা ফেলা ছাড়া। যুদ্ধে অস্ত্র বিক্রি করে বিপুল মুনাফা করেছে, আমেরিকায় গড়ে উঠেছে 'ওয়্যার ইকোনমি'। অস্ত্রশিল্পের মালিকরাই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে নিয়ন্ত্রণ করে। মার্কিন অর্থব্যবস্থাকে চাঙ্গা রাখার জন্য, মুনাফার জন্য যুদ্ধ চাই। পুঁজিবাদের রক্ষক হয়ে পৃথিবীর কোথাও না কোথাও যুদ্ধ লাগিয়েই রাখছে। যে-কোনো প্রগতিমূলক ব্যবস্থাকে ধ্বংস করার জন্য, পুঁজির রক্ষক হিসেবে আন্তর্জাতিক পুলিশবাহিনীর কাজ করে চলেছে।

এই সময়কালে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অভূতপূর্ব বিকাশ ঘটে। বিশেষ করে তথ্যপ্রযুক্তি ও রবোটিকস্ ইত্যাদির। বিজ্ঞানের আবিষ্কার এখন আর জনহিতার্থে নয়, ব্যক্তিমালিকানাধীন। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির এই বিপ্লব পরিস্থিতির আমূল পরিবর্তন ঘটিয়েছে। কায়িক শ্রমের প্রয়োজনীয়তা কমিয়েছে। বিপুল উদ্বৃত্ত মূল্য সৃষ্টি করছে। সেই উদ্বৃত্ত মূল্য আত্মসাৎ করে বিপুল সম্পদের মালিক হয়েছে সাম্রাজ্যবাদী পুঁজিপতিরা। সম্পদ ব্যবহৃত হয়েছে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে। উন্নয়নশীল দেশগুলিকে প্রভাবিত করতে সম্পদ শিল্পপুঁজি হিসেবে ব্যবহৃত না হয়ে পোর্টফোলিও ক্যাপিটাল হিসেবে দেশে দেশে ঘুরে বেড়িয়েছে শেয়ার বাজারে ফাটকা খেলার জন্য। শেয়ারের দাম কমিয়ে অথবা ফেলে দিয়ে, বিপুল মুনাফা লুণ্ঠন করে চলে যায় অন্য কোনো উন্নয়নশীল দেশে। ধান্দার ধনতন্ত্র।

এই সময়কালে ভারত সহ উন্নয়নশীল দেশগুলির মেধাসম্পদ কুক্ষিগত করতে সক্ষম হয়েছে সাম্রাজ্যবাদীরা। 'ব্রেন ড্রেন' কথাটা আমরা জানি। জনগণের ট্যাক্সের টাকায় লেখাপড়া শিখে সাম্রাজ্যবাদের সেবায় নিবেদিত হয়েছে। মেধাশক্তিতে সাম্রাজ্যবাদী শিবির সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থাকে ছাপিয়ে যেতে পেরেছে। ভারতের মতো তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির তথাকথিত বুদ্ধিজীবীরা একশ্রেণির সংবাদমাধ্যম এবং সর্বোপরি সাম্রাজ্যবাদের তাঁবেদার শাসকশ্রেণিগুলি উদ্বাহু নৃত্য করেছে। বলেছে বিদেশ থেকে বহু বিদেশি মুদ্রা দেশে আসবে। যারা বিদেশে যাচ্ছে তারা পাঠাবে। ছাগলের তৃতীয় সন্তানের আনন্দের মতো। অথচ দেশে মৌলিক বিজ্ঞান, প্রযুক্তি এবং ভাষা সাহিত্য অন্যান্য ক্ষেত্রে গবেষণার প্রায় কোনো পরিকাঠামোই তৈরি করেনি। বিদেশে যাওয়া বেশিরভাগই উন্নত গবেষণার সুযোগ উন্নত জীবনযাপনের তাগিদে সেখানেই থেকে যাচ্ছে।

মানুষের অভ্যাসের প্রভাব এবং তার শিকড় খুবই গভীরে প্রোথিত। ধর্মের প্রভাব ব্যাপক ও গভীর। ধর্ম সম্পর্কে মার্কসের মত সুবিদিত। তথাপি বলা যায়—সব ধর্মের মানুষের মধ্যে মানুষের জন্য জন্য সুন্দর নির্দেশ ও উপদেশাবলী রয়েছে। কিন্তু যুগ যুগ ধরে দেশে দেশে শাসকশ্রেণিগুলি ধর্মের বিকৃত ব্যাখ্যা করে দমন নামিয়ে এনেছে রাষ্ট্রক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য। ধর্মের নামেই পৃথিবীতে সব থেকে বেশি রক্তপাত হয়েছে। অথচ কোনো ধর্মই রক্তপাতের পক্ষে নয়। ধর্মের নামেই শ্রমজীবী মানুষের মধ্যে বিভাজন সৃষ্টি করা হচ্ছে। মনোজগতের এইসব ভয়ংকর প্রতিকূলতা সরিয়েই সভ্যতাকে প্রগতির পথে এগোতে হচ্ছে।

□

সোভিয়েতে সমাজতন্ত্রের বিপর্যয়, সমাজতান্ত্রিক শিবির দুর্বল হয়ে যাওয়া, বাজার, সম্পদ ও কাঁচামালের একচ্ছত্র মালিক হওয়া সত্ত্বেও বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিপ্লবের সুযোগকে নিজ স্বার্থে ব্যবহার, বিশ্ববাণিজ্য সংস্থা, আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার, বিশ্বব্যাঙ্ক ইত্যাদি হাতিয়ারকে ব্যবহার, উদার অর্থনীতির নামে তৃতীয় বিশ্বের অর্থনীতিকে পঙ্গু করে সাম্রাজ্যবাদের ওপর আরও নির্ভরশীল করা, প্রাকৃতিক তৈল সম্পদ কবজা করার জন্য স্বাধীন ইরাককে মিথ্যা অজুহাতে ধ্বংস করে দখল করা, আফগানিস্তানের প্রগতিশীল সরকারকে উচ্ছেদ করার জন্য তালিবানদের অস্ত্রসাহায্য, পরে তালিবান উগ্রপন্থীদের দমনের জন্য আফগানিস্তান দখল, গদ্দাফি যেহেতু সাম্রাজ্যবাদের তাঁবেদার হননি সেজন্য লিবিয়ার তেলের জন্য যুদ্ধ চাপিয়ে দেওয়া, উত্তেজনা ও অস্ত্র বিক্রির জন্য প্যালেস্টাইন ও ইজ়রাইলের সংঘর্ষকে তীব্র করা হয়েছে। জেরুজ়ালেমকে ইজ়রাইলের রাজধানী ঘোষণা করা হয়েছে। সিরিয়ার আসাদ যেহেতু মার্কিন-বিরোধী ও রাশিয়ার বন্ধু সেজন্য ইসলামিক স্টেট নামে জঙ্গি সংগঠনকে দিয়ে গৃহযুদ্ধ বাধিয়ে রাখা, ইরান ও উত্তর কোরিয়াকে শয়তানের অক্ষ নামে অভিহিত করে যুদ্ধের আবহাওয়া তৈরি ইত্যাদি সবকিছু অনুকূলে থাকা সত্ত্বেও ধনতন্ত্র আজ গভীর থেকে গভীরতর অসুখে আক্রান্ত। পরিত্রাণের যত চেষ্টা করবে ততই চোরাবালিতে ডুবতে থাকবে।

উৎপাদিকা শক্তি এবং উৎপাদন সম্পর্কের পরিবর্তন না ঘটাতে পারলে মানবসভ্যতার অস্তিত্বই প্রশ্নের মুখে দাঁড়াবে।

বিশ্বে যে চারটি মৌলিক দ্বন্দ্ব ক্রিয়াশীল তার সবকটি বর্তমান সময়ে তীব্র হয়েছে। দীর্ঘকাল যাবৎ আন্তঃসাম্রাজ্যবাদী দ্বন্দ্ব স্তিমিত রাখা সম্ভব হয়েছিল। কিন্তু ধনতান্ত্রিক অর্থনীতি এমন গভীর সংকটে নিমজ্জিত যে সাম্রাজ্যবাদীদের নিজেদের মধ্যেকার দ্বন্দ্বকে আর চেপে রাখা যাচ্ছে না।

জি-৭ গোষ্ঠীর মধ্যে দ্বন্দ্বের ফলে যৌথ ইস্তাহার পর্যন্ত প্রকাশিত হয়নি। যুক্তরাজ্য ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন থেকে আলাদা হয়েছে। বাণিজ্যযুদ্ধ শুরু হয়েছে। চিনের শক্তিশালী অর্থনীতি, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র চিনা পণ্যের ওপর শুল্ক চাপাচ্ছে। চিন পাল্টা শুল্ক চাপিয়েছে। কানাডার সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য-বিরোধ তুঙ্গে। ইউরোপীয় ইউনিয়ন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শুল্কনীতির বিরোধিতা করছে। ইরান প্রশ্নে রাশিয়া ইরানের পাশে দাঁড়িয়েছে। পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে জার্মানি ঘোষণা করেছে আমেরিকার ফতোয়া তারা মানতে বাধ্য নয়। যারা উদার অর্থনীতির প্রবক্তা তাদের মধ্যে আর উদারতার অবশিষ্ট নেই। বিশ্ববাণিজ্য সংস্থা প্রায় অচল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দাদাগিরি অন্য সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলি আগের সুবোধ বালকের মতো আর মানতে চাইছে না। বাণিজ্য-যুদ্ধ শুরু হয়েছে। বাণিজ্য-যুদ্ধ ধনতান্ত্রিক দুনিয়ায় বৃহত্তর সামরিক আগ্রাসনের পূর্বাভাষ।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ব্যবহারে বিপুল পরিমাণ উদ্বৃত্ত মূল্য আত্মসাৎ, শেয়ারবাজারে ফাটকা খেলে সম্পদের কেন্দ্রীভবন ইত্যাদির মাধ্যমে যে উন্নয়ন তা হয়েছে কর্মসংস্থানহীন। ফলে

ক্রয়ক্ষমতা কমেছে। একদিকে সম্পদের বিপুল কেন্দ্রীভবন অপরদিকে কর্মহীন কোটি কোটি মানুষ। কারখানার উৎপাদিত পণ্য কেনার ক্রেতা নেই। আমাদের দেশ সহ গোটা বিশ্বময় আজ প্রান্তিক মানুষ। পুঁজির এই দুরারোগ্য অসুখের নাম অধিক উৎপাদন।

আমাদের দেশেই ৭৩ শতাংশ সম্পদ মাত্র এক শতাংশ মানুষের হাতে। মাত্র ২৭ শতাংশ সম্পদ ৯৯ শতাংশ মানুষের হাতে। ঝকঝকে শপিংমল, পাঁচতারা হোটেল, হোটেলের মতো হাসপাতাল অথবা দামিদামি স্কুল দেখে রোগের হদিশ পাওয়া যাবে না। সংগঠিত শিল্প গড়ে উঠছে না। রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রকে বিক্রি করে দেওয়া হচ্ছে। আমাদের প্রধানমন্ত্রী মাটির ভাঁড়ে চা বিক্রি দিয়ে জীবন শুরু করে এখন গোটা গোটা ইস্পাত কারখানাই বিক্রি করে দিচ্ছেন। এটাই নাকি অগ্রগতি। প্রতি দু-ঘণ্টায় এক জন কৃষক আত্মহত্যা করছে। সম্প্রতি কল্যাণী কৃষিবিশ্ববিদ্যালয়ে এক আন্তর্জাতিক সম্মেলনে বলা হয়েছে, এদেশের ৭৬ শতাংশ কৃষক চাষ ছেড়ে দিতে চাইছেন। ফসলের দাম না পাওয়া ও ঋণ শোধ করতে না পারার কারণে কৃষিতে ভয়ঙ্কর অবস্থা। অপরদিকে কৃষিতে ব্যাপক পুঁজির অনুপ্রবেশ ঘটছে, ঢুকছে যন্ত্র। জমিচাষ, ফসল রোপণ, ফসল কাটা, ঝাড়াই, বস্তাবন্দি হওয়া এখন সবই যন্ত্রে। খেতমজুর ছোটো জমির মালিকরা কাজ পাচ্ছে না। পরিযায়ী শ্রমিক হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে শুধু কাজের জন্য। কৃষিতে বর্ধিত ব্যয় বহন করার ক্ষমতা হারিয়ে ছোটো ও মাঝারি কৃষকরা ভূমিহীনে পরিণত হচ্ছে। কৃষির দখল ধনতান্ত্রিক জমিদাররা নিচ্ছে। দ্রুত কৃষিব্যবস্থাও কর্পোরেট ব্যবস্থায় পরিণত হচ্ছে।

শিল্পে সংগঠিত শ্রমিকের সংখ্যা কমছে। ঠিকা প্রথাই এখন মুখ্য। অসংগঠিত শ্রমিকের সংখ্যা দ্রুত বাড়ছে। তাও চুক্তিভিত্তিক। তিন হাজার থেকে দশ হাজার। দেশের জনসংখ্যার ৮০ শতাংশ মানুষ শুধু ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য ছুটে বেড়াচ্ছে। সেখানে ভোগ্যপণ্য কে কিনবে? যে দশ শতাংশের ক্রয়ক্ষমতা আছে সেইটুকু বাজার ধরার জন্য পুঁজিপতিদের মধ্যে চলছে খেয়োখেয়ি।

শিল্পে সংগঠিত শ্রমিকের সংখ্যা কমছে। ঠিকা প্রথাই এখন মুখ্য। অসংগঠিত শ্রমিকের সংখ্যা দ্রুত বাড়ছে। তাও চুক্তিভিত্তিক। তিন হাজার থেকে দশ হাজার। দেশের জনসংখ্যার ৮০ শতাংশ মানুষ শুধু ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য ছুটে বেড়াচ্ছে। সেখানে ভোগ্যপণ্য কে কিনবে? যে দশ শতাংশের ক্রয়ক্ষমতা আছে সেইটুকু বাজার ধরার জন্য পুঁজিপতিদের মধ্যে চলছে খেয়োখেয়ি।

শতশত কোটি টাকা ঋণ ছাড় ট্যাক্স ছাড় দিয়েও কোনো শিল্পপতিকে দিয়ে কোনো শিল্প গড়ে তোলানো যাচ্ছে না। কর্মহীন যৌবনের সংখ্যা বেড়েই চলেছে।

একই অবস্থা পৃথিবীর সব ধনতান্ত্রিক দেশেই। প্রায় এক দশক আগের একটি তথ্য বলছে পৃথিবীর সমস্ত সম্পদের ৭০ শতাংশ ভোগ করে মাত্র ১০ শতাংশ মানুষ। বাকি ৩০ শতাংশ ভোগ করে ৯০ ভাগ মানুষ। তার মধ্যে নিচের ১০ শতাংশ মানুষ ভোগ করে মাত্র ০.০৫ শতাংশ। ক্রয়ক্ষমতাহীন কোটি কোটি প্রান্তিক মানুষ থাকবে আবার স্বাভাবিক পথে পুঁজির বিকাশ ঘটবে এমনটা হতে পারে না। কিন্তু মুনাফা চাই। সেজন্য পিঁপড়ের পেট টিপে চিনিটুকুও বার করে আনতে হবে। সেজন্যই খুচরো ব্যবসায় পর্যন্ত বহুজাতিক এবং আমাদের কর্পোরেট সংস্থাগুলি নেমে পড়েছে। কোটি কোটি খুচরো ব্যবসায়ী নতুন করে রোজগারহীন হবে। শয়তানের চাকা এভাবেই আরও সংকটের দিকে গড়াবে।

ধনতন্ত্র আছে অথচ মুনাফার ধান্দা থাকবে না—সেটা হয় না। ধনতন্ত্রের সনাতনী রূপটি আর রাখা যাচ্ছে না, যেহেতু ক্রেতা নেই। প্রাক্‌পুঁজিবাদী সঞ্চয়ের দিনগুলির মতো শঠতা বর্বরতা শক্তির ব্যবহার বাড়বে। পৃথিবীর বহুদেশে অতি দক্ষিণপন্থী শক্তি রাষ্ট্রক্ষমতায় আসছে। এরা বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক মূল্যবোধকেও বিসর্জন দেয়। যেমন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ট্রাম্প। ভারতে আরএসএস-নিয়ন্ত্রিত নরেন্দ্র মোদি এবং অন্যত্রও এই প্রবণতা। দেশে দেশে ধান্দার গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে শ্রমজীবীদের ক্ষোভ ক্রমশ বিস্ফোরণের আকার নিচ্ছে।

□

একদিকে বিপুল সম্পদের কেন্দ্রীভবন, অপরদিকে সমুদ্রের মতো কর্মহীন প্রান্তিক মানুষ। একদিকে উৎপাদনের উপকরণের নিরন্তর বিকাশের ফলে ভোগ্যপণ্যের বিপুল সম্ভার আর অন্যদিকে ক্রেতাহীন সঙ্কুচিত বাজার। 'অকুপাই ওয়ালস্ট্রিট' আন্দোলনের শ্লোগানের মতো—'ওরা এক, আমরা নিরানব্বই'—একদিকে মুষ্টিমেয় কয়েকজন সম্পদশালী, অপরদিকে কর্মহীন সম্পদহীন দরিদ্র কোটি কোটি বুভুক্ষু মানুষ। এই গভীর দ্বন্দ্বের সমাধান, পৃথিবীর এই গভীর অসুখের সমাধান পুঁজিবাদের হাতে আর নেই। এই দ্বন্দ্বের সমাধান হতে পারে উৎপাদনের উপকরণের সামাজিকীকরণের মধ্য দিয়ে, পৃথিবীতে যুদ্ধের উপর যবনিকা পতনের মধ্য দিয়ে—পুঁজিবাদকে উচ্ছেদ করে। অন্য কোনো বিকল্প নেই। সোভিয়েতের সাময়িক বিপর্যয়ের পর সাম্রাজ্যবাদীরা ঘোষণা করেছিল 'There Is No Alternative (TINA)'। পুঁজিবাদের বিকল্প পুঁজিবাদই। সেই ফানুস বহুকাল আগেই ফেঁসে গেছে। একথা বলার অর্থ হল—হয় পুঁজিবাদ থাকবে নাহলে মানব সভ্যতাকেই ধ্বংস করে দেওয়া হবে। তাই দেশে দেশে মানুষ ঐক্যবদ্ধ হবেই।

বিপর্যস্ত পুঁজিবাদ বিভিন্ন বিকল্প পথ অনুসন্ধানে ব্যস্ত। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ বিশ্বপুঁজিবাদ রক্ষার চৌকিদার হয়েছে। পৃথিবীর যে-কোনো স্থানে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী—প্রগতিমুখী যে কোনো প্রয়াসকে প্রথমেই অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞার মাধ্যমে, রাষ্ট্রসংঘকে ব্যবহার করে দমানোর চেষ্টা করে। শেষ পর্যন্ত সামরিক হস্তক্ষেপ করে। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের কাছে স্বাধীন সার্বভৌম কোনো দেশ নেই। প্রয়োজনে যে-কোনো দেশে, যে-কোনো সময় অর্থনৈতিক বা সামরিক হস্তক্ষের করেছে। রাষ্ট্রসংঘকে রবারস্ট্যাম্প হিসেবে ব্যবহার করেছে। গোটা পুঁজিবাদী দুনিয়া তার পোঁ ধরেছে। বিগত কয়েক দশক এই চিত্রনাট্য চলেছে। এখন প্রতিবাদী কণ্ঠও শোনা যাচ্ছে। দক্ষিণ আমেরিকার দেশগুলি থেকে আরব দেশগুলিতে। নতুন বাতাসের নামে, এখন সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলি থেকেও ভিন্ন সুর শোনা যাচ্ছে, সংকটের ফলে আন্তঃসাম্রাজ্যবাদী দ্বন্দ্ব প্রকট হওয়ার কারণে।

আমেরিকাও কিন্তু ভয় পেতে শুরু করেছে। ছোট্ট উত্তর কোরিয়া যখন বলে আমার উঠোনে সামরিক মহড়া বন্ধ কর, আমার হাতে পারমাণবিক বোতাম আছে, তখন শান্তি আলোচনায় বসতে বাধ্য হতে হয় ট্রাম্পের মতো অতিদক্ষিণপন্থী দাম্ভিক লোককেও।

আমেরিকার সমস্যা হচ্ছে যুদ্ধ ব্যতীত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতি টিকতে পারে না। যুদ্ধাস্ত্র তৈরি ও রপ্তানি তার অর্থনীতির মূল ভিত্তি। সেজন্য যুদ্ধ লাগিয়েই রাখা তার নীতির মধ্যে পড়ে। এই

নীতিতে বোম্বেটিগিরি করা যায়, বন্ধু পাওয়া যায় না। বন্ধু যা পাওয়া যায় সেটা ভয়ে অথবা নিজ স্বার্থসিদ্ধির জন্য। ওয়ার ইকনমির ফলে অন্যান্য শিল্প, বিশেষত ভোগ্যপণ্য শিল্প কম গুরুত্ব পায়। ফলে চিনের মতো দেশ আমেরিকার ভোগ্যপণ্যের বাজার পুরোটাই দখল করে ফেলেছে। ধনতন্ত্রের সংকটে এখন বাণিজ্যযুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে।

দ্বিতীয় পথ হল বিভেদ সৃষ্টি করা। বিভেদের যথেষ্ট উপাদান পৃথিবীতে ছড়িয়ে আছে। সর্বত্র ধর্মের নামে বিভাজন সব থেকে সুবিধাজনক। সর্বত্র প্রতিক্রিয়াশীলরা বিভাজনের কাজে লিপ্ত। ইউরোপ জুড়ে মুসলিম ও খ্রিস্ট ধর্মাবলম্বীদের বিভেদ লাগিয়ে রাখা হয়েছে। আমাদের দেশে অতিদক্ষিণপন্থী আরএসএস-বিজেপি ধর্মের নামে মেরুকরণে লিপ্ত। ভারতের মতো বহু ভাষা ও ধর্মের সমন্বয়ে গঠিত যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো ভেঙে পড়ার মুখে। সংখ্যাগুরুর উগ্র সাম্প্রদায়িকতা সংখ্যালঘু সাম্প্রদায়িকতার জন্ম দিচ্ছে। মুসলিম দেশগুলিতে শিয়া-সুন্নি বিভাজন যুদ্ধ পর্যন্ত গড়াচ্ছে। আমেরিকা উভয়কেই অস্ত্র বিক্রি করছে।

যেখানে ধর্ম দিয়ে হচ্ছে না সেখানে জাতিসত্তার প্রশ্নকে সামনে আনা হচ্ছে। আফ্রিকায় জাতিসত্তার প্রশ্নে দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ চলছে। সেখানে অস্ত্র সরবরাহকারী দেশ আমেরিকা। সুদানের মতো দেশ দ্বিখণ্ডিত হয়ে গেল।

একভাষা একজাতি—এই তত্ত্ব এক রাখতে পারছে না। উন্নত ও অনুন্নত এলাকায় বিভেদ সৃষ্টি করা হচ্ছে। স্বাধীনতার পর সব তেলুগুভাষী মানুষের একটি রাজ্যের জন্য বিশাল অস্ত্র আন্দোলন হয়েছিল। এখন বিভাজিত তেলেঙ্গানা ও অন্ধ্র দুটি আলাদা প্রদেশ হয়ে গেল।

দার্জিলিং-কে আলাদা রাজ্যের দাবিতে আন্দোলন দীর্ঘদিনের। আমাদের রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী সেই নেপালিভাষী মানুষদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছেন, বিভিন্ন জনগোষ্ঠীগত উন্নয়ন বোর্ড তৈরি করার মাধ্যমে।

আমাদের বর্তমান শাসকরা মনুবাদী। শূদ্রদের মানুষ বলেই মনে করে না। হামেশাই দেশের নানা প্রান্তে দলিতদের উপর অমানুষিক নির্যাতন চলছেই। তার প্রতিরোধে ভীম সেনা বলে একটি সংগঠন তৈরি হয়েছে। গো-রক্ষার নামে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষকে পিটিয়ে মারার ঘটনা ঘটছে নিত্যদিন। সেই গোরক্ষকদের সংবর্ধনা দিচ্ছেন মন্ত্রীরা। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের এক গভর্নর বলেছেন শবরীমালা মন্দিরে মহিলাদের প্রবেশাধিকার দেওয়াতেই নাকি কেরালায় এই ভয়াবহ বন্যা।

গণেশের মাথা হাতির কেন তার ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে সেযুগে ভারতে প্লাস্টিক সার্জারি ছিল। পুরাণকে ইতিহাস বলে চালানো হচ্ছে। মহেঞ্জোদারোর নর্তকীকে দেখে বলা হচ্ছে দুর্গার আদিম রূপ। এসব নিয়ে কোনো প্রশ্ন করা যাবে না। প্রশ্ন করলেই দেশদ্রোহী তকমা দিয়ে দেওয়া হবে।

আসামে ভাষা ও ধর্মকে মিলিয়ে এমন অবস্থার সৃষ্টি করা হয়েছে যে ৪০ লক্ষ মানুষ রাষ্ট্রহীন হয়ে যাবে। আদিবাসী সমাজকে বহুধাবিভক্ত করে দেওয়া হচ্ছে। শক্তিশালী গণতান্ত্রিক আন্দোলনের অভাবে প্রতিক্রিয়াশীলরা অবাধে খেলার সুযোগ পাচ্ছে। সব রকমের মিডিয়ার একটি বড় অংশ এদের সহায়ক। ফলশ্রুতি হচ্ছে গভীর সংকটে নিমজ্জিত ধনতন্ত্রের পরিকল্পনা মতোই শোষিত মানুষ আদিম কৌমগোষ্ঠীর খোলসের মধ্যে ঢুকে টিকে থাকার চেষ্টা করছে। এটাই উত্তর-আধুনিকতার তত্ত্ব।

প্রশ্ন করা যাবে না। প্রশ্ন করলেই দাভোলকর, কুলবার্গী, পানসারে অথবা গৌরী লংকেশের মতো খুন হতে হবে। অমর্ত্য সেন-এর মতো যুক্তিবাদী মানুষও অসম্মানিত হন। কবি শঙ্খ ঘোষকে কটাক্ষ করেন উন্নয়নের অনুব্রত।

বাংলাদেশ সহ পৃথিবীর দেশে দেশে এমন ঘটনাই ঘটে চলেছে। পশ্চিমবঙ্গের পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ। এইসব অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামের পূর্বশর্তই হল গণতন্ত্র। পশ্চিমবঙ্গে গণতান্ত্রিক অধিকারই হরণ করে নিয়েছে শাসকদল।

পুঁজিবাদ বিজ্ঞানকে ব্যবহার করে মুনাফার জন্য। কিন্তু বিজ্ঞানমনস্কতাকে ভীষণ ভয় পায়। বিজ্ঞানমনস্কতাই যুক্তিবাদের জন্ম দেয়। প্রতিক্রিয়ার শক্তি যুক্তিবাদকে ভয় পায়। তাই দেশে দেশে পাশব দক্ষিণপন্থী শক্তির উত্থান। যুক্তি দিয়ে খণ্ডন নয়, পুঁজিবাদের পক্ষে তা সম্ভবও নয়, তাই লণ্ডভণ্ড করে দিচ্ছে মানবিক পরিচয়গুলি। পাবলো পিকাসো-র গোয়ের্নিকা ছবিটার কথা মনে করিয়ে দেয়।

□

ধনতন্ত্রের গভীর অসুখ বলে ধনতন্ত্র নিজে থেকেই ধ্বংস হবে এমন ভাবা মূর্খামি। ধনতন্ত্রকে ধ্বংস করেই বিকল্প সমাজব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে। শ্রমজীবী মানুষের জীবন ও জীবিকার বিষয় নিয়ে গভীর ও ব্যাপক আন্দোলন গড়ে তুলতে পারলে ধর্ম বর্ণ ভাষা জাতিসত্তার দ্বারা তৈরি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্রোতহীন জলাশয়গুলি পাড় ভেঙে মূল স্রোতে ফিরে আসবে। ভুল বুঝিয়ে মানুষকে কিছুদিন বিভ্রান্ত করা যায়, দীর্ঘকালের জন্য নয়। বহুমাত্রিক আক্রমণের বিরুদ্ধে বহুমাত্রিক প্রতিরোধ গড়ে তুলতে চাই শক্তিশালী যুক্তিবাদী আন্দোলন। যুক্তিবাদী মনই বামপন্থাকে শক্তিশালী করবে। শক্তিশালী বামপন্থী আন্দোলনই পারে গভীর অসুখে নিমজ্জিত পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে সঠিক দিশা দেখাতে।

With best compliments of

ELCON ENGINEERING

ELECTRICAL CONSTRUCTION, ELECTRICAL CONSULTANCY & TESTING

5/9, Guru Nanak Road, Durgapur-713204
Mobile : 9434388560, 9832167426
E-mail : elcon.engg@gmail.com

Sl. No. 88

সৈয়দ আবুল মনসুর হবিবুল্লাহ

বীরেন ঘোষ

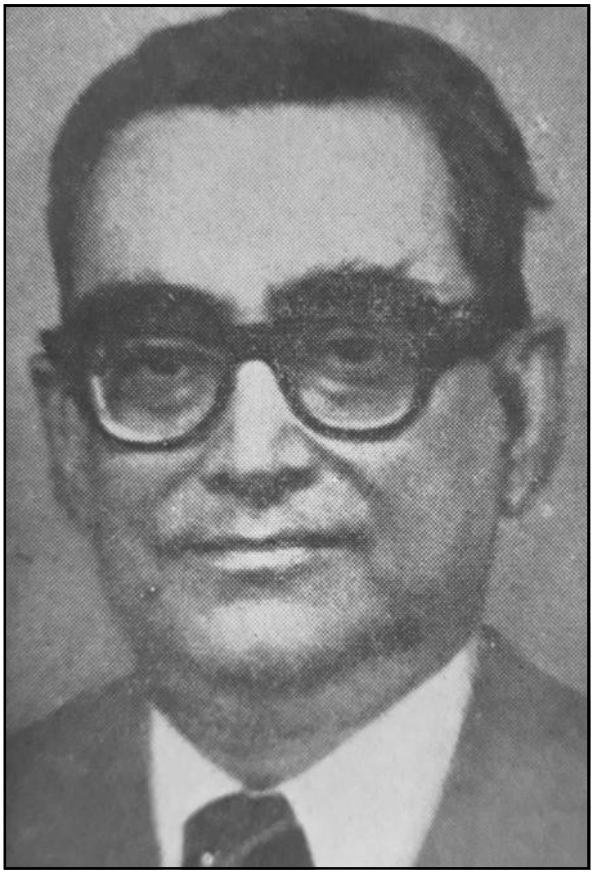

শতবর্ষে শ্রদ্ধাঞ্জলি

মহান নভেম্বর বিপ্লবের দুনিয়া কাঁপানো দশদিন ১৯১৭ সালের ৭ নভেম্বর থেকে ১৭ই নভেম্বর। সেই ঐতিহাসিক ১৯১৭ সালের ১৭ নভেম্বর মনসুর হবিবুল্লাহর জন্ম। ২০১৮ সাল তাঁর জন্মশতবর্ষ পূর্তির বৎসর। আমাদের জেলার গর্ব, অবিভক্ত বাংলার কৃষক আন্দোলনের সেনাপতি, স্বাধীনতা সংগ্রামী মনসুর হবিবুল্লাহর স্মৃতির প্রতি জানাই আমাদের বিনম্র শ্রদ্ধা।

১৯৬৯ সাল থেকে প্রায় ৩১ বছর তাঁর সাথে যোগাযোগ ও রাজনৈতিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। বর্ধমান জেলার আন্দোলন-সংগ্রামের মধ্য দিয়ে মনসুর হবিবুল্লাহ অবিভক্ত বাংলার কৃষক আন্দোলনের নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন। ১৯৪৪ সালে বর্ধমান জেলার ঐতিহাসিক ক্যানেলকর-বিরোধী আন্দোলন, অজয় বাঁধ আন্দোলন, বন্যাদুর্গত মানুষের রিলিফের আন্দোলনে প্রয়াত বিনয় চৌধুরী, শাহেদুল্লাহ সাহেব, বিপদবরণ রায়, হরেকৃষ্ণ কোঙারের নেতৃত্বে অংশগ্রহণ করেন। বিশেষ করে অগ্রজ শাহেদুল্লাহ সাহেবের প্রভাবে তিনি বর্ধমান জেলার গণআন্দোলনে নেতৃত্ব দেন। ঐতিহাসিক তেভাগা আন্দোলনের সময় তিনি অবিভক্ত বাংলায় কৃষকসভার সাধারণ সম্পাদক ছিলেন।

বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষকসভার প্রথম সম্মেলন (১৯৩৭) থেকে ষষ্ঠ সম্মেলন (১৯৪৩) পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে কৃষকসভার বিভাগীয় সম্পাদক, যুগ্ম সম্পাদক, সহযোগী সম্পাদক হিসেবে নির্বাচিত হয়ে সংগঠনের দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৪৪ সালে দিনাজপুরের ফুলবাড়িতে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষকসভার সপ্তম সম্মেলনে তিনি সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। ১৯৪৫ সালে অষ্টম সম্মেলন (হাটগোবিন্দপুর), ১৯৪৬ সালে খুলনা জেলার মৌভোগে নবম সম্মেলন, ১৯৪৭ সালে মেদিনীপুর পাঁচখুরি দশম সম্মেলনে সাধারণ সম্পাদক পদে পুনর্নির্বাচিত হন। দেশ স্বাধীন হবার পর কৃষকসভার নাম পরিবর্তন করে পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক কৃষকসভা হয়।

তিনি ১৯৪৫ সালে ১৮ বছর বয়সে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যপদ অর্জন করেন। ১৯৪৫ সালে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কমিটির (সিপিআই) সদস্য হন এবং ১৯৪৭ সালে তৎকালীন কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য নির্বাচিত হন। দেশ-বিভাগের কারণে সংগঠন গড়ে তোলার প্রয়োজনে পার্টির সিদ্ধান্তমতো মনসুর হবিবুল্লাহকে তৎকালীন পূর্বপাকিস্তানে পাঠানো হয়। সেখানে তিনি মনসুর হবিব নামে পরিচিত ছিলেন। পূর্বপাকিস্তানের রংপুর জেলায় কৃষক আন্দোলনের ভিত্তি থাকায় তিনি প্রথমে রংপুর যান, সেখান থেকে ঢাকা যাওয়ার আগেই ১৯৪৯ সালে পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করে। প্রথমে রংপুর জেল, সেখান থেকে রাজশাহী সেন্ট্রাল জেলে স্থানান্তরিত করা হয়। রাজশাহী জেলের বন্দিরা জেলের অভ্যন্তরে কদর্য পরিবেশ পরিবর্তন ও রাজবন্দিদের মর্যাদার দাবিতে অনশন আন্দোলন করেন। অনশন আন্দোলন ভাঙতে গিয়ে জোর করে নল দিয়ে খাওয়াতে গিয়ে একজন বন্দির (শ্রমিকনেতা শিবেন রায়) মৃত্যু হয়। জেলের অভ্যন্তরে আন্দোলন আরও জোরদার হয়। ১৯৪৯ সালে ঢাকা ও রাজশাহী জেলের কমিউনিস্ট বন্দিরা ৯ মাসে ৪ বারে ১৫০ দিন অনশন করেন। ১৯৫০ সালের ২৪ এপ্রিল রাজশাহী জেলের খাপড়া ওয়ার্ডে কমিউনিস্ট বন্দিদের ওপর পুলিশ নির্মমভাবে গুলি চালায়। এই ঘটনায় ৯ জন বন্দি শহিদের মৃত্যু বরণ

করেন। ৪১ জন বন্দির মধ্যে ৭ জন সরাসরি গুলিতে মারা যান। পরে দুজন হাসপাতালে মারা যান। বাকি সকলেই গুলিবিদ্ধ হন। অন্যান্যদের সাথে মনসুর হবিবুল্লাহ গুরুতর আহত হন। গুলি চালনার পর দীর্ঘ সময় আহতদের নির্জন অন্ধকার কারাকক্ষে আটকে রাখা হয়। চিকিৎসার ব্যবস্থাও করা হয় না। সেই সময় রাজশাহী জেলের ব্রিটিশ জেল সুপার ছিলেন ডব্লু এফ বিল। মনসুর হবিবের পায়ের পিছন দিকে ১০টি রাইফেলের ছররা বিদ্ধ হয়। দীর্ঘদিন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন থাকলেও অস্ত্রোপচার করে ছররা গুলি বার করা হয়নি। খাপড়া ওয়ার্ডের মর্মান্তিক স্মৃতি হিসেবে ওই ১০টি বুলেট তিনি সারা জীবন বহন করে বেড়িয়েছেন। ১৯৫২ সালের ২ অক্টোবর জেল থেকে মুক্তির সাথে সাথে জেলগেটেই দেশত্যাগের নোটিশ ধরিয়ে দেওয়া হয়। পাকিস্তান সরকার তাঁকে পূর্ব পাকিস্তান থেকে বহিষ্কার করে। তিনি কলকাতায় চলে আসেন।

তিনি কলকাতা স্কটিশচার্চ কলেজের মেধাবী ছাত্র ছিলেন। কিছুদিন সিউড়ি কলেজে ইতিহাসের অধ্যাপনা করেছিলেন। কমিউনিস্ট পার্টি করার অপরাধে তাঁকে কলেজ থেকে বহিষ্কার করা হয়। বিভিন্ন সময়ে কারাগারে আবদ্ধ থাকা, আত্মগোপনে থাকা অবস্থায় নিজের পড়াশোনা চালিয়ে গেছেন। তিনি এম.এ. এলএলবি পাশ করে কলকাতা হাইকোর্টে আইনজীবী হিসেবে যোগ দেন। তাঁর পৈতৃক বাড়ি বর্ধমান জেলার কালনা মহকুমার বেগপুর অঞ্চলের চৌঘরিয়া গ্রামে।

তিনি কলকাতা স্কটিশচার্চ কলেজের মেধাবী ছাত্র ছিলেন। কিছুদিন সিউড়ি কলেজে ইতিহাসের অধ্যাপনা করেছিলেন। কমিউনিস্ট পার্টি করার অপরাধে তাঁকে কলেজ থেকে বহিষ্কার করা হয়। বিভিন্ন সময়ে কারাগারে আবদ্ধ থাকা, আত্মগোপনে থাকা অবস্থায় নিজের পড়াশোনা চালিয়ে গেছেন। তিনি এম.এ. এলএলবি পাশ করে কলকাতা হাইকোর্টে আইনজীবী হিসেবে যোগ দেন। তাঁর পৈতৃক বাড়ি বর্ধমান জেলার কালনা মহকুমার বেগপুর অঞ্চলের চৌঘরিয়া গ্রামে। তিনি দলের সিদ্ধান্তমতো ১৯৬২ সালে বর্ধমান জেলার মন্তেশ্বর বিধানসভাকেন্দ্রে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে বিধানসভার সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৬৯ সালে নাদনঘাট বিধানসভাকেন্দ্র থেকে বিধায়ক নির্বাচিত হন।

১৯৭১ সালের ২৩ অক্টোবর সন্ত্রাস-কবলিত সুলতানপুর (কালনা) বাজারে একটি জনসভায় বক্তব্য রাখার সময় পুলিশ ও গুণ্ডা বাহিনী মিলিতভাবে বোমা, গুলি, বন্দুক নিয়ে জনসভায় সশস্ত্র হামলা চালায়। অকুতোভয় মনসুরসাহেব হামলাকে উপেক্ষা করে মানুষকে ভরসা দিতে বক্তৃতা চালিয়ে যান। সশস্ত্র গুণ্ডাদের নিক্ষিপ্ত গুলি থেকে মনসুর সাহেবকে রক্ষা করতে গ্রামের খেতমজুর কর্মী বৈদ্যনাথ মুর্মু গুলিবিদ্ধ হয়ে শহিদের মৃত্যু বরণ করেন। আধা-ফ্যাসিস্ট সন্ত্রাসের সেই সব দিনগুলিতে তিনি বিভিন্ন এলাকায় আক্রান্ত কর্মীদের পাশে থেকে সাহস জুগিয়েছেন। অন্য দিকে, কর্মীদের বিরুদ্ধে আনা নানা মিথ্যা মামলার বিরুদ্ধে কলকাতা হাইকোর্টে আইনজীবী হিসেবে লড়েছেন। কালনা, বর্ধমান, মন্তেশ্বর, মঙ্গলকোট—জেলার বিভিন্ন এলাকায় ঘরছাড়া কর্মীদের নিজ বাসভবনে আশ্রয় দিয়েছেন, নানাভাবে সাহায্য করেছেন। সত্তরের দশকে সন্ত্রাসের মধ্যেই দলের নির্দেশে ১৯৭২ সালে বিধানসভা নির্বাচনে নাদনঘাট কেন্দ্র প্রার্থী হন। কালনা মহকুমা শাসকের কাছে মনোনয়নপত্র জমা দিতে গিয়ে কংগ্রেসি গুণ্ডাদের দ্বারা আক্রান্ত হন। তাঁর প্রস্তাবক পার্টিকর্মীকে গ্রেপ্তার করা হয়।

১৯৭৭ সালে দলের নির্দেশে কাটোয়া লোকসভা কেন্দ্র প্রার্থী হন। সন্ত্রাস-কবলিত কালনা শহরে দু-চার জন বহিরাগত কর্মী নিয়ে নির্বাচনী অফিস খোলেন অসম সাহসের সঙ্গে। তিনি অফিসে বসতেই গুণ্ডা বাহিনী অশ্রাব্য ভাষায় গালিগালা করে অফিস বন্ধ করে চলে যেতে বলে। তিনি অবিচল ভাবে অফিস আগলে রাখেন। তাঁর বলিষ্ঠ দৃঢ় ভূমিকার সামনে গুণ্ডারা পিছু হঠতে বাধ্য হয়। তিনি তাঁর সাহসী ভূমিকার সাথে সাথেই নানা কৌশলে নির্বাচনী প্রচার চালান। কালনা শহরের অনেক মানুষ রাতের অন্ধকারে গোপনে খাবার ইত্যাদি পাঠিয়ে সমর্থন জানাতেন।

১৯৭৭ সাল থেকে ১৯৯১ সাল পর্যন্ত টানা ১৪ বছর নাদনঘাট বিধানসভা থেকে বিধানসভায় পুনর্নির্বাচিত হয়েছেন। তিনি প্রথম বামফ্রন্ট সরকারের আইন, বিচার ও সংসদীয় দপ্তরের মন্ত্রী হিসেবে দক্ষতার সাথে প্রশাসনিক ও সংসদীয় দায়িত্ব পালন করেন। তিনি তাঁর সংসদীয় ক্ষেত্রের সাথে নিয়ত যোগাযোগ রাখতেন। মানুষের সাথে ব্যক্তিগত নিবিড় সম্পর্ক রাখতেন—তাদের বিভিন্ন সমস্যা নিরসনে উদ্যোগ গ্রহণ করতেন। বর্ধমন-নাদনঘাট সড়কে 'বিশাল নাদনঘাট ব্রিজ' তাঁর উদ্যোগেই নির্মিত হয়েছে। দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত হয়েও এলাকার সাধারণ মানুষজনের খোঁজ খবর নিতেন। চলাফেরায় অক্ষম হয়েও বারে বারে বর্ধমান আসার জন্য ছটফট করতেন। শেষের দিকে জেলা কমিটির একটি সভায় বর্ধমান আসেন এবং অফিসের কর্মীরা চেয়ারে বসিয়ে প্রায় কাঁধে বহন করে তিন তলায় সভাকক্ষে নিয়ে যান। সেটাই তাঁর শেষ বর্ধমান সফর। বর্ধমানের প্রতি এমনই ছিল তাঁর আন্তরিক আকর্ষণ, তিনি একাধারে রসিক। মজার মানুষ ছিলেন। অন্যদিকে তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য মানুষকে মুগ্ধ করতো। ইতিহাস, সাহিত্য, সংস্কৃতি, বিজ্ঞান—যে-কোনো বিষয়ে ছিলেন সাবলীল। তাঁর অসাধারণ বাগ্মিতা গ্রামের শ্রমজীবী মানুষ থেকে শহরের বুদ্ধিজীবী সকলকেই আকৃষ্ট করত। নাদনঘাট বিধানসভা কেন্দ্রে ১৯৭৭ সাল থেকে তাঁর নির্বাচন পরিচালনার দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে তাঁকে কাছ থেকে দেখা, তাঁর ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য, রাজনৈতিক পরামর্শ আমার পাথেয়। অতীত সংগ্রামের পরম্পরার মধ্যে দিয়েই আন্দোলন সংগ্রাম বিকশিত হয়।

তেভাগা থেকে বর্গা রেকর্ড আমাদের রাজ্যের গণআন্দোলনের পরম্পরার প্রবাহ। সেই প্রবাহের মধ্যেই মনসুর হবিবুল্লাহর অবদান অমর হয়ে থাকবে। ১৯৯৬ সালের ১৪ সেপ্টেম্বর তাঁর জীবনাবসান হয়। সংগ্রামী নেতা, আমাদের অভিভাবক মনসুর হবিবুল্লাহ-র জন্মশতবর্ষ পূর্তিতে তাঁর অবদানের কথা স্মরণ করে তাঁর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাই।

শোষকশ্রেণির বিভিন্ন কৌশল ও তার মোকাবিলায় কমিউনিস্টদের কর্তব্য

সুকান্ত কোঙার

দুনিয়া জুড়ে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার সঙ্কট অব্যাহত। শোষণের ব্যবস্থা পুঁজিবাদ কখনও সঙ্কটমুক্ত হতে পারে না। সংকটে জর্জরিত পুঁজিবাদ সংকটের বোঝা সাধারণ মানুষের উপর চাপায়। ফলে শ্রমিক-কৃষক সহ সাধারণ মানুষের সংকট বাড়ে, সমাজে বৈষম্য বাড়ে—যা পুঁজিবাদী ব্যবস্থার সংকটকে আরো তীব্র করে।

সোভিয়েত সমাজতন্ত্রের বিপর্যয়ের পরে বিশ্ব পুঁজিবাদ সমস্ত দিক দিয়ে আরও আক্রমণাত্মক মনোভাব গ্রহণ করে। অর্থনীতির দিক দিয়ে চালু করা হয় নয়া উদারবাদী নীতি। অর্থাৎ আরও লুঠ, আরও শোষণ। এই বিশ্ব অর্থ ব্যবস্থার দুটি বৈশিষ্ট্য। প্রথমত সারা বিশ্বের বাজার বিশ্বের ধনী দেশগুলোর জন্য খুলে দিতে হবে। দ্বিতীয়ত সমগ্র অর্থ ব্যবস্থা থেকে সরকারের হাত গুটিয়ে নেওয়া। যার অর্থ জনকল্যাণমূলক খাতে সরকারের খরচ কমানো এবং বাজারের কার্যকলাপে হস্তক্ষেপ না করা। আমরা দেখছি মুনাফা হলে পুঁজিপতির। কিন্তু পুঁজিপতিরা অসুবিধায় পড়লে তাদের বিভিন্ন ধরনের কর ছাড় দাও, ঋণ মকুব করো ও রাষ্ট্রের তহবিল (জনগণের টাকা) থেকে তাদের সাহায্য করো।

সময়টা কঠিন, কিন্তু সম্ভবনাময়। প্রকৃত বিকল্পের বড় সুযোগ রয়েছে এখন। সংকট মোকাবিলা করার জন্য লগ্নিপুঁজি-তাড়িত পুঁজিবাদ কোনো রাস্তা খুঁজে পাচ্ছে না। পুঁজিবাদী দেশগুলোর দ্বন্দ্ব তীব্র হলেও কোনো শক্তিশালী বামপন্থী বিকল্প গড়ে ওঠেনি বিশ্ব জুড়ে। যেখানে বামপন্থী শক্তি এর প্রতিবাদে সোচ্চার হয়েছে, সেখানেই বিকল্প হিসাবে তা গ্রহণযোগ্য হচ্ছে। যেখানে বামপন্থীরা শ্রমিকশ্রেণির প্রতি বেইমানি করেছে সেখানেই তারা জনবিচ্ছিন্ন হয়েছে।

আমাদের দেশে যে দল বা জোটই কেন্দ্রের ক্ষমতায় আসুক না কেন, তারা একচেটিয়া পুঁজিবাদ এবং বড় ভূস্বামীদের স্বার্থে দেশের অর্থনীতি পরিচালনা করেছে। কেন্দ্রের বর্তমান বিজেপি সরকার লোকসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়ার কারণে কংগ্রেসের থেকে অনেক তীব্রভাবে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে নয়া উদারনীতিকে। প্রধানমন্ত্রী মোদী বার বার আমেরিকা সফরে যাচ্ছেন। আমেরিকা ভারতকে বাধ্য করছে তাদের থেকে অস্ত্র কিনতে। ভারত আমেরিকার জুনিয়ার পার্টনারে পরিণত হচ্ছে।

বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় পুঁজিপতিদের দলগুলিকে ভোটে লড়তে হয়। জেতার জন্য তারা বিভিন্ন ধরনের কৌশল গ্রহণ করে। এর একটা হলো ঢালাও নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি। বছরে ১ কোটি বা ২ কোটি বেকারকে চাকরি দেওয়া, ১০০ দিনের মধ্যে জিনিসপত্রের দাম কমানো, বিদেশ থেকে কালো টাকা ফেরৎ এনে দেশের প্রত্যেক নাগরিককে ১৫ লাখ টাকা করে দেওয়া, সবার হাতে কাজ—সবার

পেটে ভাত ইত্যাদি শ্লোগানগুলি আমাদের সকলের জানা। ভোটের পরে তারা কী করে তাও আমরা জানি। প্রধানমন্ত্রী মোদী এখন বেকারদের বলছেন পাকোড়া বানাও, আমাদের মুখ্যমন্ত্রী বলছেন তেলেভাজা ভাজো, ত্রিপুরার বিজেপি মুখ্যমন্ত্রী বলছেন বেকারদের চাকরির কোনো প্রয়োজন নেই—একটা করে গরু কিনলেই বছরে এক লাখ টাকা আয় হবে প্রত্যেকের। এ-ব্যাপারে সবারই এক রা—কংগ্রেস, বিজেপি বা আঞ্চলিক দলগুলির। ভাঁওতা হলেও জনগণের দুর্বল চেতনার কারণে কিছু মানুষকে ভুল বোঝানো সম্ভব হয়। বেকার ভাবে যদি চাকরিটা হয়, কৃষক ভাবে যদি তার দুর্দশা মোচন হয়। সমাজের অন্য অংশের মানুষ সাময়িকভাবে হলেও বিভ্রান্ত হয়। এই সব মিথ্যা প্রচারের জন্য এরা বিপুল টাকা খরচ করে, এমনকি সরকারি কোষাগার থেকেও। যেমন ২০০৪ সালের লোকসভা নির্বাচনের আগে বিজেপি সরকারি তহবিল থেকে ৫০০ কোটি টাকা খরচ করে নিজেদের প্রচারের জন্য। আমাদের রাজ্যের তৃণমূল কংগ্রেস সরকার মুখ্যমন্ত্রীকে সামনে রেখে সরকারি কোষাগারের বিপুল টাকা খরচ করছে নিজেদের প্রচারের জন্য।

শাসকশ্রেণির আর একটা কৌশল হলো টাকা দিয়ে ভোট কেনা। এর জন্য তারা বিপুল টাকা খরচ করে। সংবাদে প্রকাশ ২০১৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি কয়েক হাজার কোটি টাকা খরচ করে। এই টাকা জোগায় বৃহৎ পুঁজিপতিরা। শোনা যায় কর্ণাটক বিধানসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাওয়ার জন্য বিজেপি বিরোধী বিধায়ক পিছু ১ কোটি টাকা দর হাঁকিয়েছিলো। রাজনীতি ও ব্যবসার আঁতাত নির্বাচনী ব্যবস্থাকে কলুষিত করছে—যা বৃহৎ অঙ্কের দ্বারা পরিব্যাপ্ত। নয়া উদারনীতি চালু হওয়ার পরে দুর্নীতি ভয়ঙ্করভাবে বেড়েছে। বামপন্থীদের বাদ দিলে সব দলের বিরুদ্ধেই দুর্নীতির অভিযোগ। এই টাকার একটা অংশ তারা খরচ করে ভোটারদের কিনে নেওয়ার জন্য। পুঁজিপতিদের মধ্যে যে দলই ক্ষমতায় আসুক না কেন মৌলিক আর্থিক নীতির যেমন কোনো পরিবর্তন হবে না, একই সঙ্গে নির্বাচনী ব্যবস্থাকে কলুষিত করা আটকানো যাবে না। বর্তমানের কেন্দ্রের বিজেপি সরকার নির্বাচনী বন্ড ব্যবস্থা চালু করেছে। এর ফলে কোনো রকম জিজ্ঞাসাবাদ ছাড়াই নিজেদের পরিচয় গোপন রেখে যে-কোনো পরিমাণ অর্থ কর্পোরেট সংস্থাগুলি এখন আইনীভাবেই রাজনৈতিক দলগুলিকে দিতে পারবে। অর্থাৎ নির্বাচনে কালো টাকার দাপট বাড়বে। সিপিআই(এম) দাবি করে কর্পোরেট কর্তৃক রাজনৈতিক দলকে টাকা দেওয়া নিষিদ্ধ করতে হবে। রাষ্ট্রকেই নির্বাচনী ব্যয়ভার গ্রহণ করতে হবে। যারা কর্পোরেটের টাকা নেয় না তাদের পক্ষে নির্বাচনী কাজ পরিচালনা করা কঠিন হয়ে পড়ছে। একটাই রাস্তা—মানুষের দাবি-দাওয়া নিয়ে আন্দোলন, মানুষের চেতনা বৃদ্ধি ও জনগণের কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহ করা।

সামাজিক সুরক্ষাকে ভোটের রাজনীতিতে ব্যবহার করার প্রচেষ্টা সব পুঁজিপতি দলের মধ্যেই থাকে। সামাজিক সুরক্ষা কারো দয়ার দান নয়। এটা একটা অধিকার। সকলের জন্য খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সুস্থ সংস্কৃতি দেওয়ার ব্যবস্থা করা রাষ্ট্রের দায়িত্ব। পুঁজিবাদী রাষ্ট্র সাধারণ মানুষের জন্য এই দায়িত্ব পালন করেনা। সাধারণ মানুষের থেকে যে বিপুল পরিমাণ কর আদায় করা হয় তার একটা সামান্য অংশ থেকেই এই সুবিধাগুলি দেওয়া হয়। যেমন— উজ্জ্বলা প্রকল্প। এর মাধ্যমে গরিবদের বাড়িতে গ্যাসের সংযোগ দেওয়া হয়। বছরে পেট্রোপণ্য থেকে কেন্দ্রীয় সরকার আদায় করে প্রায় ৩ লক্ষ কোটি টাকা। আর সরকার বছরে ভর্তুকি দেয় মাত্র ৬০০০ কোটি টাকা (শতকরা ২ শতাংশ)। অথচ ভোটের বাজারে সুবিধা। আমাদের রাজ্যের তৃণমূল কংগ্রেস সরকার সামাজিক সুরক্ষাকে কীভাবে ব্যবহার করছে তা আমরা দেখছি। বিরোধী রাজনৈতিক দলের কর্মীদের ১০০ দিনের কাজ থেকে বাদ দেওয়া, পি.এম.এ.ওয়াই সহ বিভিন্ন সামাজিক প্রকল্পের সুবিধা থেকে বাদ দেওয়া, অযথা হয়রানি করার ঘটনা এ রাজ্যে রোজকার ঘটনা। সামাজিক সুরক্ষার ক্ষেত্রে এই বিষয়গুলি মানুষের কাছে তুলে ধরা আমাদের কর্তব্য।

শাসকশ্রেণির আর একটা অস্ত্র হলো গণতন্ত্র ও ভোটের অধিকার কেড়ে নেওয়া এবং দেশে স্বৈরতন্ত্র কায়েম করা। বুর্জোয়া গণতন্ত্র সব সময় সীমাবদ্ধ। লেনিন বলেছেন, ''বুর্জোয়া গণতন্ত্র সর্বদাই পুঁজিবাদী শোষণের দ্বারা সংকীর্ণ সীমার মধ্যে আবদ্ধ এবং সেই কারণেই তা সর্বদাই কার্যত সংখ্যালঘু অংশের, সম্পত্তিবান শ্রেণিগুলির, ধনীদের গণতন্ত্র হয়েই থাকে।'' পশ্চিমবাংলায় ১৯৭০-এর দশকে গণতন্ত্রের উপর তীব্র আক্রমণ নেমে আসে, ভোটের অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়। আজ তৃণমূল কংগ্রেস আমাদের রাজ্যে একই কাজ করছে। একই কাজ বিজেপি ত্রিপুরায় করছে। সাম্প্রতিক পঞ্চায়েতের উপ-নির্বাচনে ত্রিপুরায় শতকরা ৯৬ ভাগ আসনে বিরোধীদের প্রার্থী দিতে দেওয়া হয়নি।

১৯৬৭ সালে দেশের চতুর্থ সাধারণ নির্বাচনে কংগ্রেসের একচেটিয়া ক্ষমতা ভেঙে যায়, পুঁজিবাদের সংকট বাড়ে, কংগ্রেসের দ্বন্দ্ব বাড়ে। পশ্চিমবঙ্গে ১৯৬৭ ও ১৯৬৯ সালের বিধানসভা নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট বিজয়ী হয় এবং এই সরকারকে অবলম্বন করে আন্দোলন বাড়ে। গণতন্ত্র প্রসারিত হয়। এই দুটি সরকার সীমাবদ্ধ ক্ষমতার মধ্যে বিকল্প পথ দেখানোর চেষ্টা করে এবং কংগ্রেস আতঙ্কিত হয়। সারা দেশেও কংগ্রেসের জনবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে আন্দোলন বাড়ে। দুর্ভাগ্যজনক হলেও একথা সত্য যে সি.পি.আই সহ অনেকগুলি বামপন্থী ও গণতান্ত্রিক শক্তি কংগ্রেসের দিকে ভিড়ে যায়। ১৯৭৫ সালে ইন্দিরা গান্ধীর নেতৃত্বে কংগ্রেস জরুরি অবস্থা জারি করে। ১৯৭২ সালে সিপিআই(এম)-এর নবম কংগ্রেসে এ-বিষয়ে আগাম সতর্কবার্তা দেওয়া হয়। জরুরি অবস্থা জারির মধ্য দিয়ে মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়, এমনকি সংবাদ প্রকাশে ভয়ঙ্করভাবে সেন্সরসিপ চালু করা হয়।

জরুরি অবস্থা জারি করার যুক্তি হিসাবে বলা হয় আর.এস.এস, আনন্দমার্গ, জামাত-ই-ইসলামী এবং কিছু নকশালপন্থী সংগঠনের কার্যকলাপ। এদের নিষিদ্ধ করা হয়। অথচ ইন্দিরা গান্ধী একসময় আ র.এস.এস-এর প্রশংসা করেছিলেন। আর্থিক সাহায্য করেছিলেন আনন্দমার্গীদের—যে আনন্দমার্গীরা জ্যোতি বসুর প্রাণনাশের চেষ্টা করে। ১৯৭৫ সালের ২১শে জুলাই এ কে গোপালন লোকসভায় বলেন, ''এক নেত্রী, এক দল, এক দেশ'' এবং ''ইন্দিরাই ভারত, ভারতই ইন্দিরা'' ইত্যাদি শ্লোগানগুলি স্বৈরাচারের রাজনৈতিক প্রতিফলন।

জরুরি অবস্থার বিরুদ্ধে ব্যাপকতর মঞ্চ গড়ে তোলার প্রয়াসে জয়প্রকাশ নারায়ণ ও সোসালিস্ট পার্টির সঙ্গে সিপিআই(এম) যৌথ বিবৃতিতে স্বাক্ষর করে। ৫ জুন ১৯৭৫ কলকাতায় যে মিছিল হয় সেই মিছিলে পার্টি ঝান্ডা ছাড়া যোগ দেয়, সভায় বক্তৃতা করেন জয়প্রকাশ নারায়ণ। সিপিআই(এম) সিদ্ধান্ত নেয় অর্থনৈতিক দাবি-দাওয়ার প্রশ্নে নির্দিষ্ট ইস্যুতে সমস্ত গণসংগঠনের যৌথ কর্মসূচীর উপর জোর দেওয়া হবে, তা সেই গণসংগঠন যে রাজনৈতিক দলের দ্বারাই পরিচালিত হোক না কেন। এক্ষেত্রে ২টি বিষয় বলা হয়—১) বামপন্থী ও গণতান্ত্রিক দলগুলি, শক্তিগুলি ও ব্যক্তি এই ব্যাপক সমাবেশের মূল হাতিয়ার হিসাবে কাজ করবে। ২) ব্যাপক সমাবেশের অর্থ কোনো রাজনৈতিক বা নির্বাচনী ফ্রন্ট গঠন নয়। ১৯৭৭ সালের নির্বাচনে সিপিআই(এম)-এর শ্লোগান

ছিল 'জরুরি অবস্থার বিরুদ্ধে ভোট দাও'। এই নির্বাচনে ইন্দিরা গান্ধীর দল পরাস্ত হয়। প্রমাণ হয় যে স্বৈরাচার শেষ কথা বলে না।

সিপিআই(এম) মনে করে ইন্দিরা গান্ধীর পরাজয় মানে স্বৈরতন্ত্র শেষ হয়ে যায়নি। কারণ স্বৈরাচারের বীজ নিহিত থাকে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার মধ্যে। অর্থনৈতিক নীতি ও শাসকশ্রেণির সঙ্গে নানারূপে জনগণের দ্বন্দ্বের মধ্যে গণতন্ত্রের বিপদের আশঙ্কা নিহিত থাকে। উদারনীতির বিরুদ্ধে সংগ্রামের অংশ হিসাবে গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রামকে দেখতে হবে। এক্ষেত্রে বাম ও গণতান্ত্রিক শক্তিগুলির ঐক্য বিশেষ ভাবে জরুরি। সাম্প্রদায়িক শক্তির বিকাশের প্রশ্ন বাদ দিয়ে গণতন্ত্র রক্ষার সংগ্রামের আলোচনা করা অসম্ভব।

বিজেপি কংগ্রেসের জরুরি অবস্থা জারির সমালোচনা করছে। এই সমালোচনা করার নৈতিক অধিকার তাদের নেই। ওরা যুক্তিবাদ, গণতন্ত্রের উপর তীব্র আক্রমণ নামিয়ে এনেছে। দেশকে অলিখিত জরুরি অবস্থার দিকে নিয়ে যাচ্ছে। বিজেপি-কে আর ৫টা পুঁজিবাদী দলের সঙ্গে এক করলে চলবে না। এই দলটি ফ্যাসিবাদী চরিত্রের আর.এস.এস দ্বারা পরিচালিত। গণতন্ত্র সম্পর্কে আর.এস.এস-এর ধারণা কী? তাদের নেতা গোলওয়ালকার গণতন্ত্র সম্পর্কে বলেছেন, ''জনগণের দ্বারা, জণগণের গণতন্ত্র এই ধারণার মূল কথা রাজনৈতিক প্রশাসনে সকলের সমান অধিকার। এই বস্তুটি বাস্তবে একটি পৌরাণিক কল্পনা ছাড়া কিছুই নয়।'' আর হিটলার বলেছেন, ''জনগণতন্ত্রে ব্যাক্তি-স্বাধীনতা অলীক কল্পনা।'' কী অদ্ভুত মিল, এদের মুখে গণতন্ত্রের কথা?

গণতন্ত্র হত্যার হিংস্র রূপ সমগ্র বিশ্ব দেখেছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে ফ্যাসিবাদের উত্থানে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন ও তার পরবর্তীকালে পুঁজিবাদের নিজস্ব সংকটই ফ্যাসিবাদের উত্থানের জমি তৈরি করে। বুর্জোয়া ব্যবস্থার সংকট থেকেই ফ্যাসিবাদ জন্ম নেয় ঠিকই, কিন্তু ফ্যাসিবাদের ক্ষমতা দখলের অর্থ এক বুর্জোয়া সরকারের সাধারণ ক্ষমতারোহণ নয়। এক এক দেশে এক এক শ্লোগানকে সামনে রেখে ফ্যাসিস্টরা জনগণকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করে গেছে।

ফ্যাসিবাদ সম্পর্কে বিশ্বের কমিউনিস্ট আন্দোলনের নেতা জর্জি ডিমিট্রভ বলেছেন, ''ফ্যাসিবাদ হচ্ছে লগ্নিপুঁজিরই ক্ষমতা। ফ্যাসিবাদ হচ্ছে শ্রমিকশ্রেণি, কৃষক সমাজ ও বুদ্ধিজীবীদের বিপ্লবী অংশের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসবাদী প্রতিহিংসা নেবার সংগঠন।'' তিনি আরও বলেছেন, ''চরম সাম্রাজ্যবাদীদের স্বার্থে কাজ করে ফ্যাসিবাদ। কিন্তু জনগণের কাছে আবির্ভূত হয় এমন এক জাতির চেহারায় যাদের সঙ্গে বঞ্চনা করা হয়েছে, তথাকথিত অত্যাচারিত জাতীয় ভাবাবেগের কাছে আবেদন তৈরি করে। ফ্যাসিবাদ জনগণকে সবচেয়ে দুর্নীতিগ্রস্ত ও বিষাক্তদের সামনে ফেলে দেয়, কিন্তু এক সৎ ও দুর্নীতিমুক্ত সরকারের দাবি নিয়ে হাজির হয়।'' স্তালিন ফ্যাসিবাদের জয়কে শ্রমিকশ্রেণির দৌর্বল্যের লক্ষণের পাশাপাশি একে বুর্জোয়াশ্রেণির দৌর্বল্যের লক্ষণ হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। পুঁজিবাদ শ্রমিকশ্রেণির আন্দোলনকে ভাঙবার জন্য সোশ্যাল ডেমোক্রাটদের (যারা নিজেদের মার্কসবাদী হিসাবে পরিচয় দিয়ে মার্কসবাদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে) ব্যবহার করে, যে সোশ্যাল ডেমোক্রাটরা সর্বহারা বিপ্লবের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে। এই পার্টিগুলি সুবিধাবাদী ও সামাজিক জাতিদম্ভী হিসাবে নিজ নিজ দেশের বুর্জোয়াদের লেজুড়ে পরিণত হয়। এদের ভূমিকা দেখে স্তালিন সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক পার্টিগুলিকে 'সোস্যাল ফ্যাসিস্ট' আখ্যা দিয়ে বলেন, ''এরা হলো ফ্যাসিবাদের নরমপন্থী শাখা।''

ফ্যাসিবাদ পুঁজিবাদের হিংস্র রূপ হলেও সে নিজেকে পুঁজিবাদ ও সাম্যবাদ উভয়ের বিকল্প হিসাবে হাজির করেছিলো। পুঁজিবাদের সংকট ব্যাপক বেকার বাহিনী তৈরি করে। এই বেকারদের চেতনা না দিতে পারার ফলে এরাই ফ্যাসিবাদের মজুতবাহিনী হিসাবে কাজ করে।

বাজার দখলের জন্যই বিশ্বযুদ্ধ। ১৯৩৯ সালের ১ সেপ্টেম্বর জার্মান পোল্যান্ড আক্রমণ করে এবং ১৯৪১ সালের ২২ জুন সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রমণ করে। ব্রিটেন ও মার্কিন সরকার অক্ষশক্তির বিরোধিতায় ততটাই এগিয়ে এসেছিলো যতটা তাদের নিজেদের স্বার্থে দরকার ছিলো। স্তালিন বারে বারে আবেদন করেছেন দ্বিতীয় ফ্রন্ট খোলার জন্য। প্রথম আবেদন করেন ১৯৪১ সালের ৬ নভেম্বর, যখন লালফৌজ একের পর এক পিছু হঠছে। আসলে মার্কিন ও ব্রিটেন সরকার অপেক্ষা করেছে যদি নাৎসিরা শায়েস্তা করতে পারে সোভিয়েত ইউনিয়নকে। ১৯৪৪ সালের ৬ জুন মার্কিন ও ব্রিটিশ ফৌজ দ্বিতীয় ফ্রন্ট খোলে, যখন নাৎসিদের ঘায়েল করার কাজ লালফৌজ অনেকটাই করে দিয়েছে। ১৯৪৫ সালের ৯ মে ফ্যাসিবাদ পরাস্ত হয়। হিটলার চেয়েছিলেন ব্রিটিশ ও মার্কিন বাহিনীর হাতে আত্মসমর্পণ করতে যাতে পিছনের দরজা দিয়ে তারা আবার ক্ষমতায় ফিরে আসতে পারে। লালফৌজ তা হতে দেয়নি।

বিপুল শক্তিশালী ফ্যাসিবাদ পরাস্ত হয়। স্তালিন বুঝেছিলেন যে এটা শুধু সোভিয়েতকে রক্ষা করার বিষয় ছিলো না, ছিল সমগ্র বিশ্বকে ফ্যাসিস্টদের হাত থেকে রক্ষা করা। স্তালিনের অবদান চিরস্মরণীয়। সমগ্র বিশ্বের মেহনতি মানুষের কাছে তিনি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করেন তাদের সাহায্যের জন্য। স্তালিনের কৃতিত্ব এইখানে যে তিনি মার্কসবাদী লেনিনবাদী নীতির ভিত্তিতে সমগ্র পার্টিকে ঐক্যবদ্ধ করে এই মহান যুদ্ধ পরিচালনা করেন। ১৯৪৫ সালের ৩০শে এপ্রিল হিটলার ও তার প্রচার মন্ত্রী গোয়েবলস্ সপরিবারে আত্মহত্যা করে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ফ্যাসিবাদের পরাজয় ঘটলেও এর বিপদ থেকে গেছে। পুঁজিবাদের সংকট থাকলে এই বিপদ থাকবে। আজকে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে নয়া ফ্যাসিবাদের শ্লোগান উঠছে। পুঁজিবাদের সংকটে যাঁরা ক্ষতিগ্রস্ত হন, তাঁদের একটা অংশ নয়া ফ্যাসিবাদের শিকার হন। এঁরা পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে আড়াল করার জন্য দেশের মানুষকে শেখানোর চেষ্টা করেন যে, অভিবাসী শ্রমিক বা বিদেশিরাই আসল শত্রু। শ্রমজীবী জনগণের শ্রেণি-আন্দোলনকে সফলভাবে সংগঠিত করার উপরই সর্বাধিক জোর দিতে হবে। তার সঙ্গে চালাতে হবে মার্কসবাদীদের আদর্শগত প্রচার ও সংগ্রাম। মার্কসবাদী-লেনিনবাদীরা ফ্যাসিবাদবিরোধী রাজনৈতিক ও মতাদর্শগত সংগ্রামকে শ্রেণিসংগ্রামের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে গণ্য করে।

শোষক শ্রেণির আর একটা কৌশল হল বিভাজনের রাজনীতি। সারা বিশ্বেই বিভাজনের রাজনীতি বাড়ছে। শোষকদের হাতে থাকা বিভিন্ন অস্ত্রের মধ্যে এটি একটি মারাত্মক অস্ত্র। সোভিয়েত সমাজতন্ত্রের বিপর্যয়ের পরে মেহনতি মানুষের আন্দোলনের সামনে এই বিপদ অনেক বেড়েছে। দেশ, রাজ্য, ভাষা, জাত, সম্প্রদায় ভিত্তিতে মানুষকে ভাগ করা হচ্ছে তার শ্রেণি পরিচয় ভুলিয়ে দিতে। দেশ থেকে বিদেশিদের হঠালেই সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে, ইউরোপীয় ইউনিয়ন থেকে বেরিয়ে গেলেই তাদের সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। অর্থাৎ পুঁজিবাদী শোষণের ব্যবস্থাকে গোপন করো।

ফরাসি বিপ্লবের নেতাদের বক্তব্য ছিলো জ্ঞানকে ধর্মের বন্ধন থেকে মুক্ত করতে হবে। ধর্মের সঙ্গে রাষ্ট্রের কোনো সম্পর্ক থাকবে না। পরবর্তীকালে বুর্জোয়ারা তাদের এই ভূমিকা বজায় রাখতে

পারলো না। শ্রমিক আন্দোলন বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বুর্জোয়ারা ক্ষমতা হারাবার ভয়ে সামন্ততন্ত্রের সঙ্গে আপস করলো। তারা পুরোনো ধর্ম চেতনাকে খানিকটা ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করলো। ধর্মকে নিয়ন্ত্রিত ভাবে রাখবার ব্যবস্থা করলো।

আমাদের দেশে বিভিন্ন রাজ্যে দলিতদের উপর সামাজিক নিপীড়ন চলছে। বর্তমানে প্রতিরোধ বাড়ছে। দলিতদের উপর সামাজিক নিপীড়নের বিরুদ্ধে আন্দোলনকে যদি শ্রেণি আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত করা না যায় তবে সেই আন্দোলন এগিয়ে নিয়ে যাওয়া কঠিন। এই আন্দোলনে সমাজের অন্য আর সব উদয়াস্ত গতরখাটা মানুষদের যুক্ত করতে হবে। উচ্চ বর্ণের গণতান্ত্রিক শক্তিকে দলিতদের পক্ষে আনতে হবে। এমনকি দলিতদের নিজেদের মধ্যেও বিভাজন আছে। মায়াবতী দলিতদের নেত্রী বলে দাবি করেন। তিনি দীর্ঘদিন মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন। দলিতদের জমি দেওয়ার কাজ তিনি করেননি। বরং বিভিন্ন সময়ে বি.জে.পি-র সঙ্গে আঁতাত করেছেন।

স্বৈরতন্ত্র ও সাম্প্রদায়িকতা দুটোরই কাজ হলো বর্তমান শোষণের ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখা। স্বৈরতন্ত্রে অপেক্ষাকৃত সহজে শত্রুকে চিহ্নিত করা যায়। কিন্তু বিভেদ ও সাম্প্রদায়িক শক্তি নিজেকে পর্দার আড়ালে লুকিয়ে রাখে, জনগণের একজন হিসাবে তাদের মধ্যে মিশে থাকে। জ্ঞান ও যুক্তির চোখ দিয়ে তাকে চিনতে হয়। এটা ছাড়া তাকে চেনা যায় না। শোষিত ও বঞ্চিত মানুষেরা একে অপরকে শত্রু মনে করে। একটা সরাসরি আঘাত করে, অন্যটা ভিতর থেকে পচিয়ে দেয়। সাম্প্রদায়িকতা শোষক শ্রেণির দর্শন।

ভারতে সাম্প্রদায়িকতার কোনো প্রাচীন ঐতিহ্য নেই। ইংরেজরা আসার আগে ভারতে সাম্প্রদায়িকতা ছিল না। সিপাহী মহাবিদ্রোহের পর থেকেই ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শক্তি সাম্প্রদায়িক ও বিভেদকারী শক্তিগুলোকে ব্যবহার করেছে।

হিন্দু ও মুসলিম সাম্প্রদায়িক শক্তি দেখাবার চেষ্টা করে যে তারা একে অপরের শত্রু। এটা ঠিক নয়—এরা একে অপরের পরিপূরক। এরা একে অপরের বিষবৃক্ষে জল দিয়ে তাকে বাড়িয়ে তোলে। শোষণের ব্যবস্থা টিকিয়ে রাখার জন্য এরা জনগণকে বিভক্ত করে। আর.এস.এস নেতা গোলওয়ালকার ও জামাত-ই-ইসলামী প্রধান মহুদীর বক্তব্যে ভাবনার পুরোপুরি মিল পাওয়া যায়। গোলওয়ালকর ১৯৩৯ সালে বলেছিলেন , ''হিন্দু ধর্মের মধ্যে মিশে যাও। হিন্দুদের থেকে পৃথক অস্তিত্ব বিলীন করো। না হলে হিন্দুদের দয়ায় বেঁচে থাকো। এমনকি নাগরিকত্ব থাকবে না।'' গোলওয়ালকর যখন মুসলিমদের নাগরিকত্ব দেবেন না বলছেন, প্রায় একই সময় দেশ বিভাগের ঠিক আগে ১৯৪৭-এর মে মাসে জামাত-ই-ইসলামী প্রধান মাহুদী বলেছিলেন, ''ভারতীয়রা ভারতে রাষ্ট্র ও সমাজকে হিন্দু আইন অনুসারে চালনা করুন, তারাও পাকিস্তানে আল্লার নির্দেশ মোতাবেক আইন অনুসারে চলবেন। যদি ভারতে হিন্দু সরকার হিন্দু আইনে চলে, এমনকি মনুর আইনে চলে, যাতে মুসলিমদের অস্পৃশ্য বলা হচ্ছে এবং তাঁদের নাগরিকত্ব দেওয়া হবে না, তাতে তার আপত্তি থাকবে না।''

যাঁরা হিন্দু ও মুসলিম সাম্প্রদায়িক শক্তিকে হিন্দু ও মুসলিমদের পার্টি বলে মনে করেন তাঁরা মারাত্মক ভুল করেন। আর.এস.এস নেতা গোলওয়ালকর বলেছিলেন, ''হিন্দুরা তোমরা তোমাদের শক্তি নষ্ট করো না ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে লড়ে। তোমাদের শক্তি সঞ্চিত রাখো অভ্যন্তরীণ শত্রু মুসলিম, খ্রিস্টান ও কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য।'' ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে যারা মানা করে তারা কিভাবে দেশপ্রেমিক হবে? এদের থেকে বড় দেশদ্রোহী আর কে হতে পারে ? মুসলিম ও খ্রিস্টানদের বিরুদ্ধে লড়াই করার বিষয়টা বুঝলাম। কিন্তু কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে লড়াই করার কারণ কী? কমিউনিস্টারা তো মুসলিম বা খ্রিস্টান রাষ্ট্র গঠনের কথা বলে না। তারা দুনিয়ার মজদুরকে এক হওয়ার কথা বলে, শোষণের ব্যবস্থার উচ্ছেদের কথা বলে। আসলে বি.জে.পি হিন্দুদের পার্টি নয়, শোষণ-ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখার পার্টি। তাই তারা কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে লড়াই করার কথা বলে। মুসলিম বা খ্রিস্টান বিদ্বেষ তাদের অবলম্বন।

অন্যদিকে জামাত-ই-ইসলামী প্রধান মাহুদী বলেছেন, ''স্বাধীনতা, সাম্য, ধর্মনিরপেক্ষতা, সংসদীয় ব্যবস্থা—এসবই হচ্ছে বিদেশি।'' তত্ত্বগতভাবে দুটো ভিন্ন ধর্মীয় মৌলবাদ একই কথা বলছে। উভয়েই শোষণের ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখতে চায়—তাই তারা সাম্যবাদের বিরোধী।

গান্ধী হত্যার পরে আরএসএস যখন চাপে তখন গোলওয়ালকর তদানীন্তন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলকে ২৪ সেপ্টেম্বর ১৯৪৮ একটা চিঠিতে লেখেন, ''যদি আপনি আপনার প্রশাসনিক শক্তি এবং আমি আমার সংগঠনের সাংস্কৃতিক শক্তির মেলবন্ধন ঘটাই তাহলে খুব সহজেই কমিউনিস্টদের কোণঠাসা করে ফেলা আমাদের পক্ষে সহজ হবে। এই সম্মিলিত শক্তির দ্বারা আমরা কমিউনিস্টদের নির্মুল করে দিতে পারবো। এই বিদেশি আদর্শের বিজয় বৈজয়ন্তী সম্পর্কে আমি সত্যিই বিশেষ রকমের উদ্বিগ্ন। আমাদের মাতৃভূমিতে এই বিদেশি আদর্শের বাড়বাড়ন্ত যথার্থই উদ্বেগের বস্তু।'' ('জাস্টিস অন ট্রায়াল', পৃ. ২৩-২৬, ২৪.৯.১৯৪৮) ১৯৪৮ সালে কমিউনিস্ট পার্টির শক্তি ছিলো খুব কম। ওরা কিন্তু শত্রু চিনতে ভুল করেনি। সমাজে বৈষম্য থাকলে কমিউনিস্টদের এগিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্র থাকবে। তাই আর.এস.এস-এর কাছে কমিউনিস্টরাই প্রধান শত্রু। হিটলার, মুসোলিনি বিদেশি নয়—মার্কস বিদেশি।

সমানাধিকার সম্পর্কে গোলওয়ালকরের আর একটি উদ্ধৃতি দিলে বিষয়টা আর একটু পরিষ্কার হবে। তিনি বলেছেন, ''বৈষম্য হলো প্রকৃতির অবিভাজ্য অংশ এবং আমাদের এর মধ্যেই বাস করতে হবে। সুতরাং যে ব্যবস্থা প্রকৃতিগত বৈষম্যকে সমানাধিকারের আওয়াজ দিয়ে দূর করতে চায় তা ব্যর্থ হতে বাধ্য।'' অর্থাৎ না খেয়ে ও বিনা চিকিৎসায় মরো, ফুটপাতে থাকো, ছেঁড়া জামা পরে ঘুরে বেড়াও, কিন্তু প্রতিবাদ করো না—সব কিছু মেনে নাও। অথচ মেহনতি মানুষের শ্রমই দুনিয়ার লোককে বাঁচিয়ে রাখে।

স্বাধীনতার পরে ক্ষমতাসীন কংগ্রেস দল নরম হিন্দুত্বের আশ্রয় নিয়ে প্রথম থেকেই আপসপন্থাকে আশ্রয় করেছে। রাম জন্মভূমি-বাবরি মসজিদ, শাহবানু মামলায় রাষ্ট্র ও ধর্মের সংযুক্তিকরণের ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছে। সেই সুযোগকে কাজে লাগিয়েছে হিন্দুত্ববাদী দলগুলো। বাবরি মসজিদ ধ্বংসের পরে জ্যোতি বসু বিজেপি-কে বর্বর দল বলেছিলেন। এর থেকে কঠিন শব্দ আর কী হতে পারে? কিন্তু বাবরি মসজিদ কি ভাঙা সম্ভব হতো যদি কংগ্রেস দল তার যথাযথ ভূমিকা পালন করতো?

রাজীব গান্ধী বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও আধুনিকতার জয়ধ্বনি দিয়ে একবিংশ শতাব্দীর সারথি হতে চেয়েছেন। সেই তিনিই হিন্দু-মুসলিম উভয় মৌলবাদের পিঠ চাপড়েছেন, মন্দিরে-মন্দিরে ঘটা করে পুজো দিয়েছেন, সতীদাহ প্রথার ধারক শংকরাচার্যের আশীর্বাদ ভিক্ষা করেছেন, মাচান বাবার পায়ের লাথি খেয়েছেন, বিজ্ঞানবিরোধী সব ধরনের কুসংস্কার, অন্ধ-বিশ্বাস ও অলৌকিকতাকে প্রশ্রয় দিয়েছেন।

বর্তমান কংগ্রেস সভাপতি রাহুল গান্ধী গুজরাটে নির্বাচনী প্রচারে গিয়ে মোদীর সঙ্গে সোমনাথ মন্দিরে পূজো দেওয়ার প্রতিযোগিতা করেছেন, উত্তরপ্রদেশে নির্বাচনী প্রচার শুরু করেছেন

হনুমান মন্দিরে পুজো দিয়ে। ভোপালে রোড শো শুরু করেছেন ১১ জন হিন্দু পুরোহিতের আশীর্বাদ নিয়ে, পথ জুড়ে লাগানো কংগ্রেসি প্রচারসজ্জায় রাহুলকে 'শিবভক্ত' হিসাবে অভিহিত করা হয়েছে, তিনি শিবের মাথায় জল ঢালছেন—এমন ছবিতে ছয়লাপ।

আঞ্চলিক দলগুলো সাম্প্রদায়িকতা-বিরোধী লড়াই-এ দৃঢ় নয়। রাজ্যের সুবিধার নাম করে তারা বিভিন্ন সময়ে বিজেপি-র সঙ্গে জোট বেঁধেছে। আমাদের রাজ্যে তৃণমূল কংগ্রেসের ভূমিকা আমরা দেখছি। এই দল তার জন্মের পর থেকেই বিজেপি-র সঙ্গে জোট বেঁধেছে, সরকারে থেকেছে। আরএসএস মমতা ব্যানার্জিকে দেবী দুর্গা বলেছে। মমতা ব্যানার্জি আরএসএস-কে দেশপ্রেমিক সংগঠন হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। বিজেপি ও তৃণমূলের বোঝাপড়া পরিষ্কার। লোকসভায় বিভিন্ন জনবিরোধী বিল পাশ করতে তৃণমূল বিজেপি-কে সাহায্য করেছে, অন্যদিকে সারদা-নারদা মামলায় সিবিআই সক্রিয় ভূমিকায় নেই। উভয় দলই রাজ্যে প্রতিযোগিতামূলক সাম্প্রদায়িকতার রাস্তা নিয়েছে। মানুষকে ধর্মের ভিত্তিতে বিভাজিত করতে চাইছে। সাময়িক ভাবে হলেও কিছু মানুষ বিভ্রান্ত হচ্ছে। জনগণের চেতনা বাড়াতে না পারলে এর মোকাবিলা করা কঠিন। তাই বামপন্থীরা শ্লোগান দিয়েছে, ''তৃণমূল হঠাও—রাজ্য বাঁচাও। বিজেপি হঠাও—দেশ বাঁচাও।'' কিন্তু একই সঙ্গে বলতে হবে ''বামপন্থাই বিকল্প।'' বিজেপি-কে কেন্দ্রীয় সরকার থেকে হঠানো অত্যন্ত জরুরি। কিন্তু আরএসএস এবং বিজেপি-কে যদি শুধুমাত্র নির্বাচনের প্রেক্ষাপটে বিচার করলে এই বিপদকে অত্যন্ত ছোটো করে দেখা হবে। এদের বিরুদ্ধে বৃহত্তর মঞ্চ দরকার, কিন্তু বুর্জোয়া দলগুলোর সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে সতর্ক থাকতে হবে।

আমাদের রাজ্য বা দেশের বামপন্থী আন্দোলন এক কঠিন পরিস্থিতির মুখোমুখি। কঠিন পরিস্থিতির মোকাবিলা করার যোগ্যতা কমিউনিস্টদের আছে। কোনো সর্টকাট রাস্তা নেই, সর্টকাট রাস্তা খুঁজলে চোরাগলিতে ঢুকে যাওয়ার বিপদ থাকবে। মানুষের দাবি-দাওয়া নিয়ে আন্দোলন ও শ্রেণি-সংগ্রামই আজকের অগ্রগতির চাবিকাঠি। নয়া উদারনীতির কারণে মানুষের দুর্ভোগ বাড়ছে ও বাড়বে। এটাই বামপন্থীদের সামনে নতুন সম্ভবনা তৈরি করবে। পুঁজিপতিদের পরিচালিত প্রচার মাধ্যম যতই কমিউনিস্টদের বয়কট করুক বা কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে কুৎসা করুক না কেন, কমিউনিস্টদের অগ্রগতি ঠেকানোর সাধ্য কারও নাই। আন্দোলনের পাশাপাশি আদর্শগত সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে। লড়াই-এর ময়দানে জেতার জেদ থাকতে হবে। জেদের অভাবে জেতা যায়না। মূল লড়াইটা মাথায়—আদর্শগত।

তথ্যসূত্র

১. সি.পি.আই(এম)-এর বিভিন্ন দলিল
২. সাপ্তাহিক *দেশহিতৈষী* পত্রিকা
৩. *ফ্যাসীবাদ*, অনিল বিশ্বাস।
৪. *গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠায় কমিউনিস্টদের ভূমিকা*, অনিল বিশ্বাস
৫. বিনয় কোঙার রচনাবলী
৪. *তিন প্রসঙ্গ*, শ্যামল চক্রবর্তী
৫. *সাম্প্রদায়িকতা মোকাবিলা*, নিরুপম সেন
৬. *মার্কসীয় অভিধান*, ভবতোষ রায়
৭. আরেক রকম পত্রিকা
৮. দেশকাল ভাবনা

With best compliments of

M/s PRAKASH CONSTRUCTION

FABRICATOR, ERECTOR, MECHANICAL, CIVIL CONTRACTOR & GENERAL ORDER SUPPLIER

Qr. No. L/32, Sagarbhanga Colony, Durgapur-713211
Phone : 2558523, Mobile : 9332017271, 9932653994

Sl. No. 87

With best compliments of

UNITED SAW MILLS

TIMBER MERCHANT & GENERAL ORDER SUPPLIERS

G.T. Road, Main Gate, Durgapur-713203, Phone : 0343-2582381
Contact : AMIT SINGH, 9434647691, 7699999426

Sl. No. 104

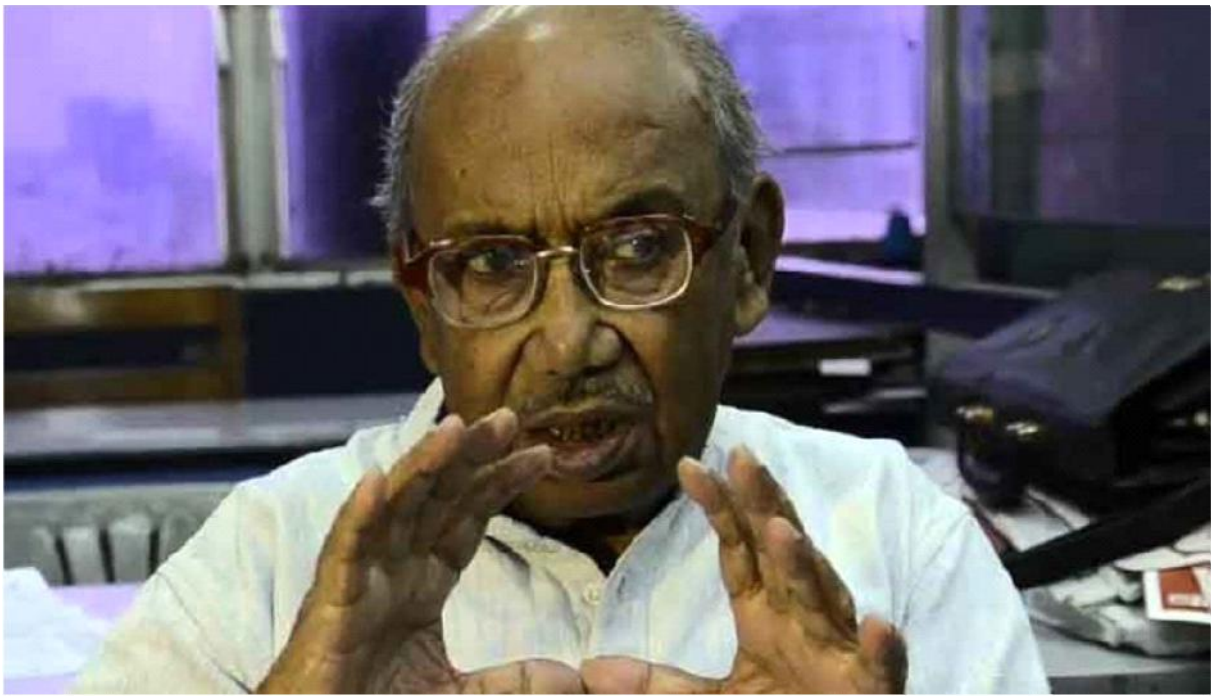

বিশিষ্ট চলচ্চিত্রকার তরুণ মজুমদারের সাক্ষাৎকার

বাবলু মণ্ডল

লেখক বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তরুণ মজুমদারের চলচ্চিত্র নিয়ে গবেষণা করে ২০১৮-র ১ সেপ্টেম্বর অ্যাওয়ার্ড পান। গবেষণাপত্রটির শিরোনাম 'তরুণ মজুমদারের চলচ্চিত্র : বাংলা সাহিত্যের নবরূপায়ণ (১৯৬৫-২০০৭)

একজন গবেষকের জীবনের সেরা প্রাপ্তি, সেরা মুহূর্ত যাঁকে নিয়ে তিনি কাজ করছেন বা করেছেন ক্ষণিকের জন্য হলেও তাঁর সান্নিধ্যলাভ। আমার জীবনের এই সেরা মুহূর্ত এসেছিল ১৯ আগস্ট ২০১৮, রবিবার। এদিন দুপুর ১.৩০ থেকে বিকাল ৫.২২ পর্যন্ত আমার জীবনের স্বপ্ন পূরণ হল সকলের প্রিয় চলচ্চিত্র পরিচালক শ্রীতরুণ মজুমদারের সান্নিধ্য পেয়ে। নিজের সম্পর্কে কৌতূহলহীন আত্মপ্রচারবিমুখ এই মানুষটির পাশে বসে এদিন আমি, সাংবাদিক পার্থ চৌধুরী, সৌম্য বন্দ্যোপাধ্যায় কাটিয়েছি চার ঘণ্টা। তরুণবাবুর ADIMPACT (ভিডিও অ্যান্ড অডিও স্টুডিও), ৬/৫০ বিজয়গড়, কলকাতা-৩২-এ এই সাক্ষাৎকারটি গৃহীত হয়। সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন তরুণবাবুর সাউন্ড ডিজ়াইনার নটরাজ মান্না এবং তাপস হালদার।

আমি মনে করি এই দিনটি আমার জীবনের সেরা মুহূর্ত ছিল। নিজের সম্পর্কে উচ্ছ্বাসহীন আপাদমস্তক বাঙালি এই ভদ্র মানুষটির কাছে শিখলাম প্রতিটি মানুষকে, প্রতি বিষয়কে কেমন করে সম্মান দিয়ে কথা বলতে হয়, সহবত কাকে বলে। সত্যিকরেই তরুণ মজুমদারের মতো মানুষেরা একটি করে সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান। আমি আপ্লুত, অভিভূত, আনন্দিত এবং এই সঙ্গে গর্বিত যে এমন একজন মানুষকে নিয়ে আমার পিএইচ.ডি গবেষণা করেছি।

এবার প্রশ্নোত্তর পর্বে আসা যাক।

■ আমরা জানি আপনার সিনেমা মানেই সাহিত্যের বিষয়কে শ্রদ্ধা সহকারে সুস্থ, রুচিশীল, সুন্দর ও নতুনভাবে উপস্থাপন। আর তার সঙ্গে অবশ্যই থাকে আপনার অদৃশ্য যাদুর পরশ, নিজস্ব এক ঘরানা। আমি গ্রামের ছেলে। আজও গ্রামেই থাকি। আমি দেখেছি গ্রাম বাংলার মানুষদের কাছে আপনার ছবি নিয়ে উন্মাদনা। অনেকে হয়তো আপনার নাম জানে না কিন্তু গ্রাম বাংলার আপামর মানুষ আপনার 'নিমন্ত্রণ', 'আগমন', 'ভালোবাসা ভালোবাসা', 'পথভোলা', 'ফুলেশ্বরী', শ্রীমান পৃথ্বীরাজ', 'আলো', 'ভালোবাসার অনেক নাম' এবং 'চাঁদের বাড়ি' অনেকবার করেই দেখেছে। আপনার এই নিজস্ব ঘরানা প্রসঙ্গে যদি কিছু বলেন।

দেখুন, আমি তো ঘরানা প্রসঙ্গে বলব, কিন্তু আপনি যে-রকম উঁচু উঁচু বিশেষণ আমার সম্বন্ধে লাগিয়েছেন তার যোগ্য আমি নই। ফলে আমার ভীষণ সংকোচ হয়। খুব মূল একটা ব্যাপারে টান দিতে হবে আপনার প্রশ্নের উত্তর দিতে গেলে। আপনি সাহিত্য মানে বলতে চাইছেন ছাপা গল্প—তাইতো? সাহিত্য কথার আভিধানিক অর্থ কিন্তু তা নয়। সাহিত্য মানে হচ্ছে সহিতত্ব,

একসঙ্গে চলা—একাত্মতা। এইটিই হচ্ছে আসল। আমাদেরও যখন ফিল্ম বানাতে হয় তখন প্রথম লক্ষ্য থাকে ফিল্মের যে মূল মর্মবস্তু, তার সঙ্গে যেন দর্শকের একটা সহিতত্ব ঘটে। সে ছাপা বই থেকেই করুন অথবা মন থেকেই করুন। এই সহিতত্বটাই হল আসল ব্যাপার। আর আমরা সাহিত্য মানে কবিতা, গল্প, উপন্যাস—এই সমস্ত বলি। আপনি হয়তো এই অর্থে বলছেন যে আমি ছাপা সাহিত্য থেকে ছবি করি। হ্যাঁ, আমি সারাজীবন বেশিরভাগ ছবিই করেছি ছোটোগল্পকে আশ্রয় করে। উপন্যাস বলতে একটাই, তারাশঙ্করের 'গণদেবতা'। নিজের লেখাও যে করিনি তা নয়। কিন্তু ওটাকে আমি খুব বেশি হাইলাইট করতে চাই না। এই কারণে যে আমি বরাবরই সতর্ক থাকি যে যখন কোনো ছবি করব তখন এমনভাবে জিনিসটা হওয়া উচিত যে সেটা যেন আমার আত্মপ্রচারের মিডিয়াম না হয়ে যায়। আর একটা কারণ, যে-কোনো পরিচালককেই যদি ছবি করার চেষ্টা করতে হয়, তাঁকে জীবনকে দেখতে হবে, সমাজকে দেখতে হবে, সম্পর্ককে দেখতে হবে। এখন, পরিচালক তো একজন মাত্র লোক, তিনি তাঁর মতো দেখে যাচ্ছেন। কিন্তু সমস্তটার ওপর নজর রাখা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। সেজন্য পরিচালককে সহস্রচক্ষু হতে হবে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত বিধাতা পরিচালককে দুটিই চক্ষু দিয়েছেন। এই যে বাকি চোখগুলো, সেগুলো হচ্ছে সাহিত্যিকের চোখ। তাঁরা এক একজন কীভাবে জীবনকে দেখেছেন, প্রকৃতিকে দেখেছেন, সম্পর্ককে দেখেছেন। বিভূতিভূষণ যেভাবে দেখেছেন, তারাশঙ্কর সেভাবে দেখেননি। আবার, প্রেমেন্দ্র মিত্র যেভাবে দেখেছেন, সেটা হয়তো বিমল কর দেখেননি। কিন্তু এই যে আমি আমার মতো ছবি করছি, তার রসদ জোগাবে কে? ছবি তৈরি করতে গেলে যে মেটিরিয়াল, যে উপকরণগুলো চাই তার একটা আধার থাকে তো? এখন এই আধারটা যদি শুধুমাত্র নিজের তৈরি করা আধার হয় তাহলে তা তো ফুরোতেই থাকবে, ফুরোতেই থাকবে, ইংরাজিতে যাকে বলে 'replenishment', একদিকে ফুরোচ্ছে আর একদিকে ভর্তি হচ্ছে, সেটা হবে না, কেননা যতটা বেরিয়ে যাচ্ছে কিছুতেই একটা জীবনের ভেতর অনুসন্ধান করে সেটাকে ভরাট করা সম্ভব নয়। এটা অবশ্য আমার নিজস্ব মত। সেই কারণে আমি মনে করি যে, যখন যখন দরকার হবে, সম্ভব হবে, তখন তখন আমার নিজের দৃষ্টিভঙ্গি ছাড়াও অন্যের দৃষ্টিভঙ্গিগুলোকেও আমি ব্যবহার করবো। এবং এই ব্যবহার করার মধ্যেও একটা ব্যাপার আছে। আমি যখন ছবিটা করবো তখন যেন মনে করা হয় যে এটা আমার নিজেরই ছবি। নিজস্বতা এক-একজনের এক-এক ধরনের থাকে। আমি যেটা অনুভব করছি না, সেটা আর একজন করেছে। আমি সেটা নিয়ে ছবি করছি—তা নয়। যা আমি করবো তার প্রত্যেকটা জিনিস ভুল হোক ঠিক হোক—প্রত্যেকটি জিনিস যেন নিজের বিশ্বাসে করতে পারি, আর এইটা যেন ভাবতে পারি যে, এর প্রত্যেকটা জিনিসের জন্য আমিই দায়ী। যদি এর ভেতরে কোথাও বিচ্যুতি হয় তার জন্যও আমি দায়ী, অন্য কেউ নয়—লেখকও দায়ী নয়। আমি এই কারণে সাহিত্যের ওপর নির্ভর করি। সাহিত্যের যে সংজ্ঞা সেটা হচ্ছে এই যে জীবনকে দেখতে গেলে আমার দুটো চক্ষুই যথেষ্ট নয়, আমার একটা মস্তিষ্কই যথেষ্ট নয়। আরও অনেক চক্ষু দরকার, অনেক মস্তিষ্ক দরকার। আর সেই মস্তিষ্ক সেই চক্ষুগুলো সাহিত্য আমাদের দিতে পারে। আমার কাজ তার থেকে বেছে নেওয়া।

■ সত্যজিৎ রায়, মৃণাল সেন, ঋত্বিক ঘটক, অরবিন্দ মুখোপাধ্যায়কে নিয়ে আপনার অনেক আলোচনা পড়েছি, শুনেছি। কিন্তু তপন সিংহ সম্পর্কে সে-রকম কিছু আলোচনা আমাদের চোখে পড়েনি। যদি তপনবাবু সম্পর্কে অভিজ্ঞতার কথা কিছু বলেন।

আপনার নজরে পড়েনি এটা আমার দুর্ভাগ্য। কারণ, তপন সিংহের ওপরে যে বই তপন সিংহ নিজে লিখেছিলেন সেটা যখন প্রকাশিত হয়েছিল তার ভূমিকাটা আমার লেখা। তপনবাবু আমার কাছে অত্যন্ত শ্রদ্ধেয় একজন মানুষ। তপনবাবুর ঠিক মূল্যায়ন এখনও হয়নি। আমাদের বাঙালিদের একটা স্বাভাবিক প্রবণতা আছে পুজো করার—যে-কোনো একটা দুটো মুর্তি পেলে পরেই আমরা ধূপ ধুনো জ্বালিয়ে ঘণ্টা বাজিয়ে ফেলি। সত্যজিৎবাবুকে আমি খুবই কাছ থেকে দেখেছি, মানে একদিক থেকে আদর্শ বলা যেতে পারে। অন্যদেরও আমি ভালো করেই দেখেছি। কিন্তু, আমার মনে হয় যে এর আড়ালে তপন সিংহ কি রাজেন তরফদারের মতো বা অজয় করের মতো পরিচালকেরা চাপা পড়ে গেছেন।

■ আমি শান্তিনিকেতনের ছাত্র আর রবীন্দ্রনাথ এবং শান্তিনিকেতন আপনাকে সব সময় কাছে টানে। সাহিত্যিক প্রচেত গুপ্তের 'চাঁদের বাড়ি' উপন্যাসে আছে জয়দীপের জাপানি বন্ধু হোতামাচু, যিনি নাকি শান্তিনিকেতনে এসেছিলেন রবীন্দ্রনাথের আঁকা ছবি নিয়ে সফটওয়্যার তৈরি করতে। আপনার কি মনে হয় না যে, এই হেতামাচু চরিত্রটিকে 'চাঁদের বাড়ি' চলচ্চিত্রে একটু প্রত্যক্ষভাবে রেখে রবীন্দ্রনাথ এবং শান্তিনিকেতন বিষয়ে দু-একটি দৃশ্য দেখানোর অবকাশ ছিল?

দেখুন, সিনেমা করতে গিয়ে অনেক কিছুই বাদ যায়। সিনেমার একটা নিজস্ব গতিপথ আছে। সেই গতিপথ অনুসরণ করে করেই ছবি চলে। 'অপরাজিত' উপন্যাসে একটা মস্ত বড়ো চরিত্র আছে লীলা বলে, সত্যজিৎবাবু সেটাকে 'অপরাজিত' ছবিতেই আনেননি। উনি মনে করেছেন যে তাঁর ওই ছবির গতিপথ তার সঙ্গে লীলা অপ্রয়োজনীয়। আমাদের বিচারে ভুল হতে পারে। আমরা কেউই কিন্তু সমালোচনা কিংবা বিচারের উপরে নই। আর রবীন্দ্রনাথ এত বড় একটা আকাশ যে তাঁর চারদিকে—এদিক থেকে ওদিক তাকানোটাই ভারি মুশকিল। আমি তার একটা ছোট্ট অংশ নিয়ে কাজ করার চেষ্টা করেছি। সেটা হচ্ছে রবীন্দ্রনাথের গান। আর একটা বিষয় নিয়ে কাজ করতে পারতাম সেটা হচ্ছে রবীন্দ্রনাথের গল্প। কিন্তু আমি দেখেছি যে রবীন্দ্রনথের গল্পের—যেগুলো আমার প্রিয় গল্প, বিশেষ করে তার সবগুলো নিয়েই ছবি হয়ে গেছে। আর উপন্যাস নিয়ে ছবি আমি করতে চাই না, তার কারণ উপন্যাস নিয়ে ছবি করা বড্ড দুরূহ ব্যাপার! আমাকে তো ছবিটা অ্যাড্রেস করতে হয় দর্শকদের। এখনকার যে দর্শক তার সঙ্গে বহু জিনিস, বহু ইম্পর্টেন্ট জিনিসের দূরত্ব তৈরি হয়ে গেছে। যেমন ধরুন, আপনাকে বলি, স্বাধীনতা আন্দোলন। এত বড় একটা আন্দোলন, এত লোকের আত্মত্যাগ, এত লোকের ফাঁসি, এত লোকের মৃত্যু, গুলি খাওয়া—এখনকার জেনারেশনের কাছে সেটা কোনো ঢেউই তোলে না। তেমনি 'গোরা'তে যে মূল চরিত্র তার এখন আবেদন কিন্তু অনেক সীমিত হয়ে গেছে। এখনকার সময়ে যেগুলোর আবেদন আছে সেগুলোর সবকটা নিয়েই ছবি হয়ে গেছে। সেগুলো নিয়ে আর একবার চেষ্টা করে কোনো লাভ তো নেই!

■ আমরা জানি আপনি ছেলেবেলায় দেখেছেন আপনার বাবা-কাকাদের দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগ দিয়ে জেল খাটতে। তারই প্রতিফলন কি আমরা দেখি আপনার ছবিতে স্বাধীনতার প্রসঙ্গকে বার বার ঘুরে ফিরে আসতে? যেমন—'বালিকা বধূ', 'শ্রীমান পৃথ্বীরাজ', 'পথভোলা', 'গণদেবতা'।

হ্যাঁ, এই জিনিসগুলো তো ভোলা যায় না। বিশেষ করে, একজন কিশোরের মনে এগুলো বড্ড বেশি ছাপ রেখে যায়। অত ইমপর্টেন্ট জিনিসগুলো সম্বন্ধে কিন্তু এখনকার প্রজন্ম কিছু জানে না। তা সত্ত্বেও আমি আমার সীমিত ক্ষমতার ভেতরে একটু চেষ্টা করেছি। যদি তারা নিছক এটাকে গল্প বলেই ভাবে, তাহলেও যেন একটা ইতিহাস জানতে পারে।

■ (১) 'ভালোবাসা ভালোবাসা' (১৯৮৫), (২) 'পথভোলা' (১৯৮৬), (৩) 'অরণ্য আমার' (১৯৮৭), (৪) 'পরশমণি' (১৯৮৮), (৫) 'আগমন' (১৯৮৮), (৬) 'আপন আমার আপন' (১৯৯০), (৭) 'পথ ও প্রাসাদ' (১৯৯১), (৮) 'সজনী গো সজনী' (১৯৯১), (৯) 'কথা ছিল' (১৯৯৪), (১০), 'অরণ্যের অধিকার' (১৯৯৮)—এই দশটি চলচ্চিত্র আপনার স্বরচিত কাহিনি অবলম্বনে নির্মিত হয়েছে। এগুলির মধ্যে আপনার উৎকৃষ্ট সাহিত্য রসবোধের পরিচয় পাওয়া যায়। এগুলির কোনো কাহিনি-সূত্র সম্পর্কে যদি কিছু বলেন।

হ্যাঁ, একটা কোথাও না কোথাও বীজ তো নিহিত হয়ে থাকে। একবার আমি কোথায় যেন ট্রেনে করে যাচ্ছিলাম। সম্ভবত উত্তর ভারতের কোথাও। তো একটা স্টেশনের স্টলে একটা বই পেলাম বীরেন দাশের 'বৌ রাণী' বলে। যখন গাড়ি চলল, পড়তে গিয়ে আমার বইটাকে থার্ড ক্লাস বলে মনে হল—যেন টাকাটাই বাজে খরচা হয়ে গেল। কিন্তু ওর ভেতরে একটা জিনিস পেয়ে আমার মনে হল যে এটাকে যদি ডেভেলপ করা যায় তাহলে পরে বইয়ের সঙ্গে সম্পর্কহীনভাবে এটাকে নিয়েই একটা ছবি করা যায়। সেই ছবিটার নাম হচ্ছে 'কুহেলি'। এটার সঙ্গে মূল গল্পের কোনো সম্পর্ক নেই। একদম কোনো সম্পর্ক নেই। বীরেন দাশের গল্পটা হল ভূতের গল্প, কিন্তু আমার 'কুহেলি' তো ভূতের গল্প নয়! কিন্তু ওইটুকুই আর কি! পড়তে পড়তে একটা জিনিস খুব খারাপ লাগতে লাগতে আমার মনে হয়, আচ্ছা, এটা যদি ওরকম না হয়ে এইরকম হয়। এই খেলা আর কি!

■ একসময় বাংলা ছবির, বাংলা কাহিনির জনপ্রিয়তা সারা দেশবাসীকে নাড়া দিত এবং পরে এইসব কাহিনি নিয়ে হিন্দি ও অন্যান্য ভারতীয় ভাষায় চলচ্চিত্র নির্মিত হত। আপনার 'বালিকা বধূ', তপন সিংহের 'গল্প হলেও সত্যি', অসিত সেনের 'উত্তর ফাল্গুনী' প্রভৃতি অসংখ্য ছবির নাম করা যায়। আজ কিন্তু পরিস্থিতি একেবারে উল্টো। আজকের বেশিরভাগ ছবি দক্ষিণী ছবির নকল। আজকের বেশিরভাগ বাঙালি পরিচালক প্রযোজকদের কাছে আত্মসমর্পণ করছেন। তাঁরা নিজেদের স্ট্যামিনা ধরে রাখতে পারছেন না, যা আপনি, আপনারা ধরে রেখেছিলেন। মনে পড়ে 'পলাতক' ছবির ক্ষেত্রে অনুপকুমারকে নায়ক করার জন্য প্রযোজকের সঙ্গে আপনার মতভেদের কথা।

আমরা পারছি না। এইটাই হচ্ছে একমাত্র উত্তর। আমরা পারছি না বলে হচ্ছে না। আসলে আমরা আমাদের শিকড় থেকে সরে যাচ্ছি! এর মূল কারণটা কিন্তু অন্য! মূল কারণ, আমাদের আমদানি করা ভোগবাদ! আমাদের রুট থেকে ছিঁড়ে না নিয়ে গেলে পরে ওদের যে ভাবস্রোত তাতে আমাদের ভাসানো যাবে না! আগে মানুষের 'plain living high thinking' ব্যাপার ছিল। তুমি ডাল ভাত খাও কিন্তু উঁচু দরের চিন্তা করো। এখন তো আপনার পকেটে যদি একটা দামি স্মার্ট ফোন না থাকে তাহলে আপনাকে প্রায় মানুষ বলেই গণ্য করা হবে না। এই ধারণা কিন্তু আপনা-আপনিই আসে না! এটার পিছনে একটা ষড়যন্ত্র কাজ করছে। তোমাদের কিছুতেই তোমাদের রুটে থাকতে দেওয়া হবে না, তোমাদের নিজস্ব সংস্কৃতি, জীবনধারাতে থাকতে দেওয়া হবে না। আমরা যেগুলো আমদানি করছি, আমরা যেগুলো বলছি, মানুষ তার ক্রেতা। সমাজ নয় বাজার—এই ধারণাতে ওরা আমাদের ফেলে দিয়েছে। এই কারণে, আপনার ভেতরে কী আছে, আপনি কতটা সংদেনশীল সেটা কেউ দেখবে না, আপনার পকেটে কত টাকা আছে, আপনি কত টাকা খরচ করে জিনিসটা কিনতে পারছেন সেটাই দেখবে, সেটাই হচ্ছে আপনার পরিচয়!

■ আজকের ন্যাশনাল মুভি চ্যানেল খুললেই দেখি দক্ষিণী ছবির হিন্দি ডাবিং। ফলে দক্ষিণী ছবি ও তার কাহিনির জনপ্রিয়তা সারা দেশজুড়ে প্রচণ্ড রকমভাবে বাড়ছে। বাংলা ছবির ক্ষেত্রে সত্যজিৎ রায়ের, আপনার, মৃণাল সেনের, ঋত্বিক ঘটকের, তপন সিংহ প্রমুখ বাঙালি চলচ্চিত্রকারদের ছবিগুলি কেন হিন্দি ডাবিং করে সমগ্র দেশবাসীর কাছে এগুলির সুন্দর কাহিনি, সংস্কৃতিকে ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে না? এ বিষয়ে আপনার মতামত?

এটা হয়নি আমরা বেঁচে গেছি। তার কারণ হচ্ছে গিয়ে আজকের যুগে অনেক অন্ধকার এবং কালো মেঘের মধ্যে এই একটাই মাত্র রুপোলি রেখা যে আমাদের ওঁরা পরিত্রাণ দিয়েছেন, কারণ ওঁরা কীভাবে ডাব করেন, কীভাবে কী করেন, সেই সমস্ত আমাদের জানা আছে তো!

■ ২৬ অক্টোবর ২০১৩, শনিবার, আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত সাংবাদিক শঙ্করলাল ভট্টাচার্যকে এক সাক্ষাৎকারে আপনি জানিয়েছিলেন আপনার পছন্দের সেরা পাঁচ অভিনেতা যথাক্রমে—তুলসী চক্রবর্তী, ছবি বিশ্বাস, উত্তম কুমার, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় এবং রবি ঘোষ। আর আপনার পছন্দের পাঁচ অভিনেত্রী যথাক্রমে—মাধবী মুখোপাধ্যায়, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, কাবেরী বসু, সুচিত্রা সেন এবং সন্ধ্যা রায়। যদি বাঙালি পরিচালকদের একটা পছন্দের তালিকা দেন।

দেখুন, এরকম বলা মুশকিল! বলতে চাই না, কিন্তু চাইলে পরেও বলা মুশকিল। তার কারণ একমাত্র সত্যজিৎ রায় ছাড়া আর কাউকেই আমি দেখতে পাচ্ছি না যে, যা কাজ করেছেন সবদিকেই ফুল ফুটে গেছে প্রায়! সত্যজিৎবাবুরও সব ছবিই যে আমার খুব ভালো লাগে আমি তা বলব না। মানে—'পথের পাঁচালী' কি 'অপুর সংসার' কি 'চারুলতা' কি 'গুপী গাইন বাঘা বাইন' আমাকে যেভাবে নাড়া দেয় এরকম হয়তো অন্য দু-একটা ছবি দেয় না। কিন্তু আমার চোখে ওঁর যেগুলো একটু নিরেস ছবি সেগুলোরও মান এতো উঁচুতে যে যার ধরাছোঁয়ার ভেতরে কেউ আসে না! এটা নিয়ে আর কী বলতে পারি বলুন?

■ ভারতীয় ছবি নিয়ে যখন কথা উঠল তখন বলি, বর্তমানে সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করার জন্য তা নিয়ে যে সমস্ত ছবি নির্মিত হচ্ছে যেমন ধরুন, 'টয়লেট—এক প্রেম কথা', 'প্যাডম্যান'। এই দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনের জন্য সমাজচেতনামূলক ছবি প্রসঙ্গে যদি কিছু বলেন।

সমাজের পক্ষে যদি ছায়াছবি কথা বলতে পারে, তাহলে ভালোই তো! 'টয়লেট—এক প্রেম কথা' ছবির প্রচেষ্টা ভালো। ছবির মূল উদ্দেশ্যটা ভালো।

■ আর 'পি.কে' ছবি?

'পি.কে.' দুর্দান্ত ছবি। 'পি.কে.', 'টয়লেট—এক প্রেম কথা'র

মতো ছবি নয়! 'পি.কে.'-র মান অনেক ওপরে। ধার্মিকতা আর ধর্ম ব্যবসা এই দুটো যে আলাদা, এটা 'পি.কে.'-র মতো এতো সাংঘাতিকভাবে কেউ দেখাতে পারেনি। সেদিক থেকে আমার 'পি.কে.'-কে ধারালো লেগেছে। এবং তার প্রতিফলন তো দেখতে পাচ্ছো—একজনের পর একজন করে গুরুদেব এবং তাঁদের কীর্তিকাহিনি সমস্ত বেরিয়ে যাচ্ছে। সুতরাং সেদিক থেকে 'পি.কে.' প্রায় একেবারে ভবিষ্যৎবক্তার মতো কথা বলে ফেলেছে।

■ সাহিত্যিক শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের 'শহর থেকে দূরে' উপন্যাস অবলম্বনে আপনি 'শহর থেকে দূরে' (রঙিন, ১৯৮১) চলচ্চিত্রটি নির্মাণ করেছেন। এই একই কাহিনি অবলম্বনে পূর্বেই কাহিনিকার শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় (১৯০৯-১৯৭৬)-ও তাঁর 'শহর থেকে দূরে' (সাদা-কালো, ১৯৪৩) ছবি নির্মাণ করেছিলেন। এই ছবিতে অভিনয় করা জহর গাঙ্গুলী (রতন), ফণি রায় (গ্রাম্য কম্পাউন্ডার) সম্পর্কে কিছু বলুন। দুটি ছবি পাশাপাশি রেখে দেখলে শৈলজানন্দের চিত্রনাট্যের সঙ্গে আপনার চিত্রনাট্যের অনেকাংশে মিল পাওয়া যায়। এ সম্পর্কে যদি কিছু বলেন।

শৈলজানন্দের ছবিটা অনেক ভলো ছবি হয়েছিল আমার থেকে। আমার ছবিটা তত ভালো হয়নি। তার মূল কারণ হচ্ছে জহর গাঙ্গুলী ওখানে যে-ধরনের অভিনয় করেছিলেন বা ফণি রায় যে ধরনের অভিনয়টা করেছিলেন, এখানে অনুপ কিংবা ভানুবাবু, তাঁরা ভালো আর্টিস্ট খুবই কিন্তু যে-কোনো কারণেই হোক, ওই হাইটে উঠতে পারেননি। আর দ্বিতীয় কারণ অরিজিন্যাল 'শহর থেকে দূরে' হচ্ছে ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট। আর ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইটের নিজস্ব একটা ফোর্স আছে। অন্যদিকে 'শহর থেকে দূরে' আমি যখন করেছিলাম তখন কালারের প্রথম পর্যায়। অনেক কিছু পারফেড কালার আছে, সেটাও ছবিটার ক্ষতি করছে।

■ আপনি এক জায়গায় বলেছেন, আপনার মূল উদ্দেশ্য সকলকে ডেকে মনের কথা জানানো, যা দেখলে সাধারণ দর্শকের মনটা ভালো হয়ে যাবে। এই ব্যাপারে কিছু বলুন।

প্রথম কথা হচ্ছে, একজন লোক ছবি করবে কেন? এই 'মনের কথা' বলার প্রথম কথা হচ্ছে আমি আমার ভাবনাগুলোকে দর্শকদের মধ্যে ভাগাভাগি করে নিতে চাই। এইটাই ব্যাপার।

■ বাঙালি সাধারণ দর্শকদের কাছে সুস্থ রুচির চলচ্চিত্র উপহারদানকারী পরিচালকদের মধ্যে আপনি অন্যতম। আগামী দিনে এইসব দর্শকরা আপনার কাছে আর কী কী সিনেমা উপহার পেতে চলেছে যদি একটু বলেন।

ওগুলো বলা মুশকিল। কাজ চলছে।

■ আর 'জনপদবধূ' কি আমরা খুব শীঘ্রই পাবো?

আশা করি পাবেন। কিন্তু আমি ওরকমভাবে বলবো না। কারণ আমাদের অনেক প্রতিকূল অবস্থার ভেতর দিয়ে কাজ করতে হচ্ছে।

■ অসংখ্য ধন্যবাদ স্যর। আজ আমি সমৃদ্ধ হলাম।

(স্নেহস্বরে আনন্দ সহকারে হাসতে হাসতে) আবার আপনি সম্পাদকীয় ভাষায় কথা বলছেন!

With best compliments from

G.S. SIDDIQUIE

CONTRACTORS AND LABOUR SUPPLIERS

SURESH COMPANY

Station Road, Durgapur-1

Sl. No. 89

আমাদের প্রতিদিনের দ্বিজাতি তত্ত্ব

শুভপ্রসাদ নন্দী মজুমদার

তত্ত্ব হিসেবে দ্বিজাতি তত্ত্ব ভারতের রাজনীতি থেকে সত্তর বছর আগে অন্তর্হিত হয়েছে। কিন্তু সত্যিই অন্তর্হিত হয়েছে কি? নাকি ওই তত্ত্বের অবশেষ এখনও আমাদের প্রতিদিনের ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবন ছেয়ে গেছে। এই রয়ে যাওয়া রেশ থেকেই আজ আবার সেই পুরোনো তত্ত্ব রাজনীতিতে মাথা তুলতে চাইছে। ধর্মবিদ্বেষের রাজনীতি যারা দেশের অন্য প্রান্তে করছে তারা শ্লোগান দিচ্ছে গোরক্ষা, লাভ জেহাদ, অযোধ্যা রামমন্দির ইত্যাদি ইত্যাদির। তাদের সহোদররা এই রাজ্যে এই বিষয়গুলিকে সামনে আনছে না। বরং জাগিয়ে তুলতে চাইছে দেশভাগের স্মৃতিকে। সে সময়ে নানা ঘটনার একটি বিশেষ বয়ানকে আবার জাগিয়ে তুলতে চাইছে। হারিয়ে যাওয়া 'আইকন'-রা আবার মহিমান্বিত পুনর্বাসন পাচ্ছেন বাংলার রাজনীতিতে। ছেচল্লিশের দাঙ্গার নায়ক গোপাল পাঁঠা 'আর্ত আক্রান্ত হিন্দুদের রক্ষাকর্তা' হিসেবে অভিহিত হয়ে উত্তর ও মধ্য কলকাতায় রাস্তার ধারে প্রতিকৃতি সহ ফেস্টুনে ঝুলছে। রাজনীতিতে আবার দ্বিজাতি তত্ত্ব ফিরতে চাইছে। যারা সচেতন, যারা বলছেন যে এই তত্ত্ব রাজনীতিতে ফিরিয়ে আনতে দেওয়া যায় না, তাদেরও অনেকেরই বাচনে ও জীবনে অজান্তে দ্বিজাতি তত্ত্বের সাংস্কৃতিক চিহ্ন রয়ে গেছে। শেষ পর্যন্ত যদিও এই যুদ্ধটা রাজনীতির ময়দানেই লড়তে হয়, তবু প্রতিদিনের জীবন থেকে এর শেষ চিহ্নটুকু সচেতন সাংস্কৃতিক সংগ্রাম দিয়ে উপড়ে ফেলতে না পারলে রাজনীতির ময়দানেও বিজয় অর্জন সম্ভব নয়। তা ছাড়া রাজনীতি মানে তো শুধু ভোট আর সরকার গঠন নয়। রাজনীতি প্রকৃতপক্ষে সামাজিক ও ব্যক্তি জীবনের সমস্ত প্রান্ত ব্যাপ্ত হয়ে থাকা একটি জীবনবোধ, একটি অবস্থান। ব্যক্তিজীবনের প্রতিদিনের ওঠাবসার সঙ্গে যে রাজনীতি তা ভোট ও সরকার গঠন থেকে অনেক দূরে থেকেও ক্রিয়াশীল থাকে সর্বক্ষণ। একে সাংস্কৃতিক রাজনীতি বলতে পারি হয়ত। আমাদের প্রায়োগিক রাজনীতির লড়াইগুলি অনেক সময়ই সাংস্কৃতিক রাজনীতির সাথে সম্পর্কহীন হয়ে নিজের চলার পথ নির্দিষ্ট করে এসেছে এতকাল, ফলে নির্বাচনী রাজনীতিতে প্রগতিশীল অগ্রযাত্রায় অলক্ষ্যে সঙ্গী হয়ে যায় নানাবিধ পশ্চাৎপদ সাংস্কৃতিক রাজনীতির কু-অভ্যেস। আমরা কখনো ভেবেছি, সমাজের আমূল বদল ঘটে গেলে বাকি 'নগণ্য' পরিবর্তনগুলো স্বাভাবিক নিয়মেই ঘটে যাবে। ফলে ওই তথাকথিকত নগণ্য পরিবর্তনগুলোর লড়াই আমাদের রাজনীতির মূল লড়াইয়ের অপরিহার্য সঙ্গী হয়ে ওঠে নি। এখন সম্ভবত তারই কুফল চোখের সামনে ক্রমে দৃশ্যমান হচ্ছে।

দ্বিজাতি তত্ত্ব এই মহাদেশকে ভেঙেছে। তখন সাম্প্রদায়িক রাজনীতিতে টালমাটাল স্বদেশে জাতীয় নেতারা ভেবেছিলেন দেশটাকে ভাগ করে দিলে এই অভিশাপ থেকে হয়ত চিরমুক্তি ঘটবে। তাছাড়া জাতীয় রাজনীতির প্রধান অংশীদারদের মধ্যে ক্ষমতার আস্বাদ অনতিবিলম্বে পাওয়ার একটা উদগ্র বাসনাও কাজ করছিল। ফলে সুদূর ভবিষ্যতের কথা না ভেবেই তড়িঘড়ি দেশকে দু-টুকরো করে দেওয়া হয়। এবার এই বিভাজিত স্বদেশের দুটি অংশে জনসংখ্যার পূর্ণ বিনিময় হবে, নাকি দুটি অংশের মানুষ তার আদি বাসস্থান থেকেই দুটি সার্বভৌম গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের নাগরিক হবেন, এ নিয়ে কোনো স্পষ্ট ধারণা ছিল না। ঘোষণাও ছিল না। তা ছাড়া এর আগে এক দশকেরও বেশি সময় ধরে প্রতিযোগিতামূলকভাবে সাম্প্রদায়িক উস্কানি ও হিংসার রাজনীতি অবাধে চলেছে। দেশের মানুষ দেশ ভাগ হওয়ার আগেই বিভাজিত হয়ে গিয়েছিল প্রায়। একপেশে সাম্প্রদায়িক ও ধর্মবিদ্বেষের রাজনীতির বয়ানে মোহগ্রস্ত মানুষ হত্যালীলায় মেতে উঠেছে বিভাজিত অংশের দুপারেই। এই রক্তস্নানের মধ্যেই ধর্মান্ধদের হাতে খুন হলেন মহাত্মা গান্ধী, ওপারে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলি খান। মৃত্যু হল পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্মদাতা ও উপমহাদেশের সাম্প্রদায়িক রাজনীতির ধুরন্ধর রাজনীতিবিদ মহম্মদ আলি জিন্নাহর। পাকিস্তান রাষ্ট্র আধুনিক-মনস্ক অথচ সাম্প্রদায়িক রাজনীতিবিদদের হাত থেকে চলে গেল পুরোপুরি ধর্মান্ধ মৌলবাদী ও সামরিক বাহিনীর নিয়ন্ত্রণে। মহাত্মা গান্ধীর মৃত্যুতে সচকিত ভারত রাষ্ট্রীয়ভাবে দ্রুত ধর্মীয় রাজনীতির করালগ্রাস থেকে নিজেকে মুক্ত করে সাংবিধানিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার পথে পা বাড়ালো। স্বাধীনতা ও মহাত্মা গান্ধীর মৃত্যু, এই মধ্যবর্তী সময়ে কংগ্রেস দলের অভ্যন্তরে উগ্র হিন্দুত্ববাদীদের দ্রুত উত্থান হচ্ছিল। সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল, গোবিন্দবল্লভ পন্থ, রবিশংকর শুক্লার মতো নেতারা কার্যত হিন্দু মহাসভার রাজনীতিরই বাস্তাবায়নের দিকে এগোচ্ছিলেন। মুসলিম ধর্মরাষ্ট্র পাকিস্তানের বিপরীতে ভারতকে এক হিন্দু-পাকিস্তানে পরিণত করার গোপন কর্মসূচি দ্রুত বাস্তবায়িত হচ্ছিল। বিভাজিত সমাজ ও রাজনীতির এই ভয়ঙ্কর বিষাক্ত সময়পর্বের বেশ কিছু অর্ধসত্য ও একপেশে সাম্প্রদায়িক বয়ান আমাদের লোকসমাজে বদ্ধমূল ধারণায় পরিণত হয়ে মানুষের মনে এখনও সুপ্ত রয়েছে। এই সুপ্ত ক্ষত আমাদের প্রতিদিনের বাচনে, চলনে, ধ্যানধারণায় এক ধরনের দ্বিজাতিতত্ত্বকে বহন করে চলেছে। সচেতনভাবে নয় সবসময়, অভ্যেসে। এই অচেতন সাম্প্রদায়িক অভ্যেস ও আচারের বিরুদ্ধে লড়াই আসলে সামগ্রিক রাজনৈতিক লড়াইয়ের অবিচ্ছেদ্য অংশই।

আমাদের প্রতিদিনের দ্বিজাতি তত্ত্ব আসলে একটি মনোভঙ্গির কথা যেখানে জ্ঞানত বা অজ্ঞানত হিন্দু ও মুসলিম এই দুটি শব্দ অবলীলায় এমন কতগুলি শব্দের স্বাভাবিক সঙ্গী হয়ে যায় যা কার্যত দ্বিজাতি তত্ত্বেরই নামান্তর হয়ে দাঁড়ায়। এমনকী সম্প্রীতির মহৎ

উদ্দেশ্য নিয়ে আমরা যে শব্দ উচ্চারণ করি বা শিল্পের সৃষ্টি করি সেখানেও কখনো দ্বিজাতি তত্ত্বের বয়ান অজান্তেই উঁকি মেরে যায়। সম্প্রীতির কথা বোঝাতে আমরা সাধারণত নানা দ্বিপদী শব্দবন্ধ ব্যবহার করি। সেগুলি সাধারণত হিন্দু-মুসলিম, এপার-ওপার, ভারত-বাংলাদেশ, ভারত-পাকিস্তান। মুশকিল হচ্ছে এপার-ওপার বা ভারত-বাংলাদেশ এই দ্বিপদগুলির সাথে আমাদের অজান্তে একাকার হয়ে যায় হিন্দু-মুসলিম দ্বিপদটি। যেন ভারত মানেই হিন্দু এবং বাংলাদেশ মানেই মুসলিম। মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে লেখা কবিতায় এমন পংক্তি পাই 'এপারে শঙ্খধ্বনি, ওপারে আজান'। অর্থ দাঁড়ায় শঙ্খধ্বনি একান্তভাবেই ভারতের এবং আজান বাংলাদেশ বা পাকিস্তানের। এ ধরনের সহজ সরল গণ্ডি নির্মাণে তখন ভারতে আজান এবং পাকিস্তান বা বাংলাদেশে ঘণ্টাধ্বনি ঘিরে এক ধরনের অপরত্বের ধারণা জন্ম হয় আমাদের চেতনায়।

এই অপরত্ব তৈরি করে আমাদের 'প্রতিদিনের দ্বিজাতি তত্ত্ব'। মনের ভূগোলের বিভাজনরেখার দুপারে প্রতিদিনের ব্যবহার করা ভাষার মাঝখানেও একটা অদৃশ্য অথচ সতত জাগ্রত দেওয়াল নির্মিত হয়। একজন মুসলিম শিশুকে তার শৈশব থেকে এই দেওয়ালগুলি সম্পর্কে সচেতন করে দেওয়া হয়। দেওয়ালের এপারে তার একটি ভাষা, দেওয়াল পেরিয়ে ওপারে গেলেই ভাষা বদলে যেতে হবে। একজন মুসলিম মানুষ নিজের পরিসরে কথা বলার সময় 'আমার চাচা', 'চাচাতো ভাই', 'খালাতো বোন', 'খালুর বন্ধু', 'পানি দাও' এই কথাগুলি যতটা সহজ স্বাভাবিকতায় উচ্চারণ করেন, ঠিক ততটা স্বাভাবিকতাতেই নিজের পরিসরের বাইরে এসেই ভাষা বদলে নেন (হয়ত নিতে হয়)। তখন বলেন 'আমার কাকা', 'আমার খুড়তুতো ভাই', 'মাসতুতো বোন', 'মেসোর বন্ধু', 'জল দাও'। ছোটোবেলা থেকেই 'আমাদের পরিসর' 'ওদের পরিসর' এই বিভাজনে অভ্যস্ত হয়ে যাওয়াতেই এটা একটা স্বাভাবিকতার সাথে চর্চিত হয়। ভাষা-ভূগোলের এই ভিন্নতার কথা আমরা জানি, কিন্তু এই সীমান্তরেখা আমাদের এক ধরনের অজ্ঞতার দূরত্বে ঠেলে দেয়। আমরা যখন সামাজিক মিলনের সাধনা করি তখন মিলতে চাই অভিন্নতার পরিসরগুলিতে মাত্র। কাজী আবদুল ওদুদ বলেছিলেন, আমরা হিন্দু ও মুসলমানের মিলন খুঁজি অভিন্নতায় শুধু। অভিন্নতায় তো প্রকৃতি মিলিয়ে রেখেছেই। কিন্তু জীবন তো অভিন্ন সত্যের নয়, সেখানে ভিন্নতাও একটা স্বাভাবিক সত্য। মিলন রচিত হতে হবে ভিন্নতার স্বীকৃতি দিয়েই। এটা হয় না বলেই বিভাজন তৈরি করা হয় ভিন্নতার উদাহরণ দিয়ে। বলা উচিত, 'তুমি জল বল, আমি পানি বলি', 'তুমি আল্লাহ বল, আমি ভগবান বলি', 'আমার আম্মা শুয়োর খান না, তোমার মা গরু খান না'—তবু, হ্যাঁ তবু আমরা অভিন্ন। মিলন বৈচিত্র পরস্পর বিরোধী সত্য নয়। আমাদের অনবধান দ্বিজাতি বোধ আরো নানা অস্বস্তিকর পরিস্থিতিতে দাঁড় করায়।

আমরা ওপার বাংলার সাথে মৈত্রীর সাথে একাকার করে দিই হিন্দু ও মুসলিমের সম্প্রীতি বা আজান ও ঘণ্টাধ্বনি সহাবস্থানের বিষয়কে। যেন এপার মানে হিন্দু, ওপার মানে মুসলিম। এপার মানে ঘণ্টাধ্বনি, ওপার মানে আজান। এই অগভীর ও অসচেতন দ্বিপদ নির্মাণে এপারে মুসলিম ধর্মের সাথে যুক্ত প্রতীকগুলি এবং ওপারে হিন্দু ধর্মের সাথে সম্পৃক্ত প্রতীকগুলির গায়ে একটা অপরত্ব আরোপিত হয়ে যায়। এটাও একটা অজ্ঞ দ্বিজাতিবাদ। একবার একটি সাংস্কৃতিক উৎসবের সংগঠকদের সহায়ক ভূমিকা পালন করতে গিয়ে অদ্ভুত অভিজ্ঞতা হয়। বাংলাদেশ থেকে একজন শিল্পীকে আমন্ত্রণ করার আগ্রহ ব্যক্ত করে একটি উৎসবের আয়োজকরা। বাংলাদেশ থেকে তখন একজন শিল্পীর নাম প্রস্তাব করা হয় যিনি ঘটনাক্রমে ধর্মপরিচয়ে হিন্দু। সেই শিল্পীর নামটি বলার পর উৎসবের সংগঠকরা এক ধরনের প্রত্যাখ্যানই করে দেন। কারণ জানতে চাইলে অকপট সংগঠকরা বলেন, আসলে বাংলাদেশ থেকে আসা শিল্পীর নাম যদি মহাদেব ঘোষ বা ভাস্কর বন্দ্যোপাধ্যায় বা হিমাংশু বিশ্বাস বা লাভলী দেব হয়, তাতে শ্রোতাদের আগ্রহ নাকি কম হবে। পরিবর্তে বাংলাদেশের শিল্পীর নাম রেজওয়ানা চৌধুরী বন্যা বা আমিনুল ইসলাম লিটন বা মকবুল হোসেন মুকুল বা অদিতি মহসিন হলে বিষয়টায় সত্যিকারের একটা 'বাংলাদেশ বাংলাদেশ ফিল' আসে। কারণ সাধারণের ধারণায় বাংলাদেশ বললেই একটি মুসলিম নামের শিল্পী, বিশেষ করে শেষে ডাকনাম ব্যবহার করা বাংলা, আরবি শব্দের সমন্বয়ে নামের শিল্পী। এই ধরনের প্রচ্ছন্ন দ্বিজাতি তত্ত্বের আচ্ছন্নতায় রয়েছেন প্রচুর প্রগতিশীলেরাও।

পরিচয়ের ক্ষেত্রে ভাষা আর ধর্ম নিয়ে গুবলেট করে দেওয়ার দ্বিজাতি চেতনা সেই শরৎচন্দ্রের 'শ্রীকান্ত' প্রথম পর্ব থেকে আজকের সচেতন বামপন্থী রাজনীতির সময়কাল অবধি সমানভাবে বহমান। শরৎচন্দ্র 'শ্রীকান্ত' প্রথম পর্বে লিখেছিলেন, 'ইস্কুলের মাঠে বাঙালি ও মুসলমান ছাত্রদের ফুটবল ম্যাচ'। মাঝের কয়েক দশকে দেশভাগ, দাঙ্গা, অবিশ্বাস, স্বাধীনতা, ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শ, খাদ্য আন্দোলন, বামফ্রন্ট সরকার এতগুলি পর্ব পেরিয়ে এসেও ২০১৮ সালে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র আন্দোলন থেকে উঠে আসা এক বামপন্থী অধ্যাপককে যখন সদ্য নিযুক্ত সহকর্মী সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়, 'ভদ্রলোক কি বাঙালি?' উত্তর আসে, 'না, না, মুসলিম'। এটা কোনোভাবেই বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। সর্বজনীন ব্যাধিই প্রায়। রেজওয়ানা চৌধুরী বন্যা পশ্চিমবঙ্গে তাঁর ভক্তদের সম্পর্কে বলতে গিয়ে ব্যক্তিগত আলোচনায় বলেছিলেন, 'এটা প্রায়ই শুনি। আপনাকে দেখলে একদম বাঙালি মনে হয়। বোঝাই যায় না আপনি মুসলমান।' অদিতি মহসিনের কথা বলতে গিয়ে বামপন্থী ঘরের এক মহিলা বলছেন, 'ওই যে শিল্পী, দারুণ গায়। নামের প্রথম অংশটা হিন্দু, পরেরটা মুসলিম।' অর্থাৎ বাংলা আর হিন্দু চেতনায় একাকার হয়ে আছে। এই অজ্ঞতারই প্রতিধ্বনি শুনি রেড রোডে ঈদের জামাতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর উর্দু-উর্দু ভান করা হিন্দি ভাষণেও। যে রাজ্যের মুসলিম জনসংখ্যার নব্বই শতাংশ বঙ্গভাষী, সেখানে উর্দু আর মুসলমানিত্ব একাকার হয়ে যাচ্ছে সরকার-প্রধানের ধারণাতেও। ইসলামপুরের উর্দু ও সংস্কৃত শিক্ষক নিয়োগ ঘিরে অশান্তিকে মুসলিম-বিরোধী বিদ্বেষে পরিণত করতে শুধুমাত্র উর্দু ভাষার উল্লেখের মধ্যেও রয়েছে ইচ্ছাকৃত অজ্ঞতার প্রকাশ।

আমাদের প্রতিদিনের জীবনে হাসিঠাট্টার পরিসরেও জ্ঞাতে অজ্ঞাতে দ্বিজাতি তত্ত্বের কালো ছায়া অদৃশ্য অবস্থায় প্রলম্বিত হয়ে আছে। যে কোনো কর্মস্থলে মুসলিম ধর্মের দুই সহকর্মী একান্তে হাসি ঠাট্টা বা খোশগল্পে মশগুল অবস্থায় থাকার সময় তৃতীয় কোনো হিন্দু সহকর্মী সেখানে উপস্থিত হলে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায় প্রথম মস্করাটা এমন হয়, 'কী ব্যাপার? দুই জাতিভাই খুব আড্ডায় মশগুল।' সাধারণভাবে দেখতে গেলে এই রসিকতাগুলো হালকা চালেই হয়। তবে এটাও ঠিক এমন আড্ডা দিনের পর দিন দেখলে তখন আর বিষয়টা হালকা রসিকতা বা মস্করায় সীমাবদ্ধ থাকে না। আড়ালে নিচু গলায় ফিসফাস রটে যায়, 'বাইরে যতই প্রগতিশীল দেখাক, ভেতরে ভেতরে ওরা কিন্তু খুবই কমুন্যাল। সব সময় একসাথে বসে থাকছে।' বিষয়টা এতটা না গড়িয়ে রসিকতা মস্করা অবধি আটকে থাকলেও সমস্যা হয়। কারণ বারংবার এই রসিকতাগুলির পুনরাবৃত্তি হতে থাকলে গ্রহীতার মনে এক ধরনের গোপন ক্ষতের সৃষ্টি হয় যা গভীর বেদনাবোধের জন্ম দেয়।

সংকটের সময় ওই বেদনাবোধই দুর্বল মনকে বিপথে চালিত করে। এই হাসি ঠাট্টার শিকার সবসময় মুসলিমরা হন তা নয়। যে কোনো অঞ্চলে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়, সে ভাষিক বা ধর্মীয় যাই হোক, তাকে কম বেশি এমন অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যেতে হয়। এই ছোটো ছোটো খনুসুটিগুলির কোনো রাজনৈতিক বা সামাজিক মাত্রা থাকে এমনটা বেশিরভাগ সচেতন মানুষই মনে করেন না। প্রকৃতপক্ষে থাকে। যে কোনো অসহিষ্ণু সমাজের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষদের ব্যক্তিগত স্মৃতিকথাতে এমন ক্ষত সৃষ্টির হাজারো উদাহরণ উল্লিখিত হয়। বরাক উপত্যকার করিমগঞ্জের বিশিষ্ট এক সাংবাদিকের নাম আবদুল খালিক বাঙ্গাল। বাঙ্গাল বা বাঙাল শব্দটি বরাক উপত্যকা বা বাংলাদেশের সিলেটে ভিন্ন অর্থ বহন করে। পশ্চিমবঙ্গে বাঙাল বলতে সমস্ত পূর্ববঙ্গীয়দের বোঝালেও ওখানে বাঙাল বা বাঙ্গালি কথাটি পশ্চিমবঙ্গের নেড়ের সমার্থক। অর্থাৎ মুসলিম। আমরা অনেকেই ভাবতাম ওই সাংবাদিক নিজের নামের পেছনে ওই শব্দটি যোগ করেছেন কেন? বেশিরভাগ লোক ভাবত হয়ত ওটা তার খেয়াল। আমার পূর্বতন কর্মস্থলে এক প্রবীণ অধ্যাপক ছিলেন আবদুল খালিক বাঙ্গাল সাহেবের বিশ্ববিদ্যালয়ের সহপাঠী। সাধারণভাবে মেধাবী ও নামী অধ্যাপক হিসেবে পরিচিত আমার সেই সহকর্মী একদিন বিদ্রুপের সুরে বললেন, 'ওর নামে ওই শব্দ যোগ হওয়ার ইতিহাস জানিস? ওটা আমাদেরই অবদান।' ঘটনাটি এরকম। বিশ্ববিদ্যালয়ে সহপাঠীরা আবদুল খালিককে দেখলেই রসিকতা করে 'কী রে বাঙ্গাল চা খাওয়া' বা 'এই বাঙ্গাল শোন' এভাবে সম্বোধন করতেন। প্রতিদিন হেসেই সবটা মেনে নিতেন আবদুল খালিক। একদিন সকালবেলা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যান্টিনে ঢুকেছেন আবদুল খালিক। দূরে কোণের টেবিলে বসা সহপাঠীরা অন্য দিনের মতই সোল্লাসে তাকে আমন্ত্রণ জানালেন, 'বাঙ্গাল, এ দিকে আয়।' কী একটা ঘটে গেল আবদুল খালিকের ভেতরে। অন্য দিনের মতো হেসে আর বন্ধুদের পাশে বসলেন না। দুম করে ঘুরে বেরিয়ে গেলেন। রাস্তায় নেমেই ছুটে উঠলেন চলন্ত বাসে। চলে গেলেন সোজা কোর্টে। বিকেলে ফিরে এলেন ক্যান্টিনে। তখন আবার বন্ধুরা ক্যান্টিনে দ্বিতীয় দফার আড্ডায় বসেছেন। বন্ধুরা অভ্যেসেই ডাকলেন, 'বাঙ্গাল আয়। কোথায় চলে গেলি সকালে?' আবদুল খালেক কোর্টের পরেট থেকে একটা কাগজ বের করে বললেন, 'বাঙ্গাল না। বাঙ্গালবাবু বা বাঙ্গাল সাহেব বা মিস্টার বাঙ্গাল বলবি। আজ থেকে আমি আবদুল খালিক বাঙ্গাল।' কোর্টের অ্যাফিডেবিটের কপি দেখে বন্ধুদের চোখ কপালে উঠল। তবে নিষ্ঠুর পরিহাস, এতগুলি বছর পরও তাঁর সহপাঠী বন্ধু আমার প্রবীণ সহকর্মী আবদুল খালিক বাঙ্গালের মনোবেদনার হদিস পান নি। গল্পটা শেষ করে তাঁর মন্তব্য, 'কী রকমের খ্যাপা ভাব্ ছেলেটা!'

আমাদের প্রতিদিনের দ্বিজাতি তত্ত্ব আসলে নির্মিত হয় কতগুলো প্রজন্ম-বাহিত বদ্ধমূল ধারণা থেকে। ব্যক্তির স্তরে বা সামাজিক স্তরেও অসাম্প্রদায়িক সমাজ নির্মাণের কাজের সাথে এই বদ্ধমূল ধারণাগুলিকে যাচাই করাটাকে যেহেতু যুক্ত করা হয় না, ফলে ধারণাগুলি থেকে গিয়ে এক ধরনের মিথ তৈরি করে। মিথগুলি নানা ধরনের। 'রাজাবাজার মানেই সমাজবিরোধী।' 'পাকিস্তান জিতলেই ওরা পটকা ফাটায়।' 'চান্স পেলেই গরু খাইয়ে দেবে।' 'মেটেবুরুজ খিদিরপুরে হিন্দু মেয়েরা রাস্তায় চলাফেরা করতে পারে না।' প্রকৃতপক্ষে এই ধারণাগুলির বেশিরভাগই সম্পূর্ণ অসত্য। পটকা ফাটানোর ঘটনা হয়ত কোথাও কোথাও বিচ্ছিন্নভাবে ঘটে। কিন্তু এই বিচ্ছিন্ন ঘটনাকে গোটা সম্প্রদায়ের ওপর দেগে দেওয়াটা দ্বিজাতি তত্ত্বেরই বিষ।

আমাদের প্রতিদিনের দ্বিজাতি তত্ত্ব আসলে নির্মিত হয় কতগুলো প্রজন্ম-বাহিত বদ্ধমূল ধারণা থেকে। ব্যক্তির স্তরে বা সামাজিক স্তরেও অসাম্প্রদায়িক সমাজ নির্মাণের কাজের সাথে এই বদ্ধমূল ধারণাগুলিকে যাচাই করাটাকে যেহেতু যুক্ত করা হয় না, ফলে ধারণাগুলি থেকে গিয়ে এক ধরনের মিথ তৈরি করে। মিথগুলি নানা ধরনের। 'রাজাবাজার মানেই সমাজবিরোধী।' 'পাকিস্তান জিতলেই ওরা পটকা ফাটায়।' 'চান্স পেলেই গরু খাইয়ে দেবে।' 'মেটেবুরুজ খিদিরপুরে হিন্দু মেয়েরা রাস্তায় চলাফেরা করতে পারে না।' প্রকৃতপক্ষে এই ধারণাগুলির বেশিরভাগই সম্পূর্ণ অসত্য। পটকা ফাটানোর ঘটনা হয়ত কোথাও কোথাও বিচ্ছিন্নভাবে ঘটে। কিন্তু এই বিচ্ছিন্ন ঘটনাকে গোটা সম্প্রদায়ের ওপর দেগে দেওয়াটা দ্বিজাতি তত্ত্বেরই বিষ।

আমাদের প্রতিদিনের দ্বিজাতি তত্ত্ব আসলে নির্মিত হয় কতগুলো প্রজন্ম-বাহিত বদ্ধমূল ধারণা থেকে। ব্যক্তির স্তরে বা সামাজিক স্তরেও অসাম্প্রদায়িক সমাজ নির্মাণের কাজের সাথে এই বদ্ধমূল ধারণাগুলিকে যাচাই করাটাকে যেহেতু যুক্ত করা হয় না, ফলে ধারণাগুলি থেকে গিয়ে এক ধরনের মিথ তৈরি করে। মিথগুলি নানা ধরনের। 'রাজাবাজার মানেই সমাজবিরোধী।' 'পাকিস্তান জিতলেই ওরা পটকা ফাটায়।' 'চান্স পেলেই গরু খাইয়ে দেবে।' 'মেটেবুরুজ খিদিরপুরে হিন্দু মেয়েরা রাস্তায় চলাফেরা করতে পারে না।' প্রকৃতপক্ষে এই ধারণাগুলির বেশিরভাগই সম্পূর্ণ অসত্য। পটকা ফাটানোর ঘটনা হয়ত কোথাও কোথাও বিচ্ছিন্নভাবে ঘটে। কিন্তু এই বিচ্ছিন্ন ঘটনাকে গোটা সম্প্রদায়ের ওপর দেগে দেওয়াটা দ্বিজাতি তত্ত্বেরই বিষ। আজহারউদ্দিন ক্যাপ্টেন থাকার সময়ে পাকিস্তানের সাথে ভারতের ম্যাচ চলাকালীন ফিল্ডিং-এ বল তার পায়ের তলা দিয়ে গলে গেলেই (যদিও খুব কমই ঘটত এই ঘটনা) বা ব্যাট করতে নেমে কম রানে আউট হলে বা ব্যাটে-বলে না হলেই টেলিভিশনের সামনে বসা সাধারণ ভারতীয় দর্শকদের সিংহভাগ রসিকতা করে হলেও মন্তব্য করত, 'শালা, পাকিস্তানের সঙ্গে ম্যাচ তো। গট আপ হতে পারে।' এই রসিকতাগুলি হয়ত পাকিস্তানের হিন্দু খেলোয়াড় দাহিশ কানোরিয়া বা অনিল দলপত বা খ্রিস্টান থাকাকালীন মহম্মদ ইউসুফ বা বাংলাদেশের হিন্দু ক্রিকেটারদের কপালেও জোটে। প্রকৃতপক্ষে, খেলাধুলা নিয়ে যতটা সাম্প্রদায়িক বিষোদ্গার হয় ততটা অন্যত্র হয় কিনা সন্দেহ। যারা করেন তাদের কাছে বিষয়গুলো নিষ্পাপই ঠেকে। কিন্তু যাদের উদ্দেশ্য করে করা হয় তারা নিজেদের সামাজিকভাবে দুর্ভাগাই মনে করেন। এই চলতে থাকে বলেই এভাবে বিভিন্ন সংখ্যালঘু সম্প্রদায় নানা দেশে নানা অঞ্চলে গোষ্ঠীগত হীনমন্যতায় নিমজ্জিত হয়। কিছুদিন আগের একটি ঘটনা মনে পড়ছে। নিত্যযাত্রীদের সাথে ট্রেনে কলকাতা ফিরছি। কলকাতা থেকে বর্ধমানে একটি অফিসে কাজ করতে আসেন এক ভদ্রলোক যাকে তাঁর পরিচিত সহযাত্রীরা বড়বাবু বলে। একদিন ফেরার পথে বিশ্ববিদ্যালয়ের আধিকারিক এক সহযাত্রী বড়বাবুকে বললেন, 'বড়বাবু, কলকাতায় কোথায় থাকেন?' বড়বাবু বললেন, 'মেটেবুরুজ।' 'কী? আপনি হিন্দু তো। মেটেবুরুজ কেন থাকেন?' বড়বাবু অবাক হয়ে বললেন, 'কেন? কত হিন্দুই তো থাকে।' 'ঈদে গরু কাটে না চারদিকে?' 'চারদিকে কেন কাটবে। তার নির্দিষ্ট জায়গা আছে। তাতে আমাদের কী?' 'রাস্তা দিয়ে রক্ত ভেসে যায় না? চার ধার থেকে নাকি গরুর চীৎকার ভেসে আসে?' 'এসব কে বলে আপনাদের? এবারই আসুন না ঈদের দিনে। নিজের চোখে দেখবেন।' 'আমরা তো ছোটোবেলা থেকে তাই শুনে বড় হয়েছি। পাকিস্তান জিতলেই পটকা ফাটায় না?' 'ওসব আগে হত, এখন প্রায় নেই বললেই চলে।' 'আপনি যে এত রাতে বাড়ি ফেরেন রাস্তায় গোলমাল হয় না? ওখানে তো নাকি বন্দুক ছুরি তলোয়ার নিয়ে প্রায়ই খোলা রাস্তায় মারামারি হয়।' 'এসব কে বলে? যতটা সমাজ বিরোধীদের মধ্যে কলকাতার অন্য অঞ্চলেও হয়, ততটাই ওখানেও

হয়।' কথোপকথন যখন এভাবে এগোচ্ছে তখন ক্রমেই বুঝতে পারি কতটা বদ্ধমূল ভ্রান্ত ধারণা কলকাতার একটি অঞ্চলকে ঘিরে সাধারণ হিন্দুদের মধ্যে প্রচলিত রয়েছে। বড়বাবুরা ৭০ বছর ধরে ওই অঞ্চলের বাসিন্দা। কথোপকথনের শেষে আমার সহকর্মী বললেন, 'যাবেন শুভদা একদিন মেটেবুরুজে। নিজের চোখে সত্যিই দেখতে ইচ্ছে করছে।' বড়বাবু বললেন ক্লান্ত হয়ে, 'মেটেবুরুজে বাড়ি বললেই এই কথাগুলি শুনতে শুনতে বিরক্তি ধরে গেল।'

আসলে বিষয়টা দূরত্বের ও পারস্পরিক অজ্ঞানতার। আমার বয়ানে যে কথাগুলি উঠে এলো তাও একতরফা। একটি বিশেষ ধর্মে জন্ম ও বেড়ে ওঠার সুবাদে আমার অভিজ্ঞতার জগৎটাও খণ্ডিত। হয়ত একই চিত্র ওপারেও। ব্যক্তিগত ও সামাজিক দূরত্ব লঙ্ঘনটাও আসলে একটি রাজনৈতিক কাজ এবং সাংস্কৃতিক সংগ্রাম একই সঙ্গে। শ্রমজীবী মানুষের জন্যে একটি শোষণমুক্ত সমাজ গড়ার অসাম্প্রদায়িক সংগ্রাম গড়ে তুলতে হলে প্রথমে মনকে অসাম্প্রদায়িক করে তুলতে হয়। প্রতিটি মানুষের সাংস্কৃতিক, সামাজিক, ধর্মীয় ও গোষ্ঠীগত ভিন্নতার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে হয়। ঘনিষ্ঠ প্রতিবেশে থাকা একটি বড় সমাজ সম্পর্কে অজ্ঞ থেকে কখনোই সকল মানুষের জন্যে সুখী সমাজ গড়ার সংগ্রাম সফল হতে পারে না। আমাদের মুসলিম প্রতিবেশীরা কিন্তু জানেন, তাদের হিন্দু প্রতিবেশীর ঘরে শিশু জন্মালে তার নামকরণের অনুষ্ঠানকে ওরা কী বলে, ওই সমাজে বিয়েতে মেয়ের বাড়ির অনুষ্ঠানকে কী বলে, কী নাম ছেলের বাড়ির অনুষ্ঠানের। জানে হিন্দু সমাজে বাবার ছোটোভাইকে কী সম্বোধন করা হয়, কী সম্বোধন করা হয় বড় ভাইকে। মায়ের বাবাকে কী ডাকে হিন্দুরা, কী ডাকে বাবার বাবাকে তাও জানা। মায়ের বোন আর বাবার বোনের যে আলাদা সম্বোধন সেটাও জানা। উল্টোদিকে হিন্দু সমাজে কিন্তু মুসলিম সমাজ সম্পর্কে সাধারণভাবে অজ্ঞতাই বিরাজ করে। গড় হিন্দু ছেলে মেয়েরা খুব কমই জানে মুসলিম সমাজের অন্দরের চিত্রটা। এই না-জানা থেকেই জন্ম নেয় নানা বদ্ধমূল ধারণা যা মিথের চেহারা ধারণ করে।

আজকের এই পরিবর্তিত সময়ে আমাদের পারস্পরিক অজ্ঞতা ও দূরত্বের অর্গল দিয়েই বিষের হাওয়া ভরে দিতে চাইছে ধর্মান্ধতার রাজনীতির কারবারিরা। এমন একটি পরিস্থিতিতে সাম্প্রদায়িকতা ও ধর্মান্ধতার বিরুদ্ধে রাজনৈতিক সংগ্রামটি শুধুমাত্র প্রথাগত রাজনীতির পরিসরে পরিচালিত করে সাফল্য পাওয়া যাবে না। আমাদের প্রতিদিনের ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক পরিসর, যা আমাদের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের মধ্যে সাধারণত অন্তর্ভুক্ত হয় না, সেখানেই প্রতিনিয়ত চলছে ধর্মান্ধ মৌলবাদী রাজনীতির সক্রিয়তা। ফেসবুক হোয়াটসআপ ইত্যাদির মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ছে নানা বিষাক্ত মেসেজ। সুপরিকল্পিত গবেষণার মাধ্যমে বুদ্ধিদীপ্ত পরিবেশন-ভঙ্গিতে তৈরি এই বার্তাগুলি না বুঝে শেয়ার করে দিচ্ছেন অনেক প্রগতিশীল মানুষও। ধার্মিকতার আবরণে ছড়িয়ে পড়ছে প্রচুর ভয়ঙ্কর মেসেজ। এই বিষাক্ত প্রযোজনার বিস্তার ঘটছে সমস্ত ধর্ম সম্প্রদায়ের মধ্যেই। এ রকম একটি পরিস্থিতিতে ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক পরিসর থেকে সংগ্রামের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে এবং এই কাজের প্রথম পদক্ষেপটি হতে হবে সামাজিক দূরত্ব ও অজ্ঞতা দূর করার অভিযান। মানুষের সাথে মানুষের বহুস্তরীয় যোগাযোগগুলিকে বিকশিত করার কাজকে রাজনীতির এজেন্ডা করে তুলতে না পারলে আমাদের প্রতিদিনের দ্বিজাতি তত্ত্ব দূর হবে না। এটা না হলে বৃহত্তর রাজনৈতিক অঙ্গনে দ্বিজাতি তত্ত্বকে ফিরিয়ে আনার প্রচেষ্টাকে প্রতিহত করা কঠিন হয়ে যাবে।

With Best Compliments of

M/s SREE KHAITAN TRADERS

Hattala Road, Durgapur

Sl. No. 90

ঔচিত্যবাদ : আজকের দিনে

সুকৃতি ঘোষাল

শিল্পবিচারের নানা মানদণ্ডের একটা হল ঔচিত্য-অনৌচিত্য বিচার। পাশ্চাত্যে হোরেস এবং প্রাচ্যে ক্ষেমেন্দ্র এ বিষয়ে বিশদ আলোচনা করেছেন। এমনটা ভাবা ভুল হবে যে 'আরস পোয়েটিকা' (খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতক) বা 'ঔচিত্যবিচারচর্চা' (খ্রিস্টীয় একাদশ শতক) লেখার আগে এ বিষয়ে কেউ মনোনিবেশ করেননি। 'পোয়েটিক্স' (খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতক) গ্রন্থে নাটকে চরিত্রের বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করতে গিয়ে অ্যারিস্টটল বললেন যে বয়ঃকনিষ্ঠকে প্রজ্ঞাবান দেখানো অনুচিত, কারণ প্রজ্ঞা বয়ঃক্রমসূত্রে অর্জিত হয়। এটা আসলে ঔচিত্য বিষয়ক ভাবনা। আবার আনন্দবর্ধন যখন 'ধ্বন্যালোক' গ্রন্থে লেখেন যে 'অনৌচিত্য ছাড়া রসভঙ্গের অন্য কোনো কারণ নেই', তখন তিনি ঔচিত্যবাদেরই ভূমিকা রচনা করেন। সে যাই হোক, আজকের সাইবার যুগে যখন আন্তর্জালের সূত্রে ছেলেবুড়োর মুঠোফোনে দুনিয়ার যাবতীয় নিষিদ্ধ বস্তু এসে ভিড় জমাচ্ছে, তখন উচিত-অনুচিত নিয়ে মাথা ঘামানোর প্রয়োজন আদৌ আছে কি? যদি থাকে, উচিত বিষয়টা কী, সাহিত্যবিচারে তার গুরুত্ব কতখানি—বর্তমান নিবন্ধে এসব প্রশ্নেরই উত্তর খুঁজতে চাই আমরা।

কোনটা উচিত আর কোনটা অনুচিত, জীবনে তা এক নৈতিক প্রশ্ন। আর শিল্পসাহিত্যে তার প্রদর্শন হল রুচির ব্যাপার। রুচি যাপিত জীবনসূত্রেই অর্জিত হয়। তাই করণীয়-অকরণীয় জীবনধারণকে শিল্পে প্রসারিত করে ঔচিত্যবোধ গঠিত হয়। জীবনে যা আমরা দেখি না, শিল্পে তা দেখানো হলে সেটা অসঙ্গত, তাই অনুচিত মনে হয়। তাছাড়া শিল্প যেহেতু জীবনের কার্বনকপি নয়, জীবনের বহু আকাঁড়া কদর্যতা অ-শিল্পসুলভ মনে হয়। বিকারগ্রস্ত যৌনতা বা হিংসা জীবনে বিরল না হলেও শিল্পরুচিসম্মত বলে মনে হয় না। উল্টোদিকে, শিল্প যেহেতু শেষ বিচারে কল্পনাশ্রয়ী, যা জীবনে ঘটেনি শিল্পে সেটাও উচিত প্রদর্শন হতে পারে। এই বোধ থেকেই অ্যারিস্টটল তাঁর 'প্রবাবিলিটি' বা সম্ভাব্যতার তত্ত্ব এনেছিলেন। তবে সাধারণ বিচারে শিল্পের ঔচিত্যবিচার জীবনের উচিতবোধের নিরিখেই করা হয়ে থাকে।

অনৌচিত্য রসভঙ্গের কারণ বলে তাকে পরিহার করাই শ্রেয় বলে রায় দিয়েছেন সমালোচকরা। এই অনৌচিত্য দোষ কাহিনি নির্বাচন, চরিত্র চিত্রণ, ভাষা প্রয়োগ, শিল্পরূপের শুদ্ধতা ইত্যাদি বিভিন্ন ক্ষেত্রে পরিলক্ষিত হতে পারে। সীতা ও রাবণের প্রেমকাহিনি অনৌচিত্য দোষে দুষ্ট কারণ তা সীতা চরিত্রের প্রচলিত ধারণাকে আঘাত করে। কোমলহৃদয় বীর বা লজ্জাশীলা বারবধূ চরিত্রায়ণ ঔচিত্যবোধসম্মত নয় বলে মনে করা হয়। কারণ, বীর কঠিনপ্রাণ বা নগবধূ ব্রীড়াহীন হবে এটাই স্বাভাবিক। ভাষার ক্ষেত্রে দেহাতি মুখে মার্জিত ভাষা বেমানান, যেমন ব্রহ্মা মেছেনীর ভাষায় কথা বললে সেটা সুবিবেচনাপ্রসূত হয় না। একই শিল্পরূপের ক্ষেত্রেও কিছু বিধিনিষেধ মানতে হয়। করুণ রসের সঙ্গে হাস্যরসের মিশ্রণ বা বীররসের সঙ্গে লঘুরসের ভেজাল রসভঙ্গ ঘটাতে বাধ্য, তাই পরিহারযোগ্য, এমনটাই ভাবা হয়।

শিল্পে ঔচিত্যবিচারের ক্ষেত্রে এ-সবই কিন্তু বস্তাপচা সাবেকি সিদ্ধান্ত। বাস্তবে কি কোনো কোনো ছেলে বুড়োর মতো কথা বলে না? আমরা তাকে ইঁচড়ে পাকা বলে বিঁধতে পারি, কিন্তু উদাহরণ বিরল নয়। বাস্তবে তা যদি ঘটে, ঔচিত্যবোধ যেহেতু জীবন থেকেই ছেঁকে নেওয়া হয়, সাহিত্যে তা কেন অনুচিত হবে? প্রতিযুক্তি হিসেবে ঔচিত্যবাদীরা 'এটা ব্যতিক্রমী, সিদ্ধান্ত টানার ক্ষেত্রে অগণনীয়' এমনটা বলতেই পারেন। কিন্তু জীবনে যা ঘটে না তা দেখানোর স্বাধীনতা তো শিল্পীর আছেই। বস্তুত জীবনকে নবরূপে নির্মাণ করতে পারেন বলেই তিনি শিল্পী। রামায়ণের সীমার বাইরে গিয়ে মধুসূদন কি মেঘনাদকে ঐশ্বর্যমণ্ডিত করেন নি। অ-চরিত্র সুলভ ভাষাই দ্বিজেন্দ্রনাথের হাস্যসাহিত্যের বড় আকর্ষণ। সেখানে তো কই সুনির্দিষ্ট বিধির বাইরে গিয়েও রসভঙ্গ ঘটছে না। এর রহস্য কী?

কোনটা উচিত আর কোনটা অনুচিত, জীবনে তা এক নৈতিক প্রশ্ন। আর শিল্পসাহিত্যে তার প্রদর্শন হল রুচির ব্যাপার। রুচি যাপিত জীবনসূত্রেই অর্জিত হয়। তাই করণীয়-অকরণীয় জীবনধারণকে শিল্পে প্রসারিত করে ঔচিত্যবোধ গঠিত হয়। জীবনে যা আমরা দেখি না, শিল্পে তা দেখানো হলে সেটা অসঙ্গত, তাই অনুচিত মনে হয়। তাছাড়া শিল্প যেহেতু জীবনের কার্বনকপি নয়, জীবনের বহু আকাঁড়া কদর্যতা অ-শিল্পসুলভ মনে হয়। বিকারগ্রস্ত যৌনতা বা হিংসা জীবনে বিরল না হলেও শিল্পরুচিসম্মত বলে মনে হয় না।

এর থেকে যে প্রাথমিক সিদ্ধান্ত আমরা টানতে পারি তা হল, জীবনের উচিতবোধগুলো শিল্পে রক্ষিত হল কিনা এটা বড় কথা নয়, তার উল্লঙ্ঘনে রসসৃষ্টি হল কিনা সেটাই মূল বিচার্য। ধনবাদী সমাজে শোষণই বাস্তব, শোষণের অবসান এক অর্থে কষ্টকল্পনা। প্রগতিবাদী সাহিত্যে শোষণমুক্তির প্রদর্শন কি তাহলে অনৌচিত্যের আওতায় পড়ে? নিশ্চয়ই না। গোর্কির 'মা' সাহিত্য না হলে সৎসাহিত্য কাকে বলা যায়? অর্থাৎ জীবনকে ছাপিয়ে ওঠা দোষের নয়, তার মাধ্যমে শিল্পরস সৃষ্টি করতে হবে। কথাটা সহজ করে বললে যা দাঁড়ায় তা হল, ঔচিত্য যেহেতু শিল্পে কী করা উচিত বা উচিত নয়, তা নির্দিষ্ট করে, তার বাইরে যাওয়া যেতে পারে যদি সে প্রস্থান রসহানি না

ঘটায়। বাস্তবে পশুপাখি তো মানুষের ভাষায় কথা বলে না। কিন্তু পঞ্চতন্ত্র বা ঈশপের ফেবল তো রসহানিকর রচনা নয়। অর্থাৎ জীবন থেকে উচিতের ধারণা আহৃত হলেও, সাহিত্য বিচারে সাহিত্যের নিয়মকেই প্রাধান্য দিতে হয়। সমস্যা হল, সাহিত্যের নিয়ম কোনো অচলায়তন নয়, তা সময়ের সঙ্গে বদলাতে থাকে। ফলে সাহিত্যের পরিধিতে উচিত-অনুচিতের সংজ্ঞা স্থির থাকে না। কালিদাসের কাব্যপ্রতিভা বিষয়ক চেনা গল্পটা এ প্রসঙ্গে সবার মনে পড়বে। শুকনো গাছের গুঁড়ি দেখে কম প্রতিভাধর কবি যখন 'শুষ্কং কাষ্ঠং তিষ্ঠতি অগ্রে' বললেন, কালিদাস সেই একই বস্তুর বর্ণনায় বললেন 'নীরসঃ তরুবরঃ পুরুতঃ ভাতি'। গল্পের ভাষ্য অনুসারে কালিদাসের কাব্যপ্রতিভা বেশি কারণ তাঁর বর্ণনায় অলঙ্কারের চমৎকারিত্ব আছে। এই প্রচলিত মতের বিরুদ্ধে গিয়ে বুদ্ধদেব বসু বললেন, শুকনো কাঠকে 'শুষ্কং কাষ্ঠং' বলা অনৌচিত্যদোষ, অলঙ্কারসজ্জা ক্ষেত্রে নিতান্তই বেমানান। অর্থাৎ ঔচিত্যের অনুশাসন এমনকি সাহিত্য মুলুকেও চিরস্থির নয়।

ঔচিত্য বিষয়ে কিছুটা নমনীয়তা না দেখালে সাহিত্যবিচারে ঔচিত্যতত্ত্ব কোনো কাজেই আসে না, রসদার্শনিকরা সেটা বোঝেন। তাই তাঁরা উচিত-অনুচিত ঝোঁক অনুযায়ী রসাভাস ও রসভঙ্গ থেকে রসকে পৃথক করতে চেয়েছেন। শৃঙ্গার রসের উদাহরণ দিয়ে বলা যায়, পরকীয়া হল রসাভাস, লঘুগুরুনিরপেক্ষ কাম (যেমন, শিষ্য ও গুরুপত্নীর রতিক্রিয়া) রসভঙ্গ, আর সমাজস্বীকৃত স্বামী-স্ত্রীর মিলনবর্ণনা প্রকৃত শৃঙ্গার রসের উদ্দীপক। এটাকে ভাবের ঘরে চুরি না বলেও মানতেই হয়, কাল যেটা রসভঙ্গের কারণ ছিল, সমাজ পরিবর্তনের ফলে আজ সেটা রসসৃষ্টির সহায়ক হয়ে উঠতে পারে। অর্থাৎ শিল্পের মতো জীবনেও উচিত-অনুচিতের সংজ্ঞা সততই বদলাতে থাকে। এক দেশ থেকে অন্য দেশে গেলে ঘড়ির সময়টিকে যেমন বাড়িয়ে কমিয়ে নিতে হয়, ঔচিত্যের নিয়মকেও তেমনি আধুনিক করে না নিলে ঔচিত্যতত্ত্ব প্রয়োগযোগ্যই থাকে না। তাছাড়া শিল্পী স্বভাববিদ্রোহী, তিনি কল্পনাশক্তির বলে বলীয়ান। উচিত-অনুচিতের তোয়াক্কা তিনি সব সময় করেন না। তাই যেখানেই প্রচলিত ঔচিত্যবোধ ধাক্কা খায় সেখানেই নিয়মভঙ্গের মধ্য দিয়ে মহত্ত্বর কিছু সৃষ্টি হল কি না দেখতে হয়। প্রচলিত ছন্দের শৃঙ্খল ভেঙে মধুসূদন যখন অমিত্রাক্ষর ছন্দ রচনা করলেন তখন উচিত-অনুচিতের প্রচলিত বিধিকে পাল্টানো ছাড়া সাহিত্যবিচারের অন্য পথ খোলা রইল না।

তাহলে যেটা দাঁড়াল, বিচার যেহেতু গুণাগুণ নির্ণয়, ঔচিত্যের একটা ভাবনা আসবেই। কিন্তু যেঠা খেয়াল রাখা দরকার তা হল কী জীবন, কী সাহিত্য, উভয় ক্ষেত্রেই উচিতের সংজ্ঞা হামেশাই বদলে যায়। কাল যা অনুচিত ছিল, আজ তা আর দোষের না ঠেকতে পারে। তাছাড়া ছক ভাঙার একটা সহজাত ক্ষমতা থাকে সব শিল্পীর। আর ছক ভাঙলে যদি শিল্প হিসেবে সার্থক হয় তখন সে দ্রোহকর্মটিকে দোষ না দিয়ে স্বাগত জানাতেই হয়, আর তার বিচারের জন্য ঔচিত্যের চিরাচরিত ভাবনাকে একটু পালটাতেই হয়। তবে পরিবেশনের স্থান-কাল সংক্রান্ত ঔচিত্য ভাবনা প্রথমাবধি একই থাকে। রোম যখন পুড়ে খাক হচ্ছে তখন নীরো বীণায় সুরসাধনায় তন্ময় হলে তা অসভ্যতা। বীণার ঝংকার যত মধুর ও ব্যাকরণসম্মত হোক, কেউই দ্বিমত হবেন না। অবশ্য ভার্চুয়াল ওয়ার্ল্ডের কল্যাণে এসব ভাবনাও লণ্ডভণ্ড হয়ে যাচ্ছে। সুনামির ধ্বংস দেখতে দেখতে রিমোটের এক খোঁচায় বিনোদন চ্যানেলে চলে যাচ্ছি আমরা। সেটা পরিবেশন নয়, দর্শন-অনৌচিত্য। তা নিয়ে কথা বলা মনে ব্যক্তিস্বাধীনতায় হাত দেওয়া। অলমিতি বিস্তারেণ।

With best compliments from

PRACHESTA SELF HELP GROUP

(Lic. No. 19026/06-07, Dt. 26-06-2006)

All Sorts of Civil, Construction/Mechanical Jobs, Labour & General Order Supplier

Regd. Office : B.B.D. Nagar, Sagarbhanga, P.O. Durgapur-11, Dist. Paschim Bardhaman
Camp Office : Qr. No. Q-2, Sagarbhanga Colony, P.O. Durgapur-11, Dist. Paschim Bardhaman
Mob. 9832749263, Ph. 0343-6453962

Sl. No. 100

সূর্য জানে

মোহিনীমোহন গঙ্গোপাধ্যায়

সূর্যের হাসির সঙ্গে পূর্ব পশ্চিম হেসে ওঠে
সে হাসিতে আকাশে মিছিল—দীর্ঘ শোভাযাত্রা শুরু
গ্রহ ও নক্ষত্রপুঞ্জ গণতন্ত্রে এখনও বিশ্বাসী।
সৌরজগতে নেই স্বৈরশাসন
কালপুরুষ কার জন্যে তৈরি করে দীর্ঘ ছায়াপথ?
কেউ নয় সাম্প্রদায়িক।

সবাই নিজস্ব নীতি মেনে চলে
ধর্মীয় ফ্যাসীবাদ পিষে ফেলতে চায়
স্বাধীন কণ্ঠস্বর, দ্যুতি ও দ্যোতনা
সময়ের রঙ পাল্টায়।

সূর্য জানে হাজার আলোকবর্ষ পরে
আরও উজ্জ্বলতা পাবে নান্দনিক যা কিছু সঞ্চয়।

আনো বিদ্রোহ

কেষ্ট চট্টোপাধ্যায়

রাজা বদলায়, রাজত্ব বদলায়
কিন্তু সমস্যা বদলায় না
সমস্ত জায়গায় আছে কাঁটাতারের বেড়া।

কোথায় যাবে তুমি?
ঘিরে রেখেছে নিজস্ব স্বদেশ রুক্ষ তাপে
দগ্ধ দিন যায়, গভীর হয় আরো।

মুক্তি নেই এ পরবাসের—
কে গায় জীবন দিয়ে মুক্তির জয়গান
আনো বিদ্রোহ, বিদ্রোহ আজ, বিদ্রোহ চারিদিকে—

পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ প্রেমের দৃশ্য

অংশুমান কর

সুচিত্রা সেনের মুখের কাছে ঝুঁকে এসেছে
ওথেলো উত্তমকুমারের মুখ
হু হু হাওয়াকে হারিয়ে দু'দিকে দু'বাহু মেলে দিয়েছে রোজ
পেছনে জ্যাক
মাউথ অর্গ্যান বাজাচ্ছেন অমিতাভ
আর একটার পর একটা আলো নিভিয়ে দিচ্ছেন জয়া ভাদুড়ি
—না, এর কোনওটিই নয়
আজও পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ প্রেমের দৃশ্য
শান্ত পুকুর আর তার ঠিক ছ'ইঞ্চি ওপরে ঝুঁকে থাকা
হিজল গাছের বাঁকা ডাল...

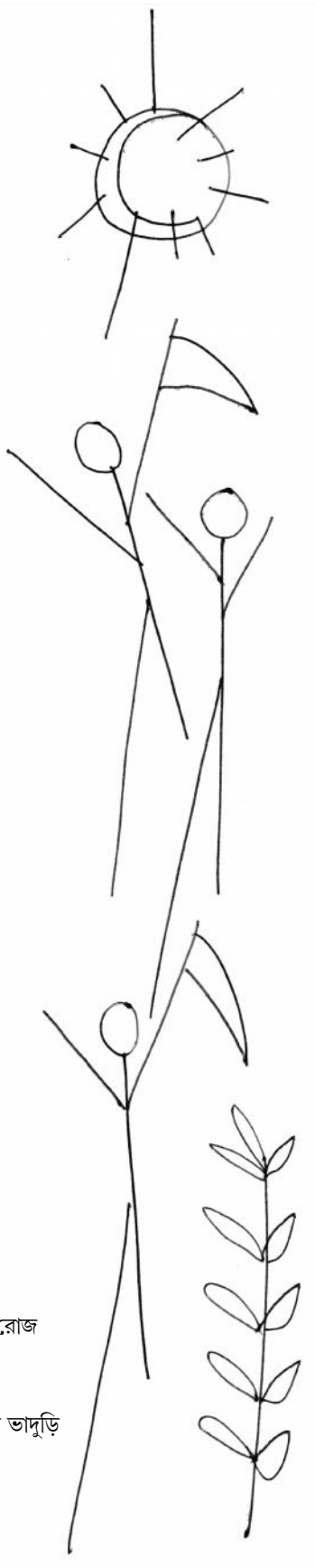

ছেঁড়া ডায়েরি

পার্থ রাহা

কাল রাতে
হলুদ জ্যোৎস্নায় এক সাদা ঘোড়াকে
মৃতদেহ হতে দেখেছি
আমার নিদ্রাহীন স্বপ্নে
হলুদ জ্যোৎস্নায় এক সাদা ঘোড়া।
আমার কররেখার স্পর্শে
ফুল ঝরে যায়
মালা
হয়ে ওঠেনি জন্মদিনের মমতা
বিবাহবার্ষিকীর প্রেমময় স্মৃতিসুখ

আমার স্বপ্নের মধ্যে
আলোর শিশুরা আর বেঁচে নেই
ময়দানের ঘাসের জাজিম
নিস্তব্ধ নিথর
বড় কাছে
চোখের মণির বড় কাছে
এখন দড়ির ফাঁসে থমকে যায়
ছুটন্ত ঘোড়ার ছবি
ফুল ছড়িয়ে যায় রাস্তায় মাটিতে
পবিত্র সেচের জমিতে

একাদশীর চাঁদ পা গুটিয়ে বসে নেই
এখনো নক্ষত্রের আলো শিরায় শিরায়
যতদূর চোখ যায়
সমুদ্রের শরীর ছাড়িয়ে পাখিদের ছায়া
বুকের মধ্যে হুগলি নদী তোলপাড়
তোলপাড়
মুঠোর মধ্যে ডালিমদানা তোলপাড়
তোলপাড়
বাগান ভরা যুঁই টগর শিউলি ফুলের পাশে
রক্তিম ক্যাকটাস
মূর্তি ভেঙে পড়ে
এখন আঁধার
আকাশ ভেঙে নামে
জানি
শুকনো রোদ্দুরের দিনে
মুখ ফেরানো সহজ নয়।

তবুও কোথায় যেন
কখন যেন
হঠাৎ যেন
পৌরুষ অট্টহাসি হাসে।

সবুজ ঘাস এবং শিশুদের তালিগান

সুকমল ঘোষ

শ্রাবণের সাদা কালো মেঘ চুমোয় ভরিয়ে দিচ্ছে নীল স্মৃতির মুখে
তোমার কপাল ছুঁয়ে টুপ্ টুপ্ মাটিতে ঝরে পড়ছে রজঃস্খলন
কে তুমি
ফ্যাকাসে অবয়ব থেকে দু-চোখ ছুঁড়ে দিচ্ছ আমার বাম অলিন্দে
আমাকে এভাবে অসহায় করে তুলোনা
ভুলিয়ে দিওনা স্মৃতির জালবোনা
তুমি কাঁদতে চাও, কাঁদো
রেটিনার অশ্রুধারায় ভরে দাও নদীমুখ
বুকের পাঁজরে যত খুশি মারো
গুম গুম গুম
আমি নদীর চরায় বসে দেখতে চাই
নীল মাছের কানকো
কী আশ্চর্য
নিকষ কালো মদেশীয়া মরদের মুখ থেকে
উগলে উঠছে লাল থক্‌থকে রক্তের চাঙড়।

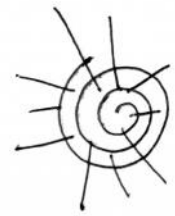

ধাপার রাজত্ব ঘেঁটেঘুঁটে আঁতি পাতি খুঁজে
একটুকরো ছেঁড়া কাগজ বার করে স্থির
দুটো চোখ মেলে আছে পাগল সুকান্ত—
কী এমন গোপন বিসংবাদ আছে তাতে!
তবে কি পেয়েছে কোন স্বর্ণাভ সন্ধান ও
নাকি নিরুদ্দেশ সংক্রান্ত কোনো বিজ্ঞাপন
অথবা ফেলে যাওয়া শিশুর লাশের রিপোর্তাজ!

মিড্ ডে মিল খাবে বলে ছুট্ ছুট্ শিশুদের দঙ্গল
রুমিয়া বিট্টু পিংকি ছোট্টু বাহমণি টুডু।

আকাশনীল
সবুজ ঘাস বিকেলের রোদ্দুর
স্বপ্ন স্মৃতিরা খেলছে তালিগান।।

কু সর্বস্ব রাত্রি

সঞ্চয়িতা কুণ্ডু

কাক জেগে পাহারা দেয় কুমিরের কোল
কর্ম নিষিদ্ধ রাত্রি
ধর্ম নিষিদ্ধ রাত্রি
ঘুমোবার জন্য সূর্য ঢলে
সমস্ত রাত্রি কিন্তু কুমিরের কোল
ধর্ম ঘুমিয়ে নেয় ঐ কোলে
দাঁতের দৌরাত্ম্য মাপে—
নিরস্ত্রের ভাষা
ঘুমের অপব্যয়
খাঁকি উর্দি পাহারা দেয় কুমিরের হাঁ...

মানুষের মৃত্যু হলে

জিয়াদ আলী

আমার নিজস্ব কোনও ঘরবাড়ি নেই
কবরে যাবার দু-গজ মাটিও নেই এই দুনিয়ায়
মরে গেলে ফেলে দিও সমুদ্রের জলে কিংবা
লাশভর্তি মর্গের ভিতর
পঞ্চাশ বছর ধরে মর্গের পাশ দিয়ে আমার নিত্য যাতায়াত
মাংসের পচা গন্ধ ভীষণই গা-সওয়া হয়ে গেছে
এখন তো ভাগাড়ের পচা মাংস মানুষ হোটেলে বসে খায়
মর্গের ইঁদুর যদি খাবলে খায় চোখ হৃদপিণ্ডটুকু
তাতেও দুঃখ নেই
মৃত মানুষের কোনও দুঃখ থাকে নাকি!

আসলে মত্যুর পর মানুষেরা লাশ হয়ে যায়
নিথর মাংসখণ্ড হাড়গোড় খুবই কাজে লাগে।

শিবির বদল

সুনির্মল কুণ্ডু

কে কে যে কখন শিবির বদলে হাসি হাসি মুখে ঘুরে বেড়ায়—
'শত্রু' 'মিত্র'-চিহ্নিত হতে এখন লোকের দ্বিধা কোথায়!
'লজ্জা'-শব্দে ধুলো জমে গেছে—'ভালো আছি' এই শব্দটায়
বেচাল কিছু দেখলে ফতুর ভারতবর্ষে শহর-গাঁয়!

পেটে যার নেই বিদ্যেবুদ্ধি—নেই ডালভাত অনেক কাল—
সে খেলে গুলির উষ্ণ পরশ তুচ্ছ প্রাণের দাম কোথায়!
অনেকটা সেই খামখেয়ালির তাল ঠুকে ঠুকে পাঁড় মাতাল—
রাস্তায় ফেলে বেদম পেটাই—সেরকম কিছু হলে পাড়ায়
মানুষ থাক ঠাণ্ডা মেরে হে... মাথা গরমের দিন এ নয়...
অধুনা দিনের সংজ্ঞা হঠিয়ে গায়ের জোরেই রোদ হাঁকায়,
আকাশটা বড়ো হুটহাট করে মেঘবৃষ্টির সব সময়
হচ্ছে কেমন ফ্যাকাশে মুখের রঙ মুছে ফেলে বসে ফাঁকায় :

আমি কাঁহাতক যুদ্ধ-জিগির তোলায় ক্ষিপ্ত না হয়ে ঠায়
গল্প গুজবে সময় দি—সময় চলে না ঢিমেতালে
যত গুলবাজদের খপ্পরে
সময় একটা নিয়মেই বাঁধা—সমঝোতা নেই সে-জায়গায়।

এ-হাত সে-হাত বেহাতে মেনেই পালাবদলের হিমঘরে
অনেকেই বেশ জমিয়ে বসেছে—এম-এল-এ এম-পি তকমাটায়
দেশটা হুতোম-দখলে যেতেই কত-না মন্ত্রতন্ত্রময়!

না হয় হলে হে মন্ত্রিমশাই, উড়েই চলেছ খুব মজায়—
হৃদয় বলে যে বস্তুটি আছে সেটি কি আসলি বস্তু নয়?

চিকুর দুপুর

মিলনেন্দু জানা

মা হেঁকে কয়, 'ঘুমাও চিকু—বলছি বারংবার—
রবিবারের দুপুরটাতে দুষ্টুমি নয় আর।
অফিস-জাগা বাবা ঘুমায়—একদম নয় ঠ্যালা,
এসো চিকু, ঘুম পাড়াবো—ভর দুপুর বেলা।'

'আঁকার খাতা' তেমনি পড়ে—যেমন ছিল কাল,
সাদাপাতায় দাগ পড়েনি, নেই কো নীল-লাল!
'এক থেকে দশ', 'এফ' দেখে ফক্স—আছে কি আর মনে?
'অ্যাম্বুলেন্স আর বাসের হর্নে'—সব ভেগেছে বনে।

মায়ের কথায় কান বাঁকে না, পা নড়ে না চিকুর—
জানলা থেকে 'ঝপাং ঝপাং'—গান শোনে ফের 'দুঃখুর'।
টবের ফুলে জল সে ঢালে, কখন ভেজায় মেঝে—
'ব্যাটবলেতে' লোক না পেলে, এমনি মাতে কাজে!
'ঠামির' কোলে হাবুডুবু, 'দাদা'র সঙ্গে গপ্পো—
রবিবারে দুপুর ছাড়া দেয়কি তারা ঝম্পো?

হপ্তাজুড়ে ছুটোছুটি—'মিস্'-মাস্টার-গাড়ি—
রবিবারে চিকুর তাই তো সব নিয়মেই আড়ি।
মন টানে না বইয়ের পাতা, 'ঘুম' আসে না চোখে—
চিকুর 'দুপুর' চিকুর আছে—'আড়চোখ' দেয় মা-কে।

মিছিল

মলয় রায়

শাক সুসুনি
মটরশুঁটি
জল কলাইয়ের
সব।

পেটের খিদে
খুঁটে বেধে
লড়াই রাখিস
যা।।

তোর জন্যই
গান বাঁধে রোজ
বাউল মাঝি
একতারায়।

মাঠ ভুঁই তোর
পাণ্ডুলিপি,
পৌঁছে গেছে
সব পাড়ায়।

তোর জন্য
জিঁয়াতির রস,
আনবেরে
ডাল ভেঙে।

ভাত কাপড়ের
কথাকলি
ফুটবে আকাশ
রেঙে।

পাকা ধানের
জঠর থেকে
রাজকন্যা
ওই।

শব নয় কো
শব্দ দিয়ে
হাঁস ডাকে
তৈ তৈ।

অট্টালিকার
অট্টহাসি,
তাই পায় না
থৈ।।

বুকের মধ্যে
আকাশ পুরে
ফের দিয়েছে
হৈ।।

কান্না গুলো
শুকিয়ে গিয়ে
কোথায় হলো
নীল।

বাচ্চাগুলো
খেলছে দেখ
কেউ ফিদেল
কেউ লেনিন।।

পথে-শপথে

অভিজিৎ দাশগুপ্ত

পায়ে পায়ে পথ, সূর্য শপথ
ভেতরে বাইরে ঢেউ
সোনালী আলোয়, মন্দভালোয়
দু-হাত বাড়ালো কেউ
দুহাত বাড়িয়ে, হৃদয় ছাড়িয়ে
পথে শপথেই সাথী
দুয়ার খুলেছি, দ্বন্দ্ব ভুলেছি
ঘরে ঘরে জ্বালি বাতি
প্রদীপ জ্বলছে, ফসল ফলছে
সূর্যসোনায় গান
দেয়াল গুঁড়িয়ে, পতাকা উড়িয়ে
জীবনের কলতান
জীবনের গানে, সব প্রাণে প্রাণে
অমৃতের উৎসব
অমৃতধারায়, বন্ধু দাঁড়ায়
পেয়েছি এ বৈভব
অমৃতের মাঝে, সকাল ও সাঁঝে
জীবনের জয়গান
উৎসবে আছি, বৈভবে বাঁচি
ভেঙে গেছে ব্যবধান
ব্যবধান মুছে, জীবনকে খুঁজে
পথের শপথে থাকি
জয়গান গাই, তোমাকেই পাই
তোমারই এ ছবি আঁকি

মজার রাজ্যে

নলিনীরঞ্জন সরকার

রাজার দারুণ দাপট
ভয়ে কাঁপে প্রজা
কর্মীদের কাজ চাই চটপট
বেতন বাকিতেই মজা।

মন্ত্রীরা বেড়ান সবাই মিলে
তাতেই চলে সরকার
নেতারা তোলা তোলে
রাজ্যের উন্নয়ন দরকার।

বিদ্যালয় থেকে বিশ্ববিদ্যালয় বেশি
শিক্ষক তো নাই।
ছুটি মেলে বড় বেশি
সবাই চুপ তাই।

যতদিন আছি

বিশ্বনাথ কয়াল

যতদিন আছি শুধু বেঁচে আছি
আমারই ছায়া প্রতিদিন শীর্ণ হয়
অশক্ত পাখির দেশে নির্বাসন দেবে বলে।
উচ্ছল জলস্রোত একদিন
শুধু বালিয়াড়ি, দর্পিত মহিরুহ
এখন অবসন্ন কাষ্ঠখণ্ড
মহাকাশে তারারা হারিয়ে যায়
বিলীন হয় কালো কালো গহ্বরে।

তবু বেঁচে আছি। প্রতিরোধ গড়ে নিতে
আমার প্রজন্ম এখনও
পথে প্রান্তরে দিকচিহ্ন খোঁজে
বেঁচে আছি গুনটেনে উজান স্রোতে
জোয়ার আশায়, জনপদ ঘাটে
ডাক দেবে পরিণত স্বর—
বেঁচে আছি
অনন্ত স্মৃতির মতো বিস্মৃতির ছায়াপথে
আলো হবো বলে।

সময়

সতীরঞ্জন আদক

সবই তো আছে
আকাশ জুড়ে বিস্তারিত মেঘ
রাতের শেষে সূর্যোদয়
এবং আরো অনেক কিছু।

দৃঢ় পায়ে হেঁটে
দিশাহীন জীবনের বুকে
যোগ হোক প্রতিবাদের ভাষা
মানুষের উজ্জ্বল মুখ।

চিন্তায়, মননে
সোঁদা মাটির গন্ধে
অন্তরের গভীর থেকে
ফিরে আসুক খুশির হিল্লোল।

সময় বদলে যাচ্ছে দ্রুত
নিজেকে গুটিয়ে নিচ্ছি আমরা
ভেসে আসছে নানান কথা
মুখোশের দিন
তবুও অপেক্ষায় থাকি।

যাপনচিত্র

রথীন্দ্রনাথ ভৌমিক

গঞ্জ নগর কর্মমুখর নিশ্চুপ ঠোঁট-চাপা
চলছে ফিরছে করছে যে যার ঘরগেরস্তি কাজ
না করলে নয় প্রাণধারণে
কোনো কথাই যায় কি কানে
বোঝা যায় না চলন দেখে বুকের গোপন সাজ।

এ ওর মুখে অবিশ্বাসে তাকিয়ে নির্নিমেষ—
এই কথাটা যায় কি বলা! যায় করা বিশ্বেস!
অদ্ভুত এক চলছে দোলাচল
অন্য হাওয়া ওড়ায় যে অঞ্চল
শুকনো পাতায় হাওয়া ছড়ায় বিভাজনের দ্বেষ।

চাপা ঠোঁটের ভিতর ভিতর জিহ্বা যে চঞ্চল
বুঝছি বেশ নিজের জিভের বেচাল চলন দেখে
এই শাসানি ওই শাসনে রোখ
চাপা আগুন ধোঁয়ায় জ্বলে চোখ,
দিন গুনছে দিন গুনছে চোয়াল চেপে ক্রোধ।

শেখ জয়নাল আবেদীনের তিনটি কবিতা

বন্যপ্রাণী

তোমরা মানুষ নও—বন্যপ্রাণী পশুর অধম
কাঠুয়া উন্নাও কাণ্ড লোকালয়ে চলে না এসব
নির্লজ্জ অরণ্যচারী সভ্যতার শক্তি নয় কম
একুশ শতকে হবে সিংহনাদে মারণ উৎসব।।

প্রতারক

তোমরা মানুষ নও—অর্থলোভী ধূর্ত প্রতারক
অথচ আগুন চোখে বড় গলা চোরের মায়ের
শোষিত বঞ্চিত হাত ছিনিয়ে নেবেই তার হক
তখন থাকবে কিনা গেঞ্জিখানা জানিনা গায়ের।

প্রাণঘাতী

তোমরা মানুষ নও—প্রাণঘাতী ক্ষুদ্রকায় দল
কিউবা ইরাক ছেড়ে সিরিয়ার গায়ে দাও হাত
আবিশ্ব ধিক্কার হানে প্রতিরোধে সেদেশ সবল
বাঁচাবে স্বদেশভূমি হাতি ঘোড়া হবে কুপোকাত।

বই পাঠকের মনে

গৌতম সাহা

দুর্গা-অপু ছুটছে কাশের বনে।
রেলগাড়িটা দেখবে বলে
সব আনন্দ মনে।।

দোল দিয়ে যায় বোল ফুটিয়ে,
চল এগিয়ে চল,
পড়ুক পায়ে খন্দ-খানা,
ঢোল পুকুরের জল।
অচিন জিনিস দেখতে পাবি,
মিলবে খুশির ঘরের চাবি,
চিনলে এবার আবার যাবি
শঙ্কাবিহীন মনে—
শরৎ এলে দুর্গা-অপু
রোজ ছুটে যায় বনে।।

দুর্গা ঘরে ভুগছে জ্বরে,
উঠছে রোজই বেঁচে,
আম সে কুড়োয় বৃষ্টি ভিজে
ঝড়ের সঙ্গে নেচে।
অপুর বয়স আর বাড়েনি,
কাউকে মহাকাল কাড়েনি,
সঙ্গ ওদের কেউ ছাড়েনি
জাগায় সঙ্গোপনে—
ভাই-বোন দুই ঘুমিয়ে থাকে
সব পাঠকের মনে।

অনন্য

পরেশ কর্মকার

আমরা তো মানুষ
আমাদের পাশে কিছু
মুখোশধারী অ-মানুষ
ঘুর ঘুর করে চারপাশে, সব সময়,
সংকটহীন জীবনে আনে সংকট
বিভেদের বীজ বোনে অন্তরে
জীবনকে করে তোলে বিষময়।

সেই সংকট কাটাতে হবে
আমাদের বিবেক, বুদ্ধি, আর ভালোবাসায়।

এ-জীবন একবারই আসে
আসে না বারবার,
আসে না কিছু রেখে যাওয়ার জন্য
যে—ভালোবাসার জগতে
হয়ে ওঠে অনন্য...
হয়ে ওঠে হৃদয়ের উষ্ণপরশে।।

চরণে চরণে ক্ষতচিহ্ন

শ্যামলবরণ সাহা

১.
হঠাৎ পায়ে কী যে হোল পা জ্বলে যায় কিসে?
জব্দ হয়ে শয্যা নিলাম নাম না জানা বিষে।

২.
রথ চলে না পা চলে না রাতারাতি ঠুঁটো।
পাহাড় ভাঙার স্বপ্ন দেখে আমার পা দুটো।

৩.
ঘুমের ভিতর পা টানে রোজ নষ্ট খালের কুমীর,
চোখ মুছে দেয় আদর করে সাতটি তারার তিমির!...

৪.
দুধে আছি ভাতে আছি কলতলাতে আঁচায়,
পায়ের কষ্টে দিব্যি আছি অচিন পাখির খাঁচায়!

৫.
মৃত্যু এসে পা ধরে রোজ পায়ে মহাচোট—
পায়ে পায়ে জড়িয়ে গেছে সাঁইত্রিশ কালনা রোড।

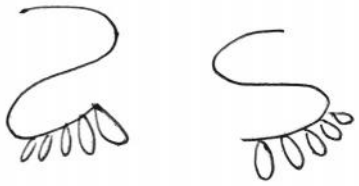

লং ড্রাইভ

বিপ্লব গঙ্গোপাধ্যায়

দু-পাশের গল্প সরিয়ে মাঝে সরু রাস্তা
স্টিয়ারিং হাতের বশ্যতায়
সরলরেখার নীচে থরে থরে সাজানো গরমিল
পেরিয়ে যাচ্ছে মিথ্যা তিমিরবর্ণ কিছু অনুভূতি

চশমায় জ্যোৎস্নার তিল
জমাটবদ্ধ এই জার্নির চারপাশে ফ্রেমলগ্ন
গাছপালা আর নিজস্ব মুদ্রাদোষ

এভাবেই গতির পাশে
হাওয়ার অম্লান দ্বীপ
সামনের সমস্ত রাস্তা চলে গেছে অনিশ্চয় দেশে

দূরত্ব কুড়িয়ে পথ সেলাই করছে পা।

জয়আমি ও তারানাথ

পঙ্কজ পাঠক

অনির্বাণ, আকাশ ও অনি তিনটি নাম—তবে একজনেরই
মনে হয় চোখের তারা দুটো
এখুনি নদী হয়ে গড়িয়ে পড়বে
জ্যাঠামশাই আবার নাম দিয়েছেন বাচস্পতি
তিনি ঠাকুরদার জীর্ণ চতুষ্পাঠীতে বসে এসরাজ বাজান
এইখানে বসেই ঠাকুরদা তাঁকে শুনিয়েছিলেন তারানাথের কথা

একসময় তারানাথের নাম যখন দেশব্যাপী ছড়িয়েছিল
তখন বিদ্যাসাগরের নামও মুখে মুখে ফিরত
ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে তারানাথের যোগদানের জন্য
তিনি পায়ে হেঁটে কলকাতা থেকে কালনায় গিয়েছিলেন
তখন গঙ্গার পাড় ধরে সন্ন্যাসীরা জগন্নাথ দর্শনে যেত
ভোরের আকাশ থেকে গন্ধ ছড়িয়ে পড়ত পথে প্রান্তরে
তারানাথকে বাবা কালিদাস সার্বভৌম বলেছিলেন—
দেখ, নিমচাঁদ শিরোমণির তুই ছাত্র
শিক্ষকের মুখ উজ্জ্বল করিস
তিনি তর্কবাচস্পতি উপাধির মান রেখেছিলেন
তর্কযুদ্ধে তাঁকে কেউ হারাতে পারেনি
কেনই বা পারবে। যতই হোক রামরাম তর্কসিদ্ধান্তের নাতি
বর্ধমানের মহারাজা তিলকচন্দ্ এমনি এমনি কি আর
রামরামের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন
মেয়ে জ্ঞানদাকে যেদিন তারানাথ স্কুলে ভর্তি করলেন
সেদিন বেথুন সাহেবের চোখ চিকচিক করে উঠেছিল
টিকিধারী পণ্ডিতের এ-হেন আধুনিক মানসিকতা,
তাও আবার ভারতবর্ষে
তাঁর বিস্ময়ের শেষ ছিল না

অনি ঘাসের দিকে তাকিয়ে থাকে আনমনে
বাবা শুনতে পান কে যেন অনিকে ডাকছে বাচস্পতি বলে
তিনি জানেন টোল-চতুষ্পাঠীর দিন শেষ
বাগানের গাছগুলো বড় হলে একদিন পাখি আসবে
তাদের কলতান শেষ হলে
ক্লোরোফিলেরা ধ্যানের গভীরে প্রবেশ করবে
অনির বিদেশে পাড়ি দেওয়ার বিমান
ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাবে শরতের মেঘ

জয় চেয়েছিনু আমি—

দেবেশ ঠাকুর

ধৃতরাষ্ট্রের হাত ধরে আজ গান্ধারী
যুদ্ধ শেষের কুরুক্ষেত্রে দেখতে যাচ্ছে আবাদ হল কেমন
ওই ওখানে ঘর পুড়ছে, ছড়িয়ে যাচ্ছে আত্মজনের কাটামুণ্ড
অনেকগুলো রক্তনদী পার হয়ে তো একটি ঘটি জয় পাওয়া যায়
কুরুক্ষেত্রের আশেপাশে গ্রাম পুড়ছে,
বজ্রবাণে অগ্নিবাণে দহনক্ষত দু-একটা গাছ দাঁড়িয়ে আছে
প্রেতের মতো। লাউ-কুমড়োর মতো মাঠে গড়িয়ে যায় হাজার মাথা
কানে দেখছেন ধৃতরাষ্ট্র। কানে দেখছেন গান্ধারী আজ
জয়-পরাজয় আপ্তবাক্য
বসত ভেঙে ভাগাড় বাড়ে

বৃষ্টি নেই মেঘও উধাও আকাশ আজ স্তব্ধ ছাই
পায়ে কেন কাদা লাগছে! রক্ত-ধুলোয় কাদা মাটি
এ রক্ত কি কৌরবের? পাণ্ডবের? কোশল-বৃজি-গান্ধারের?
জয়ের যদি ভাগ করা যায় রক্ত কেন ভাগ হবে না?

নিবৃত করেনি মাগো, ভিজে মাটি সাপের বসত
চোখের পটি খুলে দেখতে পাবে শত শত বিধবার থান
তুমি যাকে জয়মাল্য মনে করো হিরে চুনি পান্না
আসলে ওটা রক্ত, পাঁক। হিরে নয়, কান্না

নিত্যবৃত্ত

কণিষ্ক আচার্য

প্রতিদিনই একই কাজ করে চলে রবি
ভোরাই-এর সাথে লাল টিপ এঁকে দেওয়া
গগনের তালে—
গোধূলিতে দিনান্ত ঘোষণা।

নিত্যদিন একই কাজ করে চলে অলি
ওষ্ঠ দিয়ে ফুলকলি ছোঁওয়া—
গুন-গুন গুঞ্জনে উদাসী বাউল
যথারীতি কাড়ে মন—
খেয়ামাঝি খেয়াপারাপার করে—
হয়না, হয়না অন্যমনা।

পরের অহিত যার ব্রত—তার
ভালো কাজে আত্মনিয়োজন
নৈব নৈব চ!!
প্রতিদিন যত্নবান ছিদ্র অন্বেষণে

কেরালা বন্যাতে বিধ্বস্ত হয়েও

অজয়রঞ্জন বিশ্বাস

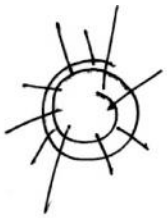

কেরালার ত্রিশূর জেলাতে কোচুকাড়াভুর মসজিদ-চত্বর অথৈ প্লাবনে ধ্বস্ত
মুসলিম-ভাইরা সমাগত ঈদের নামাজ পড়বেন কোথায়?
এই দুশ্চিন্তাতে তাঁদের মন-প্রাণ-দিল অবিন্যস্ত—
এগিয়ে এলেন ত্রিশূরের হিন্দু জনপদবাসীরা এবং দ্রুত হলেন তৎপর,
খুলে দিলেন পুরাপ্পুল্লিক্কাভু রত্নেশ্বরী-মন্দির চত্বর :
সেখানেই নিশ্চিন্ত নামাজীরা উদাত্ত কণ্ঠে উচ্চারণ করলেন : আল্লাহু আকবর
কোয়াম্বাতুরের এক অঞ্চলে বন্যাপ্লাবিত দুইটি মন্দিরের অভ্যন্তরের আনাচ-কানাচ
সাফাই করছেন ধুয়ে মুছে পরিচ্ছন্ন পবিত্র করছেন
পাড়ারই মুসলমান ভাইরা এবং নির্দ্বিধায় গণপতিদেবের আসন ধরছেন
ভারি পাথরের শিবলিঙ্গ মাথায় তুলে স্থানান্তরণে সহায়তা করছেন—
এই সবে অনাহতই থাকলো নির্বিকল্প খোদা-আল্লাহর বিমূর্ততার ধাঁচ
এবং একটুও বিনষ্ট হয়নি কোনো নৈবেদ্যের বাতাসা-ঘৃতাঞ্জলি-এলাচ!

এই ঈদের পরবে-পর্বান্তরে মুসলমান জননী-ভগ্নিদের হাতে-নখে-গালে
মেহেন্দির বিচিত্র ছবি এঁকে দিচ্ছেন খ্রিস্টান গির্জার সন্ন্যাসিনীরা সায়াহ্নে-সকালে
বন্যাপ্লাবিত কোতুনগাল্লুরের ত্রাণশিবিরে এসে
সঙ্গে দিচ্ছেন বুকভরা শুভাকাঙ্ক্ষা আর ব্লেসিংস অক্লেশে
সন্ত্রাস-হিংস্রতা-ঘৃণার স্থিতি নেই বন্যা-ধ্বস্ত কেরালার দিকচক্রবালে—
কৃষ্ণমন্দিরের সন্নিকটে তাই রমরমিয়ে জ্ঞানবাগী-মসজিদ বহুকাল ধরে এবং একালে!!!

প্রীতি ও সম্প্রীতি এই ভারতের ধমনীতে অনন্তকাল প্রবাহিত স্পন্দিত
কেরালার আত্মার ছন্দ বন্যাতে-বিপর্যয়েও বাজবে অপরূপ লহরীতে আনন্দিত।

কাণ্ডারী

অরুণ মজুমদার

সমুদ্র উত্তাল ভারী
নাবিকের দক্ষ কঠিন হাতে
এবার ধরুক হাল

উত্তাল ঢেউ ভেঙে ভেঙে
সুনামির দাপট এড়িয়ে
বেনামি বন্দরে ভিড়ুক সাম্পান

সাম্পানওয়ালার সঠিক নিশানা
বন্দরের কাল এনে দেবে

কবিতাই যদি হোত

সত্যনারায়ণ মাজিলা

কবিতাই যদি হোত কারো দেয়া চিঠি
সংশয় হাতে অকুণ্ঠ প্রেম-নদী
বয়ে যেতে যেতে প্লাবিত বন্যা যদি
না ডোবাতো শস্যভূমি—
হোত না কোনো ক্ষতি।

কবিতাই যদি হোত কিংখাবে মখ্‌মল
হোত না হত্যার কথা মজলিসে
তাজমহলের মমতাজ এসে
খুলে দিয়ে যেত—
শাহজাহানের শৃঙ্খল।

কবিতাই যদি হোত সহস্র ব্যথা
হিমালয় থেকে কন্যাকুমারিকা
তার অশ্রুতে বয়ে যেত সাগরিকা
ধরা দিত রাজকন্যা—
জীবন তো নয় আরব্য-রজনী কথা।

ভুল করে শ্রাবণ ভেবে

তপন দাস

চাষাভুষো পৃথিবীর কেউ নও তুমি
হৃদয় কখনো ঘামে ভেজাওনি তাই
আউশ-আমনের মাঠে নামোনি কখনো
মাখোনি বিপন্ন ধুলো বা বিষণ্ণ কাদা

আমাদের সম্পর্কের ভিতর চলে গেছে
ভূমিকম্পের দীর্ঘ ফাটল—তবুও
সভ্যতার ইঙ্গিতে লাঙল টানি একটানা
রক্তের ধানগাছ যাতে সূর্য ছুঁতে পারে
মিটিয়েছি তিনপুরুষের দেনা

শঙ্খচিলের মতো শোকাতুর আমিও
পুরোনো মাঠে মন ফিরে যেতে চায়
সময়ের শস্যবীজ জড়ো করি আবার
ছোঁড়া-ফাটা মেঘও জুড়ি, নতুন ফলনের আশায়

আমিও ভুল করে শ্রাবণ ভেবেছিলাম তোমাকে
চৈত্রের কোনও এক নির্জন মেঘলা দুপুরে!

খড়ি নদী

প্রকাশ দাস

খড়ি নদীর জলে
ভেসে আছে এলোমেলো চাঁদ।
রাতচরা পাখিগুলি
উড়ে যায় জ্যোৎস্নার আকাশে।
রাতের আকাশ থেকে দু-একটি শিস্
এসে ছুঁয়ে যায় নদীর জল।

খড়ি নদীর জলে ভেসে যায়
এলোমেলো মানব সংসার।
কখনো ভাঙে পাড়,
ভাঙে মাঠ-গ্রাম-জনপথ।
স্নান শেষে নদীর থেকে উঠে এসে
ভোরের সূর্যকে প্রণাম করে
প্রান্তরের দিকে হেঁটে যায়
আনমনা একটি মানুষ।

এক ভারতীয় নারী: চিরকালের পথশিশু

অরবিন্দ সরকার

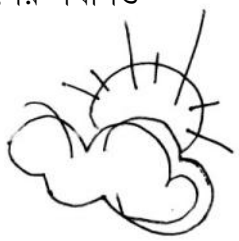

মেঘ রোদ্দুর খেলায় কে ঘুমোয়?
বিশ্বসিংহ রোডে
কেন্দ্রীয় শুল্ক আবাসনের
ঘাসের ফুটপাতে বিনা শুল্কে
যাবতীয় সম্পত্তি আগলায় এক ভারতীয় নারী
ভীরুতায় নয়, দর্পে শাসন করে পৃথিবী
স্নেহের কলস উপুড় করতে কৃপণতা নয়
আকাশ ছাদের নীচে দিন গুজরান
আর ভৈরবী রাগে বাঁশিতে ফুঁ দেওয়া
ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স নেই ইনটারনেট-এ
কিংবা ডটকম্-এ একেবারে কারো সঙ্গে
নয় তথ্য আলাপ
কেউ পাগলি বলে মজা পায়
কেউ দিনভর খ্যাপায় শুধু
কিন্তু ওই নারী নিজস্ব ভঙ্গিতে
যাবতীয় তছনছ করে
ভ্রুকুটিতে সভ্যতাকে চাবকায়
গহন গম্ভীরে লাবণ্য ছড়ায়
মমতায় মেলে ধরে মাতৃত্ব
অনাদরে থেকেও
আদর নদীর ঢেউয়ে
কুচক্র অন্ধকারে মশাল জ্বালায়
নিথর অরব থেকেও
শিশুর মতো সরব পাখায় উড়ে চলে...
ভেসে বেড়ায়।

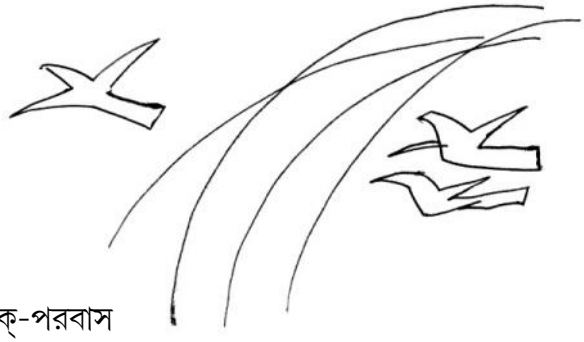

প্রাক্-পরবাস

পরেশ কর্মকার

বাতাসে ঘ্রাণ নয় শ্বাস নিতে চায় ডুবো জাহাজের মানুষ
যাত্রী, ক্রুজার, ক্যাপ্টেন আটকে গেছেন সমুদ্র জলের মাঝে
একটি একটি করে সব গৌরবান্বিত প্রশংসার দলগুলি
আকণ্ঠ জলপান করে বীরত্বের পরিচয়ে সলিল শহিদ হবে
মৃদু উচ্চারণে ঢেকে যাবে রঙিন জলের ফানুস স্বপ্নেরা
ইতিউতি চাউনি আর হয়তো থাকবে না পথে প্রান্তরে
এখন বাতাস নয় জলকে বিশ্বাস করে ক্ষমতা সমর্পণ
হোক তবে পরবাস জলভরা হৃদয় সমুদ্র করুক ধারণ।

দিনলিপির পৃষ্ঠা থেকে

পান্নালাল মল্লিক

ডাইনি অপবাদ দিয়ে যার মাকে পোড়ানো হল সদরে—
শোকাতুরা তার মেয়ে
সেও একদিন নবজাতকের মুখ দেখবে ঘটা করে
একবুক কান্না ঠেলে।

সমাজের মঙ্গল কামনায় যে বধূ স্বামীর মৃত্যুর সাথে সাথে
সহমরণের পথে পা বাড়াল, চিতার আগুনে
আত্মাহুতির পর দেশ থেকে আঁধার
সরল না একটুও।
আদালতে বাদী-বিবাদীর কড়চা এখনও বেশ উপভোগ্য,
কিন্তু কোথাও কারও কপালে ভাবনার মেঘ জমল না কখনও।

নিখোঁজ মেয়েটির বাপ হাঁটুতে মাথা গুঁজে
থাকতে থাকতে যেদিন
বন্ধকি গয়না ফেরত পাওয়ার মতো
শহর থেকে উদ্ধার হওয়া মেয়েটিকে
ঘরে নিতে পারল না—
সেদিন দেশের কোন ফতোয়া মানুষকে বধির করেছিল!
মানুষের সেই দিনলিপি...
সময়ের স্রোতে আজ মুছেও মোছেনি।

এসো জীবনের গান গাই

বিকাশ বিশ্বাস

অসহিষ্ণুতার কালো মেঘ
আকাশ জুড়ে পুঞ্জীভূত
ঢেকে দিতে চায়
আমার ভালোলাগা
রামধনু রঙ।
প্রতিনিয়ত লাঞ্ছিত, আহত
মানুষের বিশ্বাস, ভালোবাসা।
এসো সূর্যের মতো নত হয়ে
চেতনালোকে দূর করি
মধ্যযুগীয় মননের গাঢ় অন্ধকার।
সৃজনধারায় প্লাবিত হোক
কূপমণ্ডুকতা অন্ধবিশ্বাস
কালবুর্গী, গৌরী লঙ্কেশের সুরে
এসো জীবনের গান গাই।
শাণিত যুক্তির প্রভায়
উদ্ভাসিত হোক
আমাদের যাপন অভিমুখ।
রক্তের দাগ মুছে বলো চরৈবেতি
বুকে টেনে নিই পরম মমতায়
নিপীড়িত মানবসন্তান।

নো পাশারন

যযাতি দেবল

ক্রমশ কুয়াশাজাল ছিঁড়ে এলে স্পষ্ট হয় বিভা
জনপদ ছেড়ে যায় ধূর্ত শিবাদল,
ইতস্তত লেগে থাকে নখরের দাগ;
প্রাণের পুতুলি কাঁদে; কোথাও অনুজা।

অধ্যাদেশে আষ্টেপৃষ্ঠে ক্রুশে বেঁধা প্রজ্ঞাভূমি দেশ
নগর সংকীর্তন ছেড়ে ক্লান্ত বড়ো মোমজ্বলা হাত
কখন খেলাত পাবে আগে ভাগে সেই স্বপ্নে
সে তোলে ঢেকুর!
রঙ্গভরা বঙ্গভূমি—আহা বেশ বেশ।

এদিকে ফুঁসছে গ্রাম ভেসে যাচ্ছে শহর নগর
তুচ্ছ ওই লাঠি গ্যাস তুচ্ছ করে জল-কামান
জনস্রোতে উদ্বেলিত আন্দোলিত প্রাণের নিশান
পালাবার পথ নেই জেনে রেখো শাসকের চর।

আশ্চর্য বাগান

রসুল করিম

একটা বাগান। আশ্চর্য এক বাগান। যে বাগানের কোনো বাউন্ডারি নেই। নেই কোনো অন্ধকার। খণ্ড বা প্রকাণ্ড পাথর ছাড়া সবার অবারিত দ্বার। তবে প্রবেশ করাটাও বড়ো কষ্টকর। একবার প্রবেশ করতে পারলে মনে হবে লন্ডনের বাকিংহাম প্যালেস কিংবা চেন্নাইয়ের মেরিনা বিচে বসে আছি। অসুবিধা একটাই, অবিরাম উড়ে পড়ছে ধুলো। ধুলোর আস্তরণে মজাও আছে অনেক। বিশেষ করে বাচ্চারা যারা ধুলোর সাথে লেপ্টে থাকে সারাদিন। ঝরাপাতা, লোনাজল, ঝরে পড়া চুন, সুড়কি— এদেরই অগ্রাধিকার সবার আগে।

সমস্ত বাগানজুড়ে হরেক কিসিমের গাছ। ফলের গাছেরই সংখ্যাধিক্য তার মধ্যে আপেল। যেন আপেল সাম্রাজ্য। ধুলোরা এই আপেল খেতে পারে জানতাম না।

বাগানের বামদিকে ফুলের গাছ। কত যে ফুল ফুটে আছে তার ইয়ত্তা নেই। সেসব ফুল দেখিনি কোনোদিন।

যাঁরা এই বাগানের নির্মাতা তাঁরা কেউ বেঁচে নেই এখন। বিজ্ঞানী আইনস্টাইন বেঁচে নেই। অথচ তাঁকে এই বাগানের কথা বলতে শুনেছি বার বার। তার জন্যে তাঁকে দেশান্তরী হতে হয়েছিল।

আমি শুধু স্বপ্নে দেখেছি এমন বাগান। পোড়া দেশে স্বপ্ন চিরকাল স্বপ্নই। ফোঁটা ফোঁটা দুঃখ জড়ো করে তাই রাত জেগে বসে আছি, আশ্চর্য এক বাগানের জন্যে।

স্বভাবত তাই

কঙ্কণ সরকার

যত দূরে যাই মনের মধ্যে তুমি দেদীপ্যমান
যত কাছে মেলামেশা অন্তরঙ্গ সরে যায় ব্যবধান
তবুও অদৃশ্য দেওয়াল রয়েছে কেন?
মনের গভীরে প্রবেশের অধিকার পায়নি এখনও...
সেখানে উলঙ্গ দেবতা উন্মত্ত নিকষ কালো যত নৃত্যেরত

এই দেশ এই বিশ্ব এই সময় এই যে মানুষ কত
জ্ঞানী ধনী মূর্খ কিংবা নিঃস্ব যেমনই হোক
আমাকে কেউ ভেতরে ডাকেনি...
তাই, আমি বাইরের লোক, স্বভাবত!

ভূগর্ভের অন্ধকারে অনাবিষ্কৃত কত না খনিজ, মন
সেখানে আমার প্রবেশের অধিকার নেই।
তাই, কাছে দূরে ছড়ানো ছিটানো অগোছালো,
আমার এই স্বল্প সংক্ষিপ্ত জীবনের সঞ্চিত ধন

আদিবাসী মেয়েদের নাচ

বাসুদেব মণ্ডল চট্টোপাধ্যায়

কী বর্ষা তখন ছিল, এখন তা নেই—
এই কথা কবিতায় বলেছি অনেক,
হয়তো আবারও বলব, বলতে হবেই
মৃত্তিকা যদি না পায় সুবৃষ্টির সেঁক।

আমাদের গ্রাম-লাগা, বেশ কাছাকাছি
পাঁচ ছটি তকতকে আদিবাসী গ্রাম,
ছোটোবন, গাছপালা, ফুলে মৌমাছি
নিজস্ব ডহরে আসে সন্ঝা বিহান।

ধানতোলা হয়ে গেলে আদিবাসী গ্রামে
বাঁদনা পরব, ভাসে খুশির আতর
নিকোনো দেওয়ালে রাঙা আলপনা জানে
কীভাবে বাঁচাতে হয় টোটেমের স্বর।

সেরকম বর্ষা নেই, কে মেশাল খাদ?—
বাঁদনায় নির্ভেজাল ধামসা মাদল,
আর বাজে আড়বাঁশি। এখনও নিখাদ
আদিবাসী মেয়েদের নাচের আদল।।

দায়বদ্ধ

সোমনাথ বেনিয়া

ঘুমের ভিতর ঢেউয়ের তোলপাড়
রক্তের ভিতর অন্ধকার গলি—
পেরিয়ে যাওয়ার ব্যর্থ চেষ্টা...
কুকুরের লেজের মতো গুটিয়ে শব্দের প্রকরণ
শিকড়ে-শিকড়ে ধাক্কা লাগছে না বলে—
পাতাদের গভীর শোকপ্রস্তাব—
নিজের ভ্রম বনাম প্রেতদল, এটুকুই ভরসা!
কার কাছে দায়বদ্ধ থাকবে বলে—
প্রতিবার ডায়েরির প্রথম পাতা ফাঁকা থাকছে
সে-কী মৃত্যু?
এও তো হতে পারে—
সঙ্গমের সময় নিঃশ্বাসে শঙ্খলা গলে
দাবাখেলার জন্য—
ঈশ্বরের সামনে তার ছায়াপুরুষ বসে...

আমি গ্রহণ করেছি তাকে

তপনজ্যোতি চৌধুরী

দিশাহীন স্বামীর মন পেতে—
অনেকটা সময় চলে গেল সে অভাগিনীর!
মন-কাননের সদ্য-প্রস্ফুটিত পুষ্প-সম্ভারে,
দেবারতির অন্ত ছিল না সে হৃদ-মাঝারে।
তবু অনেকটা সুন্দর সময় হারিয়ে গেল তার জীবন থেকে!

দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসানে, হঠাৎ এক প্রভাতে—
আরক্তিম-সূর্যের স্বর্গীয়-মাধুরী অঙ্গে মেখে,
কঙ্কণ-নূপুরের রিমিঝিমি আওয়াজে, শরীরী-তরঙ্গে ভেসে,
অনাবিল তৃপ্তির আবেশে, ওষ্ঠের মৃদু কম্পনে, হেসে বলে—
'সে আমাকে গ্রহণ করেছে'!

লজ্জা, ভীষণ লজ্জা, নারীজাতির লজ্জা!
আপন সম্পদে শ্রদ্ধা করে না যে নারী,
শতধিক্ তাকে!

তুমি মহীয়সী নারী, এ পৃথিবীর সৃষ্টির আধার,
তোমাকে দয়া করে গ্রহণ করবে, এ সাধ্য কার!

তুমি বীরাঙ্গনা—
হীনমন্যতা ঝেড়ে ফেলে, প্রমীলা ঢঙে,
সদর্পে শুধু একবার বল—
সে নয়, আমি গ্রহণ করেছি তাকে।
যেদিন, শৌর্যে-বীর্যে আমার উপযুক্ত মনে হয়েছে,
সেদিন, আমি গ্রহণ করেছি তাকে।

কিছু হাত

অরূপ আচার্য

কিছু হাত ভেঙে দেয় সংস্কার
নির্মল বৃষ্টিপাত আনে।
কিছু হাত ভেঙে দেয় ভুল কাজ
হীনমন্য বাতিঘর

কিছু মুখ ম্রিয়মান অলস দুপুরে
ঢিলেঢালা স্রোতে ভাসমান
কিছু সুখ নদীঘাট ছুঁতে পারেনি
বিহ্বল চেয়ে থাকে ব্যর্থতার তিনশো গল্পের দিকে

কিছু হাত বসন্তকাল আনে, মাধুর্যের হাতছানি
উত্তপ্ত চরাচরে শীতল হাওয়া।
কারো মুখ পরাজয়ে কালো
কারো হাতে আলোর জানালা খুলে যায়।

কুহক

দিশা চট্টোপাধ্যায়

কারোর বিরুদ্ধে কিছু বলার নেই
সবাই ভালোমানুষ...
কসাইও তার সন্তানের কাছে পিতা।

ধনীরা রেস্তোরাঁয় বসে
কাবাব আর বিদেশি মদের ফোয়ারা ছোটাচ্ছে—
এখানেও আমার কিছু বলার নেই।

আমি যদি কুহকের সঙ্গ চাই
আমার চালচিত্রে সারাদিন রোদ এসে বসে,
খেয়ে যায় কৃষ্ণচূড়া ফুল...

আনি নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে দেখি—
আমার গল্পের তীক্ষ্ণতা কমে আসছে।

চারধারে ধুলোমাটি জমেছে...
তাতে বসে আছে কাক, কুয়াশার চাঁদও ওঠে।

সামনে কয়েক ধাপ সিঁড়ি—
হয় উঠে যাব, নয় নেমে জেব্রাক্রসিং দিয়ে
দিগন্তেও চলে যেতে পারি

এর কোনোটাই আজ আমার হাতে নেই।

কুর্নিশ

মনামি ঘোষ

দাঙ্গাবাজ যতই ঘোরাও লাঠি
যতই তুমি অস্ত্রেতে দাও শান
কাঁধে কাঁধে পা মিলিয়ে হাঁটি
গলা ছেড়ে গাই লালনের গান

ভাবছো শুধুই ছড়িয়ে দেবে ঘৃণা
আগুন জ্বেলে ছড়াবে বিদ্বেষ
মুখোশ দেখে ভয়তো করি না
সব সুরেতেই ভালোবাসার রেশ

ধর্মে খোঁজ পৈতে দাড়ি হিজাব
অবিশ্বাসী ধূসর চারিধার
জ্ঞান কি পোড়ে যতই পোড়াও কিতাব
কৃত্রিমতায় প্রবঞ্চিত আঁধার

বাবরি ভাঙো বুদ্ধ বামিয়ান
রক্তঝরাও আগুন পোড়া ছাই
এক সুরেতেই শঙ্খ ঘণ্টা আজান
গফুর সেলিম একশো কোটির ভাই

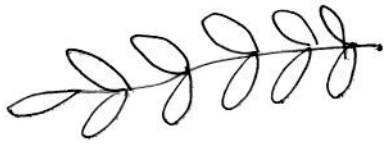

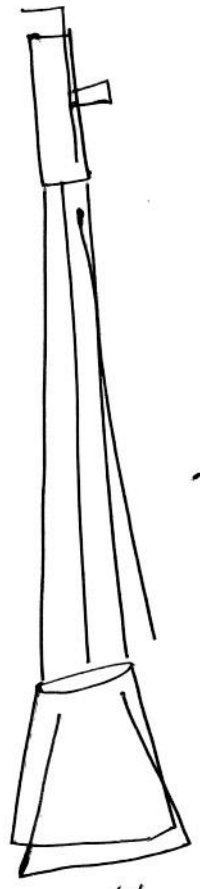

হিম জ্যোৎস্নায় একা

পরেশ ঘোষ

দোলাচলে কেটে গেল একটা জীবন
তবু ছুঁয়ে আছি অফুরান ভালোবাসা
অগণিত মানুষের পাশে থেকে আজও
বৃষ্টিজলে কাগজের নৌকোর মতো ভাসা।

কে কবে কোথায় হাত নেড়ে ডেকে গেছে
সাজিয়ে রেখেছে গুল্ম পাতাবাহার
সংলাপ সদালাপে সাড়া দেয় না মন
গোপনে কে জমিয়েছে ব্যথার পাহাড়।

এখনও হাজার তারার ভিড়ে ধ্রুবতারা জ্বলে
ডানা মেলে উড়ে যায় অজানা পাখি
হিম জ্যোৎস্নায় কপালে চিন্তার ভাঁজ
খাদের কিনারে দাঁড়িয়ে কোথায় পা রাখি!

কুপ্রস্তাব

কালিদাস ভদ্র

অবশেষে কুপ্রস্তাব নিয়ে
ত্রিশূল আজ অস্থান কুস্থানে ঘোরে
ত্রিফলা বেয়ে ওই নেমেছে আশঙ্কাস্রাব

ত্রিশূল অসুরবধ শিল্প বলে
মানুষের কৌতূহল উৎসাহ

কে কাকে ন্যাপকিন পরাবে এখন...

অধুনা

নিলয় মিত্র

অধুনা পাথরের মতো ভারি হাওয়ার শরীর
ভয়ার্ত বুক, পাতা খসার শব্দেও চমকে ওঠে,
অরণ্যে পাহাড়ে খেতে কলকারখানায় জনপদে
মুখরেখায় হাড়ে মাসে বিবর্ণ ছবি,
ঘরের নির্জনতাতেও জল্লাদের গায়ের বুনো গন্ধ,
অসহায় গতিহীন বৃত্তে বসে আছে গ্রাম শহর নগর,
নিস্বর নদী। অস্থির পাখিদের বুক।

সংখ্যার বদলেই বস্তুর পরিবর্তন, গৃহদাহর তাণ্ডব,
চোখের মণিতে আলোর অভাব
হৃদয়ের যাবতীয় নীলিমা ধূসর পাংশুল,
বদলে যাচ্ছে শরীর রেখা, মুখের ভাষা
বদল নীতি পেটিকার, প্রগতিবিরোধী ক্লিন্ন হিংসায়
তছনছ সমাজ হাড়মাস, ক্রুশবিদ্ধ গণতন্ত্র,
তাচ্ছিল্য আর ঔদ্ধত্যের অনায়াস বিচরণ সমাজভূমিতে,
সন্ত্রাস পাহারা দেয় আলো বাতাস শস্য, জীবনের গান।
দোল খাচ্ছে বিনাশ। পরিচিত অনেক মুখের ছবিতে
ক্ষয়ের প্রতিভাস, পুড়ছে বোধের তন্তু।

এত নষ্ট শব্দেও বেগবান মানবিক শস্যদানা
শিকারী জল্লাদের মুখে ঘৃণা ছুঁড়ে
ঋজু দাঁড়িয়ে আছে লড়াই ময়দানে।
মানুষের বুক থেকে যতবার পবিত্র নিঃশ্বাস
কেড়ে নিয়েছে শুঁড়িখানার নরক,
ফুসফুস ফুলিয়ে বাতাস বুকে নিয়ে মানুষ
মানুষেরা প্রতিরোধের ব্যারিকেড গড়ে
চক্রীমুখের সকল হাসিকে দু-পায়ে গুঁড়িয়ে
বাঙ্ময় হয়ে ওঠে নতুন ইতিহাসে,
রৌদ্র সড়ক স্পষ্ট হয়ে ওঠে রক্তের চুক্তিতে।

মাটি গাছ করে দিলো

অমিত বাগল

কত কিছুই তো হয়, হতে পারে
এই ধরো, যারা যারা চলে গেস্‌লো
রাগ করে
ঘাড় ধরে নিয়ে যাওয়াও কি যাওয়া!
অথবা নানাবিধ অথবার পালে
বাতাস না কুবাতাস লেগে গেস্‌লো
তাই, তাই...
জঙ্গলে দাবানল জ্বলছে
দেখে দেখে

ঘরে ও বাইরে
প্রকাশ্য রাস্তায়
অমলের অপলক চিঠি-বাবু
আসতো যে মেঠোপথ ধরে...
দাবানল দেখে
তাপে
ভাপে
গায়ে ফোস্কা নিয়ে
সুতীক্ষ্ণ অপমান মাথায় নিয়ে নিয়ে
ফিরে এলো ঘরে
তারা কি ঘরের ছেলে হয়! না হয় না!

বেড়াল-বেড়ালীও তার শাবককে চেনে ঠিক
এক-পা
দু-পা
করে ঠিক ফিরে আসে, বহুদিন আগে চেনা দুয়ারে
দুয়ারটি থেকে ঘুরে
পাখিরা তো 'চিত্রগ্রীব', চেনে...
মৎস্য-বিশেষজ্ঞ জানেন
দারা-পুত্র-পরিবার মাছেরা কি চেনে! আমি তা জানিনে
শুধু জানি,
একদিন একখানা জবাডাল পুঁতেছিলাম
মাটি ওকে গাছ করে দিলো
লালে লাল গাছটিও—

কবিতার পেন, খাতা ভরে
যা না তাও লেখা যায়—যারা পারে, তারা পারে,
আমি তা পারিনে

মানচিত্র

ঝর্না মুখোপাধ্যায়

মানচিত্রে থাকে না কোনো সুখের খবর
সারা গায়ে আঁকাবাঁকা চাবুকের দাগ
ভাঙা ঘরের স্বপ্ন মুছে—
সরলাদি ভোর ভোর উঠোন ঝাঁটায়
খামারে ধান তোলে আব্দুল চাচা
নবান্নের সন্ধ্যা ঘিরে উঠোন মজলিসে
হাফিজ ভাইয়ের গলায় লালনের গান।
পূর্ণিমা, ফতেমাদি, ঘরের দাওয়ায় বসে
ঘোর লাগা জীবনের কবিতা সাজায়।

মানচিত্রের ফুটোগুলো ভরাট করবে বলে
রিপু করে যাচ্ছিল গৌরী লঙ্কেশ।
মহাঘোরে আক্রান্ত ঝুরো বিপ্লব—
থামিয়ে দিল তাকে ঝাঁঝরা শরীর!
নিবিড় নৈঃশব্দে একে একে দাঁড়াল
দুঃখ-বোধ-যন্ত্রণা।
দিনরাত একসাথে ঝুরি নামিয়ে চলে—
নগর আলোর দিকে।

তার সাথে এক কোয়া মেঘ, আস্তে আস্তে
বিরোধী হাওয়ায় রূপ বদলে এল—
আমাদের সাথে।

চলো

নাসের হোসেন

ওই যে দূর থেকে দেখা যাচ্ছে ধোঁয়া
বোরোচ্ছে অল্প-অল্প করে
চলো ওখানেই যাই, অনেক ক্ষণ কোনো
বিশ্রামের কিছু ঘটেনি।
শুধুই দৃশ্য দেখে চলেছি নয়নাভিরাম।
আমাদের দশজনের যে দল সেখানে একজন
হচ্ছে রীতিমতো বাচ্চাছেলে, এই বছর দশেক
বয়স, বয়সের তুলনায় অত্যন্ত সাহসী
এবং বোঝদার।
সামনে পড়লো হালকা বয়ে যাওয়া জলস্রোত
সকলেই সেখানে হাত-পা-মুখ ধুয়ে নিলাম
এত স্বচ্ছ জল ভাবা যায় না
মুখে দিয়ে দেখলাম, অসম্ভব চমৎকার, পানযোগ্য।

বর্তমানে শিক্ষার হাল হকিকৎ ও কিছু প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন

সেখ সাইদুল হক

২০১৬ সালে 'নতুন চিঠি'-র শারদ সংখ্যায় শিক্ষার অধিকার আইন-২০০৯ এবং খসড়া জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১৬কে পর্যালোচনা করে 'শিক্ষাক্ষেত্রে যে চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি আমরা' নাম দিয়ে একটি প্রবন্ধ লিখেছিলাম। এখানে সরকারি শিক্ষা ব্যবস্থাপনায় বিদ্যালয় শিক্ষাকে পর্যালোচনা করে মূলত চারটি ভাগে চ্যালেঞ্জগুলিকে ভাগ করেছিলাম— (১) অস্তিত্বের চ্যালেঞ্জ, (২) গুণমানের চ্যালেঞ্জ, (৩) পরিকল্পনা ও তা রূপায়ণের চ্যালেঞ্জ এবং (৪) দৃষ্টিভঙ্গির চ্যালেঞ্জ। বর্তমানে গত দুই বছরে শিক্ষাঙ্গনে নানা পরিবর্তন এসেছে। কিছু সমীক্ষা তথ্য প্রকাশিত হয়েছে। এই বছর ASER (Annual Status of Education Reports) ২০১৭ সমীক্ষা রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে। ২০০৫ সাল থেকে এই সংস্থা মূলত প্রাথমিক (Primary) ও বুনিয়াদি শিক্ষার (Elementary Education) ক্ষেত্রে অগ্রগতি ও গুণমান অর্জনের সমীক্ষা রিপোর্ট প্রকাশ করে চলেছে এবং সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে তা গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে। ২০১৭ সালে ওরা সমীক্ষা চালিয়েছে মাধ্যমিক স্তরের ১৫-১৮ বছর বয়সী ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে। ২৪টি রাজ্যের ২৮টি জেলায় ৩০ হাজার ওই-বয়সী ছাত্রছাত্রীদের অগ্রগতি ও গুণমান সম্পর্কে সমীক্ষা করেছে। আমাদের রাজ্যের প্রতীচী ট্রাস্ট সংস্থাও শিক্ষা বিষয়ে, বিশেষত প্রাথমিক শিক্ষা বিষয়ে, গবেষণা ও অনুসন্ধান মূলক সমীক্ষা প্রকাশ করে চলেছে। এই বছর প্রতীচী ট্রাস্টের সহযোগী সংস্থা শিক্ষা আলোচনা মঞ্চ 'পশ্চিমবঙ্গে প্রাথমিক শিক্ষা—একটি প্রতিবেদন' শীর্ষক সমীক্ষা রিপোর্ট প্রকাশ করেছে। এর ভূমিকা লিখেছেন অধ্যাপক অমর্ত্য সেন।

এই বছর আইআইএম আহমেদাবাদ-এর কয়েকজন গবেষক নিউ দিল্লির সেন্ট্রাল স্কোয়ার ফাউন্ডেশনের গবেষকদের সাথে মিলিতভাবে শিক্ষার অধিকার আইনের ১২(১)(সি) ধারার রূপায়ণ সম্পর্কে একটি সমীক্ষা করেছে। আইনটির ওই ধারায় বলা আছে প্রতিটি বেসরকারি বিদ্যালয়কে ২৫ শতাংশ ছাত্রছাত্রী ভর্তি করতে

হবে সংশ্লিষ্ট এলাকার পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠী ও অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল পরিবারগুলি থেকে। ওই রিপোর্ট এই বছর ফেব্রুয়ারি মাসে ইকনমিক অ্যান্ড পলিটিক্যাল উইকলি (EPW) পত্রিকার ফেব্রুয়ারি সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে। এই বছর কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক শিক্ষার অধিকার আইনের অনুচ্ছেদ ১৬তে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত যে 'No Detention Policy' ছিল তারও পরিবর্তন করে পঞ্চম শ্রেণি থেকে 'Detention Policy' অর্থাৎ পাশ-ফেল প্রথা চালু করার প্রস্তাব করা হয়েছে এবং তা রাজ্যগুলির বিচার-বিবেচনার ওপর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। এই বছরই (২০১৮) অগস্ট মাসে কেন্দ্রীয় সরকার ইউজিসি তুলে দিয়ে তার জায়গায় হায়ার এডুকেশন কমিশন চালু করার প্রস্তাব এনেছে। এসবগুলিকে বিবেচনায় রেখেই বর্তমান প্রবন্ধ 'শিক্ষার হালহকিকৎ—কিছু প্রাসঙ্গিক অভিমত'।

প্রেক্ষাপট

উপরোক্ত বিষয়গুলি সম্পর্কে প্রাসঙ্গিক অভিমত দেবার আগে শিক্ষাক্ষেত্রের প্রেক্ষাপটটি দেখা নেওয়া যাক। ভারতে বিদ্যালয়শিক্ষার ক্ষেত্রটি বিশ্বের মধ্যে অন্যতম সর্ববৃহৎ। ইউনেস্কোর তথ্য অনুযায়ী সারা বিশ্বের প্রাথমিক স্তরের মোট শিক্ষার্থীর ১৮.৩ শতাংশ এবং ওই স্তরের মোট শিক্ষকের ১২.১৮ শতাংশ আছে ভারতে। মাধ্যমিক স্তরের ক্ষেত্রে এই হার যথাক্রমে ২০ শতাংশ এবং ১০ শতাংশ। দেশের ৩৬টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের ৬৮৩টি জেলার ৭৩০০ ব্লকের মধ্যে ছড়িয়ে আছে সরকারি, আধা-সরকারি ও বেসরকারি মিলিয়ে প্রায় ১৫ লক্ষ বিদ্যালয়। এই বিদ্যালয়গুলিতে কমবেশি ২২ কোটির ওপর ছাত্রছাত্রী পড়াশোনা করে। এগুলিতে শিক্ষক-শিক্ষিকার সংখ্যা প্রায় ৮০ লক্ষ। এই বিদ্যালয়গুলির মধ্যে প্রায় ১১ লক্ষ সরকারি ব্যবস্থাপনার বিদ্যালয় যেখানে শিক্ষার্থীর সংখ্যা প্রায় ১৪ কোটি। বাকি বিদ্যালয়গুলি হয় ব্যক্তিমালিকানাধীন বা স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার পরিচালনাধীন কিংবা মিশন পরিচালনাধীন সংখ্যালঘু স্টেটাস মর্যাদাপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান। ডাইস (DISE) রিপোর্টের তথ্য অনুযায়ী সরকার ও সরকারি-পোষিত বিদ্যালয়গুলিতে প্রাথমিক স্তরে বিদ্যালয় ছুটের হার ১৭ শতাংশ। অষ্টম মান পর্যন্ত ধরলে এই হার ৩০ শতাংশের ওপর। বেসরকারি সংস্থা চালিত প্রতিষ্ঠানগুলির ক্ষেত্রে ওই রিপোর্ট থেকে জানা যায় এই সংখ্যা ৬ থেকে ১০ শতাংশের মধ্যে। ভারতে উচ্চশিক্ষার (কারিগরি ও শিক্ষক প্রশিক্ষণ সহ) ক্ষেত্রটিও বেশ প্রশস্ত। উচ্চশিক্ষায় অধ্যয়নরত বিশ্বের মোট শিক্ষার্থীর ১৮.৬ শতাংশ আছে ভারতে এবং ওই স্তরে অধ্যাপনায় রত মোট শিক্ষকের ৬.১২ শতাংশ আছে ভারতে। বর্তমানে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের অধীন বিশ্ববিদ্যালয় এবং বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় মিলিয়ে সারা দেশে ৭৬০টি বিশ্ববিদ্যালয় আছে। এর মধ্যে ২৬০টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়। কলেজ আছে ৪০,৭৬০টি। উচ্চশিক্ষায় বর্তমানে সারা দেশে প্রায় সাড়ে তিন কোটি ছেলেমেয়ে পড়াশোনা করে। এর মধ্যে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলিতে পড়ে ৫০ শতাংশের বেশি। আর একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য, তা হল গ্লোবাল র‍্যাঙ্ক অব ইউনিভার্সিটির তালিকায় বিশ্বের ২০০টি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে ভারতের কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থান নেই। এই প্রেক্ষাপটকে বিবেচনায় রেখে পূর্ব-উল্লিখিত সমীক্ষা রিপোর্ট ও বিষয়গুলি সম্পর্কে আলোকপা করতে চাই।

ASER রিপোর্ট

এ.এস.ই.আর-রিপোর্টে সরকারি বা সরকার-পোষিত বিদ্যালয়গুলির ছাত্রছাত্রীদের গুণমান অর্জন সম্পর্কে ঘাটদির কথা বলা হয়েছে। এবং বেসরকারি ব্যবস্থাপনার তুলনায় সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত বিদ্যালয়গুলির দৈন্যদশার চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। গুণমানের শিক্ষার ক্রমাবনতির চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। বেসরকারি ব্যবস্থাপনার তুলনায় সরকারি ব্যবস্থাপনায় কর্মরত শিক্ষকদের কর্তব্যনিষ্ঠা সম্পর্কে কিছু প্রশ্ন তোলা হয়েছে। বলা হয়েছে যে সরকারি ব্যবস্থাপনায় বিদ্যালয়গুলির অবস্থা অনেকটা উলঙ্গ রাজার মতো। 'রাজা তোর কাপড় কোথায়?'—এই প্রশ্ন করার কেউ নেই। অর্থাৎ এগুলি কেমন চলছে তা ঠিকমতো দেখার কেউ নেই। এগুলি সম্পর্কে একটি উন্নাসিকতা পরিলক্ষিত হচ্ছে।

এটা ঠিকই যে সরকারি ব্যবস্থাপনায় বিদ্যালয়গুলি নানা সমস্যায় জর্জরিত। বিদ্যালয় পরিচালকমণ্ডলী ও পরিদর্শকমণ্ডলীর ঘাটতিকে ছোটো করে দেখা ঠিক হবে না। পাশাপাশি এটাও দেখতে হবে যে ওই বিদ্যালয়গুলির পরিকাঠামোগত সমস্যা ও শিক্ষক-ঘাটতির বিষয়টিকে। শিক্ষকদের দায়বদ্ধতার প্রশ্নটিকে অবহেলা বা অস্বীকার না করে এটাও বিবেচনায় রাখতে হবে সরকারি ব্যবস্থাপনার বিদ্যালয়গুলিতে কোন স্তরের পরিবার থেকে ছাত্রছাত্রীরা আসছে। এগুলি বিবেচনায় না রেখে ব্যক্তি-মালিকানাধীন বিদ্যালয়গুলির পাশাপাশি সরকারি বিদ্যালয়গুলির তুল্যমূল্য বিচার করলে শিক্ষার ক্ষেত্রে দুটি পৃথক সমান্তরাল ধারাকে মান্যতা দিয়ে ব্যক্তি-মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানগুলির শ্রেষ্ঠত্বকে প্রতিষ্ঠা করে সরকারি ব্যবস্থাপনার বিদ্যালয়ের মৃত্যুঘণ্টা বাজানো হবে।

এ.এস.ই.আর টিমের সমীক্ষা-পদ্ধতি নিয়ে কিছু প্রশ্ন থাকতেই পারে। যেমন সারা ২৪টি রাজ্যের মাত্র ২৮টি গ্রামীণ জেলায় ৩০, ০০০ পরিবারের কাছে যাওয়া শতাংশের হিসেবে খুবই নগণ্য। তাছাড়া এটা যতখানি না কাগজকলমে সমীক্ষা তার চেয়ে বেশি মৌখিক প্রশ্নোত্তরের পদ্ধতিতে সমীক্ষা, স্কুলভিত্তিক না হয়ে পরিবার-ভিত্তিক সমীক্ষা এবং তথ্য সংগ্রহকারীরা বিদ্যালয়-শিক্ষক নয়, কিছু স্বেচ্ছাসেবক। কিন্তু এই প্রশ্ন বাদ দিলেও এ.এস.ই.আর রিপোর্টের কতকগুলি বিষয় পর্যালোচনায় আনতে হবে। বিশেষ করে, বর্তমান সময়ে যখন নয়া-উদারবাদের চেতনায় প্রভাবিত হয়ে বলা হচ্ছে যে ব্যক্তিমালিক- পরিচালনাধীন বিদ্যালয়গুলির ম্যানেজমেন্ট ব্যবস্থাকে সরকারি প্রতিষ্ঠানে প্রয়োগ করতে হবে তাদের দায়বদ্ধতা ও নৈপুণ্য বাড়াবার জন্য। বলা হচ্ছে যে বিদ্যালয় সংগঠন পরিচালনায় আরও পেশাদারিত্ব আনতে হবে। কিন্তু তা হবে কীভাবে? এ বিষয়ে কেন্দ্র ও রাজ্য উভয় সরকারই দায় এড়াতে পারে না। উভয় সরকারকেই তা রূপায়ণের জন্য যে রাজনৈতিক সদিচ্ছা দেখানো দরকার তা দেখাতে হবে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান কোনো ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান নয়। অথচ পূর্বের কেন্দ্রীয় সরকার ও বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার শিক্ষাক্ষেত্রে তার দায় এড়িয়ে একে বাণিজ্যিকীকরণের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। যদিও আমরা সবাই জানি ও মানি যে শিক্ষাক্ষেত্রে সরকারও তার দায় ঝেড়ে ফেলতে পারে না। শিক্ষার প্রসারে সরকারকেই বড়ো ভূমিকা নিতে হবে— ব্যক্তি-উদ্যোগকে নয়। অথচ সরকার চাইছে ব্যক্তি-উদ্যোগই বড়ো ভূমিকা নিক। আর এ.এস.ই.আর রিপোর্টে লেখা আছে— ''Whether at school level or college, we have many institutions. But often institutions don't deliver what they are supposed to do. It takes individuals, their dreams and desires to confront and then bridge gaps thereby creating new opportunities for moving ahead ('Opportunities and outcomes'', ASER, 2017—Beyond Basics)। অথচ আমরা মনে করি শিক্ষাক্ষেত্রে শূন্যতা পূরণে ব্যক্তি নয়—সরকারকেই সেই মূল ভূমিকা নিতে হবে। শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যয়বরাদ্দ বাড়াতে হবে। শিক্ষণ প্রক্রিয়ায় সামাজিক পটভূমিকাকে এবং তার সাথে

শিক্ষার্থীদের সম্পর্ককে আমরা ছোটো করে দেখতে পারি না। কোঠারি কমিশন বলেছে যে ভবিষ্যৎ ভারত রূপ নিচ্ছে তার শ্রেণিকক্ষের মধ্যে। ওই বক্তব্যের মর্মার্থকে উপলব্ধি করতে হবে। এ.এস.ই.আর. রিপোর্টে বলা হয়েছে প্রথাগত শিক্ষা সবার জন্য নয়। বরং প্রথাগত শিক্ষা বদলে কারিগরি নৈপুণ্য অর্জনের শিক্ষার ওপর (Vocational Training Skill) জোর দিতে হবে। এ বিষয়েও তো অতীত অভিজ্ঞতা আছে। আগেই সরকারি উদ্যোগে চালু হয়েছিল এই কোর্স। তার পরিণতি কী? গরিব ঘরের ছেলেদের উৎসাহিত করা হয়েছে মোটরভ্যান মেরামত, ফিডার, মেকানিক, রিপেয়ারিং ইত্যাদি কাজে আর মেয়েদের জন্য চুলের যত্ন ও ফ্যাশান শিক্ষা কিংবা পুতুল তৈরি বা বুটিক শিল্প বা কাঁথাস্টিচ। এতে কিছু আর্থিক সুরাহা হবে। কিন্তু এইসব বিষয়েই তাদের আরো উচ্চশিক্ষায় যাওয়ার সুযোগ রাখা হয়নি। উচ্চ পারদর্শিতা অর্জনের জন্য ব্যবস্থা রাখা হয়নি। এটা কি কাম্য হতে পারে? নানা সমালোচনার মুখে এখন সরকার বলছে শিক্ষা আইনে ব্যক্তিমালিকানাধীন বিদ্যালয়গুলিতে ২৫ শতাংশ আসন পশ্চাৎপদ বা দুর্বল অংশের পরিবারের জন্য সংরক্ষিত রাখা হয়েছে। সেখানে তারা পড়তে পারে, গুণমানের শিক্ষা লাভ করতে পারে। সরকারই খরচ যোগাবে। শিক্ষা আইন চালু হয়েছে ২০১০ সালে। এই সংস্থান আছে ওই আইনের ১২(১)-সি ধারায়। এখন গত আট বছরে তার কী পরিণতি হয়েছে দেখা যাক।

শিক্ষা আইনের ১২(১)সি ধারার রূপায়ণ

শিক্ষা আইনের ওই ধারায় বলা হয়েছে সংখ্যালঘু প্রতিষ্ঠান বাদ দিয়ে প্রতিটি বেসরকারি বিদ্যালয়কে ২৫ শতাংশ ছাত্রছাত্রী ভর্তি করতে হবে সেই এলাকার অর্থনৈতিকভাবে এবং সামাজিকভাবে পশ্চাৎপদ পরিবার থেকে। শিক্ষার্থীদের জন্য সরকার যে টাকা ছাত্রপিছু শিক্ষার জন্য ব্যয় করে তা বেসরকারি বিদ্যালয়কে দিয়ে পুষিয়ে দেবে। ২০১৫ সালের জাতীয় নমুনা সমীক্ষা থেকে দেখা যাচ্ছে বেসরকারি বিদ্যালয়ের সংখ্যা দ্রুত গতিতে বাড়ছে এবং এই ধরনের বিদ্যালয়ের প্রতি পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠীভুক্ত পরিবারগুলিরও একটা বড় অংশের আকর্ষণ তৈরি হয়েছে। কিন্তু নানা কারণে তারা এখানে ভতি করতে পারছে না বা খরচের ভয়ে সাহস করতে পারছে না। সরকার সেই সুযোগ দেবার জন্য এই ধারাকে শিক্ষা আইনে রেখেছে। এই ধারা নিয়ে নানা বিতর্ক তৈরি হয়। বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কেউ কেউ মামলার পথে যায়। ফলে ভারত সরকারের মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রক ২০১২ সালে কোর্টে এফিডেবিট করে এবং পরে বিবৃতি দিয়ে বলে—'Admission of 25% children from disadvantaged groups and weaker sections in the neighbourhood is not merely to pro-vide avenues of quality education to poor and disadvantaged children. The larger objective is to provide a common place where children sit, eat and live together for at least eight years of their lives across caste, class and gender. It narrows down such divisions in our society." পাশাপাশি সরকারি সর্বজনীন শিক্ষা অর্জনের লক্ষ্যে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেরও দায়িত্বের কথা উল্লেখ করেছে। প্রসঙ্গত কোঠারি কমিশনও নেবারহুড বিদ্যালয়ের কথা বলেছে যেখানে সব অংশের ছেলেমেয়েরা পড়বে। কোঠারি কমিশন বলেছে বিদ্যালয় শিক্ষার এক একটি শ্রেণিকক্ষ হবে মিনি ভারতবর্ষ। সরকারের মতে এই ধারা অনুসারে গোটা দেশে প্রতি বছর প্রায় ২৩ লক্ষ ছাত্রছাত্রী ভর্তি হতে পারে।

এই ধারার বিষয়ে কিছু অস্পষ্টতা আছে। সরকারকেই তা স্পষ্ট করতে হবে। যেমন নেবারহুড বলতে কী বোঝাবে, মাইনরিটি স্ট্যাটাস কি কেবল ধর্মীয় না ভাষাগত সহ বোঝাবে, অর্থনৈতিক পশ্চাৎপদতা বলতে সেই পরিবারের বার্ষিক আয় কত ধরা হবে এবং কোন কোন গোষ্ঠীকে সামাজিক পশ্চাৎপত বলা হবে ইত্যাদি। তাছাড়া বেসরকারি স্কুলের সংখ্যার বিষয়ে সরকারের কাছে কোনো নির্দিষ্ট তথ্য নেই। যেমন কেন্দ্রীয় সরকারের মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রক কর্তৃক সংগৃহীত তথ্য থেকে জানা যাচ্ছে যে সারা দেশে ৩ লক্ষ ৩৫৯টি এই ধরনের বিদ্যালয় আছে, যার মধ্যে কমপক্ষে একজনও এই ধারায় ভর্তি হয়েছে এমন বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৯১ হাজার ১৪৯টি। অর্থাৎ বিদ্যালয়ে অংশগ্রহণের হার হল ৩০.৩৫ শতাংশ। জম্মু-কাশ্মীরে শিক্ষা আইন চালু হয়নি। লাক্ষাদ্বীপে কোনো বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নেই। তাহলে বাকি ৩৪টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের মধ্যে ১৮টি থেকে দেখা যাচ্ছে হয় কোনো রিপোর্ট নেই অথবা ওই রাজ্যগুলির কোনো স্কুলই এই ধারাতে ভর্তি করেনি। ১৮টির মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা, কেরালা, অন্ধ্রপ্রদেশ, হরিয়ানা, হিমাচলপ্রদেশ, পাঞ্জাব, তেলেঙ্গানা ইত্যাদি আছে। যাই হোক, ওই তথ্যকে সঠিক ধরলে দেখা যাবে ২৩ লক্ষের মধ্যে মাত্র ৭ লক্ষ পূরণ হয়েছে। সবচেয়ে বেশি ভর্তি হয়েছে দিল্লি, চণ্ডিগড় ও ছত্তিশগড়ে (৯৮ শতাংশ)। সবচেয়ে কম ভর্তি হয়েছে মহারাষ্ট্রে (৬ শতাংশ) ও উত্তরপ্রদেশে (১ শতাংশ)।

আবার যদি ডাইস DISE (District Information System of Education) রিপোর্ট ধরি তাহলে দেখব কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল বাদে রাজ্যগুলির মধ্যে ২০১৪-১৫ বর্ষে সারা দেশে এই ধরনের ২ লক্ষ ৯২৭ টি বিদ্যালয় আছে। তার মধ্যে ৪৬ হাজার ৯৯৬টি বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী ভর্তির হার ২১.২০ শতাংশ। (সূত্র EPW ফেব্রুয়ারি, ২০১৮ সংখ্যা)। এতে দেখা যাচ্ছে সবচেয়ে বেশি ভর্তির হার—দিল্লি (৫১.৮৪ শতাংশ), তামিলনাড়ু (৫১.২৪ শতাংশ), উত্তরাখণ্ড (৪২.৯৭ শতাংশ), রাজস্থান (৪৭.৮৮ শতাংশ), ছত্তিশগড় (৩৯.১৭ শতাংশ), কর্নাটক (৩৭.৯৫ শতাংশ)। সবচেয়ে কম ভর্তি তেলেঙ্গানা (১ শতাংশেরও নিচে), উত্তরপ্রদেশ (১.১৩ শতাংশ), ওড়িশা (১.৫০ শতাংশ), মেঘালয় (১.৩৯ শতাংশ), গোয়া (৫.৮ শতাংশ), হিমাচল প্রদেশ (৬ শতাংশ)-এ। অন্ধ্রপ্রদেশে ভর্তির হার শূন্য শতাংশ। পশ্চিমবঙ্গ এই ধরনের ৬০৯০টি বিদ্যালয়ের মধ্যে ১০৬৬টিতে ভর্তির হার ১৭.৫ শতাংশ।

গ্রেড-১ অর্থাৎ প্রথম শ্রেণিতে ভর্তি হলেও ভর্তি হওয়ার পর কত শতাংশ পরবর্তী শ্রেণিগুলিতে যাচ্ছে ডাইস রিপোর্টে সেই হার নেই। শিক্ষার অধিকার আইনের একটি বড় প্রতিবন্ধকতা হল প্রাক্-প্রাথমিক এই ধরনের ভর্তির কোনো নিয়মনীতি নেই। ফলে ওইসব বিদ্যালয়ে যে-সব পশ্চাৎপদ বাড়ির ছেলেমেয়েরা আসছে তারা দু-ধরনের বাধা নিয়ে আসছে। এক পশ্চাৎপদ বাড়িতে শিক্ষার পরিবেশের অভাব; দুই, বিদ্যালয়ে ভর্তির পর ওই বিদ্যালয়ে প্রাক্-প্রাথমিক সম্পূর্ণ করা শিক্ষার্থীদের তুলনায় পিছিয়ে থাকা। এই সমস্যার সমাধান না হলে ওই নিয়মের মধ্যে ভর্তি হলেও বিদ্যালয়-ছুটের হার বাড়বে যা পরবর্তীতে ভর্তির হারকেও কমিয়ে দেবে। এই আইনের ওই ধারা প্রয়োগের আর একটি সমস্যা হলো আবাসিক বিদ্যালয়গুলির ক্ষেত্রে কী হবে? প্রথমত, নেবারহুডের ধারণা এখানে কার্যকর নাও হতে পারে। এ নিয়ে আদালতে মামলা চলছে। দ্বিতীয়ত, সরকার ওই ধারায় ভর্তি শিক্ষার্থীদের মাস-মাহিনার জন্য যে ব্যয়ভার হবে সেই টাকা দেবে, অন্য খাতে অর্থ দেবে না। তাহলে হস্টেলে থাকার ব্যয়ভার কে বহন করবে? যারা অর্থনৈতিকভাবে ও সামাজিকভাবে পশ্চাৎপদ (এই দুটি বিষয়

পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত) তারা এই ব্যয়ভার বহন করতে পারবে না।

আইনের এই ধারা রূপায়ণের আর একটি সমস্যা হল ছাত্রপিছু ব্যয়ভার কত হবে এবং কীভাবে কত মেটানো হবে? তথ্য পরিসংখ্যানে দেখা যাচ্ছে ৩৬টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের মধ্যে মাত্র ১৪টি রাজ্য কেবল কেন্দ্রের কাছে এই খাতে অর্থ দাবি করেছে। আবার ১৪টি রাজ্য থেকে মোট দাবি এসেছে ১৪৬ কোটি ৬২ লক্ষ টাকা। আর কেন্দ্রের শিক্ষা মন্ত্রকের এ-সম্পর্কিত PAB (Plan Approval Board) অনুমোদন দিয়েছে মাত্র ২৫ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা। অর্থাৎ মোট দাবির ১৭.১ শতাংশ। এর ফলে বিদ্যালয়গুলি এই ধারা প্রয়োগে যেমন অনিচ্ছা দেখাচ্ছে তেমনি ৬-১৪ বছর বয়সী সকলের জন্য প্রারম্ভিক শিক্ষা সুনিশ্চিত করার কাজটি অসম্পূর্ণ থাকছে।

না আটকানোর নীতি

শিক্ষার অধিকার আইনে অষ্টমশ্রেণি পর্যন্ত না-আটকানোর যে নীতি (No Detention Policy) ছিল বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার তা পরিবর্তন করে পঞ্চম শ্রেণি থেকে পাশ-ফেল প্রথা চালু করার প্রস্তাব করেছে এবং রাজ্যগুলির ওপর তা প্রয়োগের দায় দায়িত্ব ছেড়ে দিয়েছে। ইতিমধ্যে বহু রাজ্য তাতে সম্মতি জানিয়েছে। এটা ঠিকই, একটা দাবি অভিভাবকদের একটা অংশ থেকে জোরালোভাবে উঠেছিল যে সরকার-পোষিত বিদ্যালয়গুলিতে পাশ- ফেল না ফেরালে গুণমান বাড়বে না। শিক্ষাবিদদের মধ্যেও পক্ষে-বিপক্ষে মত ছিল। এটা অনস্বীকার্য যে একটা প্রচার পরিকল্পিত ভাবে তোলা হয়েছে এবং তা বেশ কিছুটা গণভিত্তি পেয়েছে যে সরকারি বিদ্যালয়ে গুণমান খারাপ হচ্ছে কেননা সেখানে পাশ-ফেল প্রথা নেই। এমনকি ASER রিপোর্ট যা আমলা ও বুদ্ধিজীবী মহলে কমবেশি মান্যতা পায়, সেখানেও এ প্রত্যয় ব্যক্ত করা হয়েছে যে 'Detain Children, Ensure Learning' রিপোর্টে বলা হয়েছে ওই আইনের অনুচ্ছেদ ১৬ অনুযায়ী একজন শক্ষার্থী অষ্টমশ্রেণি পর্যন্ত বিনা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে শিক্ষণ প্রক্রিয়ায় সে কী ধরনের সাহায্য প্রত্যাশা করে তা বোঝা যায় না। তার প্রাপ্তশিক্ষার মূল্যায়ন বা পরিমাপ করা যায় না। নিরবচ্ছিন্ন মূল্যায়ন ব্যবস্থা ঠিকমতো কার্যকর নয়। শিক্ষকবৃন্দ যান্ত্রিকভাবে ও দায়সারাভাবে মূল্যায়ন করেন। অভিভাবকরা জানতেই পারেন না তার সন্তান কী কী বিষয়ে দুর্বল। এর মধ্যে সততা নেই তা নয়, কিন্তু এটা সবটাই সত্য নয়। প্রথমত মনে রাখা উচিত কোন পরিবেশ ও পরিবার থেকে সরকারি ব্যবস্থাপনায় বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীরা আসছে। আগেই বলেছি প্রারম্ভিক স্তরে বিদ্যালয় ছুটের হার ক্রমবর্ধমান। নীপা (NUEPA)-র প্রতিবেদন অনুযায়ী মাধ্যমিক স্তরে ৪০ শতাংশের কাছাকাছি। ফলে পাশ-ফেল প্রথা সঞ্জাত পরীক্ষাভীতি একটা বাড়তি মনস্তাত্ত্বিক চাপ তৈরি করবে কিনা ভাবতে হবে। ভাবতে হবে এতে বিদ্যালয়-ছুটের হার বেড়ে যাবে কিনা। তাছাড়া, মনে রাখা দরকার যে এখন শুধু উচ্চবিত্তই নয়, মধ্যবিত্ত এমনকি নিম্নবিত্তদের মধ্যেও বেসরকারি বিদ্যালয়, বিশেষ করে, ইংরেজি-মাধ্যম বিদ্যালয়ের প্রতি আকর্ষণ বেড়েছে। সরকারি ব্যবস্থাপনায় বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী কমছে। কেউ কেউ বলছে সরকারি ব্যবস্থাপনার বিদ্যালয়ে পাশ-ফেল নেই বলে ভর্তি কমছে। কিন্তু প্রশ্ন হল, পাশ-ফেল প্রথা চালু হলে ওই অভিভাবকরা যে সরকারি বিদ্যালয় ব্যবস্থার প্রতি ঝুঁকে পড়বে এমনটা নাও হতে পারে। কেননা আমরা চাই বা না চাই বেসরকারি, বিশেষ করে ইংরেজি মাধ্যমে পড়ানোর একটা 'ক্রেজ' বা ঝোঁক তৈরি হয়েছে। বলা ভালো—তৈরি করা হয়েছে। এখানে একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য যে, সম্প্রতি আই.আই.এম. আমেদাবাদের দুজন গবেষক গত ১০ বছরের জাতীয় তথ্য যা ASER রিপোর্টেও উল্লিখিত হয়েছে তা বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন সরকারি ব্যবস্থাপনায় অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত বিনা বাধায় উত্তীর্ণ হবার ফলে শিক্ষার মান গুণগত তলানিতে ঠেকেছে এমন নয়। এমনকি তারা কিছু স্কুলে সমীক্ষা চালিয়ে দেখিয়েছেন যেখানে পাশ-ফেল আছে আর যেখানে পাশ-ফেল নেই উভয় ধরনের বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীদের একই দক্ষতা দেখা গেছে। ওই সমীক্ষা রিপোর্ট মতে এটা নির্ভর করছে বিদ্যালয়ের পরিবেশ কতখানি শিক্ষা-বান্ধব এবং শিক্ষক-শিক্ষিকারা কতখানি অন্তরিক তার ওপর। এটা অনস্বীকার্য যে বেসরকারি বিদ্যালয়ের তুলনায় সরকারি ব্যবস্থাপনার বিদ্যালয়ে গুণমান নিম্নমুখী। ASER সহ বহু সমীক্ষাতেই তা উঠে এসেছে। তা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। কিন্তু সব কারণ শিক্ষকদের ওপর চাপানো ঠিক নয়। আরও নানা কারণ আছে, যেমন পরিকাঠামোর অভাব, শিক্ষক প্রশিক্ষণের অভাব, ছাত্র-শিক্ষক অনুপাতের অভাব, ঠিকমতো পাঠ্যপুস্তক সরবরাহে অনিশ্চয়তা, শিক্ষার্থী-বান্ধব বিদ্যালয় পরিবেশের অভাব, শিক্ষকদের ওপর মিড-ডে মিলের বোঝা ইত্যাদি। প্রতীচী ট্রাস্টের সম্প্রতি শিক্ষা আলোচনায় তা উঠে এসেছে। ওই রিপোর্টে বলা হয়েছে পাশ-ফেল প্রথা না থাকার নানা প্রভাবের মধ্যে একটি হল অভিভাবক ও শিক্ষকদের মধ্যে এই ধারণা কাজ করে যে অনায়াসে শিশু যেহেতু এক ক্লাস থেকে অন্য ক্লাসে উত্তীর্ণ হচ্ছে তাই তার লেখাপড়ায় আগ্রহ থাকবে না। এই ধারণা যে-পদ্ধতিতে বার্ষিক পরীক্ষা দিয়ে শিক্ষার মূল্যায়ন চলতি সেই প্রথাগত শিক্ষাপদ্ধতি দ্বারা প্রভাবিত। তাই এ বিষয়ে চটজলদি কোনো সিদ্ধান্তে আসাটা সমীচীন হবে না। এটা ঠিকই বিদ্যালয়-শিক্ষার গুণমান না বাড়ালে তার আকর্ষণ কমবে। শিক্ষকরা তাঁদের দায়িত্বকে ছোটো করে দেখতে পারেন না। কোনো কোনো বিদ্যালয় বা কোথাও কোথাও শিক্ষকদের সমস্যা থাকতে পারে সি.সি.আই. রূপায়ণে। বিশেষ করে, এক-শিক্ষক বিশিষ্ট বিদ্যালয়ে। তথাপি মনে রাখতে হবে শিক্ষার্থীরা কমে গেলে তাদের বিদ্যালয়গুলি অস্তিত্বের সংকটে ভুগবে। তাই সর্বাধিক উদ্যোগ শিক্ষকদেরই নিতে হবে। এটা মাথায় রেখেই মূল্যায়ন ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করা, অভিভাবকদের সাথে নিয়মিত মত বিনিময় এবং দুর্বল ছাত্রছাত্রীদের সংশোধন মূলক পাঠে সর্বাধিক গুরুত্ব দিতে হবে। পাশ-ফেল প্রথা যদি চালুই করতে হয় তবে তা হোক সংশোধনমূলক পাঠকে শক্তিশালী করে শিক্ষার্থীকে সমমানে পৌঁছাবার উদ্দেশ্যে, শিক্ষার্থীকে আটকাতে নয়। এখন প্রতীচী ট্রাস্ট ও শিক্ষা আলোচনা মঞ্চের প্রতিবেদনটি সম্পর্কে কিছু আলোকপাত করা যাক।

প্রতীচী ও শিক্ষা আলোচনা মঞ্চ

অমর্ত্য সেন প্রতিষ্ঠিত প্রতীচী সংস্থা এবং এর সহযোগী শিক্ষা আলোচনা মঞ্চের যৌথ প্রয়াসে রচিত প্রতিবেদনটির নাম হল Primary Education in West Bengal: The Scope for Change। রিপোর্টে বলা হয়েছে পশ্চিমবঙ্গে প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে শিশুদের ভর্তি করা আগের থেকে অনেকটাই সুনিশ্চিত হয়েছে। কিন্তু প্রাথমিক শিক্ষার গুণমান উন্নত করার ক্ষেত্রে এখানো কাম্য ভূমিকা গ্রহণ করতে পারেনি। প্রাথমিক স্তরে শিক্ষাদানে বৈষম্য একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা। এর ফলে শিশুর বিদ্যালয়ের এক স্তর থেকে অন্য স্তরে অর্থাৎ প্রাক্-প্রাথমিক থেকে প্রাথমিক বা প্রাথমিক থেকে উচ্চ প্রাথমিক স্তরে যাওয়ার ক্ষেত্রে নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে। রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে শিক্ষার অধিকার আইন অনুযায়ী বাসস্থানের এক কিলোমিটারের মধ্যে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় থাকার কথা। কিন্তু সেক্ষেত্রে প্রায় প্রতিটি এলাকাতেই উদ্বেগজনক ঘাটতি রয়েছে। স্কুল-ছুটদের একটাই শ্রেণিতে পুনর্বার থেকে যাওয়ার দিক দিয়ে

রাজ্যজুড়েই একটি উদ্বেগজনক চিত্র রয়েছে। শিশুরা নানা কারণে ১৩ বছর বয়সের কাছাকাছি এসে স্কুলে আসা বন্ধ করে দিচ্ছে। তবে স্কুলছুট বা রিপিটার (একই শ্রেণিতে পুনর্বার থাকা) সমস্যাটি প্রাথমিক অপেক্ষা উচ্চ প্রাথমিকে বেশি। প্রাথমিক স্তরে এটা খুবই উদ্বেগজনক এমন অভিজ্ঞতা আমার হয় নি। বিদ্যালয় সংসদের সভাপতি থাকাকালীন বা সর্বশিক্ষা মিশনের পরিচালনায় জেলাস্তরে দীর্ঘদিন যুক্ত থাকার সময় প্রায় প্রতি বছর করা সমীক্ষাতে তা উদ্বেগজনকভাবে আসেনি। এমনও দেখা গেছে প্রাথমিক স্তরে যারা দীর্ঘদিন স্কুলে আসেনি তাদের মধ্যে রিপিটারের সংখ্যা বেশি। আর যা একটি অভিজ্ঞতায় মেলে না তা হল প্রতিটি জেলাতেই এক কিলোমিটারের মধ্যে প্রাথমিক বিদ্যালয় না থাকার উদ্বেগজনক ঘাটতি। ২০০১ সালে সর্বশিক্ষা চালু হওয়ার পর সর্বাধিক জোর দেওয়া হয়েছিল এমন কোনো বসতি যেন না থাকে যেখানে এক কিলোমিটারের মধ্যে কোনো প্রাথমিক বিদ্যালয় থাকবে না। বর্ধমান জেলায় ২০০৭ সালের মধ্যেই এই কাজ সম্পন্ন হয়েছিল। আরও বহু জেলায় হয়েছিল। পঞ্চায়েত দপ্তরের উদ্যোগে বহু শিশুশিক্ষা কেন্দ্রও গড়ে তোলা হয়েছিল এবং বলা যায় সমীক্ষায় দেখা গেছে কোথাও কোথাও প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কাছাকাছি এস.এস.কে গড়ে উঠেছে। ফলে এগুলির অনেকে শিক্ষার্থী-স্বল্পতায় ভুগছে। প্রতীচী রিপোর্টের একটি জায়গায় উল্লেখ করা হয়েছে সারা রাজ্যেই স্কুলের সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধির ফলে স্কুলশিক্ষার সুযোগ বাড়ানোর পাশাপাশি ছাত্রশিক্ষক অনুপাতেও উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি ঘটেছে। রাজ্যের ছাত্র-শিক্ষক গড় অনুপাতটি এখন বেশ অনুকূল—২৩:১। তবে সামঞ্জস্যের অভাব আছে। যেমন কোথাও কোথাও ১২:১, আবার কোথাও ৪০:১। মালদা, মুর্শিদাবাদ, উত্তর দিনাজপুরের চিত্র খারাপ। তাই রিপোর্টে সঠিকভাবেই বলা হয়েছে রাজ্যে এখন যে প্রাথমিক শিক্ষকরা আসছেন তাঁদের বিভিন্ন স্কুলে নিয়োগের কাজটিতে পুনর্বিন্যাসের যথেষ্ট অবকাশ আছে। শিক্ষক সংগঠনগুলিকে এ-বিষয়ে বলিষ্ঠ ভূমিকা নিতে হবে।

ওই রিপোর্টে আরও বেশ কিছু বিষয়ে মতামত দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল মিড-ডে-মিলের সার্বিক মানোন্নয়ন ও বরাদ্দ বাড়ানো, শিক্ষকমণ্ডলীর ওপর এর পরিচালনার দায়িত্ব লঘু করা, বিদ্যালয় পরিচালনায় সরকার কর্তৃক আরও অর্থ প্রদান, বাচ্চাদের ওপর পড়ার অতিরিক্ত চাপ কমানো (প্রথম শ্রেণির বাচ্চাদের জন্য ৩৪৮ পাতার 'আমার বই'-এর ওজন বাচ্চার তোলার ক্ষমতার চেয়ে বেশি), বিদ্যালয়গুলিতে আংশিক সময়ের জন্য সঙ্গীত, চিত্রাঙ্কন ও খেলাধূলার জন্য শিক্ষক নিয়োগ। আরও দুটি বিষয়ের কথা ভাবতে হবে যা অধ্যাপক অমর্ত্য সেন উল্লেখ করেছেন। বিষয়-দুটি হল 'স্কুলটা যে তাদের নিজেদের' এই বোধটি শিক্ষার্থীদের মধ্যে জাগানো এবং শিক্ষকমণ্ডলীর মধ্যে নিজেদের কাজ সম্পর্কে সম্যক উপলব্ধি ও অধিকারবোধের পাশাপাশি কর্তব্য ও দায়িত্ববোধ বাড়ানো।

উচ্চশিক্ষায় 'হেকি' আইন

এবার উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রটিতে নজর দেওয়া যাক। কেন্দ্রীয় সরকারের মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রক ভারতের উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থার উৎকর্ষ বৃদ্ধি, পরিচালনা, নিয়ন্ত্রণ ও উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির সমন্বয়ের লক্ষ্যে ইউজিসি তুলে দিয়ে একটি নতুন সংস্থা গড়তে খসড়া আইন ২৮ জুন, ২০১৮ প্রকাশ করে। ৭ জুলাইয়ের মধ্যে মতামত পাঠাতে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছিল। নতুন সংস্থার নাম দেওয়া হয়েছে The Higher Education Commission of India Act-2018 (Repeal of UGC Act) সংক্ষেপে HECI (হেকি)। খসড়া আইনটির উদ্দেশ্য সম্পর্কে মন্ত্রক বলেছে কেন্দ্রীয় সরকারের দেয় প্রতিশ্রুতি মোতাবেক উচ্চশিক্ষার নিয়ন্ত্রণকারী ব্যবস্থার সংস্কার করে এমন ব্যবস্থা চালু করা হবে যেখানে উচ্চশিক্ষার উৎকর্ষের ওপর জোর দেওয়া হবে। নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে আইনি পরিধিকে কমানো হবে এবং উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিচালনায় সরকারি হস্তক্ষেপ করা হবে না। বলা হয়েছে : লেস গভর্নমেন্ট, মোর গভর্ন্যান্স। অথচ ইউজিসি-র পরিধিকে ছাঁটাই করে বলা হয়েছে উচ্চশিক্ষায় অর্থবরাদ্দ বিষয়টি দেখবে কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রক আর 'হেকি' দেখবে কেবল শিক্ষাগত বিষয়। তারপর খসড়া আইনটি এমনভাবে রচিত হয়েছে যাতে হেকিকে শিখণ্ডী করে রাজ্যগুলির বৈচিত্র্যকে বিনষ্ট করে উচ্চশিক্ষার কেন্দ্রীভবন ঘটিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার তাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে ও নিজেদের আদর্শগত ভাবনাগুলিকে গ্রথিত করতে পারে এবং উচ্চশিক্ষায় মুনাফার ক্ষেত্রকে আরও উন্মোচিত করে তাকে বেসরকারিকরণের দিকে ঠেলে দিতে পারে। ২০১৬ সালে বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার নতুন জাতীয় শিক্ষানীতি ঘোষণা করেছে যার লক্ষ্য হল শিক্ষায় কেন্দ্রীকরণ, বাণিজ্যিকীকরণ ও সাম্প্রদায়িকীকরণ। এ-সম্পর্কে ইতিমধ্যে 'গণশক্তি'-দে ওই ধারাগুলি বিশ্লেষণ করে প্রবন্ধ লিখেছি। আগ্রহী পাঠক পড়ে দেখতে পারেন। কর্পোরেটরা উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রটিকে লুটের মৃগয়াক্ষেত্র হিসেবে ধরতে চাইছে। বিশ্বব্যাঙ্কের 'এডুকেশন স্ট্র্যাটেজি-২০২০' সেই উদ্দেশ্যে রচিত হয়েছে। বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার (এবং বলা ভালো, পূর্বতন কেন্দ্রীয় সরকারও) কর্পোরেটদের এই উদ্দেশ্যকে সফল করতে পদক্ষেপ নিচ্ছে যাতে দেশের শিক্ষাব্যবস্থাকে এক ধাঁচে নিয়ে আসা যায় এবং পাঠ্যক্রম, পাঠ্যসূচি ও পরীক্ষাব্যবস্থাকে কেন্দ্রীকরণ করা যায়। উচ্চশিক্ষার চিত্রটি দেখা যাক।

উচ্চশিক্ষার চিত্র

কেন্দ্রীয় সরকারের মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রকের ১৬-১৭ সালের রিপোর্ট থেকে দেখা যায় ১৯৪৭ সালে সারা দেশে ৫০০টি কলেজ এবং ১০টি বিশ্ববিদ্যালয় ছিল। ২০১৭ সালে তা বেড়ে হয়েছে ৪০,৭৬০টি কলেজ এবং ৭৬০টি বিশ্ববিদ্যালয়। ১৯৪৭ সালে ছিল ২ লক্ষের বেশি ছাত্রছাত্রী। এখন তা বেড়ে হয়েছে ৩ কোটি ৩৩ লক্ষ (১ কোটি ৭৯ লক্ষ ছেলে এবং ১ কোটি ৫২ লক্ষ মেয়ে)। এর মধ্যে প্রায় ৮০ শতাংশ হল স্নাতক স্তরের, ১২ শতাংশ হল স্নাতকোত্তর স্তরের আর ১ শতাংশ হল গবেষণা স্তরের। আমাদের দেশে প্রতি এক লক্ষ জনসংখ্যায় কলেজ হল গড়ে ২৮টি। বিহারে সবচেয়ে কম ৭টি এবং তেলেঙ্গানায় সবচেয়ে বেশি ৬০টি। বর্তমানে ম্যানেজমেন্ট ও ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষায় শিক্ষার্থী বেড়েছে উল্লেখযোগ্যভাবে—ম্যানেজমেন্টে ১৭.৫৭ শতাংশ, ইঞ্জিনিয়ারিং-এ ১৬.৫ শতাংশ। সেই তুলনায় সাধারণ বিজ্ঞানশিক্ষায় ১৮.৬৫ শতাংশ। কলা বিভাগে এখনও সর্বাধিক ৩৭ শতাংশ। ফলে দেশে উচ্চশিক্ষার বাজার ক্রমবর্ধমান। সর্বভারতীয় উচ্চশিক্ষার সমীক্ষা রিপোর্টে দেখা যাচ্ছে দেশের সাধারণ কলেজ, কারিগরি ও শিক্ষক শিক্ষণ কলেজ সহ ৬০ শতাংশের ওপর কলেজ ব্যক্তিমালিকানাধীন।

কেন ইউজিসি তুলতে চাইছে

১৯৫৬ সালে ভারতীয় সংসদ ইউজিসি আইন পাস করে একে বিধিবদ্ধ সংস্থায় পরিণত করে। অবশ্য এর আগেই ১৯৪৪ সালের সার্জেন্ট কমিটির রিপোর্টের ভিত্তিতে ১৯৪৫ সালে আলিগড়, বেনারস ও দিল্লি এই তিনটি বিশ্ববিদ্যালয় দেখার জন্য ইউনিভার্সিটি গ্রান্ট কমিটি গঠিত হয়।১৯৪৭ সালে এই কমিটির অধীনে আনা হয়

দেশের সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে। ১৯৪৮-৪৯ সালে উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে গঠিদ রাধাকৃষ্ণণ কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে তৎকালীন কেন্দ্রীয় সরকার (শিক্ষামন্ত্রী ছিলেন আবুল কালাম আজাদ) সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয় ও উচ্চশিক্ষার প্রতিষ্ঠানগুলির আর্থিক সাহায্য ও পরিচালনগত বিষয়ে সমন্বয়ের জন্য ১৯৫৩ সালে ইউনিভার্সিটি গ্রান্ট কমিটি কমিশন গঠন করে। ১৯৫৬ সালের আইনে তাকে বিধিবদ্ধ করা হল। বলা হল উচ্চশিক্ষার প্রতিষ্ঠানগুলির আর্থিক বিষয়ে অনুদান ও তাদের অনুমোদন, নিয়ন্ত্রণ, পরিচালনগত সমন্বয়, প্রতিষ্ঠানগুলির মূল্যায়ন সংক্রান্ত যাবতীয় দিক দেখভাল করবে ইউজিসি। এ-বিষয়ে সরাসরি সরকারি হস্তক্ষেপ করা হবে না এবং পদাধিকারী হবেন মূলত শিক্ষাবিদগণ— আমলারা নন। অতীতে ইউজিসি-কে প্রভাবিত করার চেষ্টা হয়নি এমন নয়। তা সত্ত্বেও এটি স্বশাসিত সংস্থা হিসেবে কাজ করেছে। এখন উচ্চশিক্ষার বাজারটি প্রসারিত হওয়ায় কর্পোরেট লবি দাবি জানাচ্ছিল ইউজিসি-র বাঁধন আলগা করছে। তাই পূর্বতন কেন্দ্রীয় সরকারের আমলে কপিল সিবাল যখন মন্ত্রী ছিলেন তখনই ইউজিসি তুলে দিতে চেয়েছিলেন। সেই উদ্দেশ্যে ২০১১ সালে বিলও আনা হয়েছিল। কিন্তু বিভিন্ন রাজ্যের আপত্তিতে তা কার্যকর হয়নি। ২০১৪ সালে নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে সরকার গঠিত হবার পর বেসরকারিকরণের মাত্রা বেড়েছে। সেই লক্ষ্যেই উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রটিদে নানা সংস্কার শুরু হয়ে যায়। যেমন 'ন্যাক' (ন্যাশনাল অ্যাসেসমেন্ট অ্যান্ড অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল) পরিদর্শন ব্যবস্থার সংস্কার, ৬০টি উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে গ্রেডেড অটোনমি দিয়ে ইউজিসি নিয়ন্ত্রণের বাইরে এনে কর্পোরেটদের অংশগ্রহণের পথটিকে সুগম করার লক্ষ্যে সংস্কার, মুক্ত ও দূরশিক্ষা ব্যবস্থার সংস্কার ইত্যাদি। সেই সূত্র ধরেই এলো বর্ধমান কেন্দ্রীয় সরকারের ইউজিসি তুলে দিয়ে 'হেকি' বা হায়ার এডুকেশন কমিশন'। মূল ৩১টি ধারা নিয়ে খসড়া হেকি আইন রচিদ হয়েছে। প্রথমত উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে অর্থ প্রদান ব্যবস্থা না রেখে তা সরকারের নিজের হাতে রাখার মধ্য দিয়ে উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে 'হেকি' অপেক্ষা সরকারি মন্ত্রকের মুখোমুখি করতে চাওয়া হয়েছে। অপরদিকে হেকি গঠন ও পরিকল্পনাকে এমনভাবে সাজানো হয়েছে যাদে সরকারি মন্ত্রকের, বিশেষ করে আমলাদের নিয়ন্ত্রণ ও হস্তক্ষেপ বাড়ে। বেসরকারিকরণের মাত্রাকে বাড়ানো যায়।

আমাদের রাজ্যের তৃণমূল সরকার 'হেকি' আইনকে অগণতান্ত্রিক বলে অভিহিত করেছে। অথচ নিজেরাই সেই পথের পথিক। রাজ্যে হায়ার এডুকেশন কাউন্সিলের মাথায় বসানো হয়েছে স্বয়ং শিক্ষামন্ত্রীকে। একদিকে উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থায় নির্বাচিত আন্ডার গ্র্যাজুয়েট/পোস্ট গ্র্যাজুয়েট, ফ্যাকাল্টি কাউন্সিল গঠন না করে বোর্ড অব স্টাডিজ়গুলিকে অকেজো করা হচ্ছে, নতুবা পছন্দের ব্যক্তিদের বসিয়ে অ্যাড হক ভিত্তিতে চালানো হচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলির স্বশাসনকে ভূলুণ্ঠিত করা হচ্ছে। অপরদিকে, কলেজগুলিতে ছাত্রভর্তিকে কেন্দ্র করে শাসক দলের ছাত্র-সংগঠনকে লুঠের মৃগয়াক্ষেত্র করতে চাইছে। শিক্ষাক্ষেত্রে প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণকে কুক্ষিগত করতে রাজ্য সরকার পশ্চিমবঙ্গ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় (প্রশাসন ও নিয়ন্ত্রণ) আইন ২০১৭ চালু করেছে। এই আইনে এমন অনেক বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে যা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের রীতিনীতি ও স্বাধিকারের পরিপন্থী। শিক্ষামন্ত্রী বলছেন সরকার টাকা দিচ্ছে তাই হস্তক্ষেপ করতেই পারে। অথচ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণাণ বলেছিলেন—''Higher Education is, undoubtedly, an obligation of the State but State aid is not to be confused with State control over academic policies and practices.''

আর যা ভাবা দরকার

প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে যে-সব রাজ্যগুলির সাফল্য কাহিনি প্রায়ই আলোচিত হয় সেইসব রাজ্যগুলিতে বেসরকারি বিদ্যালয়ে ছাত্র ভর্তির প্রবণতা এত বৃদ্ধি পেয়েছে যে বহু সরকারি ব্যবস্থাপনার বিদ্যালয় অস্তিত্বের সংকটে পড়ছে। পশ্চিমবঙ্গ সহ বহু রাজ্যেই এই প্রবণতা বিদ্যমান। এই প্রবণতার কারণ হিসেবে বলা হয়—সরকারি ব্যবস্থাপনার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে শিক্ষকের অভাব, পরিকাঠামোর অভাব, শিক্ষাবান্ধব পরিবেশের অভাব, পরিদর্শনের অভাব, রাজনীতির আধিপত্য ইত্যাদি। তথাপি এগুলিকেই একমাত্র কারণ হিসেবে ধরে নেওয়া ঠিক হবে না। নয়া উদারনীতির যুগে ১৯৯০-পরবর্তী সময়ে মনন জগতে যে পরিবর্তন সাধিত হয়েছে তাকেও হিসেবের মধ্যে রাখতে হবে। এটা নয় যে ব্যাঙ্কের ছাতার মধ্যে গড়ে ওঠা সব বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের পরিবেশ-পরিকাঠামো ভালো এবং সব সরকারি ব্যবস্থাপনার বিদ্যালয় খারাপ। বর্তমানে বিশ্ববাজারে বিশ্বায়নের হাতছানি ইংরেজি মাধ্যমগুলির প্রতি মানুষের আকর্ষণ বাড়িয়েছে। অপরদিকে, পরিকল্পিতভাবেই সরকারি ব্যবস্থাপনার বিরুদ্ধে অভিযোগগুলিকে সামনে এনে এদের সকলকে এক সারিতে ফেলে এদের সম্পর্কে নেতিবাচক ধারণা তৈরি করানো হচ্ছে। ইতিমধ্যে আমেরিকার উদ্যোগে রাষ্ট্রসংঘ 'শিক্ষা ভিশন-২০২০' প্রকাশ করে শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যক্তি-উদ্যোগকে উৎসাহিত করতে চেয়েছে। এই পটভূমিতেই সরকারি ব্যবস্থাপনার বিদ্যালয়গুলির যে সময়োপযোগী পুনর্গঠন করা দরকার, যে অর্থ বরাদ্দ করা দরকার, সরকারি উদ্যোগেই তা করা হয়নি।

পাশাপাশি এটাও মনে রাখতে হবে পূর্বে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের বৃহৎ অংশ বিদ্যালয়গুলির আশেপাশে বাস করতেন। ফলে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে একটা আত্মিক সম্পর্ক ছিল। এখন বৃহৎ অংশ শহরে বাস করেন, গ্রামে শিক্ষকতা করেন। ফলে আত্মিক সম্পর্ক ছিন্ন হচ্ছে কি না দেখা দরকার। দেখা দরকার তাঁরা নিজেরা সরকারি ব্যবস্থাপনার বিদ্যালয়ে নিজেদের ছেলেমেয়েদের পড়াচ্ছেন কিনা। এ বিষয়ে শিক্ষা আলোচনা মঞ্চ একটা সমীক্ষা করার কথা ভাবতে পারে। ১৯৬৬ সালে কোঠারি কমিশন সতর্ক করেছিল যে অর্থনৈতিকভাবে সুবিধাপ্রাপ্ত পরিবারের ছেলেমেয়েরা ভালো মানের শিক্ষা গ্রহণ করবে, অন্যদিকে সাধারণ পরিবারের ছেলেমেয়েরা নিম্নমানের শিক্ষা গ্রহণ করছে বাধ্য হবে এটা চলতে দেওয়া উচিত হবে না। এই বিষয়ে গত ২০১৫ সালের ৮ অগস্ট এলাহাবাদ উচ্চ আদালত একটি যুগান্তকারী রায় দিয়ে বলেছে সরকারি অফিসার, কর্মচারী, শিক্ষকমণ্ডলী, যাঁরা সরকার থেকে বেতন গ্রহণ করেন, তাঁদের ছেলেমেয়েদের সরকারি ব্যবস্থাপনার বিদ্যালয়েই পড়াতে হবে। এ বিষয়ে সরকারকে উদ্যোগ নিতে হবে। শিক্ষকমণ্ডলী ও শিক্ষক সংগঠনগুলিকেও এই রায়ের মর্মার্থ উপলব্ধি করতে হবে। নিজেদেরকে সেই মতো পরিবর্তিত করতে হবে। তা না হলে, গাছের ডালে বসে ডালটিকেই কেটে ফেলবো এই ভাবনা তৈরি হবে। অধ্যাপক অমর্ত্য সেন ওই প্রতিবেদনের ভূমিকাতে যথার্থভাবেই লিখেছেন—''নীতিগত সংস্কার ও দৃঙ্গিভঙ্গির বিকাশ পরস্পরের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত। আমাদের দুটোই দরকার।''

শিক্ষা ও শিক্ষাব্যবস্থা : কিছু অর্থনৈতিক মতামত

বিভাস সাহা

শিক্ষার শুরু সাক্ষরতায়। শিক্ষার অগ্রগতি কী শিখছি এবং কতটা শিখছি তার বিচারে। ভারত আজ দক্ষিণ এশিয়ার 'সুপার পাওয়ার' এবং পৃথিবীর উন্নতিশীল দেশগুলির মধ্যে একটা নজর-কাড়া দেশ। সামগ্রিক জাতীয় আয়ের হিসাবে আমরা এখন পৃথিবীতে ষষ্ঠ এবং অনেকদিন ধরেই প্রথম বারোটি দেশের মধ্যে আছি। এই শিরোপা সম্ভব হয়েছে ১৯৯০-এর পর থেকে জাতীয় আয়ের বৃদ্ধির হার বাড়ার জন্য।

জাতীয় আয়ের বৃদ্ধি নিশ্চয় সুখের বিষয়। জাতীয় ক্ষেত্রে কংগ্রেস এবং বিজেপি উভয় পক্ষই এ নিয়ে কৃতিত্ব দাবি করেছে এবং করবে। কিন্তু আয় বৃদ্ধি এবং উন্নয়ন এক জিনিস নয়। জাতীয় আয়ের বৃদ্ধি নিশ্চিতভাবে দারিদ্র্য দূর করে না বা মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নত করে না। অমর্ত্য সেন তাই বারবার শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের উন্নতির কথা বলেন। এককথায়, যে-কোনো দেশের সামাজিক স্বাস্থ্যের হাল বুঝতে গেলে তার শিক্ষাব্যবস্থা এবং শিশুস্বাস্থ্য ও নারীস্বাস্থ্য দেখা উচিত। অমর্ত্য সেন এই ধারণাটিকে বহুমাত্রিক দারিদ্র্যর ধারণায় রূপান্তরিত করেছেন (multi-dimensional poverty)। ইউনাইটেড নেশন্‌স্ এই ধারণাটিকে গ্রহণ করেছে এবং সমস্ত দেশেই এই বহুমাত্রিক দারিদ্র্য মাপা হচ্ছে। এছাড়াও human development index শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের আর একটা হিসাব দেয়।

সাক্ষরতা ও প্রাথমিক শিক্ষা

স্বাধীনতার পর থেকে ধরলে আমাদের সাক্ষরতার হার বছরে ১ শতাংশের কম হিসাবে বেড়েছে। ১৯৫১ সালে আমাদের সামগ্রিক সাক্ষরতার হার (শিশু ও বয়স্ক সবাইকে ধরে) ছিল ১৮.৩ শতাংশ। ২০১১-র আদমসুমারিতে তা গিয়ে দাঁড়িয়েছে ৭৩ শতাংশে। এত বড় দেশের পক্ষে এইটুকু উন্নতি উড়িয়ে দেওয়ার কথা নয়। কিন্তু আমরা যখন দেখি চীন (জনসংখ্যা আরো বেশি), মালয়েশিয়া, ভিয়েতনাম এবং শ্রীলঙ্কা—যারা ১৯৭০/৮০-র দশকে আমাদের মতো বা আমাদের থেকে আরো নীচে ছিল শিক্ষা ও অর্থনীতির ব্যাপারে—তাদের সামগ্রিক সাক্ষরতা এখন ১০০ শতাংশ (প্রায়)। প্রশ্ন ওঠে, সুপারপাওয়ার হওয়ায় এত আগ্রহী আমরা কেন শতকরা ১০০ ভাগ সাক্ষরতা আনতে পারছি না?

এখানে বলে রাখা ভালো, শিশুদের মধ্যে (৯/১০ বছর বয়সীদের মধ্যে) আমাদের সাক্ষরতা এখন প্রায় ১০০ ভাগ। সাত থেকে পনেরো বছর বয়সীদের সাক্ষরতাও অনেক বেড়েছে। পনেরো বছরের কম বয়সীদের বাদ দিলে সাক্ষরতার হার পাই—৬৯.৩ শতাংশ (২০১১-র হিসাবে)। এটা সর্বভারতীয় তথ্য এবং সমস্ত জনগোষ্ঠী ধরে। তপশিলি উপজাতিদের মধ্যে এই হার মাত্র ৫১.৯ শতাংশ। সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে পুরুষ ও নারীদের মধ্যে সাক্ষরতার হারের তফাৎ ১৬ শতাংশ। চিত্রটি মোটেই সুখব্যঞ্জক নয়।

স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রেও হতাশা উপেক্ষা করার নয়। পোলিও দূরীকরণের ক্ষেত্রে আমরা সাফল্য পেয়েছি ঠিকই। কিন্তু রাস্তাঘাটের পরিচ্ছন্নতা, শৌচাগারের অভাব এবং শিশুদের কম ওজন, মায়েদের দুর্বল স্বাস্থ্য—ইত্যাদি সমস্ত ব্যাপারেই পশ্চাৎপদতা লক্ষণীয়। ১ বছরের কম শিশুদের মৃত্যুর হার ভারতে উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি। ২০০৯ সালে প্রতি ১০০০ শিশুর জন্মের পাশাপাশি ৫০টি শিশু ১ বছরের মধ্যেই মারা যেত। ২০১২-তে এই সংখ্যা ৪২-এ নেমে আসে এবং ২০১৫-য় দাঁড়ায় ৩৮-এ। একটু অতীতে, ১৯৬০ সালে এই সংখ্যা ছিল ১৬৩.৮। সুতরাং উন্নতি হচ্ছে সন্দেহ নেই।

কিন্তু উন্নতি বিষয়টি আপেক্ষিকও বটে। ২০১৫-তেই এই শিশুমৃত্যুর হার বাংলাদেশে ছিল ৩১, ভূটানে ২৭, নেপালে ২৯, শ্রীলঙ্কায় ৮ আর চীনে ৯। পিছিয়ে গেলে দেখি ১৯৬০ সালে বাংলাদেশ তথা পূর্বপাকিস্তানে এই হার ছিল ১৭০.৬, আর ২০১৬-য় বাংলাদেশ তাকে ২৮.২-তে নামিয়ে এনেছে। (তথ্যসূত্র : বিশ্বব্যাংক)। ভারতীয় শিশুদের ডি.পি.টি. দেওয়ার হার ৭১.৩ শতাংশ, আর ডি.পি.টি. বুস্টার দেওয়ার হার ৪১.৪ শতাংশ (২০১৫)। কম ওজন এমন মায়েদের সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি এবং সবচেয়ে বড় কথা এই সমস্যা খুব একটা কমছে না।

দুর্বল স্বাস্থ্য হলে শিশুর শিক্ষায় ব্যাঘাত ঘটবে এবং তার প্রভাব অনেক বড় বয়স অবধি চলতে থাকে। আবার শিক্ষায় ঘাটতি থাকলে স্বাস্থ্য-সচেতনতা কম হবে, বদভ্যাস জনিত স্বাস্থ্যহানি হবে। এক কথায় স্বাস্থ্য ও শিক্ষা একে অপরের পরিপূরক।

এই সমস্যাগুলির পিছনে অনেক কারণ থাকতে পারে—তার মধ্যে কিছু সরকারি নীতিজনিত, কিছু সামাজিক, কিছু পরিবারগত। তাই সব সমস্যা একসঙ্গে সমাধান করা যাবে না। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় ১০০ ভাগ শিশুকে স্কুলে আনার কাজ সফল। দিকে দিকে নতুন স্কুল তৈরি করে এবং মিড-ডে-মিল চালু করে প্রথম ইউ.পি.এ. সরকার এই কাজে দ্রুত সাফল্য পেয়েছে। কিন্তু স্কুলে অষ্টম শ্রেণি অবধি ছাত্রছাত্রী ধরে রাখার কাজ বেশ কঠিন, তাই সেক্ষেত্রে সাফল্য অত্যন্ত শ্লথগতির। এবং যদি ছেলেমেয়েরা কী শিখছে তার চিত্র দেখি, তা আরও করুণ। তবে শিক্ষাক্ষেত্রে কিছু সমস্যা একটা পরিবারের একটা প্রজন্মের মধ্যেই বদলে ফেলা যায়।

যেমন সাক্ষরতা, বা মাধ্যমিক অবধি পড়াশোনা করা। যে বাবা মা নিজেরা হাই স্কুল অবধি পড়েছেন, তাঁরা নিশ্চিত করবেন যে ছেলেমেয়েরা যেন অন্তত মাধ্যমিক পাশ করে, এবং তাদের পরবর্তী বংশধারায় এই সমস্যা আর হবে না, বরং শিক্ষার হার বাড়বে।

কিন্তু স্বাস্থ্যের বহু সমস্যাই (কম ওজন বা খাবারের বদভ্যাস বা অপুষ্টি) দুষ্টচক্রের মত এক প্রজন্ম ও আর এক প্রজন্মের মধ্যে ঘোরাফেরা করে। দরিদ্র পরিবারের মায়ের অপুষ্টি তার শিশুসন্তানকে অপুষ্ট রাখতে পারে এবং মেয়েদের প্রতি সামাজিকভাবে নানা অবহেলা চলতে থাকে বলে এই দুষ্টচক্র ভাঙা অতি শক্ত হয়ে যায়। এর উপরে আরো একটা বড় সমস্যা হলো যারা এই সমস্যা কাটিয়ে বড় হবে (অর্থাৎ গড়ের থেকে বেশি যাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা) তারা ভাববে এই সমস্যাগুলি অমূলক; 'কই আমার তো কিছু হয় নি' বা 'অমুক তো দিব্যি রয়েছে'—এই ধরনের যুক্তি আর কি। তাই স্বাস্থ্যের সমস্যা সমাধান একটু জটিল।

কী শিখছি?

ভারতে ছাত্রছাত্রীরা কী শিখছে তার নির্ভরযোগ্য তথ্য সংগঠিত ভাবে যোগাড় করা হয় না। মাধ্যমিক স্তরে বোর্ড-পরীক্ষায় তথ্য পাওয়া যায় বটে, কিন্তু তা অনেক দেরিতে। চতুর্থ বা পঞ্চম শ্রেণি স্তরে আর বোর্ড-পরীক্ষা নেই। তাই এ বিষয়টিতে নির্ভরযোগ্য তথ্যের অভাব আছে। জাতীয় স্তরে সরকারিভাবে NCERT-র পক্ষ থেকে এখন পঞ্চম শ্রেণিতে ভাষা, গণিত এবং পরিবেশবিদ্যার উপর পরীক্ষা করা হচ্ছে। স্কুলে নেওয়া এই পরীক্ষাটির নাম Nartional Achievement Survey (NAS)। ২০০১ থেকে চারবার এইরকম পরীক্ষা হয়েছে। এই পরীক্ষায় ছাত্রদের সাফল্য বা অসাফল্যের সারাংশ তথ্য সরকার প্রকাশ করে।

NAS তথ্য সর্বভারতীয় এবং ৮ হাজারের অধিক স্কুল এবং দেড় লক্ষ ছাত্রছাত্রীর অংশ নেওয়া পরীক্ষার ওপর ভিত্তি করা, কিন্তু এর থেকে 'কতটা শিখছে'—সেভাবে জানা যায় না। বরং একটা তুলনামূলক চিত্র পাওয়া যায়—বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে, ছেলে ও মেয়েদের মধ্যে ইত্যাদি। ২০১৫-য় প্রকাশিত ২০১৪-য় নেওয়া পরীক্ষায় দেখা যাচ্ছে, মেয়েরা ছেলেদের থেকে ভালো করছে, কিন্তু গ্রাম ও শহরের মধ্যে বিশেষ ফারাক নেই। তপশিলি জাতি বা উপজাতির ছেলে-মেয়েরা অন্যদের থেকে পিছিয়ে। তার চেয়েও উদ্বেগের ব্যাপার, গড়পরতা হিসাবে ২০১৪-য় ছাত্রছাত্রীরা ২০১০-এর (এর আগের NAS Cycle) থেকে খারাপ ফল করেছে। বেসরকারিভাবে আর একটি সার্ভে করা হয়। এটির উদ্যোক্তা এবং আয়োজক Pratham নামক একটি NGO; এই সার্ভে রিপোর্টটির নাম Annual Status of Education Report (ASER)। এটি বাৎসরিক, এবং ক্রমে ক্রমে এর পরিধি বাড়তে বাড়তে সাড়ে পাঁচ লক্ষ ছেলেমেয়েকে অন্তর্ভুক্ত করেছে। এই সংস্থা বাড়ি বাড়ি গিয়ে ৫ থেকে ১৬ বছর বয়সী বাচ্চারা বা নবীনরা খুবই প্রাথমিক স্তরে পড়তে পারছে কিনা বা অংক করতে পারছে কিনা তার হিসাব নেই। এদের তথ্যভাণ্ডার শিক্ষাবিদ ও অর্থনীতিবিদদের কাছে বেশ সমাদৃত হচ্ছে।

ASER তথ্য বিশেষভাবে মূল্যবান শিক্ষার ঘাটতি বোঝার জন্যে। প্রথম থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত ছাত্রছাত্রীদের পড়তে দেওয়া হয়েছিল প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির পাঠ্যবই। কারা কেমন পড়তে পেরেছে তার একটা চিত্র সারণি-১-এ দেওয়া হয়েছে। এক একটি শ্রেণিকে ধরে তার ছাত্রছাত্রীদের পড়ার অবস্থার শতাংশ-ভিত্তিক বিবরণ রয়েছে। এই চিত্র গ্রামীণ ভারতের, যেখানে অবশ্যই শিক্ষার সুযোগ কম এবং দারিদ্র্য অনেক বেশি।

দেখা যাচ্ছে প্রথম শ্রেণিতে পড়ে অথচ অক্ষর চিনতে পারছে না এমন ছাত্রছাত্রী রয়েছে ৪৬.১ শতাংশ এবং প্রথম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তক পড়তে পারে মাত্র ৫ শতাংশ ছাত্রছাত্রী। দ্বিতীয় শ্রেণির ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে দ্বিতীয় শ্রেণির পাঠ্যপুস্তক পড়তে পারে ১৩.৪ শতাংশ। হতাশ হওয়ার কথা। যেহেতু ছাত্রছাত্রীদের দ্বিতীয় শ্রেণির ঊর্ধ্বে বই পড়তে বলা হয় নি, তাই এটাই হচ্ছে তাদের শিক্ষার ঊর্ধ্বতম মাপকাঠি। যত ওপরের শ্রেণিতে আমরা যাচ্ছি তত বেশি শতাংশ ছাত্রছাত্রী দ্বিতীয় শ্রেণির পাঠ্য পড়তে পারছে স্বাভাবিক ভাবেই। অষ্টম শ্রেণির ছাত্রছাত্রীদের ৭৩ শতাংশ দ্বিতীয় শ্রেণির পাঠ্যবই পড়তে পারছে, এবং সম্ভবত এদের অনেকেই আরো ওপরের শ্রেণির পাঠ্যবই পড়তে পারবে। কিন্তু হতাশার ব্যাপার হলো অষ্টম শ্রেণির পড়ুয়াদের মধ্যে ২৭ শতাংশ দ্বিতীয় শ্রেণির বই পড়তে পারছে না, এবং দুঃখজনকভাবে ১৩.৯ শতাংশ প্রথমশ্রেণির বইও পড়তে পারছে না।

শিক্ষার ঘাটতি বোঝার জন্যে একই ধরনের পরীক্ষা ও সার্ভে পূর্ব এশিয়ার উন্নতিশীল দেশগুলিতে নান সময় করা হয়েছে, এবং তার ভিত্তিতে বলা যায় যে গ্রামীণ ভারতের ছেলেমেয়েরা পূর্ব এশিয়ার গ্রামের ছেলেমেয়েদের তুলনায় শিক্ষার দিক থেকে দুই থেকে তিন বছর পিছিয়ে আছে।

অনেকেই বলবেন ভারতের ছেলেমেয়েরা নানা আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায়—বিশেষত গণিত, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যায়, সফল হচ্ছে। আমাদের আই.আই.টি, আই.এস.আই. এবং আই.আই.এস.সি. বিশষভাবে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন। এগুলি আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার শক্তির প্রমাণ। অনস্বীকার্য, কিন্তু আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার দুর্বলতার দিকটাও উপেক্ষা করা উচিত নয়। এটা বিশেষভাবে আরো গুরুত্বপূর্ণ, কারণ অল্পশিক্ষিত, দরিদ্র মানুষেরাই কলকারখানায় বা পরিষেবাক্ষেত্রে কায়িকশ্রম দেবে এবং শিক্ষা এদের উৎপাদনশীলতার একটি বিরাট উপাদান। বর্তমান অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় সফল হতে গেলে সাধারণ শ্রমিকের উৎপাদনশীলতা বাড়াতে হবে, এবং তাই স্কুল থেকেই এর প্রস্তুতি নিতে হবে শিক্ষা ও স্বাস্থ্যব্যবস্থার উন্নতির মধ্যে দিয়ে।

সারণি-১ : শ্রেণিভিত্তিক শিক্ষাঘাটতির শতকরা হিসাব (গ্রামীণ ভারত)

বর্তমানে যে শ্রেণিতে পড়ছে	অক্ষর চিনতে পারছে না (%)	বড়জোর অক্ষর চিনতে পারছে (%)	কিছু শব্দ পড়তে পারছে (%)	প্রথম শ্রেণির বই পড়তে পারছে (%)	দ্বিতীয় শ্রেণি বই পড়তে পারছে	মোট শতাংশ
প্রথম	৪৬.১	৩১.৭	১২.৪	৫.০	৪.৮	১০০
দ্বিতীয়	২৩.৫	৩১.৫	১৯.৮	১১.৮	১৩.৪	১০০
তৃতীয়	১৩.৬	২৪.১	১৯.৯	১৭.৩	২৫.১	১০০
চতুর্থ	৮.৫	১৭.২	১৭.৭	১৯.২	৩৭.৪	১০০
পঞ্চম	৬.০	১৩.৩	১৪.২	১৮.৬	৪৭.৮	১০০
ষষ্ঠ	৪.০	৯.৬	১১.৬	১৮.০	৫৬.৯	১০০
সপ্তম	২.৮	৭.২	৮.৯	১৫.১	৬৬.১	১০০
অষ্টম	২.০	৫.৪	৬.৫	১৩.১	৭৩.০	১০০

সূত্র : ASER 2016 (www.asercetre.org, p.52

শিক্ষা ঘাটতির কারণ

যারা শিক্ষক বা শিক্ষাকর্মী তাঁরা জানেন, শিক্ষা-ঘাটতির কারণ বহুবিধ। এর মধ্যে স্কুলের পরিকাঠামো—দরজা, জানালা, শৌচাগার, গ্রন্থাগার ইত্যাদি—যেমন রয়েছে, তেমনই রয়েছে শিক্ষকদের বেতন যথাযথ না হওয়া, তাঁদের ট্রেনিং ঠিকমত না হওয়া, কাজে ফাঁকি দেওয়া, এবং সর্বোপরি ছাত্রছাত্রীদের পড়াশুনোয় উৎসাহ হারিয়ে যাওয়া— প্রত্যেকটি বিষয়ই হচ্ছে বিস্তৃত গবেষণার বিষয়। এখানে আমি দু-একটি বিষয় নিয়ে লিখব।

সরকারি স্কুলে শিক্ষকদের ঠিকমত কাজ না করা—স্কুলে না আসা বা স্কুলে এসেও উৎসাহ নিয়ে না পড়ানো—নানা সময়েই খবর হয়ে উঠেছে, এবং গবেষকরা দেখছেন এই সমস্যা অনেক দেশেই আছে এবং দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলির মধ্যে বিশেষভাবে লক্ষণীয়। এমনিতেই শিক্ষা সর্বত্রই রাজনৈতিক দলগুলির একটি প্রিয় বিষয়। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জর্জ ডব্লু বুশ তাঁর কর্মসূচির মধ্যে রেখেছিলেন 'No child left behind'। যার ফলশ্রুতি হিসাবে 'ভাউচার' ব্যবস্থা অনেক রাজ্যে হয় এবং শিক্ষকদের বেতন ছাত্রছাত্রীদের পরীক্ষার ফলের সঙ্গে যুক্ত করা হয় (অনেক জায়গায়)। একই সময়ে ব্রিটিশ সরকার 'Every child matters' পলিসি নেয় এবং শিক্ষকদের কর্মপদ্ধতির অনেক সংস্কার করা হয় এবং প্রধানশিক্ষকদের দায়বদ্ধতা বাড়ানোর জন্যে বেশ কিছু পরিবর্তন আনা হয়। এখানে উল্লেখযোগ্য, আমেরিকা, ব্রিটেনসহ পাশ্চাত্যের সমস্ত দেশেই, প্রাথমিক ও উচ্চস্তরে স্কুল বলতে প্রায় সবই সরকারি। বেসরকারি স্কুল খুবই ব্যয়বহুল এবং বড়লোক ও উচ্চমধ্যবিত্ত ছাড়া অন্যরা কেউ সেখানে ছেলেমেয়ে পাঠানোর কথা ভাবতে পারে না।

ভারতে সরকারি স্কুলে শিক্ষকদের বেতন সাধারণত বেসরকারি স্কুলের থেকে বেশি এবং এই কারণে অভিভাবক বা কোনো কোনো রাজনৈতিক দল তাঁদের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করেন। পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান সরকার শিক্ষকদের প্রতি প্রকাশ্যেই সহানুভূতিহীন। মুখ্যমন্ত্রী ও তাঁর বহু সমর্থক বিদ্বজ্জন মনে করেন শিক্ষকদের বেশি মাইনে দেওয়া হচ্ছে। মাননীয়া আবার প্রাথমিক স্তরে তাঁর নিজের লেখা আঁকা ইত্যাদি (যা অত্যন্ত নিচুমানের ও হাস্যকর) পাঠক্রমের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়েছেন। পূর্বতন বামফ্রন্ট সরকার শিক্ষকদের বেতন বাড়িয়ে এবং শিক্ষক নিয়োগ পদ্ধতির সংস্কার করে স্কুলশিক্ষা ব্যবস্থায় একরকম নির্ভরযোগ্যতা এনেছিল। কিন্তু এটা ঠিক যে কাজে ফাঁকি দেওয়ার সমস্যার সমাধান হয় নি, এমনকি এই সমস্যা বেড়েও ছিল।

উৎসাহ তত্ত্ব (Incentive Theory) আধুনিক অর্থনীতিশাস্ত্রের একটি বিশেষ ক্ষেত্র। যে কোনো উৎসাহব্যঞ্জক প্রাপ্তি— মাইনে বৃদ্ধি, বাড়তি ভাতা, বা যাতায়াতের খরচায় ভরতুকি, সরকারি আবাসন ইত্যাদি—কাজকর্মের উপর প্রভাব ফেলে। কীভাবে ফেলে, কতটা কার্যকর হয় তা বোঝাই হচ্ছে উৎসাহ তত্ত্বের বিষয়। উৎসাহ প্রদানের মূল ও সবচেয়ে কার্যকর রাস্তা হল ব্যক্তিগত চুক্তি। যদি আমরা প্রত্যেকটি শিক্ষক, প্রত্যেকটি কর্মচারীর সাথে আলাদা আলাদা চুক্তি করতে পারতাম—যেমন কখন আসবেন, যাবেন, কী পড়াবেন, কী কী কাজ করবেন, কতগুলি হোমওয়ার্ক দেখবেন ইত্যাদি ইত্যাদি—তাহলে শিক্ষক বা কর্মচারীর কাজে ফাঁকি দেওয়ার সমস্যা অচিরেই সমাধান করা যেত।

কিন্তু এই চুক্তি-ব্যবস্থা একটা সমস্যা যেমন সমাধান করবে, তেমনি অন্যদিকে নতুন কিছু সমস্যার সৃষ্টিও করবে। যেমন স্কুল কর্তৃপক্ষ বৈষম্যমূলক আচরণ করতে পারেন, সহকর্মীদের মধ্যে হিংসা ও সন্দেহ বাড়বে এবং সর্বোপরি চুক্তি তৈরির সময় স্কুল কর্তৃপক্ষের কিছু তাৎক্ষণিক লক্ষ্য থাকতে পারে যা ভালো শিক্ষার পরিপন্থী হতে পারে।

এর বিপরীত ব্যবস্থাটা আমরা জানি। এক স্তরের সমস্ত শিক্ষক-শিক্ষিকাদের বেতন একই, নিয়মও একই, এমনকি প্রোমোশন বা মাইনে বাড়ার নিয়ম একই। পৃথিবীর সর্বত্রই সরকারি প্রশাসনে বেতন এবং কাজের নিয়ম 'সবার ক্ষেত্রেই একই' এইভাবে চলে। তার বড় কারণ এদের কাজের ফল (সরকারি পরিষেবা) মাপা সহজ নয় এবং সফলতা-অসফলতা বিচার করা শক্ত; যে কোনো সমষ্টিগত ব্যবস্থায় (অর্থাৎ যেখানে বহুলোকের এক সঙ্গে কাজ করার দরকার) এই একই সমস্যা। তাই এখানে স্থায়ী বেতনক্রম থাকে। এই কর্মচারীরা সহজেই এবং সাগ্রহে ইউনিয়ন গড়তে পারেন বা লাভবান হবেন। হাসপাতালের ডাক্তার বা স্কুল-শিক্ষকদের কাজের ফলাফল মাপা গেলেও, তাদের অসাফল্যের জন্য কাকে কতটা দায়ী করা যায়, তা নিশ্চয় বিতর্কিত বিষয়। সেই কারণে এদেরও বেতনক্রম আমাদের দেশে স্থায়ী এবং 'সকলের ক্ষেত্রেই এক'। কিন্তু মাইনে বাঁধা হলে এবং চাকরি স্থায়ী হলে, যত টাকাই মাইনে হোক না কেন, কাজে ফাঁকি দেওয়ার প্রবণতা অনেকের মধ্যেই থাকবে। অর্থাৎ বাঁধা মাইনে হলে ফাঁকির সমস্যা বাড়বে আর মাইনে পরিবর্তনশীল হলে ফাঁকির সমস্যা কমবে। অন্যদিকে বাঁধা মাইনে স্থায়িত্ব দেয়, তাই কর্মচারী সেই কাজে থেকে যাওয়ার চেষ্টা করবে। এর পাশাপাশি মাইনের কম বেশি, অর্থাৎ কতটা পাচ্ছে, একটা অন্য প্রভাব আনে। শিক্ষকের মাইনে বেশি হলে (যা বামফ্রন্ট সরকার করেছিল) বহু সংখ্যক মানুষ শিক্ষকের কাজে আগ্রহী হবেন, এর ভালো মন্দ দুটো দিকই আছে। ভালো দিকটি হলো শিক্ষকদের মধ্যে গড়পড়তা মেধা ও যোগ্যতা বাড়বে। বাজে দিকটি হল 'পড়াতে ভালোবাসেন না' কিন্তু মেধাবী এমন অনেকে শুধু বড় মাইনের টানে শিক্ষক হবেন; পরবর্তীকালে এঁরা ছাত্রছাত্রীদের মনে বিশেষ ছাপ ফেলতে পারবেন না।

সংক্ষেপে বলি, মাইনে বেশি হলে পড়াতে ভালোবাসেন না এমন অনেকেই শিক্ষক হবেন (যদিও তাঁদের ক্ষমতা যথেষ্ট), আবার মাইনে কম হলে অযোগ্য ও অমেধাবী শিক্ষকের সংখ্যা বাড়বে। অন্যদিক দিয়ে অত্যন্ত মেধাবী নন, কিন্তু পড়ানোয় আনন্দ পান এমন মানুষ বহু আছেন, তাঁরা চাকরি নাও পেতে পারেন। এই অন্তরের তাগিদ (Intrinsic motivation) বিষয়টি নিয়ে নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত ফরাসি অর্থনীতিবিদ Jean Tirole বর্তমানে প্রচুর কাজ করছেন। Tirole আধুনিক উৎসাহ তত্ত্বের এক প্রধান স্তম্ভ। এ-বিষয়ে আমাদের জ্ঞান এখনো বেশ কম, তবে একটা জিনিস অর্থনীতিবিদরা বুঝতে পারছেন যে অন্তরের তাগিদের সাথে আর্থিক উৎসাহের একটা বিরোধ আছে—এর সমাধান সহজ নয়।

বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে মালিকরা বা কর্তৃপক্ষ উপরের দুটি সমস্যাকে মোকাবিলা করার জন্য মাইনে বেশি দিতে রাজি থাকেন যাতে মেধাবী ছেলেমেয়েরা চাকরির আবেদনে আগ্রহী হয়। কিন্তু চাকরি পাওয়ার পর তাঁদের মাইনের মধ্যে বোনাস ইত্যাদি পরিমাণ বাড়িয়ে বেতনকে পরিবর্তনশীল করা হয়, যাতে তাঁর কাজে ফাঁকি না দেন। এই দুটির মধ্যে অবশ্য রয়েছে কর্মী নির্বাচন পদ্ধতি যার লক্ষ্য সঠিক যোগ্যতা বাছা এবং অন্তরের তাগিদ আছে কি নেই সেটা বোঝা।

আমাদের দেশে জনসংখ্যার চাপ অত্যন্ত বেশি। তাই কর্মী নির্বাচন পদ্ধতি অত্যন্ত যান্ত্রিক। পুলিশের চাকরি এবং শিক্ষকের চাকরি একই নিয়মে চলে। শিক্ষার ক্ষেত্রে অন্তরের তাগিদ বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দিনের পর দিন আমাদের শিক্ষাক্ষেত্র সর্বস্তরেই

কেন্দ্রীকরণের দিকে যাচ্ছে—সার্ভিস কমিশন, ইউজিসি রুল, বি.এড ট্রেনিং ইত্যাদি ইত্যাদি—এর ফলে যোগ্যতার দিকটাতে নজর পড়ছে অনেক, স্থানীয় দুর্নীতির হাত থেকে বাঁচা যাচ্ছে, কিন্তু উৎসাহী শিক্ষকের নির্বাচন আরো শক্ত হয়ে পড়ছে। অর্থাৎ অন্তরের তাগিদ এই ব্যাপারটা একেবারেই দেখা হচ্ছে না।

একটা উপায় আছে। যোগ্য অথচ নিরুৎসাহী শিক্ষককে উৎসাহ নিয়ে পড়ানোয় আগ্রহী করতে গেলে তাদের বোনাস দেওয়া যেতে পারে (মনে রাখা উচিত এঁরা বেশি টাকার জন্যেই শিক্ষকতায় এসেছেন)। বোনাস দেওয়া যেতে পারে ছাত্রছাত্রীদের পরীক্ষার ফলের ভিত্তিতে। প্রস্তাবটি শুনতে অবান্তর মনে হলেও বাস্তবে কিন্তু প্রয়োগ করা হয়েছে। এর কিছু প্রয়োগগত জটিলতা আছে, যেমন বোনাস কী দেওয়া হবে ক্লাসের গড়পড়তা নম্বরের ওপর, না কত শতাংশ লেটার গ্রেড পাচ্ছে তার ওপর? এটি কি সব সাবজেক্টে দেওয়া হবে নাকি বেছে বেছে দু-একটি সাবজেক্টের ওপর? ইত্যাদি অনেক রকম। এইসব গবেষণায় দেখা যাচ্ছে যে বোনাস উৎসাহে ছাত্রদের ফল ভালো হচ্ছে। একই সঙ্গে কিছু নেতিবাচক দিকও দেখা যাচ্ছে, শিক্ষার গুণগত ব্যাপারে; মুখস্তবিদ্যার ওপর জোর পড়ছে, শুধুমাত্র পরীক্ষাকেন্দ্রিক পড়াশোনা হচ্ছে (teaching to test), এমনকি পরীক্ষাও হয়ে যাচ্ছে স্মৃতিনির্ভর। আমেরিকার একটি রাজ্যে আরো ভয়াবহ একটি ফল দেখা গিয়েছিল—শিক্ষকরা ছাত্রদের পরীক্ষায় সাহায্য করেছিলেন, গোপনে অবশ্যই, পরে তাঁরা ধরা পড়ে যান। এ বিষয়ে একটি চমৎকার লেখা আছে ডাবনার ও লেভিট লিখিত Freakonomics বইটিতে, বইটি সাধারণ পাঠকদের জন্য লেখা, সবাই পড়তে পারবেন।

পশ্চিমবঙ্গে কী করা যেতে পারে তা দীর্ঘ আলোচনাসাপেক্ষ। কিন্তু বিদ্যালয় পরিচালনায় প্রধান শিক্ষককে কিছু স্বাধীনতা দেওয়া উচিত। তাঁর ক্লাসে তিনি কীভাবে পড়ালে সমস্ত ছাত্রছাত্রী উপকৃত হবেন, তিনিই ভালো বুঝবেন। একই নিয়ম সর্বত্র খাটে না। শিক্ষকদের প্রতিদিন স্কুলে আসার বাধ্যবাধ্যকতা কেন থাকবে? কলেজ অধ্যাপকদের মতো তাঁদেরও অফ-ডে দেওয়া যেতে পারে। কোনো শিক্ষিকা যদি তিনদিনের কাজ দুদিনে শেষ করতে পারেন তাহলে ক্ষতি কী? মনে রাখতে হবে বহু শিক্ষিকা তরুণী মা; তাঁদের নিজেদের শিশু সন্তান আছে। প্রতিদিন দীর্ঘ বাসযাত্রা করে চাকরি করা তাঁদের ও তাঁদের শিশুর ওপর বিশেষ চাপ সৃষ্টি করে। তাই কর্মপদ্ধতির কিছু সংস্কার কাম্য। একই সঙ্গে ক্লাস নেব না, এমন আলসেমি মানা যাবে না। একজন ছাত্রও ক্লাসে থাকলে ক্লাস নেওয়া উচিত। অবশ্য এসবের বাইরেও বহু বিষয় রয়েছে যা শিক্ষক-শিক্ষিকার নিয়ন্ত্রণের বাইরে। শিক্ষকরা সংঘবদ্ধ হয়ে (তাঁদের ইউনিয়নের মাধ্যমে বা সংগঠনের মাধ্যমে) সেই বিষয়গুলির মোকাবিলা করতে পারেন বা করা উচিত।

সরকারি না বেসরকারি স্কুল?

ভারতের অন্যান্য রাজ্যে অনেক আগেই শুরু হয়েছিল, পশ্চিমবঙ্গে হয়েছে অনেক পরে—দিকে দিকে সরকারি স্কুল ছেড়ে বেসরকারি স্কুলে ভর্তি হওয়া। অনেকেই একমত হবেন যে বেসরকারি স্কুলের একটা বড় আকর্ষণ হলো ইংরাজি। সম্ভবত এই কারণেই বহু সমালোচক/বিশেষজ্ঞ বামফ্রন্ট সরকারের কয়েক বছরের জন্য প্রাথমিক স্তরে ইংরাজি তুলে দেওয়ার সিদ্ধান্তকে সবচেয়ে ক্ষতিকারক সিদ্ধান্ত বা বেসরকারি স্কুলে ঝোঁকার কারণ বলে চিহ্নিত করেন।

অর্থনীতিবিদদের খুশি করার মতো কোনো গবেষণাপত্র আমি এখনো দেখি নি, যেখানে এই মত প্রমাণ করা হয়েছে। আমার নিজের অনুমান ইংরাজি একটা প্রধান কারণ ঠিকই, কিন্তু এই ইংরাজির দিকে ঝোঁকের শুরু আশির দশকের মাঝামাঝি থেকেই, যখন আস্তে আস্তে বিদেশি ও বহুজাতিক কোম্পানির জন্যে দরজা খোলা হচ্ছে তখন থেকে। অতীতে বহুজাতিক কোম্পানিতে কাজ করত ধনী ও উচ্চশিক্ষিত শ্রেণির মানুষরা এবং এদের সম্পর্কে নিম্ন বা মধ্য মধ্যবিত্ত মানুষরা বিশেষ কিছু জানতই না (পুরনো বাংলা সিনেমায় এইসব পরিবার দেখা যেত)।

একদিকে বিদেশি কোম্পানির চাকরি এবং ভারতীয় বৃহদায়তন কোম্পানিগুলির বিস্তার এবং অন্যদিকে পশ্চিমবঙ্গে চাকরির অভাব—দুইয়ে মিলে ইংরাজির দিকে ঝোঁক বাড়িয়েছে, বিশেষ করে ইংরাজি বলতে পারা। এর পরে নব্বই-এর দশকে সফ্‌ট্‌ওয়্যার প্রযুক্তির উন্নতি, ডট্‌কম রিভোলিউশন এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভারতের সফ্‌ট্‌ওয়ারে অভূতপূর্ব সাফল্য এই ইংরাজি ও বিজ্ঞানমুখী ঝোঁককে আরো বহুগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে। বোঝা যাচ্ছে সরকারি স্কুল এই পরিবর্তনের সাথে তাল মেলাতে পারে নি। তার ফলে সরকারি স্কুল বেশির ভাগ জায়গাতেই গরিবদের স্কুল এবং যেসব সরকারি স্কুল নাম করা, দেখা যাচ্ছে তারা বেশিরভাগই ভর্তির পরীক্ষার মাধ্যমে বেছে বেছে ছাত্রছাত্রী ভর্তি করে। সরকারি স্কুলে ছাত্রসংখ্যা কমার ফলে অনেক জায়গায় স্কুল বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে এবং শিক্ষকনিয়োগ কমে যাচ্ছে। বিষয়টি দুর্ভাগ্যজনক, কারণ সরকারি স্কুল ছাড়া দরিদ্রবাড়ির ছেলেমেয়েদের শিক্ষায় এগোনো সম্ভব নয়।

এ ক্ষেত্রে দুটি বিষয় রয়েছে। প্রথমত, বাবা-মা ছেলেমেয়েদের ভবিষ্যতের কথা ভেবে যে স্কুল 'ভালো মনে হবে' সেখানে পাঠাবেন এর মধ্যে অন্যায় বা বিতর্কের কিছু নেই। কিন্তু এটাও সত্যি যে আমাদের ব্যক্তিগত সিদ্ধান্তের কিছু সামাজিক বা সমষ্টিগত প্রভাব আছে। মধ্যবিত্ত শ্রেণির বাবা-মা-রা যত বেসরকারি ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের দিকে ঝুঁকবেন, তত সরকারি স্কুলের এক প্রকার গুণগত অবনমন হবে, কারণ অশিক্ষিত দরিদ্র বাবা-মা-রা পঠনপাঠনের ঠিক গুণগত বিচার করতে পারেন না, তাই স্কুলের কাছে তাঁরা বিশেষ কিছু দাবিও করবেন না। শিক্ষকরাও ছাত্রদের উৎসাহের অভাবে পড়ানোর উৎসাহ হারাবেন। কিন্তু এই দুর্ভাগ্যজনক প্রক্রিয়ার জন্য মধ্যবিত্ত বা ধনী বাবা-মা-কে দায়ী করা অর্থহীন। সরকারেরই দায়িত্ব এই সমস্যা সমাধান করার।

দ্বিতীয় বিষয়টি হল, বাবা মা-রা যে স্কুলকে ভালো মনে করছেন বা যে স্কুল বছরের পর ভালো রেজাল্ট দিচ্ছে সে স্কুলকে কেন ভালো বলব? প্রশ্নটি একটু বদলে এভাবে বলা যেতে পারে; স্কুল ভালো বলে রেজাল্ট ভালো হয়, না ভালো ছেলেরা এইসব স্কুলে আসে বলে রেজাল্ট ভালো? তাছাড়া ভালো ছেলেদের পিছনে বাবা মা-র প্রচুর যত্ন উদ্যোগ এবং প্রাইভেট ট্যুইশানি থাকতে পারে। প্রশ্নটি একদিক দিয়ে 'ডিম আগে না মুরগি আগে'—এমন ধরনের প্রশ্ন।

অর্থনীতিবিদদের কাছে এই ধরনের সমস্যা—কোন্‌টা আগে কোন্‌টা পরে—বহু ক্ষেত্রেই আসে। শিক্ষার ক্ষেত্রে এই প্রশ্নের উত্তর বের করা বেশ জটিল। জটিলতার বড় কারণ হলো ভালো বা উচ্চ মেধার বা বেশি উদ্যোগী ছাত্রছাত্রীরা স্বাভাবিকভাবেই তথাকথিত ভালো স্কুলের দিকে আকৃষ্ট হবে। যদি শুধুমাত্র লটারির মাধ্যমে (মেধা বা পূর্ব পড়াশোনার রেজাল্ট উপেক্ষা করে) ছাত্রছাত্রী ভর্তি করা হত, তাহলে এই সমস্যা বোঝার জটিলতা অনেক কমে যেত, অত্যন্ত গবেষণার দিক দিয়ে। কিন্তু বাস্তবে তা হয় না। ফলে অর্থনীতিবিদরা কিছু পরোক্ষ (এবং জটিল) পদ্ধতি ব্যবহার করেন এবং সরকারি বনাম বেসরকারি স্কুল কোন্‌টা বেশি ভালো—এই প্রশ্নের কিছু উত্তর পাওয়া গেছে।

সাধারণভাবে দেখা যায় যে উন্নত দেশগুলিতে বেসরকারি স্কুল ভালো সরকারি স্কুলের থেকে। উন্নতিশীল দেশগুলিতে চিত্রটি মিশ্র। দক্ষিণ আমেরিকায় দেখা যাচ্ছে, হয় সরকারি ও বেসরকারি স্কুলের মধ্যে বিশেষ তফাৎ নেই, নয়ত সরকারি স্কুল ভালো। চীন এবং ইন্দোনেশিয়ার ক্ষেত্রেও সরকারি স্কুলকে অপেক্ষাকৃত ভালো দেখা যাচ্ছে। ভারতের ক্ষেত্রে সীমিত গবেষণায় দেখা যাচ্ছে কোথাও কোথাও বিশেষ ফারাক নেই, আবার বেশ কিছু জায়গায় প্রাইভেট স্কুলকে ভালো দেখা যাচ্ছে, বিশেষত ইংরাজি বা গণিতের ক্ষেত্রে, উল্টোদিকে স্থানীয় ভাষার ক্ষেত্রে সরকারি স্কুল এগিয়ে রয়েছে। এক কথায় দেখা যাচ্ছে বাবা মায়েদের বেসরকারি স্কুলের দিকে ঝোঁকা অমূলক নয়। সুতরাং সরকারি স্কুলের ভবিষ্যৎ সংকুচিত হতে থাকবে।

কী করা যেতে পারে?

সরকারি স্কুলের বেসরকারিকরণ নয়, সরকারি স্কুলের সংস্কার এবং আধুনিকীকরণ জরুরি। যেমন, ইংরাজির বিষয়টি ধরা যাক। সরকারি স্কুলে ইংরাজি লেখা ও পড়ার পাশাপাশি কেন ইংরাজি বলতে শেখানো হবে না? ছোটোখাটো কাজ চালানোর মতো ইংরাজি বলা অনায়াসেই শেখানো যেতে পারে। প্রয়োজনে শিক্ষকদেরও ট্রেনিং দেওয়া যেতে পারে। মাতৃভাষাকে উপেক্ষা না করেও ইংরাজি শিক্ষার উন্নতি করা যায়, এবং আমাদের বিশ্বাস এই একটি মাত্র কাজই সরকারি স্কুলের ওপর আস্থা ফিরিয়ে আনবে। বিষয়টি ভেবে দেখার ব্যাপার।

দ্বিতীয় ব্যাপারটি হলো শিশুর শিক্ষার দায়িত্ব (অন্তত ১৪ বছর বয়স অবধি) বাবা-মার উপরে ছাড়লে চলবে না, স্কুলকে দায়িত্ব নিতে হবে। যারা পড়াশুনায় দুর্বল, বা পিছিয়ে পড়ছে বা অনিয়মিত স্কুলে আসছে তাদের জন্যে আলাদাভাবে নজর দিতে হবে, এবং প্রয়োজনে সাময়িক মেয়াদের শিক্ষকও নিয়োগ করা যেতে পারে। বিষয়টি ব্যায়বহুল, কিন্তু বিরল্প নেই। যে কোনো শিক্ষকের কাছেই প্রাথমিক স্কুলে এবং বিশ্ববিদ্যালয়েও, ছাত্রছাত্রীর অনাগ্রহ অত্যন্ত হতাশার ব্যাপার; মনে হবে সব চেষ্টা জলে গেল। কিন্তু অনাগ্রহী ছাত্রছাত্রীকে আগ্রহীতে রূপান্তরিত করার আনন্দও অতুলনীয়। শিক্ষকমাত্রেই জানেন আসল শিক্ষার চাবিকাঠি ছাত্রছাত্রীর মনের মধ্যে শেখার আগ্রহ সৃষ্টি করা।

তৃতীয়ত, প্রাথমিক স্তরে শিক্ষা ও স্বাস্থ্যকে একসূত্রে বাঁধা দরকার। দুর্বল স্বার্থের কারণে পড়াশোনা ব্যাহত হয় এবং তার ফলে স্কুলে যাওয়া ছেড়ে দেয়। সুতরাং মিড-ডে মিলকে পুষ্টিদায়ক করে তোলা দরকার এবং ছাত্রছাত্রীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষার বিষয়টিও স্কুলে বা স্কুলের ও স্থানীয় স্বাস্থ্যকেন্দ্রের সমন্বয়ে দেখাশোনা করা উচিত।

চতুর্থত, অদূর ভবিষ্যতে কারিগরি বিদ্যা চালু করা উচিত মাধ্যমিক স্তরে। বর্তমানে এটি আই.টি.আই.-এর ওপর ছেড়ে দেওয়া আছে। কিন্তু বাধ্যতামূলকভাবে বাংলা (বা স্থানীয় ভাষা) ইংরাজি, গণিত ও বিজ্ঞানের শিক্ষার পাশাপাশি কিছু কারিগরিবিদ্যার (ঐচ্ছিক) সুযোগ রাখা দরকার। কারণ যারা উচ্চশিক্ষায় যাবে না বা যেতে পারবে না, কিন্তু কাঠের কাজ শিখতে চায় বা রাজমিস্ত্রির কাজ শিখতে চায়, তাদের কেন স্কুল ছেড়ে ঠিকে মজুরের কাজ করতে হবে? এই শিক্ষা স্কুলে বা স্কুলের সাহায্যে কোনো কারিগরি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে দেওয়া যেতে পারে।

পরিশেষে বলব, বাঙালির ইতিহাসে ভালো স্কুল গড়ে তোলার অনেক গৌরবজনক অধ্যায় আছে। আজকের সরকারি (বা স্পনসর্ড) স্কুলের সবই এক সময় স্থানীয় মানুষের উদ্যোগে বা কোথাও কোনো ধনী ব্যক্তির দানে তৈরি হয়েছিল। আজও দিকে দিকে বহু শিক্ষকের নিরলস প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে। এঁদের কাছ থেকে শিক্ষা নিয়ে সেই চেষ্টা যদি আমরা সমাজের বাকি অংশে পৌঁছে দিতে পারি, তবেই শিক্ষা সর্বজনীন হয়ে উঠবে। আর এ বিষয়ে সরকারকেই সবচেয়ে বেশি উদ্যোগ নিতে হবে। বর্তমান সরকার অপচয়ে আগ্রহী, তাদের চিন্তাভাবনার বিশেষ কোনো প্রমাণ নেই। সর্বোপরি রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ ও এক বিশেষ ব্যক্তিত্বের ব্যক্তিপূজাই তাদের লক্ষ্য বলে মনে হচ্ছে। তবু ভরসা, শিক্ষকরাই শিক্ষার বাতি আগলে রাখবেন।

তথ্যসূত্র

ASER (2016). Annual Status of Education Report (rural) 2016, www.asercentre.org

Banerjee, A. V. &Duflo, E. (2011) Poor Economics: Rethinking Poverty & the Ways to End it. Random House India: Noida, UP

Chaudhary, A. B. & Kaul, V. (2015) Ensuring learning at the elementary stage: Are children school-ready?

Chaudhury, N., Hammer, J., Kremer, M., Muralidharan, K., & Rogers, F. (2006). Missing in Action: Teacher and Health Worker Absence in Developing Countries.*Journal of Economic Perspectives,* 20(1), 91-116.

Chudgar, A., & Quin, E. (2012). Relationship Between Private Schooling and Achievement: Results from Rural and Urban India. *Economics of Education Review,* Vol. 31: 376-90.

Desai, S., Dube, A., Vanneman, R., & Banerji., R. (2008). 'Private Schooling in India – A New Educational Landscape', mimeo University of Maryland and NCAER.

Duflo, E., Hanna, R. and Ryan, S. (2012). Incentives Work: Getting Teachers to Come to School. *American Economic Review*, 102(4), pp.1241-1278.

Dutta, P. V. (2006). Returns to Education: New Evidence for India, 1983-1999. *Education Economics* 14(4), 431-451.

EdInvest (2000), *Investment Opportunities in Private Education in India*, International Finance Organization, available online at http://www.ifc.org.

Government of India (2016a). Education Statistics at a Glance, Ministry of Human Resources Development, New Delhi

Government of India (2016b).Themes and questions for policy consultation on school education, Ministry of Human Resource Development.

Jimenez, E., and Lockheed, M. E. (1991). Private versus public education: An international perspective. *International Journal of Educational Research*, 15(5), 353-497.

Kingdon, G. (1996). The quality and efficiency of private and public education: A case-study of urban India. *Oxford Bulletin of Economics and Statistics*, 58(1), 57-82.

Levitt, S. D. & Dubner, S. J. (2005). *Freakonomics: A Rogue Economist Explores the Hidden Side of Everything*, Allen Lane: New York.

Muralidharan, K. and Sundararaman, V. (2011). Teacher

Performance Pay: Experimental Evidence from India. *Journal of Political Economy*, 119(1), pp.39-77.

NCERT (2015) What students of class V know and can do: A summary of India's National Achievement Survey, class V (Cycle V), National Council of Educational Research and Training.

Newhouse, D., & Beegle, K. (2006). The Effect of School Type on Academic Achievement: Evidence from Indonesia.*Journal of Human Resources*,41, 529-557.

Pal, S. (2010). Public infrastructure, location of private schools and primary school attainment in an emerging economy.*Economics of Education Review*, 29, 783-794. https://doi.org/10.1016/j.econedurev.2010.02.002

Pal, S. &Saha, B. (2018). Failing to learn: India's schools and teachers, in Kanungo, R. P., Rowley, C., and Banerjee, A. N. (eds.) Changing the Indian Economy: Renewal, Reform and Revival, Elsevier: Amsterdam

Saha, B. &Saha, S. (1999) Schooling, informal experience and formal sector earnings.*Review of Development Economics*, 3(2), pp. 187-199

Singh, A. (2015). Private school effects in urban and rural India: Panel estimates at primary and secondary school ages, *Journal of Development Economics*, 113(C), 16-32, https://doi.org/10.1016/j.jdeveco.2014.10.004

Somers, M. A., McEwan, P. J., &Willms, J. D. (2004). How effective are private schools in Latin America? *Comparative Education Review*, 48, 48-6

Tooley, J., & Dixon. P. (2003) Private Schools for the Poor: A Case Study from India, CfBT Research and Development, UK.

Happy Puja Greetings from

Real Kajora Colliery Employees
Co-Operative Credit Society Ltd.

Reg. No. 140 of 19.06.87

At : Nabakajora Colliery, Dist. Paschim Bardhaman

Sl. No. 118

With best compliments from

M/s. BENGAL CONSTRUCTION & CO.

T.C. ROAD (CHAUL PATTY)
P.O. TARAKESWAR, DIST. HOOGHLY
PIN : 712410

Sl. No. 35

ভাষার অপমৃত্যু—এই দেশ, এই বিশ্ব

কল্যাণ সান্যাল

আধুনিক পৃথিবী সঙ্গত কারণেই বৈচিত্র্য রক্ষার প্রশ্নটিকে বেশ গুরুত্বসহকারে আলোচ্য বিষয়ের মর্যাদা দিয়ে থাকে। প্রকৃতপক্ষে এ বিষয়ে কতটা কী করা যেতে পারে অথবা করা সম্ভব তা নিয়ে মাথাব্যথা খুব কিছু আছে বলে মনে হয় না। কারণ উন্নয়ন নিয়ে যারা বাগাড়ম্বর করে থাকেন তাঁরা সব কিছু ছাড়তে রাজি থাকেন শুধু তথাকথিত উন্নয়নের স্বার্থেই। আর সেকারণেই অনেক আইন প্রণীত হলেও বনাঞ্চলের পরিবেশ রক্ষা পায় না, রক্ষা পায় না জলাভূমি অথবা পর্বতাঞ্চল। দূষণ নিয়ন্ত্রণের আইন প্রণীত হয়, পর্ষদ গঠিত হয়, কিন্তু কাজের কাজ কিছু হয় না। তেমন একটি ব্যবস্থায় ভাষাবৈচিত্র্য মর্যাদা পাবে এমন ভাবা অবিমৃষ্যকারিতা বললে কম বলা হয়। অথচ আমাদের এই পৃথিবী এবং বিশেষভাবে আমাদের এই দেশ বিভিন্ন বৈচিত্র্যে পরিপূর্ণ। ভাষাবৈচিত্র্য শুধু এ দেশেই নয় সারা পৃথিবীতেই বোধ হয় সব থেকে বড় মাপের বৈচিত্র্যের সূচক। এই বৈচিত্র্য রক্ষা করার সচেতন প্রয়াস আশা করা একটু বাড়াবাড়ি হয়ে যায় একারণে যে বৈচিত্র্য সম্পর্কে তেমন কোনো ধারণাই জনমানসে গড়ে ওঠে নি। আসলে তেমন কোনো উপলব্ধি আপনা থেকে গড়ে ওঠে না, তা গড়ে তুলতে হয়। সেই গড়ে তোলার কাজটি একটি সংবেদনহীন রাষ্ট্রযন্ত্র এবং তার পরিচালক শাসনযন্ত্রের পক্ষে করা সম্ভব নয়। তবে যেভাবে সারা বিশ্বজুড়ে গণতন্ত্রের জয়ধ্বনি শোনা যায়, সেই পরিপ্রেক্ষিতে রাষ্ট্রপরিচালকদের কাছে এমন দাবি করা অসঙ্গত নয় যে প্রতিদিন যেভাবে ভাষার অপমৃত্যু ঘটছে তা আটকানোর দায়িত্ব রাষ্ট্রেরই এবং রাষ্ট্র সেই দায়িত্ব পালনে অক্ষম হলে তা গণতন্ত্রের ব্যর্থতা ছাড়া অন্য কিছু নয়। সাম্প্রতিক একটি ভাষা সমীক্ষা ভাষার এই অপমৃত্যু চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে।

গত পঞ্চাশ বছরে ভারতে দুইশত কুড়িটি ভাষা হারিয়ে গেছে। বর্তমানে ব্যবহৃত এবং সজীব ভাষার সংখ্যা এদেশে আটশত পঞ্চাশ। এই তথ্যটিতে আনন্দিত হওয়ার কিছু নেই। সমীক্ষকদের আশঙ্কা যে আগামী পঞ্চাশ বছরে চারশত ভাষা অবলুপ্ত হবে—শুধু এদেশেই। অবশ্য সারা পৃথিবী জুড়ে এই সময়কালে চার হাজার ভাষা অবলুপ্ত হবে। বর্তমানে পৃথিবীতে ভাষার সংখ্যা ছয় হাজার। অর্থাৎ সারা পৃথিবীতে আগামী অর্ধশতকে যত ভাষা বিলুপ্ত হবে, এদেশে বিলুপ্ত হবে তার এক-দশমাংশ। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে পৃথিবীতে চারটি মাত্র দেশে—ভারত, নাইজেরিয়া, ইন্দোনেশিয়া এবং পাপুয়া নিউগিনি—বিরাট সংখ্যক সজীব ভাষার অস্তিত্ব বর্তমান। কিন্তু যা আজ গর্বের বিষয় একদিন তাই অগৌরবে পর্যবসিত হবে।

ভারতে ভাষা-সমীক্ষার কাজটি প্রথম শুরু হয়েছিল ১৯০৩ সালে। ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসের সদস্য এবং ভাষাবিদ জর্জ আব্রাহাম গ্রিয়ারসন ভারতের ভাষাগত বৈচিত্র্য খুঁজে দেখার দুরূহ কাজটি প্রথম শুরু করেছিলেন। পঁচিশ বছর ধরে নিরন্তর গবেষণা চালিয়ে তিনি খুঁজে পেয়েছিলেন পাঁচশত ভাষা এবং ১৯২৮ সালে প্রকাশিত হয়েছিল তাঁর এদেশের ভাষা সংক্রান্ত প্রথম প্রতিবেদনটি। এরপর অপেক্ষা করতে হয়েছিল অনেকগুলি বছর। জনগণনার সঙ্গে ভাষাগোষ্ঠী খুঁজে দেখার কাজ ঠিকঠাক সম্পন্ন হল ১৯৬১ সালের জনগণনায়। ঐ জনগণনায় ১৬৫২টি মাতৃভাষার খোঁজ পাওয়া গেল। যদিও গণনাকারীদের ভুলভ্রান্তির কারণে একথা মনে

করা হয়েছে যে প্রকৃতপক্ষে ঐ সংখ্যাটি ১১০০-র বেশি হওয়ার কথা ছিল না। যাই হোক, চমকপ্রদ তথ্য হল এই যে পরবর্তী জনগণনাতে ভাষার সংখ্যা কমে দাঁড়াল ১০৮টিতে। অবশ্য ১৯৭১ সালের জনগণনায় দশ হাজারের বেশি মানুষ ব্যবহার করেন এমন ভাষাগুলিকেই গণনাযোগ্য বলে মনে করা হয়েছিল। কিন্তু কেন সেভাবে ভাষাসমীক্ষা করা হল তার যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা কিছু দেওয়া হয়নি। ২০১১ সালের সর্বশেষ জনগণনায় এই সংখ্যাটি বেড়ে দাঁড়িয়েছে একশত বাইশটিতে। অথচ এই সময়কালে অনেক ভাষার অপমৃত্যু ঘটেছে। সরকারি ভাষাসমীক্ষার নানা দুর্বলতা উপলব্ধি করেই গড়ে তোলা হল একটি অসরকারি সংগঠন—'ভাষা গবেষণা এবং প্রকাশনা কেন্দ্র'। অধ্যাপক জি.এন. ডেভি-র নেতৃত্বে তিন হাজার সমীক্ষক নেমে পড়লেন ভাষা সমীক্ষার কাজে। ২০১০ সালে শুরু হওয়া এই কর্মকাণ্ডে অর্থসাহায্য পাওয়া গেল জামশেদজি টাটা ট্রাস্টের কাছ থেকে। ২০১৩ সাল থেকে প্রকাশিত হতে শুরু করেছে রাজ্যভিত্তিক ভাষাসমীক্ষার ফলাফল। দেশের সব অংশের সমীক্ষার চালচিত্র ২০২০ সালের মধ্যে প্রকাশিত হয়ে যাবে। রাষ্ট্রের পক্ষে এও এক অগৌরবের কথা। যে সমীক্ষা করার জন্য একাদশ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় অর্থ বরাদ্দও হয়ে গিয়েছিল, সেই ভাষা সমীক্ষার কাজ কিছুই এগোয়নি। এসব দেখে কেউ প্রশ্ন করতেই পারেন যে রাষ্ট্র কি আদৌ ভাষাবৈচিত্র্য রক্ষার প্রশ্নটিকে গুরুত্ব দিতে চায়! বিশেষত এই সময়ে যখন 'একজাতি—একরাষ্ট্র—একতা' সব রাষ্ট্রেই মন্ত্রের মত উচ্চারিত হচ্ছে। আর সবার উপরে বাজার সত্য। বাজার অর্থনীতি বৈচিত্র্য পছন্দ করে না। তাই বাজারের ভাষাই রাষ্ট্রীয় সমর্থন পায়। আবার বাজারের আগ্রাসনই অপেক্ষাকৃত ছোটো গোষ্ঠীর ভাষাকে গুরুত্বহীন করে দেয়। অর্থনৈতিক কারণে ভাষার বিপন্ন হওয়ার নজির আমাদের এই দেশে খুঁজে পাওয়া কঠিন নয়। গত পঞ্চাশ বছরে যে-সব ভাষা বিলুপ্ত হয়েছে তার বেশিরভাগই সমুদ্র-উপকূলবর্তী অঞ্চলের ভাষা। গভীর সমুদ্রে মাছ ধরার আধুনিক প্রযুক্তি নিয়ে করপোরেট শক্তি যখন ঝাঁপিয়ে পড়ল তখন যারা এতদিন সমুদ্রে মাছ ধরার জীবিকায় নিয়োজিত ছিলেন তাঁরা জীবিকাচ্যুত হলেন। দীর্ঘকালের বসবাসের অঞ্চল থেকেও তাঁরা সরে যেতে বাধ্য হলেন। সমীক্ষকরা দেখিয়েছেন জীবিকা হারিয়ে এভাবে বহু মানুষ তাঁদের ভাষাকেও হারালেন।

সমস্যাটা আসলে এখানেই। কোনো জনগোষ্ঠীর দীর্ঘদিনের ব্যাবহৃত ভাষা যখন হারিয়ে যায় তখন সেই সঙ্গেই হারিয়ে যায় আরও অনেককিছু। ভাষা ভাব প্রকাশের মাধ্যম ছাড়া আরও বেশি কিছু। একটি ভাষার অবলুপ্তি একটি সংস্কৃতির অবলুপ্তি ঘটায়। ভাষার অবলুপ্তির সঙ্গে সঙ্গে ঐতিহ্যগত জ্ঞানভাণ্ডার বিনষ্ট হয়, বিনষ্ট হয় সামাজিক ভারসাম্য। সুতরাং যা একান্ত প্রয়োজন তা হল প্রচলিত ভাষাসমূহের সংরক্ষণের এক সুচিন্তিত নীতি। সেই নীতি প্রণয়ন সম্ভব যদি নীতিপ্রণেতাগণ শুধু সহানুভূতি নয়, সমানুভূতির দ্বারা চালিত হন। ভাষা বিপন্ন হয় অনেকভাবে—স্বীকৃতির অভাবে, জনবসতি উচ্ছেদের কারণে, জীবিকানির্বাহে ভাষা সহায়ক না হওয়ার কারণে, ভাষা যথেষ্ট উন্নত নয় এমন একটি হীনমন্যতার কারণে। উল্লিখিত সমস্ত কারণগুলি রাষ্ট্রীয় সহায়তায় দূর হতে পারে এবং অবলুপ্তির করাল গ্রাস থেকে ভাষা রক্ষা পেতে পারে। আসলে যা প্রয়োজন তা হল সদিচ্ছা।

With Best Compliments of

M & D ENTERPRISE

DURGAPUR

Sl. No. 102

বিপদে প্রবাল প্রাচীর

অরবিন্দ দাশ

প্রবাল প্রাচীর প্রকৃতির এক বিস্ময়কর উপাদান। প্রবাল কীট এক ধরনের আঠালো ক্ষুদ্র আকৃতির অমেরুদণ্ডী সামুদ্রিক প্রাণী। এই কীটের খোলস বা কঙ্কালটি প্রবাল বা পলা নামে পরিচিত। প্রবাল কীট দেখতে অনেকটা একমুখ বন্ধ নলের মতো। বন্ধ মুখটিতে থাকে আঁকড়ে ধরার উপযোগী সরু সরু আকর্ষী। অ্যানথোজোয়া গোষ্ঠীভুক্ত এই কীটসমূহ সাধারণ বহিঃত্বকের চারপাশে এক ধরনের অস্থিময় বস্তু ক্ষরণ করে এবং তাতে চুনাপাথরের কঠিন এক কঙ্কাল সৃষ্টি হয়। কঙ্কালটি এই কীটের শরীরের বহিরাবরণ মাত্র। বাইরের আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা ও শরীরের ওজন সুষম রাখার প্রয়োজনে এইরূপ কঙ্কাল সৃষ্টি হয়। কীটের শরীরের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কঙ্কালটির আকারে দেহাবরণটিও গঠিত হয়। প্রথমে প্রবাল কীট জলের তলায় অবস্থিত কোনো পাথরের সঙ্গে নিজেকে আটকে নেয়, আর কঙ্কালটিও সেইখানে শরীর ঘিরে বাড়তে থাকে। প্রবাল কীটের শরীর থেকে জন্ম নেয় তাদের বাচ্চারা এবং খোলের ভিতর তারা বাড়তে থাকে। মা-কীট মারা গেলে বাচ্চা-কীট সেই খোলেই থেকে যায় এবং নতুন কীট সৃষ্টি করে চলে। এইভাবে লক্ষ কোটি প্রবাল কীট বসতি গড়ে ওঠে। আর তাদের খোলসটি, যার নাম প্রবাল, সেটি সমুদ্রে স্তরে স্তরে সজ্জিত হয়ে গড়ে ওঠে প্রবাল প্রাচীর বা প্রবাল দ্বীপ। এমন একটি প্রবাল প্রাচীর গড়ে উঠতে সময় লাগে হাজার হাজার বছর।

১৯৯৭ সাল ছিল প্রথম আন্তর্জাতিক প্রবাল প্রাচীর বর্ষ। মানুষকে প্রবাল প্রাচীর ও তার ক্রমবর্ধমান বিপদ সম্পর্কে অবহিত করার জন্য বিশ্বের ৫০টি দেশের ২২৫টিরও বেশি সংস্থা আলোচনায় অংশগ্রহণ করে। দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক প্রবাল প্রাচীর বর্ষ পালিত হয় ২০০৮ সালে। সেবার ৬৫চি দেশের ৬৩০টি প্রকল্পের মাধ্যমে ব্যাপকভাবে প্রবাল প্রাচীর বিষয়ে আরও

বেশি মানুষকে বিষয়টি সম্পর্কে জানানো হয়। এবার ২০১৮ সালে তৃতীয় আন্তর্জাতিক প্রবাল প্রাচীর বর্ষ পালিত হচ্ছে। উদ্দেশ্য—বাস্তুতন্ত্রে প্রবাল প্রাচীরের গুরুত্ব ও তার আশু বিপদ সম্পর্কে মানুষকে নিবিড়ভাবে সচেতন করা। সরকারি, বেসরকারি, শিক্ষা, অসামরিক ইত্যাদি সর্বস্তরের প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় প্রবাল প্রচীরের দীর্ঘস্থায়ী ব্যবস্থাপনা বিষয়ে সঠিক পদক্ষেপ নেওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

বিস্ময়কর প্রবাল জগৎ

প্রায় ৫৪৩-৫২০ মিলিয়ন বছর আগে ক্যাম্ব্রীয় যুগের পরবর্তী বিভিন্ন যুগের জীবাশ্ম নমুনায় প্রবালের আধিক্য পরিলক্ষিত হয়। সুদূর অতীতে প্রবালের এতটাই প্রাচুর্য ছিল যে প্রাচীন সমুদ্রগুলির বিশেষ বিশেষ অংশগুলিকে প্রবাল সাগর নামে অভিহিত কর হত। প্রাচীনকালে এইসব প্রবাল তটভূমি ও প্রাচীর গঠিত হয়েছিল যা এখন স্তরীভূত চুনাপাথর ও কর্দমশিলার মধ্যে অতিকায় অবয়বহীন পাথুরে ভূমিরূপে বিরাজ করছে। এইসব প্রবালদ্বীপ বায়োহার্ম নামেও পরিচিত, যা পেট্রোলিয়ামের সম্ভাব্য উৎস হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে।

২২ ডিগ্রি সেলসিয়াসের কাছাকাছি তাপমাত্রার সামুদ্রিক জল প্রবালের গঠনের জন্য অনুকূল, কিন্তু ১৮ডিগ্রি সেলসিয়াসের কম তাপমাত্রা এর গঠনের জন্য প্রতিকূল। সুতরাং দেখা যায় অধিকাংশ প্রবাল প্রাচীর ভূগোলকের ২৮° উত্তর ও দক্ষিণ দ্রাঘিমার মধ্যবর্তী ক্রান্তীয় ও উপক্রান্তীয় জলভাগের মহীতট ও দ্বীপ তটভূমিতে সীমাবদ্ধ। ভূতত্ত্ববিদদের মতে পৃথিবীর বৃহত্তম প্রবাল প্রাচীর, দ্য গ্রেট বেরিয়ার রিফ। অস্ট্রেলিয়ার কুইন্সল্যান্ডে ৯০০ দ্বীপপুঞ্জে ২৯০০ স্বতন্ত্র প্রবাল প্রাচীর অবস্থিত। এই বিস্তীর্ণ প্রাচীরের দৈর্ঘ্য প্রায় ২৩০০ কিলোমিটার, প্রস্থ উত্তর প্রান্তে ২৪ কিলোমিটার আর দক্ষিণপ্রান্তে ২৪০ কিলোমিটার। ভারতে প্রায় ১৬১৭ বর্গকিলোমিটার অঞ্চলে ৩৭টি বর্গের ১৯৯

প্রজাতির প্রবাল প্রাচীর অবস্থান করে—যার মধ্যে আন্দামান ও নিকোবরে ৯৫৯ বর্গকিমি, লাক্ষাদ্বীপে ৮১৬ বর্গকিমি, গুজরাটে ১৪৮ বর্গকিমি এবং তামিলনাড়ুতে ৯৪ বর্গকিমি। কোনো এক সুদূর অতীতে হয়ত বা লক্ষ দ্বীপের সমাহার ছিল, তা থেকে দ্বীপটির নাম লাক্ষাদ্বীপ—যা ভারতবর্ষের প্রবাল প্রাচীরের স্বর্গোদ্যান। মধ্য অক্টোবর থেকে এপ্রিল পর্যন্ত যখন সমুদ্র অপেক্ষাকৃত শান্ত থাকে এবং জোয়ারভাটার তীব্রতা অনুকূলে থাকে তখন ডুবুরিরা মূল্যবান প্রবাল সংগ্রহ করে। সাধারণত পূর্ণিমা ও নবোদিত চান্দ্র তিথিতে প্রবাল সংগ্রহ করা হয়। বহুমূল্য রত্ন হিসেবে প্রবাল বা পলা বিশেষরূপে সমাদৃত। ভূমধ্যসাগর, আটল্যান্টিক ও প্রশান্ত মহাসাগরে প্রাপ্ত 'কোরালিয়াম' প্রবাল রক্তিম, ফিকে লাল বা কমলা রঙের হয়। অ্যানথোজোয়া নিঃসৃত ক্যালসিয়াম কার্বনেট যৌগের সঙ্গে উদ্ভিজ্জ রঞ্জক পদার্থ মিশে প্রবালের এই আশ্চর্য সুন্দর বর্ণের সৃষ্টি করে।

প্রবাল প্রাচীরের গুরুত্ব

প্রবাল প্রাচীর এক দৃঢ় সৃজনশীল বাস্তুতন্ত্র, যা কেবলমাত্র জীববৈচিত্র্য পোষণকারী নয়, মানবসভ্যতার বিভিন্ন কল্যাণকর কাজে একান্ত প্রয়োজনীয়। কয়েকটি উদাহরণ দিলে বিষয়টি স্পষ্ট হবে।

১. **সমুদ্রোপকূল সুরক্ষা** : সারা বিশ্বের প্রায় ১০০টি দেশের মধ্য দিয়ে ১,৫০,০০০ কিলোমিটারব্যাপী সমুদ্রতটকে রক্ষা করে প্রবাল প্রাচীর। সমুদ্রজলে দ্রবণীয় অসংখ্য রাসায়নিক পদার্থকে শোষণ করে জলজ প্রাণীদের পক্ষে সমুদ্রজল যাতে বিষাক্ত না হয় সে ব্যাপারে সহায়তা করে। আবার বিশাল প্রবাল প্রচীর সমুদ্রতরঙ্গ শক্তিকে আত্মভূত করে উপকূল ক্ষয় থেকে বাঁচায়। প্রবাল প্রাচীর ভূ-ভাগে ঝড়-ঝঞ্ঝা, ঘূর্ণাবর্ত, সুনামির মতো প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ক্ষয়ক্ষতি কমাতে সাহায্য করে। প্রবাল প্রাচীরের এই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা মাথায় রেখে ভঙ্গুর উপকূলকে রক্ষা করার জন্য ইদানীংকালে কংক্রিটের ঢালাই ব্যবহার করে কৃত্রিম প্রাচীরের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। ভূতত্ত্ববিদদের মতে প্রবাল প্রাচীর না থাকলে মালদ্বীপ, কিরিবাটি, টুভালু, মার্শাল দ্বীপপুঞ্জ ইত্যাদির অস্তিত্বই থাকত না।

(২) **আবাসস্থল** : প্রবাল প্রাচীর হল বিশ্বের জীববৈচিত্র্যের অতি গুরুত্বপূর্ণ লীলাভূমি। এক মিলিয়ন গাছপালা ও নানা প্রজাতির প্রাণীদের ২৫ শতাংশেরও বেশি সামুদ্রিক জীব। অসংখ্য রকমের সামুদ্রিক

সারা বিশ্বের প্রায় ১০০টি দেশের মধ্য দিয়ে ১,৫০,০০০ কিলোমিটারব্যাপী সমুদ্রতটকে রক্ষা করে প্রবাল প্রাচীর। সমুদ্রজলে দ্রবণীয় অসংখ্য রাসায়নিক পদার্থকে শোষণ করে জলজ প্রাণীদের পক্ষে সমুদ্রজল যাতে বিষাক্ত না হয় সে ব্যাপারে সহায়তা করে। আবার বিশাল প্রবাল প্রচীর সমুদ্রতরঙ্গ শক্তিকে আত্মভূত করে উপকূল ক্ষয় থেকে বাঁচায়। প্রবাল প্রাচীর ভূ-ভাগে ঝড়-ঝঞ্ঝা, ঘূর্ণাবর্ত, সুনামির মতো প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ক্ষয়ক্ষতি কমাতে সাহায্য করে।

মাছের চারণভূমি এই প্রবালপ্রাচীর অঞ্চল। ভারত ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় প্রবাল প্রাচীরের পৃষ্ঠদেশ মনুষ্যসভ্যতার আবাসস্থলও বটে। যুগ যুগ ধরে আক্ষরিক অর্থেই নিমজ্জমান প্রবাল প্রাচীরের পৃষ্ঠদেশে মানবসভ্যতা গড়ে উঠেছে। এই অঞ্চলের অধিবাসীরা এমন ভূমিতে চাষ করে ফসল ফলায়, প্রবালের উপকরণ দিয়ে বাসস্থান কিংবা গৃহস্থালীর উপাদান তৈরি করে। এইভাবে তারা বিশ্বপ্রকৃতির উত্তরাধিকার অর্জন করেছে। আবার মানববিশ্বের উত্তরণও বটে; কারণ তারাই প্রবাল সংস্কৃতির ধারক ও বাহক। প্রবাল সভ্যতা আমাদের হেরিটেজ এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে জীবন্ত উদাহরণ।

(৩) **আর্থিক গুরুত্ব** : সমগ্র পৃথিবীর এক-অষ্টমাংশ অর্থাৎ প্রায় ৮৫০ মিলিয়ন লোক উপকূলভাগের ১০০ কিলোমিটার প্রবাল প্রাচীরের ওপর খাদ্য, নিরাপত্তা ও কর্মসংস্থানের ব্যাপারে অতি নির্ভরশীল। উন্নয়নশীল দেশ ও বিভিন্ন দ্বীপপুঞ্জের অধিবাসীরা প্রবাল প্রাচীর অঞ্চলের প্রাণীসম্পদ—বিশেষত মাছ, ঝিনুক, সন্ধিপতও অন্যান্য অমেরুদণ্ডী প্রাণীর প্রোটিনের ওপর অনেকটাই নির্ভরশীল।

প্রবাল প্রাচীর অঞ্চলে কোটি কোটি ডলারের মাছের ব্যবসা এখন অতি লাভজনক ব্যাপার। শুধুমাত্র ফিলিপিন্সে এই ব্যবসার পরিমাণ বছরে ১.১ বিলিয়ন ডলার। একটি পরিসংখ্যান দিলে বিশ্বব্যাপী বাৎসরিক ব্যবসার চিত্র পরিষ্কার হবে : মোট আয় ২৯.৮ বিলিয়ন ডলার, পর্যটন সংক্রান্ত আয় ৯.৬ বিলিয়ন ডলার, সমুদ্রোপকূল রক্ষাজনিক আয় ৯ বিলিয়ন ডলার, মৎস্য শিকার দ্বারা আয় ৫.৭ বিলিয়ন ডলার, আর জীববৈচিত্র্য সংক্রান্ত আয় ৫.৫ বিলিয়ন ডলার। প্রবাল সংক্রান্ত পর্যটন শিল্পে পৃথিবীর শতাধিক দেশ সমৃদ্ধ হয়েছে। আর কুড়িটি দেশের বার্ষিক আয়ের ৩০ শতাংশই প্রবাল পর্যটন নির্ভর। অনেক দ্বীপপুঞ্জে ৯০ শতাংশেরও বেশি আর্থিক উন্নয়ন প্রবাল পর্যটন।

(৪) **চিকিৎসার কাজে** : যে-সমস্ত রোগের চিকিৎসায় প্রবাল কীট প্রয়োগ করে সুফল পাওয়া গেছে সেগুলি হল লিউকোমিয়া, এডস্, হৃদ্‌যন্ত্রের সমস্যা, আলসার ইত্যাদি। প্রবাল কঙ্কালের সঙ্গে মানুষের অস্থিকাঠামোর সাদৃশ্য থাকায় আমাদের অস্থি জোড়া দেওয়ার শল্য চিকিৎসায় প্রবালের প্রয়োগ করা হয়। এছাড়া প্রবালের প্রধান উপাদান ধাতব ক্যালসিয়াম প্রয়োগ করে ক্যান্সার, ডায়াবেটিস, আরথ্রাইটিস, অস্টিওপোরোসিস, একজিমা, অ্যালঝাইমার, উচ্চ কোলেস্টরল সমস্যা, পেশিতে টান ধরা, কিডনি স্টোন, গলস্টোন, বাত, খিদে না হওয়া, হার্নিয়া, উচ্চ রক্তচাপ, মাথা ধরা ইত্যাদি রোগের চিকিৎসায় সুফল পাওয়া গেছে।

উপসংহার

সাগর মহাসাগরে তিল তিল করে গড়ে ওঠা প্রবাল প্রাচীর সম্পর্কে মানুষের কৌতূহলের অন্ত নেই। এই বিশাল সাম্রাজ্যের রত্নরাজি মনুষ্যসমাজের সমৃদ্ধি তথা দীর্ঘস্থায়ী উন্নয়নের সূচক। অথচ সমুদ্রজলের মাত্র কয়েক ডিগ্রি তাপমাত্রার হেরফেলে পৃথিবীর বৃহত্তম প্রবাল প্রচীর দ্য গ্রেট বেরিয়ার রিফের অস্তিত্বও বিপন্ন হতে পারে। ভূবিজ্ঞানীদের মতে যে প্রধান দশটি কারণে প্রবাল প্রাচীরের ওপর বিপদ ঘনিয়ে আসছে সেগুলি হল : ভূ-উষ্ণায়ণ ও আবহাওয়া পরিবর্তন, সমুদ্রজলের অম্লত্ব বৃদ্ধি, প্রবাল বিরঞ্জন, প্লাস্টিক ও অন্যান্য রাসায়নিক পদার্থদ্বারা সমুদ্রজলের দূষণ, তেজস্ক্রিয় বিকিরণ, বেহিসেবি উন্নয়ন, খনিজ সম্পদ আহরণ, আগ্নেয়গিরির উদ্‌গীরণ, ভূপৃষ্ঠের কঠিন পদার্থ ধোয়ানির মাধ্যম সমুদ্রে জমা হওয়া, অধিক পরিমাণে মাছ শিকারের কারণ-জনিত সমস্যা। তৃতীয় আন্তর্জাতিক প্রবালবর্ষে সারা বিশ্বের পরিবেশ-সচেতন মানুষের সাথে আমাদেরও সচেতনতা প্রসারিত হোক প্রকৃতির মহামূল্যবান এই প্রবাল সাম্রাজ্যের অস্তিত্বকে দীর্ঘস্থায়ী করার লক্ষ্যে।

একদিন ব্রাম পাই নাৎসিদের হাতে ধরা পড়ে গেলেন। জেলে নিয়ে যাওয়া হল তাঁকে। কেমন করে নাৎসিরা খবর পেয়েছিল, তা ব্রাম বার করতে পারেননি। সময়ের জন্য বেঁচে গেলেন ব্রাম...

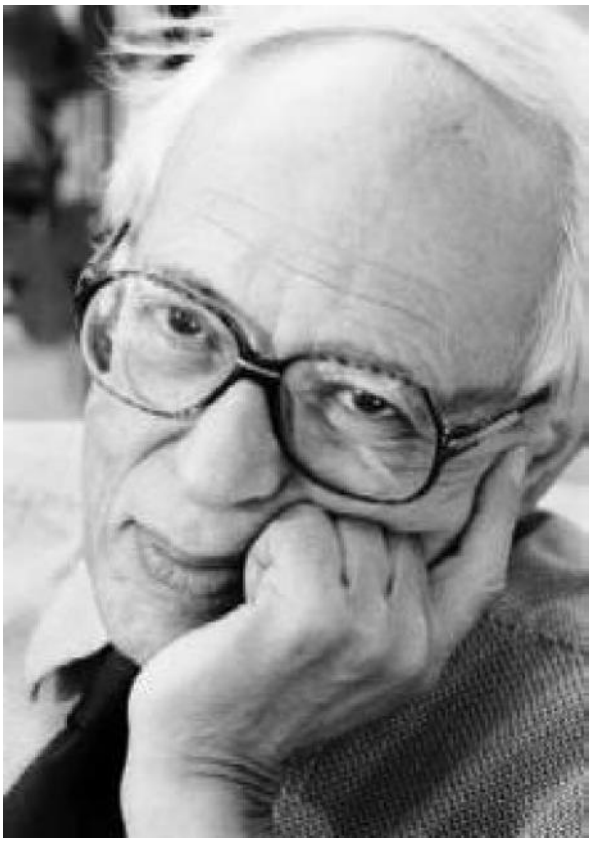

বিজ্ঞান ঐতিহাসিক ব্রাম পাই-এর একশো বছর

শ্যামল চক্রবর্তী

যে বছর বিশ্বযুদ্ধ শেষ হল, সেই বছরে পৃথিবীর তিন জন সুপরিচিত বিজ্ঞান ঐতিহাসিকের জন্ম হয়। দু-জন আমাদের দেশের নাগরিক। দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ও সমরেন্দ্রনাথ সেন। তৃতীয় জনের নাম ব্রাম পাই। নেদারল্যান্ডে জন্ম তাঁর। জীবন কাটিয়েছেন আমেরিকায়। ২০০০ সালে ডেনমার্কের কোপেনহেগেন মারা যান। দেবীপ্রসাদ ও সমরেন্দ্রনাথকে নিয়ে আমাদের দেশে এ-সময় কিছু লেখালেখি হচ্ছে। তেমন না হলেও তাঁদের অবদান নিয়ে এখানে ওখানে খানিকটা আলোচনা হচ্ছে। এই লেখায় আমরা ব্রাম পাই-এর জীবন ও কাজ নিয়ে দু-চার কথা বলব।

দেবীপ্রসাদ ছিলেন দর্শন শাস্ত্রের মেধাবী ছাত্র। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম স্থানাধিকারী। তেমনি সমরেন্দ্রনাথও ছিলেন পদার্থবিদ্যার মেধাবী ছাত্র। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম স্থানাধিকারী। পড়াশোনায় ব্রাম পাই একই দলে পড়েন। এগিয়ে থাকা ছাত্রদের দলে। নেদারল্যান্ডের ইহুদি এক মধ্যবিত্ত পরিবারের জ্যেষ্ঠ সন্তান তিনি। এঁদের পূর্বপরিবার সপ্তদশ শতাব্দীতে পর্তুগাল থেকে নেদারল্যান্ডে চলে এসেছিলেন। বাবা-মা দু-জনেই স্কুলে পড়াতেন। বিয়ের পর মা চাকুরি ছেড়ে দিয়েছিলেন। ব্রামের এক বোন ছিলেন তাঁর চেয়ে দু-বছরের ছোটো। বাবা প্রথমে প্রাইমারি স্কুলের মাস্টারমশাই, পরে হেড মাস্টার। চাকুরিজীবনের শেষ ক-বছর একটি ইহুদি হিব্রু স্কুলের হেড মাস্টারমশাই হয়েছিলেন।

ব্রাম পাইয়ের ইংরেজি নামের বানান 'Abraham Pias'। ডাচ ভাষা। কয়েকটি অক্ষরের উচ্চারণ উহ্য থাকে। তাই তাঁর নাম ব্রাম পাই। আমরা সাধারণ পড়ুয়ারা তো নানা দেশের ভাষা ও তার উচ্চারণে পণ্ডিত নই। ইংরেজি নাম তাঁর আমাদের অনেকের চেনা। আসল উচ্চারণ তাই ভাষাবিদ বন্ধুদের কাছ থেকে জেনে লিখতে হল।

ছোটোবেলা ব্রামের কেমন কেটেছে? তিনি বলেছেন, ''ভালো, খুব ভালো, গরিব ছিলাম না, বড়োলোকও ছিলম না। আনন্দে দিন কেটেছে। পড়াশুনোয় ছিলাম খুব খারাপ রকমের (!) ভালো—miserably bright। অসুখ বিসুখ ছিল না। সাঁতার কেটেছি প্রচুর। বন্ধু ছিল অনেক। ভয় কাকে বলে জানতাম না কখনও।''

নেদারল্যান্ডের রাজধানী শহর আমস্টারডাম। রাজধানী শহরেই ব্রামের জন্ম। সেখানকার স্কুলে ছোটোবেলায় পড়েছেন। বারো বছর বয়সে হাইস্কুলে পড়েছেন। পাঁচ বছর পর পরীক্ষা দিয়ে ক্লাসের বন্ধুদের মধ্যে প্রথম হলেন। সিলেবাসে যেমন থাকে, বিজ্ঞানের গোটা কয় বিষয় ছিল, ইংরেজি ফরাসি ও জার্মান ভাষা খানিকটা শিখে নিয়েছিলেন।

১৯৩৫ সাল। সময়টা তখনও ইউরোপের ভালো ছিল না। একটা যুদ্ধের কাল কেটেছে প্রায় দুই দশক হল। আবার যুদ্ধের আবহ মাথা চাড়া দিচ্ছে। জার্মানিতে মসনদ দখল করেছে হিটলার। ইতালিতে মুসোলিনি। যাই আসুক জীবনে, সত্যকে নিতে হবে সহজে। আমস্টারডাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হলেন ব্রাম। ১৬৩২ সালের বিশ্ববিদ্যালয়। দুবার নাম বদল করে ১৯৬১ সালে নাম হয়েছে আমস্টারডাম বিশ্ববিদ্যালয়। এর ধরন আজকের দেশের কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো। ওঁরা বলেন, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়। নেদারল্যান্ডের তিন নম্বর প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয়।

রসায়ন ও পদার্থবিদ্যা মেজর হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন ব্রাম। মাইনর হিসেবে অঙ্ক আর জ্যোতির্বিদ্যা। একদিন লেইডেন বিশ্ববিদ্যালয়ের মেধাবী ছাত্র,

এহ্‌রেনফেস্টের গবেষণা সহযোগী ও বিখ্যাত গাউডস্মিথ-উলেন্‌বেক পরীক্ষার জর্জ উলেন্‌বেক আমস্টারডাম বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা দিতে এসেছিলেন। উলেন্‌বেক ছিলেন বিজ্ঞানী এনরিকো ফের্মির নিবিড় বন্ধু। সেই বক্তৃতায় ব্রাম শ্রোতা হিসেবে হাজির ছিলেন। সে-সময় উলেন্‌বেক ইউট্রেক্ট বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াতেন। নেদারল্যান্ডেরই বিশ্ববিদ্যালয় ইউট্রেক্ট। ১৬৩৬ সালে তৈরি হয়েছিল। যাই হোক, উলেন্‌বেক তাঁর দু-খানা বক্তৃতায় এনরিকো ফের্মির 'বিটারশ্মি বিকিরণ' ও 'নিউট্রিনো' গবেষণার ফলাফল পদার্থবিদ্যার জগৎকে কতটা আলোকিত করেছে সে-কথা বলেছেন। এই বক্তৃতা ব্রামকে অসম্ভব অনুপ্রাণিত করে। তিনি মনে মনে ভেবে নিয়েছিলেন, পদার্থবিদ্যা নিয়ে পড়াশোনা ও গবেষণা করবেন। ফের্মির গবেষণাজগত বুঝতে চাইলে তত্ত্বীয় পদার্থবিদ্যায় কাঁচা থাকলে চলবে না। তখনই ঠিক করে নিলেন ব্রাম, আমস্টারডামের তত্ত্বীয় পদার্থবিদ্যার ক্লাস তিনি কখনও ফাঁকি দেবেন না। সে-সময় এই শাখায় আমস্টারডামে ছিলেন একজনই অধ্যাপক। তাঁর নাম চেনা। ভ্যান ডার ওয়াল্‌স জুনিয়র। সিনিয়র ভ্যান ডার ওয়াল্‌স ১৯১০ সালে নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন। তাঁরই ছেলে ভ্যান ডার ওয়াল্‌স জুনিয়র। তাঁর পড়ানো ব্রামের মোটেই ভালো লাগছিল না। উলেন্‌বেক বলতে গিয়ে শ্রোতাদের মনে যে আগ্রহ জাগিয়ে তুলছিলেন, তেমন কোনো আগ্রহ ব্রামের মনে তৈরি হচ্ছিল না। তিনি সোজাসুজি উলেন্‌বেকের কাছে চিঠি লেখেন, ''আমি আপনার সঙ্গে দেখ করতে চাই।'' দেখা করলেন। ব্রামকে পছন্দ হল তাঁর। বললেন, ''আসছে সেশন থেকে ইউট্রেক্টে ক্লাস করো। আমার গবেষণাগারে মাঝে মাঝে এসো।'' এ তাঁর জীবনে এক পরম প্রাপ্তি। পরম প্রাপ্তির শুরু বলা যায়। বাকি উজ্জ্বল দিন সব সামনে পড়ে আছে। সব-ই কি উজ্জ্বল দিন? দেখাই যাক।

১৯৩৮ সালে ব্রাম ইউট্রেক্ট বিশ্ববিদ্যালয়ে চলে গেলেন। উলেন্‌বেক সে-সময় নিউ ইয়র্কের কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াতে গেছেন। তবে যাবার আগে ব্রামকে তাঁর গবেষণাগারে কাজের অনুমতি দিয়ে গেলেন। কিছু বিষয় বলে গেলেও সেগুলো ভালো করে পড়ে নিতে হবে। লেইডেন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সে-সময় বিখ্যাত পদার্থবিদ হেনড্রিক কাজিমির (১৯০৯-২০০০) সপ্তাহে দু-দিন ইউট্রেক্ট বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াতে আসতেন। কাজিমির কোয়ান্টাম পদার্থবিদ্যা পড়াতেন। তাঁর পড়ানো ব্রামের খুব ভালো লাগত। এদিকে আমেরিকা থেকে উলেন্‌বেক ফিরে এসে সবাইকে জানালেন, ওয়াশিংটনের বিজ্ঞান সম্মেলনে নীলস বোর ও এনরিকো ফের্মি প্রথম নিউক্লিয়াসের 'ফিসান' নিয়ে কথা বলেছেন। সারা সম্মেলনে এই নিয়েই আলোচনা করেছেন সকলে। তেমনটাই তো স্বাভাবিক। এই উদ্ভাবনা থেকে এক গভীর সম্ভাবনা ও আশঙ্কা দুই-ই তৈরি হয়েছে।

সত্যি বলতে কি, বিজ্ঞানী উলেন্‌বেক-কে ব্রাম তেমন করে পেলেন-ই না। উলেন্‌বেক আমেরিকার মিচিগান বিশ্ববিদ্যালয়ে চলে গেলেন। তাঁর টানেই তো ব্রাম ইউট্রেক্ট বিশ্ববিদ্যালয়ে এসেছিলেন। চলে যাওয়ার আগে উলেন্‌বেক একটা কাজ করলেন। লেইডেন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হেনড্রিক ক্র্যামার্স-এর সঙ্গে ব্রামের পরিচয় করিয়ে দিয়ে গেলেন। নীলস বোরের সঙ্গে উঁচু মানের কাজ করেছেন ক্র্যামার্স।

উলেনবেক্ ইউট্রেক্ট বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে চলে যাবার পর সেই পদে যোগ দেন বেলজিয়াম বিজ্ঞানী লিওঁ রোজেনফেল্ড (১৯০৪-১৯৭৪)। ধর্মনিরপেক্ষ এক ইহুদি পরিবারে রোজেনফেল্ডের জন্ম। তিনিও ছিলেন বিজ্ঞানী নীলস বোরের এক অন্তরঙ্গ সহ-গবেষক। রোজেনফেল্ডের গবেষণা-জগতের বিস্তার ব্যাপকতর। তিনি ছিলেন একজন মার্কসবাদী। 'নিউক্লিয়ার ফিজিক্স' জার্নালের প্রতিষ্ঠাতা রোজেনফেল্ড। আমরা যে 'লেপটন' কণার কথা বলি কণাপদার্থবিদ্যায়, এই শব্দটি তাঁরই উদ্ভাবনা। বিজ্ঞানের দর্শন ও ইতিহাস বিষয়ে তাঁর ছিল গভীর আগ্রহ। ইতিহাস ও দর্শনের মার্কসীয় বিশ্লেষণেই আগ্রহ ছিল তাঁর। রোজেনফেল্ডের জীবন ও কাজের কথা বিস্তারিত জানতে চাইলে আমাদের হাতের কাছে যে বইটি মেলে তার নাম 'লিওঁ রোজেনফেল্ড : ফিজিক্স, ফিলোজফি অ্যান্ড পলিটিক্স ইন দ্য টুয়েনটিয়েথ সেঞ্চুরি'। ২০১২ সালে বইটি প্রকাশিত হয়েছে। ইউট্রেক্ট বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়াও রোজেনফেল্ড ম্যানচেস্টার ও কোপেনহেগেন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়িয়েছেন। রোজেনফেল্ডের কথা আমরা দু-এক লাইন বললাম এই জন্য যে তাঁর কাছে ব্রাম গবেষণা-সহযোগী পদে যোগ দেন। বিস্তারিত আলোচনায় না গিয়েও বোঝা যায়, রোজেনফেল্ডের জীবনদর্শন তরুণ ব্রামের বেড়ে ওঠাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল। বিজ্ঞান, ইতিহাস ও দর্শনে আগ্রহ, তাকে বিশ্লেষণ করার পন্থা, এ-সবের প্রাথমিক পাঠ তাঁর রোজেনফেল্ডের হাতেই ঘটেছে। ডক্টরেট গবেষণার কাজ ব্রাম রোজেনফেল্ডের অধীনে সমাধা করেন। ১৯৪০ সালের সেপ্টেম্বর থেকে উৎসাহ নিয়ে কাজ শুরু করেছিলেন ব্রাম পাই। ইউরোপ সে-সময় ডুবে যাচ্ছিল মহাযুদ্ধে। হিটলার-মুসোলিনির দাপট বাড়ছিল বই কমছিল না। ১৯৪০ সালের মে মাসে হিটলার হল্যান্ড দখল করেছে। প্রথম মাস কয় ওরা বিশেষ অত্যাচার করেনি। ধীরে ধীরে অত্যাচারের মাত্রা বাড়িয়েছে। ১৯৪০ সালের সেপ্টেম্বরে প্রথম ফতোয়া বেরোলো, 'ইহুদিরা কোনো সিনেমা হলে ঢুকতে পারবে না'। ব্রাম লিখলেন, তখন আমাদের মনে হচ্ছিল, ''এতে কী? ছবি না দেখতে পেলেও জীবন চলে যাবে।'' কিন্তু একের পর এক ফতোয়া আসতেই শুরু করল। সে ইতিহাস লিখতে গেলে অনেক দীর্ঘ হয়ে যাবে। ১৯৪০-এর নভেম্বরে নতুন ফতোয়া, 'কানো সরকারি কাজে কোনো ইহুদি থাকবে না। স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়েও ইহুদিদের জায়গা হবে না।' ব্রাম পাই ইহুদি। ধর্ম নিয়ে তিনি বিন্দুমাত্র মাথা ঘামান না। তাই বলে ছাড় পাবেন নাকি? গবেষণা-সহযোগীর কাজ হারান ব্রাম। পরে জানা যায়, গোপনে রোজেনফেল্ড ব্রামের জন্য প্রতি মাসে কিছু টাকাকড়ি দিতেন। অধ্যাপকরাও চাকুরি হারাতে লাগলেন। ১৯৪১ সালের ১৪ জুন নতুন ফতোয়া বেরোলো—'কোনো ইহুদিকে ডক্টরেট দেওয়া যাবে না।' মাত্র পাঁচদিন আগে, ১৯৪১ সালের ৯ জুন, ব্রাম পাই ডক্টরেট ডিগ্রি পেয়ে গিয়েছিলেন। তাই এই ফতোয়ার হাত থেকে তিনি বেঁচে যান।

১৯৪৩ সালের প্রথম থেকে নাৎসিরা ঠিক করল, এবার জার্মান ইহুদি ও ডাক ইহুদিদের বন্দিশিবিরে নিয়ে যেতে হবে। বন্দিশিবিরে নিয়ে গেলে কী পরিণতি হয় তা সকলেই জানেন। বেশিরভাগেরই আর কোনো কালে ফেরা হয় না। ততদিনে ব্রাম এক কন্যার সঙ্গে ঘর পেতেছেন। নাম তার 'তিনেকে'। তিনেকে বললেন, তাঁর চেনা একটা বাড়ি আছে। খালের ধারে সেই বাড়ি। ব্রাম সেখানে গিয়ে লুকিয়ে থাকুন। ব্রাম গেলেন সেখানে। ন-মাস কেটে গেল। একদিন গেস্টাপোরা তল্লাশিতে এল। দুই দেওয়ালের মাঝখানে একটা লুকোবার জায়গা ছিল। সেখানে চলে যান ব্রাম।

ন-মাস পর ১৯৪৪ সালের সামারে ব্রাম একজন সাইকিয়াট্রিস্ট-এর বাড়িতে চলে যান। পুরো সামার ঘরবন্দি। একবারও

রাস্তায় বেরোননি। কাজ কি তবে বন্ধ থাকবে? অনেক বই খাতাপত্র নিয়ে এসেছিলেন ব্রাম। সকাল সন্ধে নিয়মিত কিছু কাজ করতেন। বই পড়তেন। তখন টলস্টয়ের 'ওয়ার অ্যান্ড পিস' পড়েছেন। ডিকেন্সের সব বই-ই পড়ে শেষ করেছেন। ব্রাম তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছেন—''এমন দিন গিয়েছে সারাদিন বই পড়েছি। আর ভেবেছি।''

দু-বছর দু-মাস ব্রাম নানা জায়গায় লুকিয়ে থেকেছেন। বেরোতেন না। কখনও একবার সন্ধের পর বেরোতেন। একবার সাহস করে ট্রেনে চেপে আমস্টারডাম থেকে ইউট্রেক্ট গিয়েছিলেন। চল্লিশ মাইল পথ।

এদিকে আমস্টারডামের সকল ডাচ ইহুদিদের 'ত্রাণ' শিবিরে জড়ো করা হচ্ছিল। ব্রামের বাবা-মা যাননি। বোন আর বোনোর বর গিয়েছিলেন। উপায় ছিল না কোনো। ব্রাম ও জনা তিনেকে মিলে থাকার জায়গা করেছিলেন। বোনের বর হার্মান ব্যবসা করেন। তিনি কিছুতেই লুকোতে চাইতেন না। তাই বোনও চাইছিল না। ব্রাম লিখেছেন, ''আমি বোনকে বলতে পারছিলাম না, 'ক্যাম্পে গেলে শেষ পরিণতি গ্যাস চেম্বার।' বলতে খারাপ লাগছে, সেই যে 'ত্রাণ' শিবিরে ওদের নিয়ে গিয়েছিল, আর তাদের কখনও ফেরা হয়নি।

ব্রামের বাবা ছিলেন ধর্মপ্রাণ ইহুদি। তিনি বলতেন, 'যেতে যদি হয় বন্দিশিবিরে যাব। আমার ভাগ্য আর বাকি ইহুদিদের ভাগ্য আলাদা হবে কেন?' মা ছিলেন ভিন্ন মতের মানুষ। সাহসও ছিল খুব। বাবাকে বলতেন, 'তুমি যেতে পার, আমি যাব না।' বাবার তাই যাওয়া হয়নি। লুকিয়ে দুজনে থেকেছেন। যুদ্ধের সময়টাকে পার করেছেন।

রোজগার কোথায় তখন? বাবা ছিলেন টিকেট সংগ্রাহক। প্রচুর টিকেট ছিল বাবার কাছে। সেসব বিক্রি করে সংসার চলছে। এই সম্পদের ওজন নেই। হালকা। এখানে ওখানে খুব সহজে লুকিয়ে নেওয়া গিয়েছে।

মার্চ, ১৯৪৫। একদিন ব্রাম পাই নাৎসিদের হাতে ধরা পড়ে গেলেন। জেলে নিয়ে যাওয়া হল তাঁকে। কেমন করে নাৎসিরা খবর পেয়েছিল, তা ব্রাম বার করতে পারেননি। সময়ের জন্য বেঁচে গেলেন ব্রাম। রাইন নদী পেরিয়ে মার্কিন সেনাদল চলে এল। নেদারল্যান্ডের উত্তরভাগকে বিচ্ছিন্ন করে দিল। তাই ব্রাম বন্দিশিবিরে যাবার হাত থেকে বেঁচে যান। রেল-লাইনও কেটে দেওয়া হয়েছিল যাতে বন্দিদের বন্ধ কামরায় পশুর মতো না নিয়ে

১৯৭০ দশকের পর বিজ্ঞানের ইতিহাস বিষয়ে তাঁর গভীর আগ্রহ জন্মায়। এই আগ্রহের অন্যতম অনুপ্রেরণা ছিলেন রোজেনফেল্ড, সেকথা আমরা আগে বলেছি। আধুনিক পদার্থবিদ্যার ইতিহাস বিষয়ে ব্রাম অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেছেন। তবে সম্ভবত তাঁর লেখা যে বইটি সবচেয়ে বেশি মানুষের পরিচিত সেই বইটি তিনি বিজ্ঞানী আইনস্টাইনকে নিয়ে লিখেছেন। খুব কাছ থেকে বিজ্ঞানীকে দেখেছেন তিনি। একই বিভাগে কাজ করতেন দু-জন।

যেতে পারে। তাই যে-কদিন জেলে থাকতে হয়েছে, আমস্টারডামের জেলখানাতেই দিন কেটেছে। জেরার হাত থেকে তাই বলে পিতা রক্ষা পাননি। গেস্টাপোদের মূল অফিসে নিয়ে গিয়ে জেরা করা হয়। শুরুতে কী অমায়িক ব্যবহার! রেজিস্ট্যান্স বাহিনীর খবর যা জানো বলে দাও, কাক-পক্ষীতে টের পাবে না। তোমার গায়ে আঁচড়টিও লাগবে না। ব্রাম এ-সবের খবর বিন্দুবিসর্গ জানতেন না। ঠাণ্ডা মাথায় কথা চলছিল। হঠাৎ মুখে এক ভয়ঙ্কর ঘুসি। খবর বলতে হবে। রেজিস্ট্যান্স বাহিনীর খবর। ছত্রিশ ঘণ্টা নাৎসিরা ব্রামকে খেতে দেয়নি। ব্রাম লিখেছেন, ''আমার শরীর সুস্থ ছিল। একবার খেলে তিন ঘণ্টা পর খিদে পেয়ে যেত। ওই ছত্রিশ ঘণ্টা আমার কোনো খিদে পায়নি।''

যে বাড়িতে লুকিয়ে ছিলেন ব্রাম, সে বাড়ির সবাই ধরা পড়ে। বাড়ির অভিভাবক লিওঁ নর্ডহেইম ভয় পেলেন বেশি। ''আমিও পেয়েছিলাম। ভাবখানা করেছিলাম যেন ভয় পাইনি। 'শিকার' ভয় পেলে পশুরা তা বুঝতে পারে। গেস্টাপোরা তেমন-ই। লিওঁকে ওরা মেরে ফেলে।''

জেল থেকে মাসখানেক পর বেরিয়ে তিনেকের জন্য বাড়ি গেলেন ব্রাম। ওরা কেউ বিশ্বাস করতেই পারছিলেন না যে ব্রাম পাই ফিরে এসেছে! অথচ ব্রাম এরপর বেশ ক-মাস অনুভূতিহীন হয়ে পড়েন। হাসি নেই, কান্না নেই। কারও নাম মনে করতে পারছেন না। ব্রামের লেখা থেকে বলছি:

''আমরা সব চেনা ইহুদি ছিলাম। তবে আমি তেমন কোনো কষ্ট পাইনি। আমার পরিবারের প্রায় সকলে খুন হয়েছে।... পাঁচ জন ইহুদির চারজন আর ফেরেননি কোনো কালে।''

১৯৮৬ সালে ব্রাম পাই একটি দীর্ঘ সাক্ষাৎকার দিয়েছিলেন। এই সাক্ষাৎকার লিখিত আকারে বেরোয়। ব্রামের অনুভূতি আমরা সেই লেখা থেকে সংগ্রহ করেছি।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হল। ব্রাম যুদ্ধের আগেই নীলস বোরের কাছ থেকে কোপেনহেগেনে গবেষণার আমন্ত্রণ পেয়েছিলেন। যুদ্ধ তাঁকে গৃহবন্দি করে দিয়েছিল। ১৯৪৬ সালে ব্রাম নীলস বোরের কাছে চলে গেলেন। ১৯৪৭ সালে যোগ দেন প্রিন্সটনের বিখ্যাত গবেষণাগারে, যেখানে কাজ করতেন অ্যালবার্ট আইনস্টাইন। চোখের সামনে এক অনুপ্রেরণার উৎসকে দেখতে পেলেন তিনি। তাঁর গবেষণার বিস্তারিত কথায় যাচ্ছি না আমরা। আড়াই দশক তিনি কণা পদার্থবিদ্যা ও একীভূত ক্ষেত্রতত্ত্বের ওপর কাজ করেছেন। ১৯৫৬ সালে ব্রাম মার্কিন দেশের নাগরিক হলেন। ১৯৬৩ সালে রকফেলার বিশ্ববিদ্যালয়ে তত্ত্বীয় পদার্থবিদ্যার গবেষণায় যোগ দেন। অধ্যাপনা ও গবেষণায় সেখানেই তিনি জীবন কাটিয়ে দিয়েছেন।

১৯৭০ দশকের পর বিজ্ঞানের ইতিহাস বিষয়ে তাঁর গভীর আগ্রহ জন্মায়। এই আগ্রহের অন্যতম অনুপ্রেরণা ছিলেন রোজেনফেল্ড, সেকথা আমরা আগে বলেছি। আধুনিক পদার্থবিদ্যার ইতিহাস বিষয়ে ব্রাম অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেছেন। তবে সম্ভবত তাঁর লেখা যে বইটি সবচেয়ে বেশি মানুষের পরিচিত সেই বইটি তিনি বিজ্ঞানী আইনস্টাইনকে নিয়ে লিখেছেন। খুব কাছ থেকে বিজ্ঞানীকে দেখেছেন তিনি। একই বিভাগে কাজ করতেন দু-জন। তবে খুব বেশিদিন আইনস্টাইনের সান্নিধ্য পাননি তিনি। ১৯৪৭ সালে ব্রাম প্রিন্সটনে যোগ দিয়েছিলেন। ১৯৫৫ সালে আইনস্টাইন প্রয়াত হয়েছেন। এই বছরগুলিতে আইনস্টাইন বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার ভাবনায় মগ্ন। বই তিনি লিখেছিলেন দুটি। ১৯৮২ সালে প্রকাশিত বইয়ের নাম 'সাবট্‌ল ইজ দি লর্ড—দি সায়েন্স অ্যান্ড দি লাইফ অব অ্যালবার্ট আইনস্টাইন'। পরের বইটি বেরোয় ১৯৯৪ সালে। সেই বইয়ের নাম 'আইনস্টাইন লিভ্‌ড হিয়ার'। প্রথম বইটি বেরোবার পরের বছরই মার্কিন দেশের 'জাতীয় পুস্তক পুরস্কার' অর্জন করেছেন। নানা দেশে উচ্চপ্রশংসিত হয়েছে এই বই। বহু পরিশ্রমের ও গবেষণার ফসল এই বই। তাঁর হাতে যে কটি বই রচিত হয়েছে, ভিন্ন রুচি

ও সংস্কৃতির পরিচয় মেলে। ১৯৮৮ সালে তিনি লিখেছেন, 'ইনওয়ার্ড ব্রাউন্ড : অব মেটার্স অ্যান্ড ফোর্সেস'। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের বস্তু আর শক্তি নিয়ে বই কি আরও লেখা হয়নি? হয়েছে। কিছু বই কালোত্তীর্ণ হয়েছে। যেমন স্টিফেন হকিং-এর বই। স্টিফেন ভেইনবার্গের বই। কার্ল সাগানের বই। তেমনি জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে এই বই। হকিং নিশ্চয়ই সবাইকে ছাড়িয়ে গিয়েছেন।

১৯৯৫ সালে একটি বড়ো কাজের সঙ্গে জড়িয়ে ছিলেন ব্রাম পাই। বিংশ শতাব্দীতে পদার্থবিদ্যার যে-সকল যুগান্তকারী গবেষণাপত্র এই বিজ্ঞানের গতিপথ গড়ে তুলেছিল তাদের সংকলন ও আলোচনা তিনখণ্ডে বের করেন তিনি। বইগুলি আমাদের দেখার সুযোগ হয়েছে। পদার্থবিদ্যার যে-কোনো গবেষকের অবশ্য সংগ্রহযোগ্য বই। তিন জনে মিলে সম্পাদনার কাজ করেছেন। যদি কেউ ১৯৯৭ সালে প্রকাশিত তাঁর আত্মজীবনী পড়ার সুযোগ পান, তবে দেখবেন যুদ্ধের আবহে ইউরোপের বিজ্ঞানজগতে কেমন ভাঙাগড়া চলেছে। উগ্র জাত্যভিমানীদের কবলে পড়লে দেশের কেমন দুর্দশা ঘনিয়ে আসে। তাঁর নিজের দুর্দশার কথা এই সঙ্গে বর্ণনা করেছেন লেখক। দু-একটা ছবি আগে যোগ করেছি আমরা।

অক্লান্তভাবে কাজ করে গিয়েছেন তিনি। ২০০০ সালে ব্রাম পাই তাঁর চেনা সতেরো জন বিজ্ঞানীর জীবনকথার সংকলন প্রকাশ করেছেন। শীর্ষস্থানীয় বিজ্ঞানী সকলে। নীলস বোর, স্যাক্স বর্ন, পল ডিরাক, অ্যালবার্ট আইনস্টাইন, হ্যানস ক্র্যামার্স, জন ফন নিউম্যান, উলফ্যাং পাউলি, জর্জ উলেনবেক সহ মোট সতেরো জনের কথা রয়েছে।

বিজ্ঞানের আশ্চর্য চরিত্র ছিলেন রবার্ট ওপেনহাইমার। 'কমিউনিস্ট' অভিযোগে এক সময় মার্কিন শাসকদলের হাতে চরম হেনস্থা হয়েছেন। তাঁকে নিয়ে বৃহৎ জীবনীগ্রন্থ রচনার কাজ হাতে নিয়েছিলেন ব্রাম। মৃত্যুর পর এ-কাজ শেষ করেছেন দার্শনিক ও বিজ্ঞান ঐতিহাসিক অধ্যাপক রবার্ট ক্রিস। ২০০৬ সালে অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস থেকে বইটি বেরিয়েছে। ওপেনহাইমারকে নিয়ে এর চেয়ে ভালো বই আজও বেরোয়নি। যেকথা বলতেই হয়, বিজ্ঞানী নিলস বোরকে নিয়ে ব্রাম পাইয়ের লেখা একটি অসাধারণ বই রয়েছে। ব্রাম পাই শেষ জীবনে সপত্নীক ডেনমার্কে থাকতেন। নীলস বোর ইনস্টিটিউটে কাজ করতেন। সেখানেই তিনি মারা যান।

'আমেরিকান ফিজিক্যাল সোসাইটি' তাঁর নামে একটি পুরস্কার ২০০৫ সাল থেকে চালু করেছেন। 'ব্রাম পাই পুরস্কার'। পদার্থবিদ্যার ইতিহাস রচনায় যাঁরা কৃতিত্ব দেখাবেন, তাঁদের এই পুরস্কার দেওয়া হবে। বিভিন্ন বছরে যাঁরা পুরস্কার পেয়েছেন তাঁদের নাম নিচে দেওয়া হল—

২০০৫ : মার্টিন ক্লেইন—অধ্যাপক, ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়। বিজ্ঞানী পল এহরেনফেস্টের ওপর অসাধারণ জীবনীগ্রন্থ লিখেছেন। বিজ্ঞান ইতিহাসে মৌলিক কাজ করেছেন।

২০০৬ : জন হেইলব্রন—ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেছেন। ক্যালটেকে পড়াতেন। দীর্ঘ পঁচিশ বছর 'হিস্টরিক্যাল স্টাডিজ় ইন দ্য ফিজিক্যাল অ্যান্ড বায়োলজিক্যাল সায়েন্সেস' সম্পাদনা করেছেন। গ্যালিলিও, রাদারফের্ড, লরেন্স, ম্যাক্স প্ল্যাঙ্ক ও মোসলে-র জীবনকথা রচনা করেছেন। টমাস কুনের ছাত্র ছিলেন।

২০০৭ : ম্যাক্স জেমার—ইজ়রায়েলে পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক ছিলেন। আইনস্টাইন ভালোবাসতেন তাঁকে। পৃথিবীর বহু বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়িয়েছেন। ২০১৫ সালে প্রয়াত। পদার্থবিজ্ঞানের নানা শাখার ইতিহাস লিখেছেন।

২০০৮ : গেরাল্ড হলটন—মার্কিন পদার্থবিদ। ১৯২২ সালে জন্ম। হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থবিদ্যা ও বিজ্ঞান ইতিহাসের অধ্যাপক ছিলেন। সমাজবিকাশের ধারায় নানা বিজ্ঞানীর ভূমিকা নিয়ে একাধিক বই লিখেছেন।

২০০৯ : স্টিফেন ব্রুশ—লরেন্স লিভারমুর ন্যাশনাল ল্যাবরেটরিতে বিজ্ঞানী ছিলেন। পরে মেরিল্যান্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞানের ইতিহাসের অধ্যাপক পদে যোগ দেন। গেরাল্ড হলটনের সঙ্গে অনেক বই যৌথভাবে সম্পাদনা করেন।

২০১০ : রাসেল ম্যাককর্মাক—মার্কিন পদার্থবিদ। স্ত্রীর সঙ্গে যৌথভাবে হেনরি ক্যাভেনডিসের জীবনী লিখেছেন। একাধিক বই রয়েছে তাঁর ক্যাভেনডিসের ওপর। বেল গবেষণাগারে কিছুকাল চাকুরি করেন। পরে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপনায় চলে গিয়েছেন।

২০১১ : সিলভার স্কুয়েবার— ফরাসি দেশে জন্ম। মার্কিন বিজ্ঞানী। ব্র্যানডাইস বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেন। এছাড়া হার্ভার্ডে বিজ্ঞানের ইতিহাস পড়াতেন। ২০১৭ সালে তিনি মারা যান।

২০১২ : লিলিয়ান হডসন—আমেরিকার নানা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়িয়েছেন লিলিয়ান। দুবার নোবেলজয়ী জন চার্ডিনের জীবনকথা লিখেছেন। নানা পরমাণু গবেষণাগারের ইতিহাস লিখেছেন।

২০১৩ : রোজ়ার স্টুয়ের—বিজ্ঞান ইতিহাসের অধ্যাপক। মার্কিন দেশের একাধিক বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াতেন। এছাড়া মিউনিখ, ভিয়েনা, গ্রাজ়, অ্যামস্টারডাম ইত্যাদি জায়গায় পড়িয়েছেন। 'ফিজিক্স ইন পারস্পেকটিভ' জার্নালের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা।

২০১৪ : ডেভিড কাসিডি—কোয়ান্টাম পদার্থবিদ্যার ইতিহাস রচনায় খ্যাতি অর্জন করেছেন। ভার্নার হাইজেনবার্গের জীবনীগ্রন্থ লিখেছেন। বিজ্ঞান ইতিহাসের ওপর নাটক লিখেছেন।

২০১৫ : স্পেনসার ওয়েয়ার্ট—পদার্থবিদ্যার ছাত্র ছিলেন। নিউক্লিয় বিজ্ঞানের ইতিহাস লিখেছেন। বিশ্ব উষ্ণায়ন নিয়ে বই লিখেছেন।

২০১৬ : অ্যালান ফ্র্যাঙ্কলিন— মার্কিন পদার্থবিদ। বিজ্ঞান ও দর্শন নিয়ে একাধিক বই লিখেছেন। 'এক্সপেরিমেন্ট, রাইট অর রঙ্' একটি সুপরিচিত বই।

২০১৭ : মেরি জো নাইয়ে—অরিগন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেন। সামাজিক ও রাজনৈতিক ঘটনাবলীর সঙ্গে বিজ্ঞানের উদ্ভাবনার সম্পর্ক নিয়ে কাজ করেন। জঁ পেরি-র জীবনী রচনা করেছেন। পি এম এস ব্ল্যাকেটের ওপর লিখেছেন।

২০১৮ : সবশেষ এই পুরস্কারের প্রাপক পিটার গ্যালিসন। ১৯৫৫ সালে জন্ম। হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রথমে পদার্থবিদ্যা ও পরে বিজ্ঞানের ইতিহাস—দুটি বিষয়ে ডক্টরেট করেন। স্ট্যানফোর্ডে পড়িয়ে তিনি হার্ভার্ডে গিয়েছেন। 'হাইড্রোজেন বোমা' নিয়ে হিস্ট্রি চ্যানেলের একটি ছবি করেছেন।

আজ এই বিজ্ঞান ইতিহাসবিদ বেঁচে নেই। কিন্তু তাঁর অধীত শাখার চর্চা বেড়েছে বই কমেনি। তাঁর নামাঙ্কিত পুরস্কারে শুধু কি তাঁর নাম বেঁচে থাকবে? এই বিদ্যার চর্চা নানা প্রজন্মে কেমন বাঁক নিচ্ছে, তার ইতিহাসও নিশ্চয়ই লেখা থাকবে। যে কাজ করতে পারে মার্কিন দেশের পদার্থবিদদের একাডেমি, সে কাজ কি আমাদের দেশের বিজ্ঞান একাডেমি করতে পারে না? একটা চোখে পড়ার মতো স্বীকৃতিদানের আয়োজন থাকলে বিজ্ঞান ইতিহাসের প্রকৃত চর্চা বাড়বে বই কমবে না। বর্তমানের ভারত এই দাবি জোরালোভাবে পেশ করছে। বিজ্ঞান সংস্কৃতির নির্যাতনের হাত থেকে বাঁচতে চাই যে আমরা।

দ্রোহকাল

চিকিৎসায় সংকট : স্বরূপ ও সমাধান

কৌশিক লাহিড়ী

কিছু কি হয় এই সব করে? অনশন করে, বুকে কালো ব্যাজ পরে, ছবি তুলে কনভেনশন করে, সোশ্যাল মিডিয়ায় ঝড় তুলে সত্যিই কি একটুও বদলায় সমাজ? অথবা তুমুল কালবৈশাখী আর এক আকাশ বৃষ্টি সাক্ষী রেখে নিজের অশীতিপর বাবা-মা, স্ত্রী, কিশোরী কন্যার হাত ধরে, শিশুপুত্রটিকে বুকে জাপটে ধরে মিছিলে পা মেলালে আদৌ কিছু এসে যায় প্রশাসকের? এই উন্মত্ত, অমর্ষ, অসহিষ্ণু পৃথিবীতে কারো সময় আছে ফিরে তাকাবার? না কি, এটা একটা যুদ্ধ-যুদ্ধ খেলা? যাতে শুধু নিজের অহং পরিতৃপ্ত হয়? পুরুলিয়ায়, পাঁশকুড়ায়, ডেবরায়, শিলিগুড়িতে, ভাঙ্গড়ে, আউশগ্রামে, গোপীবল্লভপুরে, মালদায়, মথুরাপুরে, বোলপুরে, বর্ধমানে, ইসলামপুরে, ভগবানগোলায়, ডায়মন্ডহারবারে, দার্জিলিং-এ, কলকাতায়, মুর্শিদাবাদে ও আরো বহু নাম শোনা না শোনা জায়গায় অপমানিত, লাঞ্ছিত, নিগৃহীত, আহত, বিষ্ঠালেপিত, বিধ্বস্ত ডাক্তারটির শরীরে মনে এই প্রতীকী প্রতিবাদ আদৌ কি বয়ে আনলো একটু শুশ্রূষার স্নিগ্ধতা? জানি না।

কিন্তু আমার নিঃসাড়, নিয়ন্ত্রিত শীতাতপের আপাত নিরাপত্তায় কাল সারারাত ভেসে বেড়ালো স্বেদ, শোণিত, মৃত্তিকা, বিষ্ঠার ঘ্রাণ ছাপিয়ে জুঁইফুলের গন্ধ! আর তাতে মাখা সঙ্গ, শপথ, শ্রদ্ধা আর সহমর্মিতার উষ্ণতা।

এতো শুধু ব্যক্তিগত প্রতিবাদ নয়। বিন্দু বিন্দু করে সিন্ধু না হলেও কয়েক সহস্র চিকিৎসকের স্বতঃস্ফূর্ত, স্বচ্ছতোয়া একটা প্রতিবাদ-প্রবাহের সাক্ষী হয়ে তো থাকলো দিনটা। আর কোন প্রবাহ যে কখন সর্বগ্রাসী প্লাবনে পরিণতি পায়, সংবেদনহীন হিমযুগের সমাপ্তির সূচনা করে, তা বোধ হয় প্রবাহ নিজেও জানে না। ব্যক্তি-বিন্দু তো আরোই না!

মানুষ বড়ো কাঁদছে, তুমি মানুষ হয়ে পাশে দাঁড়াও
মানুষই ফাঁদ পাতছে, তুমি পাখির মতো পাশে দাঁড়াও
মানুষ বড়ো একলা, তুমি তাহার পাশে এসে দাঁড়াও।
তোমাকে সেই সকাল থেকে তোমার মতো মনে পড়ছে
সন্ধে হলে মনে পড়ছে, রাতের বেলা মনে পড়ছে
মানুষ বড়ো একলা, তুমি তাহার পাশে এসে দাঁড়াও।
এসে দাঁড়াও, ভেসে দাঁড়াও এবং ভালোবেসে দাঁড়াও
মানুষ বড়ো কাঁদছে, তুমি মানুষ হয়ে পাশে দাঁড়াও
মানুষ বড়ো একলা, তুমি তাহার পাশে এসে দাঁড়াও।

মনে পড়ে না, সাম্প্রতিক অতীতে, এ রাজ্যে, আর কোন আইন নিয়ে চিকিৎসক সমাজ এবং তার সঙ্গে সঙ্গে বৃহত্তর নাগরিক সমাজ ঠিক এতখানি উত্তেজিত, আলোড়িত, আন্দোলিত, ক্ষুব্ধ, ক্রুদ্ধ, বিভাজিত হয়েছেন। তবে প্রশাসকের যতখানি, প্রদেশ বা দেশটা ঠিক ততখানিই আমার, আপনার, সকলের। দেশের নাগরিক হিসেবে কয়েকটা কথা বলাই যায়। তাতে কোনো আইন ভঙ্গের অপরাধে আশা করি 'সাত দিনের ফাঁসি' বা 'তিন দিনের জেল' হবে না। কিন্তু সমস্যাটা হলো, বন্ধু আর্যতীর্থ যেমন লিখেছেন, ইদানীং—

মৃত্যু মানেই গোলমেলে ডাক্তারি
মৃত্যু মানেই প্রমাণ গাফিলতি
অমর ছিলো মানুষ নাকি আগে
চিকিৎসকই মেরেছে সম্প্রতি।

□

২০১৭ সালের ফেব্রুয়ারির ১৫ তারিখে কলকাতা শহরের একটি নামী বেসরকারি হাসপাতালে রোগীমৃত্যু ঘিরে ঘটে যায় ভয়ংকর হামলা, আক্রমণ, ভাঙচুর। আহত হন বেশ কিছু চিকিৎসাকর্মী। শুরু হয় বিপুল বিতর্ক। রাজ্যের সর্বোচ্চ প্রশাসক ২২ ফেব্রুয়ারি সব বেসরকারি হাসপাতালের কর্তাদের সঙ্গে এক অভূতপূর্ব মিটিং করেন, যা সরাসরি সম্প্রসারিত হয় প্রতিটি স্থানীয় দৃশ্য-শ্রাব্য সংবাদ মাধ্যমে। তাৎক্ষণিকভাবেই প্রস্তাবিত হয় রাজ্যের চিকিৎসা সংস্থাগুলির নিয়ন্ত্রক একটি নয়া কমিশন। এর ঠিক আটচল্লিশ ঘণ্টার মাথায় আর একটি বেসরকারি হাসপাতাল জড়িয়ে পড়ে আর একটি রোগীমৃত্যু-পরবর্তী দুর্ভাগ্যজনক বিতর্কে, যার ফলে পদত্যাগ করেন হাসপাতালের প্রধান কার্যনির্বাহী কর্ত্রী। অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে, এর মাত্র সাতদিন পরে ৩ মার্চ রাজ্য বিধানসভায় প্রস্তাবিত এবং গৃহীত হয় চিকিৎসা সংক্রান্ত এক নতুন প্রাদেশিক আইন (অথবা, পুরোনো আইনের নব সংস্করণ) যার পুরো নাম West Bengal Clinical Establishments (Registration, Regulation and Transparency) Bill, 2017। কিন্তু এরপর থেকেই রাজ্য জুড়ে সৃষ্টি হয় এক অস্বস্তিকর, অনাকঙ্ক্ষিত এবং ভয়ংকর পরিস্থিতি। একের পর এক চিকিৎসা সংস্থা, চিকিৎসক এবং চিকিৎসাকর্মীদের ওপর নেমে আসতে থাকে আক্রমণ। তার কিছু স্বতঃস্ফূর্ত হলেও, বেশির ভাগটাই রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। নতুন আইন করা হয়েছিল শুধুমাত্র বেসরকারি হাসপাতালের কথা ভেবে, কিন্তু আইন বলবৎ হবার পাঁচ মাস পর দেখা যাচ্ছে, সিংহভাগ আক্রমণের অভিমুখ হচ্ছেন সরকারি ডাক্তাররাই।

এই যুগ তথ্য-প্রযুক্তির, আরো নির্দিষ্ট করে বললে, সোশ্যাল মিডিয়ার। এই অভূতপূর্ব মন্থনকালের প্রভাব আছড়ে পড়লো সেই ভার্চুয়াল দুনিয়াতেও। ফেসবুকের প্ল্যাটফর্মে স্বতঃস্ফূর্তভাবে জন্ম নিলো চিকিৎসকদের সম্পূর্ণ রাজনীতি-নিরপেক্ষ নতুন সংগঠন ওয়েস্ট বেঙ্গল ডক্টর্স ফোরাম (ডব্লুবিডিএফ)। জন্মলগ্ন থেকে আজ অব্দি মাত্র মাত্র কয়েক মাসে যার ভার্চুয়াল সদস্যসংখ্যা পৌঁছে গেছে প্রায় কুড়ি হাজারের অভাবনীয় মাইল ফলকে। এলো আরো কিছু ভ্রাতৃপ্রতিম চিকিৎসক সংগঠন। জোট বাঁধলেন চিকিৎসক সমাজ।

রাজ্যবাসী সাক্ষী থাকলেন এক ঐতিহাসিক মিছিলের, ব্যক্তিগত এবং সমষ্টিগত রাজনৈতিক মতভেদের ঊর্ধ্বে উঠে 'ভরসা থাকুক' ব্যানারে হাঁটলেন কয়েক হাজার চিকিৎসক। দাবি সামান্যই, কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তার, রোগী-চিকিৎসকের সুসম্পর্কের আর সর্বজনীন স্বাস্থ্য পরিষেবার। তাতে পরিস্থিতি বদল হলো না এতোটুকু। নেমে আসতে থাকলো একের পর এক আক্রমণ। আদালতের দ্বারস্থ হলেন চিকিৎসকরা, সুবিচারের আশায়। সংগঠিত হতে থাকলো, মিটিং, কনভেশন। এলো, চিকিৎসক নিরাপত্তার জন্য এস ও এস অ্যাপ, কোথাও বা চিকিৎসক সমাজ আত্মরক্ষার জন্য নিজেদের প্রশিক্ষিত করে তুলতে চাইলেন মার্শালআর্টে। ঘনীভূত হলো অন্ধকার। চিকিৎসক সমাজের কাছে এ এক ভয়ঙ্কর সময়। দুঃসহ, নিরাশ্রয়, বিপন্ন, অসহায়।

বিশদে যাবার আগেই কয়েকটা কথা জেনে রাখা ভালো। এদেশে চিকিৎসাব্যয় মাথাপিছু ৩৯ ডলার যা এমনকি অনেক অনুন্নত দেশের থেকেও কম। প্রতি হাজারে শয্যাসংখ্যা ০.৮ যা প্রতিবেশী শ্রীলঙ্কার (৩/১০০০) থেকে কম। স্বাস্থ্যখাতে বাজেট বরাদ্দ জিডিপির মাত্র ১.২ শতাংশ। জনস্বাস্থ্যে খরচের হার মাত্র ৩৩ শতাংশ (প্রয়োজন ৭০%), স্বাস্থ্যে ব্যক্তিগত বিনিয়োগ শতকরা ৮০%, যার ৭৪% ব্যয় হয়ে যায় ওষুধ ও সরঞ্জামের জন্য। সরকারি পরিকাঠামোয় রোগী-চিকিৎসকের সাক্ষাতের গড় সময় মিনিটখানেক মাত্র।

স্বস্থ্যের মানোন্নয়নের জন্য যে উপযুক্ত পরিকাঠামো প্রয়োজন তার অভাবের কথা চিন্তা করে সরকার ডা. শ্রীনাথ রেড্ডি কমিশন গঠন করেন যার সুচিন্তিত বক্তব্য সাম্প্রতিককালে সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য ব্যবস্থা বলে বিবেচিত হয়। ডা. শ্রীনাথ রেড্ডি কমিশনের রিপোর্ট সরকার গ্রহণ করেন নি, সে রিপোর্ট এখন ঠাণ্ডাঘরে!

ক্লিনিক্যাল এস্টাব্লিশমেন্ট? কিন্তু যেখানে কোনো এস্টাব্লিশমেন্টই নেই? নেই প্রথাগত 'ক্লিনিক্যাল' তকমাধারী কোনো কিছুর অস্তিত্ব? আজও আমাদের দেশের (এবং প্রদেশের) প্রতিটি প্রান্তে প্রাথমিক এবং আপৎকালীন স্বাস্থ্য পরিষেবা দিয়ে থাকেন প্রথাগত শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণ বিহীন কিছু মানুষ, যাঁদের আমরা 'হাতুড়ে' বলে থাকি। এঁদের মধ্যে কিছু প্রশিক্ষণবিহীন স্বশিক্ষিত মানুষ আছেন, যাঁরা সত্যি মানুষের উপকার করেন, বা অন্তত করতে চান, নিজেদের সীমিত বিচার বুদ্ধি, অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে। আর আছেন প্রচুর ভণ্ড, ঠগ, শঠ, ভেকধারী নকল চিকিৎসক, যাঁরা প্রতিনিয়ত মানুষকে ঠকিয়ে চলেছেন। আছেন, হোমিও, আয়ুর্বেদ, ইউনানী, ম্যাগনেটোথেরাপি বা আয়ুষ চিকিৎসকেরা। তাঁদের সিংহভাগই কিন্তু বেসরকারি। থাকবেন তো তাঁরা এই আইনের আওতায়? কোথাও কিন্তু এই ব্যাপারটার উল্লেখ নেই! এই একশ তিরিশ কোটির দেশে প্রতি হাজার মানুষ পিছু মাত্র একজন চিকিৎসক! তার জন্য কি একজন চিকিৎসক দায়ী? সেই একজন যিনি তাহলে ছোটো বেলা থেকে মনোযোগী ছাত্র বা ছাত্রী ছিলেন, মেধাবীও। পাড়ায়, ইস্কুলে, কলেজে যাঁকে ভালো ছেলে বা মেয়ে বল হতো, কৈশোর আর যৌবনের প্রায় পুরোটাই যিনি মনোনিবেশ করেছেন বইয়ের পাতায়, জয়েন্ট এন্ট্রান্সের দুর্লঙ্ঘ্য পর্বতারোহণ করে ফের পাড়ি দিয়েছেন অজস্র পার্ট, সেমেস্টারের ঢেউ পেরিয়ে এমবিবিএস-এর অকূল পাথার, তারপর আবার পোস্টগ্রাজুয়েশনের যুদ্ধে জয়ী কিংবা পরাজিত হয়ে নেমেছেন জীবন যুদ্ধে! কেউ কেউ আবার মধ্যবিত্ত পরিবারের নানা রকম পিছুটান পেরিয়ে শুধুমাত্র মেধার ওপর ভিত্তি করে পাড়ি দিয়েছেন বিলেতে, উচ্চশিক্ষিত হয়েছেন, নিয়েছেন সর্বোচ্চ মানের প্রশিক্ষণ এবং তারপর ফিরে এসেছেন নিজের দেশে, হয় বাধ্য হয়ে অথবা আদর্শের টানে। সেই দেশে যেখানে 'ব্রেন ড্রেন'-কে জঘন্য অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হয়, কিন্তু পঞ্চায়েত প্রধান, কাউন্সিলর, এমএলএ, এমপি, প্রাক্তন মন্ত্রী এমনকি প্রাক্তন কয়েদি পর্যন্ত চিকিৎসকদের বা সংস্থাকে হুমকি দিয়ে থাকেন প্রায় জন্মগত অধিকারবশত। তবে কি যত দোষের ভাগী শুধুমাত্র চিকিৎসকরাই? আরো নির্দিষ্ট করে বললে বেসরকারি চিকিৎসকরা?

আমাদের দেশের (এবং প্রদেশের) প্রতিটি প্রান্তে প্রাথমিক এবং আপৎকালীন স্বাস্থ্য পরিষেবা দিয়ে থাকেন প্রথাগত শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণ বিহীন কিছু মানুষ, যাঁদের আমরা 'হাতুড়ে' বলে থাকি। এঁদের মধ্যে কিছু প্রশিক্ষণবিহীন স্বশিক্ষিত মানুষ আছেন, যাঁরা সত্যি মানুষের উপকার করেন, বা অন্তত করতে চান, নিজেদের সীমিত বিচার বুদ্ধি, অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে। আর আছেন প্রচুর ভণ্ড, ঠগ, শঠ, ভেকধারী নকল চিকিৎসক, যাঁরা প্রতিনিয়ত মানুষকে ঠকিয়ে চলেছেন।

দরকার ছিল এরকম একটি আইনের, অন্তত আইনের ভয়ের, অনেক কুলাঙ্গার অসৎ চিকিৎসা-ব্যবসায়ী আছেন তাঁদের নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য। এই আইনে সঠিকভাবেই সাধারণ মানুষের রক্ষাকবচের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু, চিকিৎসক সুরক্ষিত থাকবেন কোন কবচের ভরসায়? হ্যাঁ। শুধু বেসরকারি চিকিৎসা পরিষেবা কেন, দেখতে হবে সরকারি চিকিৎসা ব্যবস্থাতেও আর কেউ যেন ভুক্তভোগী না হন! কারণ, কেবলমাত্র বেসরকারি হাসপাতাল তো নয়, সাধারণ মানুষ তো সরকারি হাসপাতালেও যেতে পারেন, যানও। তো, সরকারি হাসপাতাল কেন এই আইনের বাইরে থাকবে? গত কয়েক মাসে আক্রান্ত চিকিৎসকদের দুই-তৃতীয়াংশ তো সরকারি হাসপাতালেই কাজ করনে! সরকারি চিকিৎসক আক্রান্ত হলে বা সরকারি চিকিৎসাকেন্দ্রে ভাঙচুর হলে কেন প্রয়োগ করা হয় না West Bengal Medicare Service Persons & Medicare Service Institutions (Prevention of Violence & Damage to Property) Act, 2009? আইনসভা ছাড়াও দেশের সংবিধান-স্বীকৃত আর একটি স্তম্ভ হলো বিচার সভা। এই আইনে অভিযুক্ত চিকিৎসক বা চিকিৎসা-সংস্থা আবেদন করতে পারবেন না কোনো দেওয়ানি আদালতে, চাইতে পারবেন না বিচার। কিন্তু কেন? একজনও সৎ, পরিশ্রমী, প্রশিক্ষিত চিকিৎসক যেন অসম্মানিত না হন, না হন হেনস্থার শিকার, সেটা দেখার দায়িত্ব কার? দেখা যাচ্ছে চিকিৎসায় গাফিলতির অভিযোগ একজন মানুষ এই সমস্ত জায়গায় যেতে পারেন, যানও—১. পুলিশ, ২. সিএমওএইচ, ৩. কমিশন, ৪. উপভোক্তা ফোরাম, ৫. রাজ্য মেডিক্যাল কাউন্সিল, ৬. স্বাস্থ্য ভবন, ৭. সংবাদ মাধ্যম। ন্যাচারাল জাস্টিসের সূত্র মেনে একজন ফাঁসির আসামীও আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ পায়, একজন অভিযুক্ত চিকিৎসক পাবেন না কেন। সাঁইতিরিশ বা সাতান্ন বা সাতাত্তর নেহাত সংখ্যা হতে পারে, কিন্তু মনে পড়ে 'মঁসিয়ে ভেরদু' ছবিতে চ্যাপলিনের সেই অমোঘ উচ্চারণ "One murder makes a villain, millions a hero." এ কোন সমাজে আমরা এসে পৌঁছালাম যেখানে সদ্য চিকিৎসক হওয়া এক মেধাবী তরুণীর অবমাননা, বয়োবৃদ্ধ চিকিৎসকের শারীরিক নিগ্রহ, এমনকি সরকারি আধিকারিক চিকিৎসকের বিষ্ঠাস্নান আমাদের নিদ্রাহীনতার কারণ ঘটায় না! মিছিল দূরস্থান, সুশীল সমাজের

একজন প্রতিনিধিও মোমবাতি হাতে বলেন না, Not in my name!

নতুন একটি অগণতান্ত্রিক, অবৈজ্ঞানিক, দমনমূলক, জনবিরোধী বিল আনতে চলেছেন দেশের সরকার বাহাদুর। অনেক দোষ-ত্রুটি সত্ত্বেও মেডিক্যাল কাউন্সিল কিন্তু একটি নির্বাচিত স্বশাসিত সংস্থা। নতুন ব্যবস্থায় নির্বাচিত কাউন্সিলের বদলে আসবেন সরকার মনোনীত আমলারা। দেশের স্বাস্থ্যনীতির নির্ধারক হবেন প্রধানত সরকারি আমলারা এমনকি এই কমিশনের সর্বোচ্চ পদেও থাকবেন একজন অচিকিৎসক। মডার্ণ মেডিসিনের চিকিৎসাপদ্ধতির সঙ্গে হোমিওপ্যাথি, আয়ুর্বেদ, ইউনানী, ম্যাগনেটোথেরাপি মিশিয়ে আনার চেষ্টা হচ্ছে এক হাঁসজারু ভয়ংকর চিকিৎসা-ব্যবস্থা। তিন সপ্তহের ব্রিজ কোর্সের মাধ্যমে একজন আয়ুষ চিকিৎসক পেয়ে যাবেন মডার্ন মেডিসিনের ওষুধের প্রয়োগাধিকার! এটা তার নিজের অধীত শাস্ত্রের প্রতি চরম অনাস্থা ও অপমান তো বটেই, মানুষের স্বাস্থ্য নিয়ে ছিনিমিনি খেলার দ্বার প্রশস্ত করা। মেধাভিত্তিক ভর্তির প্রথাকে পেছনে ঠেলে খুলে দেয়া হবে বেসরকারি, ক্যাপিটেশন ফি ভিত্তিক মেডিক্যাল কলেজের দরজা। এতে শুধু যে ভবিষ্যতের স্বাস্থ্য-শিক্ষার সর্বনাশ হবে তাই নয়, সমস্যা-জর্জর স্বাস্থ্য পরিষেবা সম্পূর্ণ ভেঙে পড়বে। সংকটকাল পেরিয়ে এক মহাশূন্যতার দিকে এগিয়ে চলেছে সমাজ। যে সমাজের চিকিৎসক প্রয়োজন নেই। তা তো নয়!

১৯৪৮ সালে জেনেভায় বিশ্ব মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশন (ডব্লিউএমএ)-এর দ্বিতীয় সাধারণ পরিষদ সভায় গৃহীত হয় আড়াই হাজার বছরের পুরোনো হিপোক্রাটিক শপথবাক্যগুলির একটি আধুনিক এবং সংহত রূপ—সারা পৃথিবী জুড়ে চিকিৎসকরা যে তেরোটি শপথবাক্যে অঙ্গীকারবদ্ধ থাকেন। খুব আশার কথা যে সম্প্রতি শিকাগোতে ১৪ অক্টোবর ২০১৭ তারিখে বিশ্ব মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশন (ডব্লিউএমএ)-এর সাধারণ পরিষদে জেনেভা ঘোষণার নতুন সংশোধিত সংস্করণটি গৃহীত হয়েছে। এবং সত্তর বছর পর এই প্রথম তাতে সংযোজিত হয়েছে একটি খুব তাৎপর্যপূর্ণ শপথ বাক্য I WILL SHARE my medical knowledge for the benefit of the patient and the advancement of healthcare; I WILL NOT USE my medical knowledge to violate human rights and civil liberties, even under threat. এই দুটির মাঝখানে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে এই কথাগুলি: I WILL ATTEND TO my own health, well-being, and abilities in order to provide care of the highest standard। নতুন কথা তো নয়, সেই চেনা কথা "Physician, heal thyself"। নিজের যত্ন নাও, ডাক্তার, নিজে সুস্থ থাকো, নিরাপদ থাকো, সুরক্ষিত থাকো। তা এই যদি বিশ্বসংস্থার শপথবাক্য হয়, তবে তো সমাজের দায়িত্ব আমাকে, আমাদের সুরক্ষা দেওয়া, সুস্থ কাজের পরিবেশ দেওয়া, যাতে একজন চিকিৎসক অন্তত নিরাপদে মানুষের চিকিৎসা করতে পারেন! Supreme court, এই দেশের সর্বোচ্চ আদালত কিন্তু বলেছিলেন এ কথা, একবার নয়, বারবার! ২০০৯ সালে মাননীয় বিচারপতি মার্কণ্ডেয় কাটজু এবং বিচারপতি আর এম লোধা-র বেঞ্চ তো পরিষ্কার জানিয়ে দেন: "This is necessary to avoid harassment to doctors who may not be ultimately found to be negligent. We further warn the police officials not to arrest or harass doctors unless the facts clearly come within the parameter laid down in Jacob Mathew's case, otherwise the policemen will themselves have to face legal action." দেখা যাক জ্যাকব ম্যাথিউর সেই কেসে মাননীয় বিচারক রায়ের সেই ঐতিহাসিক কথাগুলি : "A medical practitioner faced with an emergency ordinarily tries his best to redeem the patient out of his suffering. He does not gain anything by acting with negligence or by omitting to do an act. Obviously, therefore, it will be for the complainant to clearly make out a case of negligence before a medical practitioner is charged with or proceeded against criminally. A surgeon with shaky hands under fear of legal action cannot perform a successful operation and a quivering physician cannot administer the end-dose of medicine to his patient.

If the hands be trembling with the dangling fear of facing a criminal prosecution in the event of failure for whatever reason, whether attributable to himself or not, neither can a surgeon successfully wield his life-saving scalpel to perform an essential surgery, nor can a physician successfully administer the life-saving does of medicine." MEDICARE 2009। উপায় কিন্তু আছে, ছিলই। ২০০৯ সালে এই রাজ্যেই আনা হয় একটি আইন, আজ পর্যন্ত যার প্রয়োগ হয় নি—Weat Bengal Medicare Service Persons & Medicare Service Institutions (Prevention of Violence & Damage to Property) Act, 2009। চিকিৎসক, চিকিৎসাকর্মী এবং চিকিৎসা-প্রতিষ্ঠানের ওপর আক্রমণ এবং সম্পত্তির ক্ষতি নিবারক আইন। একটা জোরালো দাবি উঠতে পারে কি, এই ভুলে যাওয়া আইনটি অক্ষরে অক্ষরে বলবৎ করার? এই দমবন্ধকর পরিস্থিতি থেকে বেরিয়ে আসার কী উপায়? কোনো সহজ পন্থা নেই।

বিতর্ক-বিবাদ-যুক্তি-তক্কো-প্রতিবাদ-প্রতিরোধ-কনক্লেভ-মিছিল-আদালত সব চলতে থাকুক, তার সঙ্গে যোগ হোক আর একটি মাত্রা, যা অপেক্ষাকৃত সরলতর কিন্তু প্রলম্বিত। বস্তুবাদী, কিন্তু ততটা দ্বন্দ্ব-মূলক নয়। সংঘাতের বিপরীতে আলোচনায়। সমাধান-সম্ভব ধৈর্যশীলতায়। কোনো আইন একজন চিকিৎসকের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে পারে না। তার জন্য প্রয়োজন সমাজ-বদলের। নিদেনপক্ষে সমাজের মানসিকতা বদলের। দূরবীন লাগিয়েও এ হেন নিখাদ গ্রীষ্মযামিনী-স্বপ্নসম ইউটোপিয়ান সমাজবিপ্লবের সম্ভাবনাও দেখা যাচ্ছে কি? নাহ্! কিন্তু, দার্জিলিং-এর হিমালয়সম সংকটমোচনের পথ যদি আলোচনার টেবিলে বসে খোঁজা যেতে পারে, এ ক্ষেত্রে নয় কেন? শুরু হোক প্রক্রিয়াটা। প্রতিটি শহরে, গঞ্জে, গ্রামে, পঞ্চায়েতে বসুক নিয়মিত আলোচনা-সভা। থাকুন চিকিৎসক, রোগী, সাংবাদিক, সমাজকর্মী, সরকারি এবং বিরোধী রাজনীতির প্রতিনিধি, শিক্ষক, আইনজীবী সবাই। পারস্পরিক দোষারোপ নয়, আসুন সবাই মিলে খোঁজা হোক সমাধানসূত্র। এর জন্য চাই সমাধানের সদিচ্ছা। রাজনৈতিক সদিচ্ছা। সমাজের কলঙ্কমোচনের জন্য এই উদ্যোগ কিন্তু নিতে হবে প্রশাসনের সর্বোচ্চ স্তর থেকেই। কিন্তু সংশয়ী মন একটা নিষ্ঠুর হিসেবের কথা মনে করিয়ে দিচ্ছে। এই একশ তিরিশ কোটির দেশে প্রতি দেড় হাজার মানুষ-পিছু মাত্র একজন চিকিৎসক! আর সেই জন্যই ভোটবাদী এই রাষ্ট্রব্যবস্থায় প্রশাসক যে অঙ্কের (তথা ভোটের) হিসেবে করুণভাবে সংখ্যালঘু চিকিৎসক-সমাজের কথা আদৌ ভাববেন, সেটাও কষ্টকল্পনা! এটাই সত্যিকারের সঙ্কট। এক ভয়ংকর সামাজিক অচিকিৎস্য মহামারী আসন্ন হবে। আর তার দায়ভাগী হতে হবে প্রশাসনকেই। কে না জানে, অন্ধ হলে প্রলয় বন্ধ থাকে না, নগরে আগুন লাগলে দেবালয় রক্ষা পায় না। সাউথ ব্লক না! নবান্নও না!

Pooja Greetins from

DURGAPUR CONSTRUCTION

MECHANICAL, STRUCTURAL & PIPE LINE CONTRACTOR

J.P. Avenue, Durgapur-713211, Dist. Paschim Bardhaman

Sl. No. 107

হিন্দুস্থানী রাগসঙ্গীত ও নজরুল ইসলাম

অশোক দাস

নজরুলের জীবনবৃত্তান্ত জানতে হলে যে নানা গ্রন্থপাঠের প্রয়োজনীয়তা আছে তা নয়, কারণ নজরুল এমন একজন পুরোনো আমলের লোক নন যে তাঁর জীবনের অনেক তথ্য অজানা থেকে যাবে। নজরুল কৈশোরে লেটোর দলে গান বাঁধতেন একথা প্রায় সকলেই জানেন। কিন্তু লেটো এমন এক ধরনের শিল্পরীতি যাকে নাটক, গান বা লোকগীতি কিছুই বলা চলে না। তাৎক্ষণিক গান বাঁধার প্রতিভা হচ্ছে একজন সফল লেটো গায়কের সার্থকতার চাবিকাঠি। সুর সেখানে গৌণ। তবলা বা পাখোয়াজে শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের যেসব তাল ব্যবহৃত হয়, লেটো গানে সে ধরনের কোনো তালের বা সুরের প্রকরণ নেই। এমনকি লেটো গায়ককে সুকণ্ঠের অধিকারী হতে হবে এমন কোনো কথা নেই। নজরুল এই লেটো গানের অনুশীলনও খুব বেশি দিন করেননি।

নজরুল খুব একটা সুকণ্ঠের অধিকারী না হলেও তিনি যখন গান গাইতেন, তাতে এমন প্রাণপ্রতিষ্ঠা করতে পারতেন যে তাঁর পরবর্তী শিল্পী সুকণ্ঠের অধিকারী হলেও আসর জমাতে পারতেন না। কী গান গাইতেন নজরুল? আমরা যতদূর জানি, শিয়াড়শোল রাজ হাইস্কুলে পড়ার সময় স্কুলের ফাংশানে গাইবার জন্য বা নিজের আনন্দে গাইবার জন্য উক্ত স্কুলের শিক্ষক সতীশ কাঞ্জিলালের কাছে কিছু রবীন্দ্রসঙ্গীত শিখেছিলেন। এ যুগেও আপনারা অনেক স্কুল পাবেন যেখানে কোনো না কোনো শিক্ষক-শিক্ষিকা স্কুলের অনুষ্ঠানে উৎসাহিত হয়ে নাচ শেখান, রবীন্দ্রসঙ্গীত বা নজরুলগীতি শেখান। কিন্তু তাঁরা যে এ-বিষয়ে বিশেষ তালিমপ্রাপ্ত এবং ছাত্র-ছাত্রী তৈরি করে তালিম দিতে সমর্থ একথা বলা যায় না। তবুও যতটুকু মেধা, নিষ্ঠা, সুরজ্ঞান বা তালজ্ঞান আছে সেটুকু নিয়ে তাঁরা গান বা নাচ শেখান। অনুষ্ঠানও খুব একটা খারাপ হতো না। হয়তো সতীশ কাঞ্জিলাল ততটা কাঁচা শিক্ষক ছিলেন না। তিনি তাঁর কাছে নাড়াবাঁধা কোনো শিষ্যকে গান শেখাতেন তা নয়। সুতরাং নজরুল সতীশ কাঞ্জিলালের সে-রকম নাড়াবাঁধা শিষ্য ছিলেন না।

শুনেছি, 'অগ্নিবীণা বাজাও তুমি কেমন করে' গানটি নজরুল সতীশ কাঞ্জিলালের কাছেই শেখেন। এরপর রবীন্দ্রনাথের 'অতিথি' গল্পের তারাপদর দ্বিতীয় সংস্করণ নজরুল ইসলাম চলে গেলেন ফৌজে। শাস্ত্রীয় সঙ্গীত অধ্যয়ন, অনুশীলন ও পরিবেশনের সময়, সুযোগ, অধ্যবসায় ও নিষ্ঠা কোনোটাই নজরুলের ছিল না। ৪৯ নং বেঙ্গল রেজিমেন্ট ভেঙে গেলে নজরুল প্রথম দিনকয়েকের জন্য চুরুলিয়ায় যান এবং যে-কোনো কারণেই হোক নিজের জন্মভূমি গ্রামে আর কোনোদিনই ফিরে যাননি। কলকাতায় এসে প্রথম তাঁর বাল্যবন্ধু শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের মেসে এবং

সেখানে কিছু অসুবিধা থাকায় পাকাপাকিভাবে মুজফ্‌ফর আহমদের বাসায় পাশাপাশি চৌকিতে অবস্থান শুরু করলেন। তখন তাঁর বয়স একুশ বছর। মুজফ্‌ফর আহমদের সঙ্গে থেকে তিনি এক নতুন জীবন শুরু করলেন। তা হল, সাংবাদিক জীবন, যার সঙ্গে গান-বাজনার কোনো সম্পর্ক নেই। তবে গান যে তিনি গাইতেন না, তা নয়। অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই গানবাজনা আড্ডা হৈ হৈ করে তিনি কলকাতায় খুব অল্পদিনের মধ্যেই জনপ্রিয়তা অর্জন করে ফেললেন। পাশাপাশি চললো তাঁর সাহিত্যচর্চা। হারমোনিয়াম দেখলেই তাঁর হাত নিশপিশ করতো এবং বিনা অনুরোধে কোনো আড্ডায় বসে একের পর এক গান গেয়ে যেতেন। শিল্পীর দক্ষিণা ছিল কয়েক কাপ চা এবং কয়েক খিলি পান। তিনি বলতেন, ''এক লাখ কাপ চা না খেলে চালাক হওয়া যায় না। এইসব আড্ডাতেও তিনি তাৎক্ষণিক গান বেঁধে শোনাতেন। কোনো খসড়া ছাড়াই সরাসরি হারমোনিয়াম ধরে পুরো গানটির স্থায়ী, অন্তরা, সঞ্চারী, আভোগ—সব অংশই বেঁধে ফেলতেন এবং পরক্ষণেই ভুলে যেতেন। এছাড়া তখন কংগ্রেসের ছাত্র সম্মেলন, যুবসম্মেলন, কৃষক সম্মেলন বা প্রাদেশিক সম্মেলনে তাঁর ডাক পড়তো। এক্ষেত্রেও তাঁর অধিকাংশ রচনা তাৎক্ষণিক। লেটোর দলে তাৎক্ষণিক গান বাঁধার প্রতিভা এইভাবেই স্ফূরিত হচ্ছিল। তবে সুরের ক্ষেত্রে তিনি লোকায়ত সুরকেই ব্যবহার করেছেন বেশি। কেননা ব্রিটিশ-বিরোধী মেসেজ জনসাধারণের কাছে পৌঁছাতে গেলে লোকসঙ্গীতের সুরই শ্রেয়। এছাড়া বাণী রচনায় 'লাথি মার ভাঙরে তালা'র মতো স্পষ্টভাষণ লোকায়ত ধারাতেই সম্ভব।

১৯২২ সালে নজরুল 'ধূমকেতু' পত্রিকায় 'আনন্দময়ীর আগমনে' কবিতা প্রকাশের জন্য কারারুদ্ধ হন। সেখানে তিনি রবীন্দ্রনাথের 'তোমারি গেহে পালিছ স্নেহে' গানটির প্যারোডি রচনা করেন। তখনো পর্যন্ত নজরুলের হিন্দুস্থানী শাস্ত্রীয় সংগীতের বিধিবদ্ধ তালিমই শুরু হয়নি। আমরা জানি দু-একজন বাদে অধিকাংশ সঙ্গীতশিল্পীরই বিধিবদ্ধ তালিম শুরু হয় পাঁচ-ছ বছর বয়স থেকেই, যে বয়সে নজরুল দরগায় খিদমদগিরি করেছেন, গ্রামের মক্তবে মৌলবীগিরি করেছেন। বাল্যবয়স থেকে রেওয়াজ করতে করতে তাঁরা পরিণত বয়সে এসে দক্ষ শিল্পীতে পরিণত হন, কেউ কেউ ওস্তাদ বা পণ্ডিত বা বিদূষী, বা গুরু ইত্যাদি উপাধিতে ভূষিত হয়ে সঙ্গীত শিক্ষকতা শুরু করেন। শাস্ত্রীয় সঙ্গীত কখনো বিধিবদ্ধ তালিম ছাড়া শুধুমাত্র প্রতিভাবলে আয়ত্ত করা যায় না।

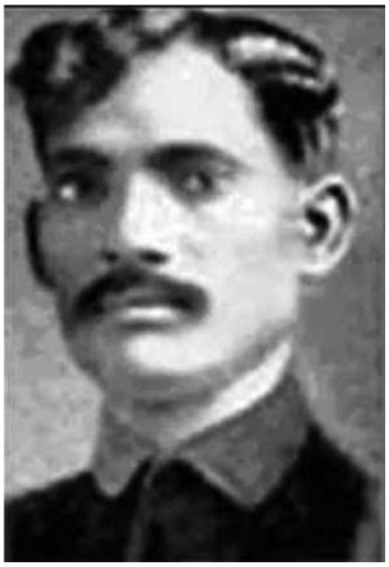

কে. মল্লিক

গিরীন চক্রবর্তী

এবার আমরা সে-সময়কার কলকাতার গানবাজনার জগতের কিছু তথ্য জানার চেষ্টা করি। নজরুলের জন্মের বহু বছর আগে রামোহন রায় যে সঙ্গীতধারাকে চালু করলেন তা হল ধ্রুপদ গান। বাংলাতেও ধ্রুপদ গান গাওয়া যেত। আমার বাবার খাতায় আমি যখন রাগে নিবদ্ধ চৌতালে বাংলা ধ্রুপদ দেখেছি। গানটি হল 'কে শবাসনা, করালবদনা হয়ে দিগ্‌বসনা সমরে নাচিছে।' বিষ্ণুপুরের ধ্রুপদ গাইয়েরা তো দস্তুরমতো দুনি চৌদুনি করে বাট করে বাংলা ধ্রুপদ গাইতেন। এর মধ্যে বাংলা আধুনিক গান হিসেবে জন্ম নিয়েছে নিধুবাবুর টপ্পা। সে এমন এক জনপ্রিয় ধারায় পরিণত হল যে সব গানই টপ্পার স্টাইলে গাওয়া হত, নজরুলও তাঁর 'আমার শ্যামামায়ের কোলে চড়ে' গানটি জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ গোস্বামীকে দিয়ে গাইয়েছিলেন। অথবা জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ নিজেই টপ্পার মতো করে গানটি রেকর্ড করেছিলেন। কারণ, নজরুল পরবর্তীকালে যে-সব শ্যামাসঙ্গীত ভবানীচরণ দাস, মৃণালকান্তি ঘোষকে দিয়ে গাইয়েছিলেন, সেগুলি মধ্যযুগের শ্যামাসঙ্গীতের যে ধারা তা থেকে পৃথক। এমনকি তিনি রামপ্রসাদী সুরকেও অনুকরণ করেননি। এসব পরের কথা। উনিশ শতকের শেষ ভাগ থেকে বিশ শতকের প্রথমভাগ পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে কোলকাতায় খেয়াল অপেক্ষা ধ্রুপদ গানেরই প্রাধান্য ছিল। জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ি তখন রীতিমতো ধ্রুপদ গানের ইউনিভার্সিটি। মহর্ষি দেবেন্দ্র বিষ্ণুপুর থেকে যদুভট্ট, রাধিকা গোস্বামী থেকে শুরু করে বহু খ্যাতনামা ধ্রুপদশিল্পীকে সন্তানদের সঙ্গীতশিক্ষার জন্য নিযুক্ত করেছিলেন। সে-সময় রবীন্দ্রনাথ ধ্রুপদভাঙা যে-সব গান রচনা করলেন, সেগুলি প্রচলিত বাংলা ধ্রুপদ থেকে আলাদা। 'মোরে বারে বারে ফিরালে' জাতীয় কিছু গান এবং কিছু সেতারের গৎ ভেঙে তৈরি গান ছাড়া তিনি খেয়াল অঙ্গের খুব বেশি গান রচনা করে যাননি। অথচ, রাগ-রাগিনী প্রয়োগে প্রচলিত তালের মধ্যেও সম ফাঁকের বৈচিত্র্য আনয়নে তিনি বাংলা গানে এক নতুন ধারা সৃষ্টি করে গিয়েছেন। সিপাহী অভ্যুত্থানের পর অযোধ্যার নবাবকে কলকাতায় নির্বাসিত করা হলে এখানে খেয়ালের চর্চা বাড়লেও বাঙালিরা কিন্তু মজে থাকলেন লোকগান, কীর্তন, বাউল, ভাটিয়ালিতে। আর বৈঠকি আসরে টপ্পা অঙ্গের শ্যামাসঙ্গীত, প্রেমের গান, আগমনী ইত্যাদি গানের চর্চাই ছিল সর্বাধিক।

নজরুল সঙ্গীতজগতে পেশাদার রচয়িতা ও সুরশিল্পী হিসেবে প্রবেশ করলেন তিরিশের দশকে। গ্রামোফোন কোম্পানিতে এক্সক্লুসিভ কম্পোজার হিসেবে। তিনি নিজে মেগাফোন কোম্পানিতে চারখানা গান রেকর্ড করলেও পরে তা বাতিল করে দেন। এবার তিনি গায়কের জীবন ছেড়ে গীতিকার ও সুরকার হিসেবে আত্মপ্রকাশ করলেন এবং বাংলা গানের জগতে এক বিপ্লবের সূচনা করলেন। বিভিন্ন গ্রন্থে পড়েছি তিনি প্রায় চার হাজারের মতো গান রচনা করে যে-সব শিল্পীদের দিয়ে গাইয়েছেন তাঁরা সেযুগের এক একজন দিকপাল শিল্পী। তার আগে রবীন্দ্রনাথ তাঁর গান রেকর্ড করার অনুমতি এই সব শিল্পীদের দেননি। কে. মল্লিক, জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ গোস্বামী, কৃষ্ণচন্দ্র দে, গিরীন চক্রবর্তী, আঙুরবালা, ইন্দুবালা, মিস হরিমতী, মিস অনিমা (বাদল), মিস প্রমোদা,

সুপ্রভা সরকার, ফিরোজা বেগম প্রমুখ খ্যাতনামা শিল্পীরা নজরুলের ট্রেনিং-এ গান করেছেন, যাঁরা কেউ কেউ নজরুলের চেয়ে বয়সে, অভিজ্ঞতায়, সঙ্গীতশিক্ষায় বড়ো ছিলেন। আঙুরবালা, ইন্দুবালা তো প্রায় তাঁর বয়সীই ছিলেন। এখানেই প্রশ্ন আসে তাহলে কি প্রথাগত তালিম ছাড়াই সঙ্গীতশিক্ষক হওয়া যায়? কারণ, নজরুল হয়তো বাংলায় কিছু লোকায়ত সুর, উত্তরভারতের কাজরী, চৈতী, হোরি, পারস্য দেশের নওরোজকা ছাড়াও তুরস্ক, মিশর প্রভৃতি দেশ থেকে সুর আমদানি করে 'চমকে চমকে ধীর ভীরু পায়', 'মোমের পুতুল মমির দেশের মেয়ে', 'দূর দ্বীপবাসিনী, চিনি তোমারে চিনি' 'শুকনো পাতার নূপুর পায়ে' গানগুলি রচনা করেছিছেলেন যা বাংলা গানের ক্ষেত্রে এক অনন্য ধারা। অন্যান্য গানে স্বঘোষিত সঙ্গীতাচার্যরা যতই সুপরিকল্পিত তান বিস্তার তেহাই প্রয়োগ করে সুন্দরী ছাত্রীদের বিগলিত প্রশংসা আদায় করুন না কেন, এইসব গানে সে সুযোগ নেই। তাই তাঁরা এগুলো গানও না। যাকগে, এই সমস্ত গানের সুর তিনি স্বল্পকালীন ফৌজি জীবনে আয়ত্ত করে আত্মস্থ করতে পেরেছিলেন স্বাভাবিক প্রতিভাবলেই। এতৎসত্ত্বেও তিনি শৈলেশ দত্তগুপ্ত, চিত্ত রায়, বিমল দাশগুপ্ত, কমল দাশগুপ্ত, ধীরেন দাস, গিরীন চক্রবর্তী, জগন্ময় মিত্র প্রমুখের সুরে গান বাঁধতে দ্বিধা করেননি। যা কিছু ভালো, তাকে স্বীকৃতি দেওয়া ছিল তাঁর প্রকৃতি।

বাংলা গানে নজরুলের অনন্য অবদান হল গজল। পারস্যদেশের সর্বাধিক জনপ্রিয় প্রেমের গান গজলের গায়নরীতি বাংলা গানে প্রয়োগ করলেও সেগুলিকে খাঁটি বাংলা গানে পরিণত করেছেন। পেশাগত কারণে, তাঁকে অনেক ফরমায়েসি গান রচনা করতে গিয়ে মৌলিক সৃজনের অনেক সময় ব্যত্যয় হয়েছে তাঁর এক দশকের সঙ্গীত জীবনে (১৯৩০-৪১), কিন্তু তিনি যদি শুধুমাত্র গজল নিয়েই সাধনা করে যেতেন, তাহলে তিনি আরও অনেক বড়ো স্রষ্টা হতে পারতেন।

□

হিন্দুস্থানী সঙ্গীত বলতে আমরা যা বুঝি তা হল পাকিস্তান, বাংলাদেশসহ সারা উত্তরভারতে যে শাস্ত্রীয় সঙ্গীত প্রচলিত অর্থাৎ ধ্রুপদ, ধামার ও খেয়াল গান। সালামত নাজাকত দুই ভাই যখন পাকিস্তান থেকে ভারতী ভবন (বার্নপুর)-এ এসে খ্যাল শুনিয়ে যান, সে গানকে তাঁরা হিন্দুস্থানী সঙ্গীত বলেই ঘোষণা করে গেছেন। হিন্দুস্থানী সঙ্গীত বলতে আক্ষরিক অর্থে বোঝায় হিন্দুস্থান নামক দেশে প্রচলিত গান, যে সঙ্গীতধারার সাথে কর্নাটকী সঙ্গীতের কোনো মিল নেই। স্বাধীনতার পর সারা ভারতবর্ষের নামের বিকল্প 'হিন্দুস্থান' নামটিকে স্থায়ী করার জন্যই পরবর্তীকালে আর হিন্দুস্থানী আর কর্নাটকী সঙ্গীত না বলে উত্তর ভারতীয় ও দক্ষিণ ভারতীয় রাগ বলে চিহ্নিত করা হচ্ছে। সম্ভবত, মুসলমান সুলতান ও মুঘল বাদশাদের আমলে অর্থাৎ ১০১০ খ্রিস্টাব্দে সুলতান মামুদের ভারত আক্রমণ ও পরবর্তীকালে মুহম্মদ ঘোরী কর্তৃক পৃথ্বীরাজ চৌহানের পরাজয়ের সময় পর্যন্ত সুলতানদের সাম্রাজ্য দিল্লি পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। তখন এই অঞ্চলটুকুকেই হিন্দুস্থান বলা হতো। হিন্দুস্থান শব্দের অর্থ হিন্দুদের দেশ একথা ভাবা ভুল। কারণ ভারতবর্ষে হিন্দু নামে কোনো জাতি বা ধর্ম কোনোকালেই ছিল না। রামায়ণে বা মহাভারতে বা গীতায় কোথাও হিন্দু শব্দের উল্লেখ নেই। বেদ উপনিষদের যুগে তো নয়ই। বৈদিক ভাষাকে আর্যভাষা বলা হতো, আর যার বেদমার্গী তাদের আর্য বলা হতো। আর্যভাষী সমাজ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এবং পরবর্তীকালে শূদ্র এই চারি বর্ণে বিভক্ত থাকার ফলে (বৃত্তি অনুযায়ী) রামায়ণের দশরথ, বা মহাভারতের শান্তনু ও তাঁর বংশধরেরা ক্ষত্রিয় নামেই পরিচিত ছিলেন, নারীরা তাঁদের স্বামীকে 'আর্যপুত্র' বলেই সম্বোধন করতেন। হিন্দুস্থান নামটি এসেছে সিন্ধুস্থান থেকে। উত্তর পশ্চিম ভারতে (প্রাক্‌ব্রিটিশ যুগে) ছোটো ছোটো রাজ্যগুলির নামের পাশে 'স্তাঁ' শব্দটি যুক্ত ছিল এবং এখনো আছে। যেমন আফগানিস্তাঁ, বেলুচিস্তাঁ ইত্যাদি। পরবর্তীকালে 'স্তাঁ' হয়ে গেল স্থান, ফলে আফগানিস্থান, বেলুচিস্থান ইত্যাদি নামগুলি এসে গেল। তবে নবগঠিত পাকিস্তান আর পাকিস্থান হলো না, উর্দু উচ্চারণই বহাল রইল। কবি ইকবালও লিখলেন 'সারে জাঁহাসে আচ্ছা হিন্দুস্তাঁ হামারা'। ১০১০ থেকে ১২০০ পর্যন্ত সাম্রাজ্য বিস্তারের সময়কালে সিন্ধু দেশকে পারসিক সুলতানেরা 'হিন্দুস্তাঁ'ই বলতেন, তাঁরাই সিন্ধু নামের শেষে 'স্তাঁ' জুড়ে দিয়েছিলেন এবং 'সিন্ধু'র পরিবর্তে হিন্দু উচ্চারণ করতেন বলে এই বিস্তীর্ণ অঞ্চলের নাম হয়ে গেল হিন্দুস্থান এবং এই অঞ্চলের দরবারি গানকে বলা হলো হিন্দুস্থানী সঙ্গীত যা রাগরাগিনী-সমৃদ্ধ ভারতীয় সঙ্গীতের সাথে ফার্সি গীতধারার মিশ্রণে তৈরি। কিছুদিন আগে পর্যন্ত বাঙালিরা অবাঙালিদের হিন্দুস্থানী বলতো, শরৎবাবুর উপন্যাসেও দারওয়ান, লাঠিয়াল ইত্যাদি পদে নিযুক্ত হিন্দুস্থানী ভাষাভাষী মানুষদের হিন্দুস্থানী বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এদিকে সমগ্র দক্ষিণ ভারতবাসীকে অনেকে বলতো মাদ্রাজী। অতএব আমরা ধরে নিতে পারি যে একাদশ শতাব্দীতে প্রাচীন ভারতীয় সঙ্গীত ধারার সাথে ফার্সি সঙ্গীতধারার সংমিশ্রণে যে সঙ্গীতধারা তাকেই হিন্দুস্থানী সঙ্গীত বলা যেতে পারে, যার লালন পালন ও অধ্যয়ন অনুশীলন হয়েছিল মুঘল সম্রাটদের আমলে, বিশেষ করে আকবর ও শাহজাহানের আমলে।

উত্তরপূর্ব ভারতে তখন দরবারি সঙ্গীত বলতে কী বোঝাত? গুপ্ত যুগে কী ধরনের সঙ্গীতধারা প্রচলিত ছিল? এগুলি স্থানাভাবে উল্লেখ করা গেল না, তবে সেনযুগে জয়দেবের গীতগোবিন্দ যে রাগ-রাগিনী সহযোগে গাওয়া হত তা বলার অপেক্ষা রাখে না। আবার সেনরাজাদের আগে পাল রাজাদের আমলে বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যগণ যে চর্যাগানগুলি বেঁধেছিলেন, সেগুলিও রাগ-রাগিনী সহযোগে গীত হত। তবে চর্যাগান দরবারের গান নয়, সম্পূর্ণ লোকায়ত। লোকগান যে রাগ-রাগিনী সহযোগে গাওয়া যায় না এমন কোনো কথা নেই। এ-যুগের মহাজনেরা এমনকি মানভূমের ঝুমুর পদকর্তারাও রাগ-রাগিনীর আশ্রয়ে পদ রচনা করেছেন। অর্থাৎ, হিন্দুস্থানী সঙ্গীত ও রাগসঙ্গীত এক বস্তু নয়, যদিও হিন্দুস্থানী সঙ্গীতে কেবলমাত্র রাগরাগিনীর আলাপ, বিস্তার, তান, বাট, সরগম রয়েছে যে যে গানে যেমনভাবে প্রযোজ্য। সেন আমল থেকে শুরু করে বাংলায় নবাবি আমল পর্যন্ত বাংলায় কীর্তন গানই ছিল ক্ল্যাসিকাল গান। চৈতন্যোত্তর যুগে কীর্তন গানের আরও বিকাশ ঘটলো, আজও তার জনপ্রিয়তা ক্রমবর্ধমান। ভারতীয় সংগীতশাস্ত্র গ্রন্থ হিসেবে সুলতান ও মুঘল আমলে শার্ঙ্গদেব রচিত 'সঙ্গীত রত্নাকর' ছাড়া অন্য কোনো গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায়নি। কিন্তু তখন বিভিন্ন রাজ দরবারে শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের ব্যাপক অনুশীলন শুরু হয়ে গেছে এবং ফারসি সঙ্গীত কম সমৃদ্ধ না হওয়া সত্ত্বেও মুসলমান শেখেরা যেমন জাকেরিয়া মুলতানী, গোয়ালিয়রের হাজি মহম্মদ গাউস শুধু প্রচলিত রাগরাগিনীই নয়, ফারসি সঙ্গীতের সাথে মিশ্রণ ঘটিয়ে নতুন নতুন রাগ সৃষ্টি করে চলেছেন।

বৈদিক সঙ্গীতের পর কীভাবে রাগ-রাগিনী সৃষ্টি হল, কীভাবে তা প্রবহমান থেকে আজও অনুশীলিত হচ্ছে সে ইতিহাসও অসম্পূর্ণ। অনেকটা ডারউইনের বিবর্তনবাদের মিসিংলিঙ্ক-এর মতো। অজানা

থেকে গেছে। ভাতখণ্ডেজী যখন সব রাগকে দশটি ঠাটে নিবদ্ধ করলেন তার আগে ছয় ঋতুতে ছয় রাগ এবং তাদের ছয়জন করে স্ত্রী এ ধারণা কীভাবে এলো তাও অনেকের অজানা। এছাড়া ছয় রাগ সম্পর্কিত ভিন্ন ভিন্ন সঙ্গীতশাস্ত্রীদের ভিন্ন ভিন্ন মত প্রচলিত ছিল। মহাদেবের পাঁচ মুখ থেকে পাঁচটি রাগ—শ্রী, বসন্ত, পঞ্চম, ভৈরোঁ ও মেঘ এবং পার্বতীর মুখ থেকে নটনারায়ণ রাগের উৎপত্তি—এ ধরনের অলৌকিক ধারণাও দীর্ঘদিন প্রচলিত ছিল। মুঘল ও সুলতানি আমলে নতুন নতুন রাগ সৃষ্টি হওয়ার ফলে এবং পরবর্তীকালে ধ্রুপদ ধামারের পাশাপাশি খ্যালের জনপ্রিয়তা যখন বাড়ল, পাখোয়াজের পাশাপাশি তবলা বিততবাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হতে লাগল তখন থেকে মুসলমান শেখদের তৈরি রাগ আরও জনপ্রিয় হল এবং ধীরে ধীরে হিন্দুস্থানে পুরোনো রাগগুলি অপ্রচলিত হয়ে পড়ল। সেসব রাগের উল্লেখ আছে পূর্বভারতের কবি জয়দেবের গীতগোবিন্দম্-এ। বড়ুচণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তনেও পাওয়া যায়। গীতগোবিন্দম্ ছাড়া শ্রীকৃষ্ণকীর্তন বা তারও আগে প্রাকৃতভাঙা বাংলায় রচিত চর্যাপদগুলিকে শাস্ত্রীয় সংগীতের পর্যায়ে ফেলা যায় না। বিস্তারিত জানতে হলে শুধু ছাত্রছাত্রীদেরই নয়, তাঁরা যে-সব গুরু, পণ্ডিত, বিদুষী বা সঙ্গীতাচার্যদের (কোথা থেকে যে এসব উপাধি পাওয়া যায় সে ব্যাপারে আমি অজ্ঞ, মাফ করবেন) যেসব বই আগে পড়া দরকার তা হলো আবুল ফজল রচিত 'সঙ্গীতাধ্যায়' অংশটি, ঔরংজেবের আমলে ফকির উল্লাহ রচিত 'রাগদর্পণ' এবং মির্জা খাঁ ইবনে ফকরুদ্দিন রচিত 'তুহফাৎ-উল-হিন্দ' গ্রন্থ তিনটি। এই গ্রন্থগুলি ফারসি ভাষায় রচিত, গ্রন্থকারগণ সংস্কৃত শিখে সংস্কৃত অধ্যয়ন করে এই লেখাগুলি লিখে গেছেন, যে গ্রন্থগুলি এখনো এশিয়াটিক সোসাইটিতে পাওয়া যেতে পারে। অধুনাবিস্মৃত এবং একদা বিশাল সঙ্গীতব্যক্তিত্ব রাজ্যেশ্বর মিত্র এই গ্রন্থগুলির বাংলা অনুবাদ করে 'মুঘল আমলের সঙ্গীতচিন্তা' নাম দিয়ে একটি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। গ্রন্থটি আকারে ক্ষুদ্র হলেও একাদশ শতাব্দী থেকে শুরু করে সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত যেভাবে হিন্দুস্থানে (যে ভৌগোলিক সীমারেখা আমরা আগেই উল্লেখ করেছি) সঙ্গীতের চর্চা হয়েছে তার সংক্ষিপ্ত ও পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ এত সহজ ভাষায় সেউ রচনা করেছেন বলে আমার জানা নেই। আরও একটি আশ্চর্যের বিষয় হল যে ঔরঙ্গজেবকে আমরা সঙ্গীতবিদ্বেষী বলে মনে করি, তাঁর আমলে রাজসভায় সঙ্গীত প্রচলন বন্ধ হলেও ফকির উল্লাহ তাঁর গ্রন্থে সাতচল্লিশ জন গায়ক ও বাদকের নামের তালিকা ও তাঁদের গুণাবলীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়েছেন। এঁদের মধ্যে ছয় জন ছিলেন অমুসলমান কলাবন্ত। ঔরঙ্গজেব যদি সঙ্গীত বিদ্বেষী হবেন তাহলে ফকির উল্লাহ গ্রন্থখানি ঔরঙ্গজেবকে উৎসর্গ করলেন কোন সাহসে? 'মুঘল আমলের সঙ্গীত চিন্তা' গ্রন্থখানি সংগ্রহ করে যারা পাঠ করবেন অথবা বইটি দুষ্প্রাপ্য হলে 'নতুন চিঠি' পত্রিকার ২০০২ সালের শারদ সংখ্যায় এই লেখকের প্রবন্ধখানি পড়ে বুঝতে পারবেন যে এই সমস্ত সঙ্গীতবিদগণ কত সূক্ষ্মভাবে ও কত বিজ্ঞানসম্মতভাবে ভারতীয় সঙ্গীতকে বিশ্লেষণ করেছেন। এই সমস্ত গ্রন্থ না পড়ে সঙ্গীত চর্চা করতে গেলে তা শাস্ত্রীয় সঙ্গীতই হোক, লোকসঙ্গীতই হোক বা কীর্তন—যাই হোক, গাইতে গেলে পদে পদে ভুল হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

□

নজরুল যখন গ্রামোফোন কোম্পানিতে যোগ দিয়েছিলেন তখন যে খুব উচ্চ মানের গান রেকর্ড হতো একথা বলা যায় না। হারমোনিয়ামের উচ্চকিত আওয়াজ, তবলার আওয়াজ—সবকিছু ছাপিয়ে শিল্পীকে উচ্চকণ্ঠে গান গাইতে হতো। রেকর্ডিং-এর মানও ছিল ততোধিক নিম্ন। অনেক বড়ো শিল্পীও তখন রেকর্ড করতে চাইতেন না এই সমস্ত কারণেই। রবীন্দ্রনাথের গানও তখন রেকর্ডে গাইবার অনুমতি ছিল না। নজরুল যেমন সুর রচনা, গীত রচনাতে সে-সময় শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছিলেন, তেমনই তিনি মার্কেটিংও বুঝতেন। তিনি গ্রামোফোন

> কাব্যগীতিতে যেমন কাব্যই প্রধান, রাগ প্রধানে তেমনি রাগই প্রধান। তিনি দীপালি তালুকদার (পরে নাগ)-কে দিয়ে 'মেঘমেদুর বরষায় কোথায় তুমি' (জয়জয়ন্তী) এবং 'রুম ঝুম ঝুম নূপুর বোলে" (নট বেহাগ) গান দুটি যখন রেকর্ড করান তখন দীপালির বয়স সতেরো। মাত্র সাড়ে তিন মিনিটের ডিস্কে এই গানগুলির রাগের তান, বিস্তার, সরগম সমস্তই তিনি করিয়েছেন দীপালিকে দিয়ে সম্পূর্ণ বাংলা খ্যালের স্টাইলে।

কোম্পানিতে তৎকালীন পরিবর্তন নিয়ে এলেন। সেই সঙ্গে ভালো ভালো শিল্পীদের আকৃষ্ট করলেন। নজরুলের হাতে তখনও বিভিন্ন দেশ থেকে প্রচলিত গীতরিত অবলম্বনে বহু গান সংগৃহীত ছিল। গ্রামোফোন কোম্পানির এক্সক্লুসিভ কম্পোজার হয়ে তিনি হিন্দুস্থানী রাগ সঙ্গীতের দিকে ঝুঁকলেন। কারণ সে-সময় যেসব শিল্পীরা গ্রামোফোন কোম্পানিতে রেকর্ড করতে আসতেন তাঁরা প্রত্যেকেই ছিলেন রাগসঙ্গীতে তালিমপ্রাপ্ত ও সুরে তালে দক্ষ। নজরুলকে তাদেরই ট্রেনিং দিতে হবে। তিনি বুঝলেন বাংলা গানকে রাগাশ্রয়ী হতে হবে, যেমন রবিবাবুর গান। রবিবাবুর গানে যেমন রাগ অপেক্ষা কাব্যই প্রবল, তেমনি গান রচনা করতে হলে অবশ্যই হিন্দুস্থানী রাগসঙ্গীত নিয়ে অধ্যয়ন, অনুশীলন ও তালিম প্রয়োজন। তা না হলে গানের কথায় সকালের বর্ণনা থাকলেও সন্ধ্যার ইমন প্রয়োগ করা যাবে কীভাবে? এ কারণেই তিনি ওস্তাদ জমিরুদ্দিন খা, মস্তান গামা ও মঞ্জু সাহেবের কাছে হিন্দুস্থানী গানের তালিম নেওয়া শুরু করলেন। ওস্তাদ জমিরুদ্দিন খাঁকে তিনি তাঁর 'বনগীতি' গ্রন্থখানি উৎসর্গ করলেন 'আমার গানের ওস্তাদ' এই সম্বোধন করে। অনেকে বলেন, জমিরুদ্দিন খাঁ-এর সঙ্গীত বিষয়ক ফারসি গ্রন্থগুলি পড়া ছিল। তারপর নজরুলের মতো শ্রুতিধর ছাত্র পেয়ে তাঁকে হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের গভীরে নিয়ে যেতে তাঁর কোনো অসুবিধা হয়নি। নজরুল নিজেও ফারসি ভাষায় রচিত নওয়াব আলি চৌধুরীর 'মেয়ারীফুন নাকমাথ' নামে এক বিশাল গ্রন্থ অধ্যয়ন করে ফেলেছিলেন। এর ফলে তিনি বাংলা গানকে এমন এক স্তরে উন্নীত করলেন যা তাঁর পূর্বসূরীদের থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। সে যুগের নবীন প্রবীণ সব ধরনের শিল্পীদের দিয়ে গাওয়ালেন অজস্র কাব্যগীতি, যেগুলিতে পরবর্তীকালে আধুনিক গান আখ্যা দেওয়া হয়। পাইওনিয়ার রেকর্ড কোম্পানি রেকর্ডের লেবেলে আধুনিক শব্দটির পরিবর্তে কাব্যগীতি শব্দটিই প্রয়োগ করতো। কিন্তু হিজ্ মাস্টার্স ভয়েস বা টুইন রেকর্ডস আধুনিক শব্দটি ব্যবহার করা শুরু করে। এই সমস্ত কাব্যগীতিতে কোনো রকমের তান, বিস্তার সরগম করার সুযোগ নেই যদিও কিছু কিছু আনাড়ি গানের মাস্টার 'সাজিয়াছো যোগী বলো কার লাগি'-র মতো গানেও যোগীয়া রাগের আরোহণ অবরোহণ করে গায়ন শুরু করতে শেখাচ্ছেন। বাগেশ্রী রাগে নিবদ্ধ 'হারানো হিয়ার নিকুঞ্জ পথে' গানটি লাউনি শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত হলেও এসব অর্থ না বুঝে মাস্টারমশাইরা এই গানেও

রাগেশ্রী রাগের বিস্তার, তান ইত্যাদি শেখাচ্ছেন। একই সঙ্গে তিনি যে ধ্রুপদী গানের কত বড়ো ওস্তাদ সেটা জাহির করছেন।

রাগাশ্রয়ী কাব্যগীতি ছাড়াও নজরুল বেশ কিছু ছোটো ছোটো বাংলা খেয়াল ও রাগপ্রধান গান রচনা করেছিলেন। রাগপ্রধান শব্দটির মধ্যেই রয়েছে এর অর্থ। কাব্যগীতিতে যেমন কাব্যই প্রধান, রাগ প্রধানে তেমনি রাগই প্রধান। তিনি দীপালি তালুকদার (পরে নাগ)-কে দিয়ে 'মেঘমেদুর বরষায় কোথায় তুমি' (জয়জয়ন্তী) এবং 'রুম ঝুম ঝুম নূপুর বোলে" (নট বেহাগ) গান দুটি যখন রেকর্ড করান তখন দীপালির বয়স সতেরো। মাত্র সাড়ে তিন মিনিটের ডিস্কে এই গানগুলির রাগের তান, বিস্তার, সরগম সমস্তই তিনি করিয়েছেন দীপালিকে দিয়ে সম্পূর্ণ বাংলা খ্যালের স্টাইলে। এছাড়া ইসলামি গান রচনার ক্ষেত্রে তিনি যেমন পারস্যের নাত মুনাজাত মুরসিদি ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকারের গীতরীতি অবলম্বন করেছেন তেমনি ইমন, পিলু, খাম্বাজ, ভৈরবী, বাগেশ্রী ইত্যাদি রাগরাগিনী প্রয়োগ করেছেন। কাজরী গানেও তিনি রাগসঙ্গীতের মিশ্রণ ঘটিয়েছেন। যেমন, 'শাওন আসিল ফিরে' গানটি তিনি পিলু ঠাটে নিবদ্ধ করেছেন। তাঁর গান কিন্তু কোনোটাই ভাঙা গান নয়, সব কটিই মৌলিক সৃষ্টি। এই কারণেই তাঁর ঝাঁপতাল, তেওড়া ইত্যাদি তালে রচিত গানগুলি ধ্রুপদভাঙা গান না হয়ে রাগাশ্রয়ী খাঁটি বাংলা গানে পরিণত হয়েছে। এমনকি 'একই বৃন্তে দুটি কুসুম'-এর মতো সহজ বাংলা গানও রচিত হয়েছে তেওড়া তালে। লোকসঙ্গীতের সাথে তিনি অবলীলাক্রমে রাগমিশ্রণ ঘটিয়েছেন, যেমন 'ও কালো বউ জল আনতে যেও না', 'আসিলে কে গো বিদেশী' গান দুটিতে তিনি যথাক্রমে আশা এবং দেশি টোড়ির মিশ্রণ ঘটিয়েছেন। নজরুলের আর একটি কীর্তি হল তিনি 'বসন্ত মুখারি' 'শিবরঞ্জনী', 'পটমঞ্জরী' 'লঙ্কাদহন সারং', 'রক্তহংস সারং' , 'নীলাম্বরী', 'সিংহেন্দ্রী মধম্যা', 'অন্তর গৌড়', 'মালঞ্চ' ইত্যাদি লুপ্ত রাগিনী উদ্ধার করে সেই সুরে গান রচনা করেছেন এবং স্থায়ীর প্রথম পংক্তিতে ওই রাগটির নাম সুকৌশলে বসিয়ে দিয়েছেন। শুধুমাত্র আরোহণ অবরোহণ জানলেই কি গান রচনা করা যায়, যদি না সেই রাগটিকে আত্মস্থ করা হয়! কোথায় পেলেন তিনি এইসব সুর যাকে অবলম্বন করে তিনি 'নীলাম্বরী শাড়ি পরি'-র মতো জনপ্রিয় গান রচনা করলেন?

দীপালি তালুকদার (নাগ)

তারপর তাঁর আর এক কৃতিত্ব হল নতুন তুন রাগ সৃষ্টি—যেমন 'দোলনচাঁপা' (প্রমীলা ইসলামের ডাকনাম ছিল দোলন), 'দেবযানী', 'মীনাক্ষী', 'অরুণরঞ্জনী' 'রূপমঞ্জরী', 'বনকুন্তলা', 'সন্ধ্যামালতী', 'উদাসী ভৈরব' 'বেণুকা', 'নির্ঝরিণী' ইত্যাদি। উৎসাহী পাঠকগণ দেবব্রত বিশ্বাসের গাওয়া 'দোলনচাঁপা বনে দোলে' এবং 'বনকুন্তলা এলায়ে' গানদুটি শুনে নিতে পারেন। এখানে তিনি রাগ অপেক্ষা কাব্যকেই ঊর্ধ্বে স্থান দিয়েছেন।

নতুন নতুন রাগ সৃষ্টি, লুপ্তরাগ পুনরুদ্ধার ছাড়াও নজরুল একাধিক রাগমিশ্রণে নতুন নতুন গান রচনা করেছেন, যেমন—'জয়জয়ন্তী-খাম্বাজ' রাগে 'ছাড়িতে পরান নাহি চায়'; 'বেহাগ-তিলক কামোদ-খাম্বাজ' রাগে 'কেন কাঁদে পরান কী বেদনায়' ইত্যাদি গানগুলির উল্লেখ করা যেতে পারে। 'তোরা সব জয়ধ্বনি কর' গানটিতে তিনি নাকি মালকোষ-ভৈরবী-মেঘ-বসন্ত-হিন্দোল- শ্রীপঞ্চম এবং নট-নারায়ণ এই সপ্তসুরে বেঁধেছিলেন, পরে এই সুর পরিবর্তন করেছিলেন।

□

নজরুল তাঁর স্বল্পকালীন সঙ্গীতজীবনে সঙ্গীতশাস্ত্রের গভীরে প্রবেশ করেছিলেন তা বলতে চাইছি না। তবে, তিনি বাংলা কাব্যগীতি বাংলা রাগাশ্রয়ী গান, বাংলা রাগপ্রধান গান বাংলা খেয়াল নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন, লুপ্ত রাগ পুনরুদ্ধার করেছেন এবং এর বাইরেও অন্য দেশের এবং অন্য রাজ্যের গায়নরীতি বাংলা গানে প্রয়োগ করেছেন। ৩২ বছর বয়স পর্যন্ত প্রথাগত তালিম না নিয়েই রাগরাগিনী নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন, সেটিও বিস্ময়ের বিষয়। এবার আমাকে অনুমানের ওপর নির্ভর করতে হচ্ছে। আমার অনুমান উস্তাদ জমিরুদ্দিন খানের ফারসি ভাষায় রচিত সঙ্গীত বিষয়ক গ্রন্থগুলি তাঁর অপঠিত ছিল না। এছাড়াও নজরুল নিজে যে ফারসি গ্রন্থখানি পাঠ করে নিজেকে সমৃদ্ধ করেছিলেন সেই গ্রন্থটি পাঠ করলে (হয়তো বা সম্ভব নয়) বুঝতে পারা যাবে নজরুল নিশ্চয় সেখান থেকে অনেক কিছু পেয়েছিলেন। নজরুলের পূর্বপুরুষ মহম্মদ ইসলাম কুতুবউদ্দিনের আমলে (১২০৬-১২১০) বাগদাদ থেকে ভারতে এসেছিলেন। তিনি ছিলেন আরবি ও ফারসি ভাষায় সুপণ্ডিত। প্রথমে তিনি পাটনার কাছে হাজিপুর মহল্লায় ছিলেন। বক্তিয়ার খিলজি তাঁকে বর্ধমানে নিয়ে আসেন। পরে তাঁকে চুরুলিয়ায় বিচারক নিযুক্ত করা হয়। তারপর অনেক পুরুষের নাম পাওয়া যায়নি। শাহজাহানের সময় তাঁর এক অধস্তন পুরুষের নাম পাওয়া যায়—গোলাম নক্সবন্দ, যিনি আরবি ফারসি ছাড়াও সঙ্গীতশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন। শাহজাহানের রাজসভায় তাঁর যাতায়াত ছিল। তিনিও ফারসি ভাষায় রচিত এই অমূল্য গ্রন্থতিনটি পাঠ করে থাকবেন একথা ভাবা যেতেই পারে। কেননা চুরুলিয়ার কাজি পরিবার ধনে-মানে-রূপে-গুণে কোনো অংশেই পৃথিবীর অন্য অশের মুসলমান পরিবার অপেক্ষা কম ছিল না। এরপর আমরা যে অধস্তন পুরুষটির নাম পাচ্ছি তিনি হলেন খেবরতুল্লাহ্। খেবরতুল্লাহর চার পুত্রের মধ্যে বড়ো পুত্রের নাম গোলাম হোসেন। গোলাম হোসেনের দুই পুত্র আমিন্উল্লাহ ও নাজিব উল্লাহ। আমিন্ উল্লাহর এক পুত্র হলেন ফকির আহমেদ্। তাঁর চার সন্তান—সাহেবজান, নজরুল ইসলাম, আলি হোসেন এবং উম্মে উলসুম। নাজিবউল্লাহের তিন পুত্র—জিল্লার রহমান, মুন্সি বজলে করিম ও ফৌয়াজ করিম। নজরুল বাল্যকালে বজলে করিমের কাছে কিছু গানবাজনা শিখেছিলেন। এই বজলে করিম সাহেবও একজন সুপণ্ডিত ও সাংস্কৃতিক গুণসম্পন্ন মানুষ ছিলেন। তাহলে এঁর কাছেও মুঘল আমলে রচিত গ্রন্থাবলী থাকা অসম্ভব নয়। সুতরাং নজরুল ইসলামের বিভিন্ন দিক নিয়ে গবেষণা হলেও তাঁর সাঙ্গীতিক জীবন কীভাবে বিকশিত হল সেটাই গবেষণার মূল বিষয়। আশা করি, বর্তমান সময়ের তন্নিষ্ঠ গবেষকগণ এ বিষয়ে এগিয়ে আসবেন এবং তাহলেই নজরুলের প্রতি প্রকৃত শ্রদ্ধাজ্ঞাপন সম্ভব হবে।

মশাবাহিত রোগ প্রতিরোধে পুরসভার পরামর্শ

- মনে রাখবেন, ১/২ সেন্টিমিটার জমা জলেও জন্মাতে পারে ম্যালেরিয়া ও ডেঙ্গির মশা। কাজেই জল জমিয়ে রাখবেন না, জল জমতে দেবেন না।
- জ্বর হলেই রক্ত পরীক্ষা করান, পুরসভার স্বাস্থ্য ক্লিনিকে. আপনার ওয়ার্ডেই পরীক্ষার সুযোগ আছে।
- খোলা জায়গায় টায়ার, ডাবের খোল, শিশি বোতল ফেলবেন না।
- অবশ্যই মশারি টাঙিয়ে শোবেন।

কলকাতা পৌরসংস্থা

বঙ্কিমচন্দ্রের দৃষ্টিতে মুসলমান

কল্যাণী ভট্টাচার্য

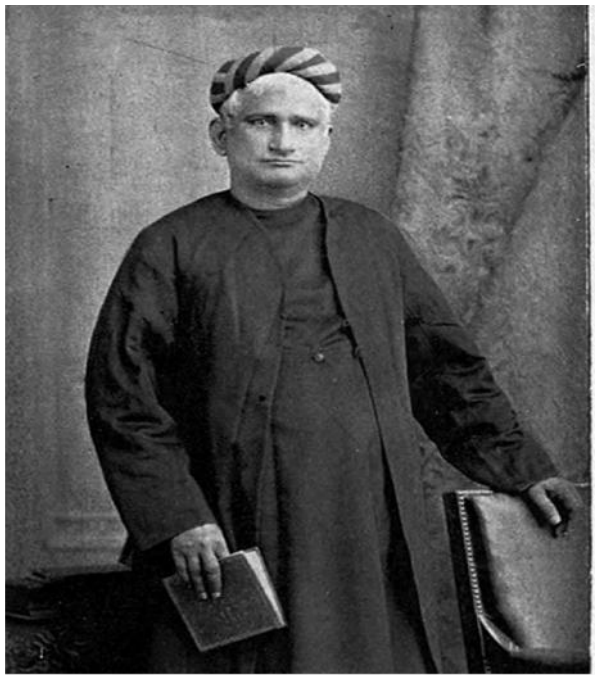

স্বাধীন ভারতে যেমন, পরাধীন ভারতবর্ষেও বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুদের পরে মুসলমানরাই ছিল দ্বিতীয় সংখ্যাগরিষ্ঠ ধর্মীয় সম্প্রদায়। সাহিত্যসম্রাট্য বঙ্কিমচন্দ্র মুসলমান সম্প্রদায়কে কী চোখে দেখতেন? তিনি কি মুসলমানবিদ্বেষী, হিন্দু সাম্প্রদায়িকতাবাদী ছিলেন? বিষয়টি নিয়ে এ-যাবৎ বিস্তর আলোচনা হয়েছে। তবে কেন এই নতুন সংযোজন? ইতিউতি সন্ধান করে যদি নতুন কিছু পাওয়া যায় তার জন্যেই এই প্রচেষ্টা।

বঙ্কিমচন্দ্র শুধু একজন বড় মাপের ঔপন্যাসিকই নন, তিনি ঊনবিংশ শতাব্দীর একজন অসাধারণ ধীমান ব্যক্তিত্ব। তিনি যেমন অনেক উপন্যাস লিখেছেন, তেমনই প্রবন্ধও লিখেছেন প্রচুর। কোনো লেখকের চিন্তাধারাকে বুঝতে গেলে উপন্যাসের থেকে প্রবন্ধেই তা বেশি স্পষ্ট। উপন্যাসে লেখক সরাসরি নিজের মত প্রকাশ করতে পারেন না, ঘটনা ও চরিত্রের আড়ালে তাঁর উপস্থিতি। কিন্তু প্রবন্ধে তাঁর সরাসরি অবস্থান। বঙ্কিমচন্দ্র একজন অসাধারণ ঔপন্যাসিক এবং সেই হিসেবেই তিনি পাঠকের কাছে বেশি পরিচিত। তাই প্রথমেই তাঁর উপন্যাসে তিনি মুসলমানকে কীভাবে এঁকেছেন সে-সম্পর্কে আলোচনা করা যেতে পারে।

১৮৬৫ সালে তাঁর 'দুর্গেশনন্দিনী' উপন্যাসটি প্রকাশিত হয়। ১৮৬৬-তে কপালকুণ্ডলা এবং ১৮৬৯-এ মৃণালিনী। বঙ্কিমচন্দ্র তখন সদ্য ডেপুটি, সরকারি কাজে নিযুক্ত। 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকা প্রকাশের আগেই এই তিনখানি উপন্যাস প্রকাশিত হয়েছিল। দুর্গেশনন্দিনী উপন্যাসে আয়েষা মুসলমান কিন্তু এই চরিত্রটি কোথাও কালিমালিপ্ত হওয়া তো দূরের কথা বরং নিজ স্বভাব বৈশিষ্ট্যে একটি উজ্জ্বল চরিত্র। সেকালে মুসলমান নবাবনন্দিনীর সঙ্গে হিন্দু জগৎ সিংহের প্রেম অভিনব না হলেও আয়েষা যেভাবে স্পষ্ট উচ্চারণে জগৎ সিংহকে ''বন্দী আমার প্রাণেশ্বর'' বলেছে তার মধ্যে অবশ্যই অভিনবত্ব রয়েছে। আবার 'ওসমান' মুসলমান হলেও হিন্দু জগৎ সিংহের থেকে কোনো অংশে নিষ্প্রভ হয়ে ওঠেনি। 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসে পদ্মাবতী ধর্মান্তরিত হয়ে মোতিবিবি হয়েছেন, কিন্তু মোতিবিবি চরিত্রও কোনো অংশেই খাটো হয়ে ওঠেনি। 'মৃণালিনী' উপন্যাসের মূল ভাব স্বদেশপ্রেম, পরবর্তীকালে 'আনন্দমঠ'-এ যার পূর্ণ পরিণতি।

প্রথম যুগে রচিত এই তিনখানি উপন্যাসে তিনি কোথাও মুসলমান চরিত্রকে হেয় প্রতিপন্ন করেননি। বঙ্কিমমনের গহন গভীরে যে সৃষ্টির আবেগ সেই আবেগ থেকেই অসাধারণ সব চরিত্র সৃষ্টি হয়েছে। জীবনের প্রথম দিকে রচিত কবিতায় যা যথাযথ রূপে প্রতিফলিত হয়নি।

ছাত্র অবস্থা থেকেই বঙ্কিমচন্দ্রের ইতিহাসের প্রতি গভীর আকর্ষণ ছিল। ভাটপাড়ার পণ্ডিতদের কাছে তিনি সংস্কৃত শিখেছিলেন। তাঁর মনের এক স্তরে ইতিহাসের অনুসন্ধিৎসা, অন্য স্তরে ধ্রুববাদী ফরাসি দার্শনিক কোঁৎ, চিন্তাবিদ রুশো, হিতবাদী বেন্থাম, মানবতাবাদী জন স্টুয়ার্ট মিল, ডারউইন, স্পেন্সার এঁরা সবাই ছিলেন। ১৮৭২ সালে 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকা প্রকাশিত হল। বঙ্কিমচন্দ্র তখন বহরমপুরে। সেখানে তখন বহু গুণীজনের সমাবেশ। ভূদেব মুখোপাধ্যায়, রামদাস সেন, লালবিহারী দে, রামগতি ন্যায়রত্ন, রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, দীনবন্ধু মিত্র তখন বহরমপুরে। এইসব মনীষীদের সঙ্গে ভাবের আদানপ্রদান বঙ্কিম ভাবনালোককে উজ্জীবিত করেছে। বঙ্কিমচন্দ্রের বহু উপন্যাস বঙ্গদর্শনের পাতায় প্রকাশিত হয়েছে, সম্পাদক কখনো বঙ্কিমচন্দ্র কখনো আবার সঞ্জীবচন্দ্র।

এই পর্বে রচিত 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসে বহু মুসলমান চরিত্র রয়েছে। গুরগন খাঁ, তকি খাঁ, মীরকাশেম—সকলেই উল্লেখযোগ্য চরিত্র। বাংলার নবাব মীরকাশেম ও দলনী বেগমের কাহিনি ও চন্দ্রশেখর, প্রতাপ ও শৈবলিনীর কাহিনি একসূত্রে বাঁধা পড়েছে। এ যেন একই বৃন্তে দুটি কুসুম হিন্দু-মুসলমান। মীরকাশেম ইতিহাসের চরিত্র। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর মধ্যে মানবীয় গুণ আরোপ করেছেন। মীরকাশেম বলেছেন, ''যদি প্রজার হিতার্থে রাজ্য করিতে না পারিলাম তবে সে রাজ্য ত্যাগ করিব।'' দলনীর মৃত্যুতে বিরহব্যথিত

মীরকাশেম বাংলার নবাবের থেকে যেন একজন সাধারণ মানুষে নেমে এসেছেন। অথচ পরবর্তীকালে এই উপন্যাস নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে বঙ্কিমের একদেশদর্শিতার, মুসলমান চরিত্রকে হেয় করার।

'আনন্দমঠ' বঙ্কিমচন্দ্রের সবচাইতে বিতর্কিত উপন্যাস। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতি উপন্যাসেরই যেমন একাধিক সংস্করণ বেরোয় আনন্দমঠও তার ব্যতিক্রম নয়। এই উপন্যাসটির নতুন সংস্করণে বঙ্কিম অনেক পাঠভেদ ঘটিয়েছেন। পত্রিকায় প্রকাশিত উপন্যাস বই হয়ে বেরোনোর সময়ে হামেশা পাঠের অদল-বদল ঘটে। যে-কোনো শিল্প অথবা সাহিত্যের প্রথমিক রূপ গড়ে ওঠে লোকচক্ষুর আড়ালে, স্রষ্টার মনে। মনের মধ্যে যে ভাঙাগড়া গ্রহণ ও বর্জন চলে তার খোঁজ পাওয়া যায় না। গ্রহণ ও বর্জন প্রক্রিয়ায় পরিশুদ্ধ হয়ে লেখাটির প্রথম প্রকাশ হল পাণ্ডুলিপি। আবার লেখাটি ছাপা হয়ে বেরোলে ভিন্ন সংস্করণে লেখক আবার পরিমার্জনা করেন। যে সংস্করণটি লেখকের জীবদ্দশায় সর্বশেষ সংস্করণ হিসেবে বাজারে প্রচলিত সেই সংস্করণ থেকেই আমরা লেখক সম্পর্কে সিদ্ধান্তে পৌঁছই। ভুলে যাই লেখার পরিপাট্য সাধন ছাড়াও অন্য অনেক কারণে লেখক পরিবর্তন করেন। দুঃখের বিষয় আমাদের দেশে এখনও পাঠভেদ-ভিত্তিক আলোচনা খুব বেশি হয়নি। বিশেষ করে বঙ্কিমের মতো লেখক, যাঁর মৃত্যুর পরও বহু বছর অতিক্রান্ত হয়েছে, তাঁর লেখার সব সংস্করণ আবিষ্কার করা প্রায় দুঃসাধ্য ব্যাপার। 'আনন্দমঠ' আলোচনা করার আগে এত কথা বলার বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে।

১৮৮২ সালে 'আনন্দমঠ' উপন্যাস প্রকাশিত হয়। এই সময় এই উপন্যাসটি বাজারে হু হু করে বিক্রি হচ্ছিল। তখনও এই উপন্যাসটি হিন্দু-মুসলমান বিভেদের কারণ হয়ে ওঠেনি। যাঁরা সংস্করণ নিয়ে চর্চা করেন তাঁরা অনেকেই জানেন আনন্দমঠের তৃতীয় সংস্করণ ছয় মাসের মধ্যে বিক্রি হয়ে যায় এবং চতুর্থ সংস্করণ বেরোয়। তখন বাংলার বিপ্লবীদের কাছে হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে আনন্দমঠ সমাদৃত হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্র যখন আনন্দমঠ রচনা করেন তখনও কংগ্রেসের জন্ম হয়নি। তখনই বঙ্কিমচন্দ্র আনন্দমঠে স্বদেশপ্রেমের কথা বলেছেন, অথচ সেই আনন্দমঠকেই একদিন পুড়িয়ে ফেলা হয়েছিল। রেজাউল করিম লিখেছেন : ''আনন্দমঠ সাজানো হইল, পরে তাহাতে অগ্নিসংযোগ করা হইল—সেই অগ্নি বিপুল হর্ষধ্বনির মধ্যে দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল।'' সেই সময় মুসলমান সম্প্রদায়ের কেউ কেউ মনে করেছেন এই উপন্যাসে মুসলমানদের জঘন্যভাবে চিত্রিত করা হয়েছে। দাবি উঠেছিল আনন্দমঠকে বাজেয়াপ্ত করতে হবে। রেজাউল করিম আনন্দমঠের এই আক্রমণের পিছনে অদৃশ্য হস্তের ইঙ্গিত দেখেছেন, অর্থাৎ তাঁর মতে ব্রিটিশ সরকার উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে আনন্দমঠ-এর বিনাশ চেয়েছিল। পাঠকদের বুঝবার সুবিধার জন্য আনন্দমঠ থেকে কয়েকটি আপত্তিকর উদ্ধৃতি তুলে ধরছি—

ক. কেহ চীৎকার করিতে লাগিলেন, ''মার মার নেড়ে মার''... কেহ বলে, ''ভাই এমন দিন কি হইবে, মসজিদ ভাঙ্গিয়া রাধামাধবের মন্দির গড়িব?''

খ. ''আমাদের মুসলমান রাজা রক্ষা করে কই? নেশাখোর নেড়েদের না তাড়াইলে আর কি হিন্দু হিন্দুয়ানী থাকে।''

গ. জ্ঞানানন্দের উক্তি—'এই বাবুইয়ের বাসা ভাঙিয়া, এই যবনপুরী ছারখার করিয়া, নদীর জলে ফেলিয়া দিব। এই শূয়রের খোঁয়ার আগুনে পোড়াইয়া মাতা বসুমতীকে আবার পবিত্র করিব।''

ঘ. ''চল আমরা সেই যবনপুরী ভাঙিয়া ধূলিগুড়ি করি। সেই শূকর নিবাস অগ্নি সংস্কৃত করিয়া নদীর জলে ফেলিয়া দিই।''

ঙ. ''অনেক যবন নিহত হইল, অনেক মুসলমান দাড়ি ফেলিয়া গায়ে মৃত্তিকা মাখিয়া হরিনাম জপ করিতে আরম্ভ করিল। জিজ্ঞাসা করিলে বলিতে আরম্ভ করিল ''মুঁই হেঁদু।''

প্রথমেই বলে রাখা ভালো যে এই উদ্ধৃতিগুলি মোটেই মুসলমানদের পক্ষে সম্ভ্রমাত্মক নয়। কিন্তু মনে রাখতে হবে এ-ধরনের উক্তিগুলি বঙ্কিম উপন্যাসের চরিত্রের মুখে বসিয়েছেন। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর লিখিত উপন্যাসে অনেক সময় স্বয়ং আবির্ভূত হয়ে মন্তব্য করেছেন, কিন্তু এই উক্তিগুলির একটিও সে-রকম নয়। জ্ঞানানন্দ, ভবানন্দ প্রভৃতি কট্টর হিন্দু সন্তানদলের নেতারা সন্তানবাহিনীকে উদ্দীপ্ত করার জন্য এই কথাগুলি বলেছেন। 'নেড়ে' শব্দটি বিরূপতা সূচক। 'নেড়ে' বলতে নিম্নশ্রেণির মুসলমানকে বোঝায়। রবীন্দ্রনাথের 'বউঠাকুরানীর হাট' উপন্যাসে নেড়ে শব্দের প্রয়োগ রয়েছে—''সকলে সমস্বরে বলিল, সে নেড়ে বেটী কোথায়?'' আবার ''যখনি দেখিয়াছি নেড়ে, তখনই আমার সন্দেহ হইয়াছে।'' 'বউঠাকুরানীর হাট' রবীন্দ্রনাথের প্রথম দিকের রচনা। বঙ্কিমের কাল থেকে খুব দূরে নয়। এখানের সাধারণ চরিত্রের মুখে 'নেড়ে' শব্দটি বসানো হয়েছে। কিন্তু এর জন্য রবীন্দ্রনাথ অভিযুক্ত হননি।

উপন্যাস হিসেবে 'আনন্দমঠ' কতদূর সার্থক সে সম্পর্কে মতভেদ থাকতে পারে, কিন্তু আনন্দমঠের 'বন্দেমাতরম্' গানটি যে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে বিপ্লবীদের জীবন বিসর্জনে প্রেরণা দিয়েছে, তা নিয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। অবশ্যই গানটি নিয়ে পরবর্তীকালে অনেক বিতর্কেরও সৃষ্টি হয়েছে।

বঙ্কিমচন্দ্র মুসলমান শাসনের অরাজকতাকে মেনে নিতে পারেননি। আনন্দমঠ উপন্যাসে স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন : ''দেখ যত দেশ আছে মগধ, মিথিলা, কাশী, কাঞ্চী, দিল্লি, কাশ্মীর—কোন দেশের মানুষ খেতে না পেয়ে ঘাস খায়, কাঁটা খায়, উইমাটি খায়, বনের লতা খায়; কোন দেশের মানুষ শিয়াল কুকুর খায়, মড়া খায়? কোন দেশের মানুষের সিন্দুকে টাকা রাখিয়া সোয়াস্তি নাই, পেট চিরে ছেলে বার করে। সকল দেশের রাজার সঙ্গে রক্ষণাবেক্ষণের সম্বন্ধ। আমাদের মুসলমান রাজা রক্ষা করে কই। ধর্ম্ম গেল, জাতি গেল, মান গেল, কুল গেল, এখন তো প্রাণ পর্যন্ত যায়।'' উপন্যাসের শুরুতে দুর্ভিক্ষপীড়িত পদচিহ্ন গ্রামের বর্ণনায়—''সেই দুর্ভিক্ষপীড়িত সময়েও মহম্মদ রেজাখাঁ, রাজস্ব আদায়ের কর্ত্তা মনে করিল আমি সেই সময়ে সরফরাজ হইব।'' বঙ্কিমের আর একটি উক্তি—''১১৭৬ সনে বাঙ্গালা প্রদেশ ইংরাজের শাসনাধীন হয় নাই; ইংরাজ তখন বাংলার দেওয়ান। তাহারা খাজনার টাকা আদায় করিয়া লন, কিন্তু তখনও বাঙ্গালীর প্রাণ, সম্পত্তি প্রভৃতি রক্ষণাবেক্ষণের ভার লহেন নাই। তখন টাকা লইবার ভার ইংরাজদের আর প্রাণসম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণের ভার পাপিষ্ঠ, নরাধম, বিশ্বাসহন্তা মনুষ্যকুলকলঙ্ক মীরজাফরের ওপর। মীরজাফর আত্মরক্ষায় অক্ষম, বাঙ্গালা রক্ষা করিবে কি প্রকারে? মীরজাফর গুলি খায় ও ঘুমায়, ইংরাজ টাকা আদায় করে ও ডেসপাচ লেখে, বাঙ্গালী কাঁদে আর উৎসন্নে যায়।''

আনন্দমঠের মধ্যে আগাগোড়া দেশাত্মবোধই প্রধান হয়ে উঠেছে। এ-পর্যন্ত আনন্দমঠকে কেন্দ্র করে বহু আলোচনা হয়েছে। ১৯৮২ সালে আনন্দমঠ জন্ম শতবার্ষিকীকে কেন্দ্র করে ব্যাপকভাবে আনন্দমঠ নিয়ে আলোচনা হলেও সংস্করণগত পার্থক্য দেখিয়ে আলোচনা খুব কমই হয়েছে। প্রথম সংস্করণের পরে দ্বিতীয় সংস্করণ আনন্দমঠে বঙ্কিমচন্দ্র ক্রমশ কিছু কিছু পরিবর্তন করলেন যাকে স্পষ্টতই ইংরাজ-তোষণ বলে মনে হয়। আনন্দমঠের একাদশ ও অষ্টাদশ পরিচ্ছেদে যে যে স্থানে 'ইংরেজ সেনা' ছিল সেখানে 'যবন' ও 'বিধর্মী' শব্দ প্রয়োগ করেছেন। শাসক ইংরেজদের রোষের হাত

থেকে নিজেকে ও নিজের সৃষ্টিকে বাঁচানোর জন্য তাঁকে এই পথ নিতে হয়েছিল।

আনন্দমঠ প্রথম সংস্করণ রেবোনোর পর স্বদেশবাসীদের মধ্যেও একটি গোষ্ঠী বঙ্কিমের বিরুদ্ধে তৎপর হয়ে ওঠে। এ-সম্পর্কে 'বান্ধব' সম্পাদক কালীপ্রসন্ন ঘোষকে একটি চিঠিতে বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছিলেন, ''চন্দ্রের মধ্যে মধ্যে পূর্ণোদয় হয়, মধ্যে মধ্যে অমাবস্যা। এখন কালী প্রসন্ন হলেই আনন্দমঠ বজায় হয়।'' ১৮ জানুয়ারি ১৮৮৩-তে ওই একই ব্যক্তিকে আরও একটি পত্রে লেখেন, ''এখন জানিলাম ইহার ভিতর অনেক চক্র আছে... সেই মন্থরার দল আমাদের স্বদেশী, স্বজাতি, আমাদের তুল্য পদস্থ, আমার ও আপনার বন্ধুবর্গের মধ্যে গণ্য। আমিই বা আনন্দমঠ লিখিয়া কি করিব, আপনিই বা তাহার মূলমন্ত্র বুঝাইয়া কি করিবেন?''

সবই সত্যি, তবু একথা বলতেই হয় বঙ্কিমের ভূমিকাটি এখানে সুবিধাবাদীর। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের পাঠান্তর আলোচনা বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। তবু একটি ছোট্ট পাঠান্তরের উদাহরণ দিচ্ছি। বঙ্গদর্শনে বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছিলেন, ''হিন্দুর রাজ্যে আবার মুসলমান রাজা কি?'' পরবর্তী সংস্করণগুলিতে সংশোধিত করে লিখলেন, ''যে রাজা রাজ্য পালন করেনি, সে আবার রাজা কি?'' অবশ্যই তাঁর দ্বিতীয় চিন্তায় তিনি পূর্ববর্তী চিন্তার সীমাবদ্ধতা বুঝতে পেরেছেন।

আনন্দমঠ উপন্যাসে হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের কথা এলেও তাতে ধর্মীয় সুরটির থেকে রাজনৈতিক সুরটিই প্রধান। প্রথম সংস্করণে বঙ্কিম যখন ইংরাজদের সমালোচনা করেন, তখন কিন্তু তাদের খ্রিস্টান বলে সমালোচনা করেননি, শাসক হিসেবে দেখেছেন। মুসলমানদের ক্ষেত্রেও বলা চলে তিনি ধর্মীয় সম্প্রদায় হিসেবে না দেখে তাদের শাসক হিসেবে দেখেছেন।

'রাজসিংহ' উপন্যাস প্রথমে বঙ্গদর্শনে ধারাবাহিক রূপে প্রকাশিত হয়। পরে এটি গ্রন্থাকারে বেরোয়। তারও প্রায় পনেরো বছর বাদে তিনি এই রচনাটিকে অনেক বড়ো করে প্রায় নতুন করে লেখেন। রাজসিংহ উপন্যাসে ঔরঙ্গজেবকে যেভাবে আঁকা হয়েছে তা অনেক মুসলমানের আপত্তির কারণ হয়েছে। এই উপন্যাসে রাজপুতকন্যা চঞ্চলকুমারী ঔরঙ্গজেবের ছবিকে পদদলিত করেছেন। অনেকে মনে করেন জিজিয়া কর ইত্যাদি বসানোর জন্য ঔরঙ্গজেবের প্রতি রাগের বহিঃপ্রকাশ চঞ্চলকুমারীর আচরণে ফুটে ওঠে। একথা ঠিক, হিন্দুদের বাহুবল ইত্যাদি প্রমাণ করার জন্য ঔরঙ্গজেবকে যেভাবে খাটো করা হয়েছে তা মেনে নিতে কষ্ট হয়। এখানে আরও একটা লক্ষণীয় বিষয় হল চঞ্চলকুমারী আকবর, জাহাঙ্গীর ইত্যাদির প্রতি শ্রদ্ধাশীল। সুতরাং এটি ধর্মীয় বিদ্বেষ নয়, সমকালীন শাসক-বিদ্বেষ। সারোয়ার জাহান দেখিয়েছেন ঔরঙ্গজেবের ব্যক্তিগত চরিত্র এবং তার অন্তঃপুরের যে বর্ণনা বঙ্কিমচন্দ্র দিয়েছেন ইতিহাসে তাঁর সমর্থন নেই। ঔরঙ্গজেবের চরিত্র যেভাবে এঁকেছেন তাতে যুক্তিসঙ্গতভাবেই আপত্তি থাকতে পারে। একথা মেনে নিয়েও বঙ্কিমচন্দ্রকে মুসলমান-বিদ্বেষী বলা চলে না। তাহলে ওই একই উপন্যাসে মবারক চরিত্র সৃষ্টি হত না। মবারক, জেবউন্নিসা ও দরিয়া কোনো চরিত্রই পক্ষপাতদুষ্ট মনে হয় না। জেবউন্নিসা বিলাসী ও স্বেচ্ছাচারী কিন্তু ব্যক্তিত্বময়ী, মানসিক যন্ত্রণায় রক্তাক্ত চরিত্র। তাছাড়া রাজসিংহ উপন্যাসে তো শুধু অত্যাচারী মুসলমান শক্তির কথা নেই, অত্যাচারে হিন্দুরাও যে কম যান না, তারও বর্ণনা আছে। একটু উদ্ধৃতি দিচ্ছি : ''কিন্তু রাজমন্ত্রী দয়াল শাহ সে প্রকৃতির লোক নহেন। তিনিও যুদ্ধে প্রবৃত্ত। মালবে মুসলমানদের সর্বনাশ করিতে লাগিলেন। ঔরঙ্গজেব হিন্দুধর্মের উপর অনেক অত্যাচার করিয়াছিল। প্রতিশোধের স্বরূপ ইনি কাজীদিগের মস্তকমুণ্ডন করিয়া বাঁধিয়া রাখিতে লাগিলেন। কোরাণ দেখিলেই কুয়ায় ফেলিয়া দিতে লাগিলেন।'' বঙ্কিম কি এখানে হিন্দু-বিদ্বেষী?

বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত অসমাপ্ত রাজসিংহে আব্দুল হামিদ নামে একটি চরিত্র আছে। চরিত্রটি এবং এই অধ্যায়টি পরবর্তীকালে বর্জিত হয়েছে। আবদুল হামিদ সংক্রান্ত পরিচ্ছেদটি সম্পূর্ণ তুলে ধরা সম্ভব নয়। অংশবিশেষ তুলে ধরছি : ''এখন আবদুল হামিদও ... জানে তাহারও একটি ছোট্ট তাম্বু ছিল—সেখানে সে আসিয়া কুরশীর উপর বসিয়া হুক্কায় অম্বুরী তামাকু চড়াইল...। বিশেষ শিবির মধ্যে গোটাকতক বড় বড় বকরি ও আরও বড় বড় চতুষ্পদ ও পক্ষবিশিষ্ট দ্বিপদের শুভাগমন হইয়াছে ও শুভ জবাইয়ের উদ্যোগ হইতেছে, ইতি সম্বাদ আসিয়া অদ্য রাত্রে সমাংস খিচুড়ী ভোজনের বিশেষ প্রত্যাশা সকলেরই চিত্তমধ্যে উদিত হইল।... আমাদিগের দৃঢ় বিশ্বাস আছে যে পলাণ্ডু লসুণ বিমিশ্র পক্ক মাংসের সুগন্ধে যাঁহার মনে বীররস উচ্ছ্বসিয়া না উঠে, তাঁহার দাড়ি গোঁপ বৃথায় ধারণ। সে গিয়া শ্মশ্রু গুম্ফ ও মস্তক মুণ্ডন পূর্বক ত্রিপুণ্ড্র ধারণ করিয়া, আতপ তণ্ডুল ও মর্তমান রম্ভার উপর ভরাভর করুন—তাঁহার আর কোনো গতি দেখিনা। তাঁহাদিগের দুঃখে আমি সর্বদা কাতর।''

হিন্দু সমাজে এখনও মুসলমান সম্পর্কে ধারণার মধ্যে অনেক পূর্বকল্পিত বিরূপ ধারণা থাকে—ইংরেজিতে যাকে 'প্রেজুডিস' বলে। এখানেও স্পষ্টতই বঙ্কিম সমাজের আর দশজনের মতোই ভিন্ন ধর্মীয় গোষ্ঠীর ক্ষেত্রে কতকগুলি পূর্বনির্ধারিত বিরূপ ধারণার শিকার হয়েছেন। এরকম উক্তি বঙ্কিমের আরও আছে। যেমন মুসলমান সম্পর্কে বলেছেন, 'গোহত্যাকারী ক্ষৌরিত চিকুর মুসলমান'। এই উক্তিগুলো থেকে বোঝা যায় মুসলমান সম্পর্কে বঙ্কিমের অনেক প্রেজুডিস ছিল। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই 'যুক্তিবাদী' বঙ্কিম এই উক্তিগুলিকে বাদ দিয়ে দিয়েছেন।

'রাজসিংহ' উপন্যাসে গ্রন্থকারের নিবেদন অংশে বঙ্কিম বলেন, ''কোন পাঠক যেন মনে না করেন যে, হিন্দু, মুসলমানের কোন প্রকার তারতম্য নির্দেশ করা এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য। হিন্দু হইলে ভাল হয় না, মুসলমান হইলেই মন্দ হয় না... ভালমন্দ উভয়ের মধ্যেই তুল্য রূপে আছে... অন্যান্য গুণের সহিত যাহার ধর্ম আছে—হিন্দু হৌক, মুসলমান হৌক, সেই শ্রেষ্ঠ।'' এখানেও আবার যুক্তিবাদী বঙ্কিম পাঠকের সামনে আসেন।

'সীতারাম' বঙ্কিমচন্দ্রের সর্বশেষ উপন্যাস। এই উপন্যাসে বহু মুসলমান চরিত্র রয়েছে। সীতারাম উপন্যাসের প্রথম সংস্করণে চাঁদশাহ নামে একটি ফকিরের চরিত্র ছিল। চাঁদশাহের একটি উক্তি : ''বাবা! শুনিতে পাই তুমি হিন্দু রাজ্য স্থাপন করিতে আসিয়াছো। কিন্তু অত দেশাচার বশীভূত হইলে, তোমার হিন্দুরাজ্য সংস্থাপন করা হইবে না। তুমি যদি হিন্দু-মুসলমান সমান না দেখ, তবে এই হিন্দু-মুসলমানের দেশে তুমি রাজ্য রক্ষা করিতে পারিবে না। তোমার রাজ্যও ধর্মরাজ্য না হইয়া পাপের রাজ্য হইবে।'' যদিও বঙ্কিমচন্দ্র 'সীতারাম'-এর পরবর্তী সংস্করণে চাঁদশাহকে রাখেননি, তবে বঙ্কিমচন্দ্রের অন্য লেখাতেও একই বক্তব্য দেখতে পাওয়া যায়।

□

বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবন্ধসাহিত্য বিস্তৃত; বহু বিষয় নিয়ে রচিত। সাহিত্যতত্ত্ব, হিন্দু দর্শন চিন্তা, পাশ্চাত্য দর্শন চিন্তা, বাঙালির উৎপত্তি, বাঙালির ইতিহাস, গ্রন্থ সমালোচনা, জীবনী রচনা—বহু বিষয় তাঁর প্রবন্ধের উপজীব্য। হিন্দুধর্মের কথা তার মধ্যে একটি বড় অংশ জুড়ে রয়েছে। আরও ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে মুসলমানদের কথা। ধর্মশাস্ত্রের কথা লিখলেও বঙ্কিম পরিষ্কার জানিয়েছেন, ''আমি ধর্মশাস্ত্র ব্যবসায়ী নহি এবং ধর্মশাস্ত্রবেত্তার আসন গ্রহণ করিতেও প্রস্তুত নহি।'' সাধারণত লেখক তাঁর মতামত প্রবন্ধেই ব্যক্ত করেন। বিশেষ

করে বঙ্কিমচন্দ্র যখন কোনো সামাজিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না, কোনো আন্দোলনের বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিপক্ষও হয়ে ওঠেননি, তাঁর লেখাতেই তাঁর মতামতের যা কিছু প্রকাশ।

শাসক মুসলমানদের মধ্যে মোঘলদের থেকে তিনি পাঠানদের উঁচু স্থান দিয়েছেন। কারণ, তাঁর মতে পাঠানদের রাজত্বকালে বাংলার দুর্দশা ঘটেনি বরং বাংলার উন্নতি হয়েছিল। এ প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্য হল রাজা ভিন্ন দেশীয় হলেই রাজ্যকে পরাধীন বলা যায় না। সপ্তদশ অশ্বারোহী বাংলা জয় করেছিলেন বঙ্কিম একথা বিশ্বাস করতে চাননি—''সপ্তদশ অশ্বারোহী কর্তৃক বঙ্গজয় হইয়াছিল এ কলঙ্ক মিথ্যা।'' ''১২০৩ সাল হইতে দিবস গনি, যেদিন বঙ্গে হিন্দু নাম লোপ পাইয়াছে সেই দিন হইতে দিনগুনি।'' হিন্দুত্ব সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের গর্ববোধ ছিল কিন্তু এই হিন্দুধর্ম চালকলা প্রত্যাশী ব্রাহ্মণের হিন্দুধর্ম নয়। যৌবনে তিনি ধর্মকে যুক্তি দিয়ে বুঝতে চেয়েছিলেন। যৌবনে কেন, পরিণত বয়সেও তাঁর ধর্মভাবনা শশধর তর্কচূড়ামণিদের ধর্মভাবনা নয়। তাঁর সুগভীর স্বদেশপ্রীতিই তাঁকে ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতি আকৃষ্ট করেছে। ইসলাম সম্পর্কে কোনো বিরূপ মন্তব্য তাঁর কোনো রচনাতেই পাওয়া যায় না। তবে তাঁর সুহৃদ ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের মতো তিনি হজরত মহম্মদকে শ্রেষ্ঠ ধর্মগুরু বলেননি। কিন্তু অনেক বারই ধর্ম-আলোচনা প্রসঙ্গে শ্রদ্ধার সঙ্গে হজরত মহম্মদের নাম উল্লেখ করেছেন।

ব্যক্তিগত জীবনে আবদুল লতিফ খাঁ বাহাদুর তাঁর বন্ধু ছিলেন। ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট এবং ডেপুটি কালেক্টরের চাকরি উপলক্ষে তাঁকে যশোহর, নেগুয়া, বারুইপুর, বারাসত, হুগলি, হাওড়া প্রভৃতি মফস্বল গ্রামাঞ্চলে ঘুরে বেড়াতে হয়েছে। মুসলমান জনজীবন তাঁর অজানা থাকার কথা নয়। কিন্তু তাঁর কোনো লেখার মধ্যে তিনি সাধারণ মুসলমানকে খাটো করেননি। বাংলার কৃষকদের মধ্যে অধিকাংশই মুসলমান সম্প্রদায়ের। বঙ্কিম হিন্দু কৃষকদের মতোই মুসলমান কৃষক সম্পর্কেও বেদনার্ত। তাঁর কাছে হাসিম শেখ আর রামা কৈবর্তে কোনো ভেদ নেই। তিনি প্রশ্ন করেছেন, ''হাসিম শেখ আর রামা কৈবর্ত দুই প্রহর রৌদ্রে খালি গায়ে এক হাঁটু কাদার উপর দিয়া দুইটি অস্থিচর্মসার বলদে ভোঁতা হাল ধার করিয়া আনিয়া চড়িতেছে। উহাদের মঙ্গল হইয়াছে কি?'' শাসক মুসলমান সম্পর্কে তিনি 'মূঢ়', 'স্বেচ্ছাচারী' ইত্যাদি শব্দ প্রয়োগ করেছেন, কিন্তু তিনি বিশ্বাস করতেন হিন্দু-মুসলমাননের দ্বেষভাব স্পৃহনীয় নয়। উনিশ শতকে আমাদের দেশে হিন্দু-মুসলমান পাশাপাশি বাস করত। কখনও কখনও হাঙ্গামা হত না তা নয়, কিন্তু 'সাম্প্রদায়িক' শব্দটির তখনও পর্যন্ত দেখা মেলেনি। হিন্দু বুদ্ধিজীবীরা হিন্দু সমাজের সংস্কার নিয়েই ব্যস্ত ছিলেন। বঙ্কিম স্বধর্মচেতনায় বিশ্বাসী কিন্তু পরধর্মের প্রতি বিদ্বেষপরায়ণ নন। সর্বক্ষেত্রেই তিনি হিন্দু ও মুসলমানদের সমতা চেয়েছিলেন। আইনের ক্ষেত্রেও বৈষম্য চাননি বলেই বলতে পেরেছেন : ''এদেশে অর্দ্ধেক হিন্দু, অর্দ্ধেক মুসলমান। যদি বহুবিবাহ নিবারণের জন্য আইন হওয়া উচিত হয়, তবে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্বন্ধেই সেই আইন হওয়া উচিত। হিন্দুর পক্ষে বহুবিবাহ মন্দ, মুসলমানদের পক্ষে ভাল এমত নহে।'' তবে বঙ্কিমচন্দ্রের কোনো কোনো উক্তি মাঝে মাঝে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করে। 'ভারত কলঙ্ক' প্রবন্ধে জাতি গঠন প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন—''আমি হিন্দু, তুমি হিন্দু, যদু হিন্দু আরও লক্ষ লক্ষ হিন্দু আছে, এই লক্ষ লক্ষ হিন্দু মাত্রেরই যাহাতে মঙ্গল, তাহাতেই আমার মঙ্গল।... যাহাতে কোনো হিন্দুর অমঙ্গল হয়, তাহা আমার অকর্ত্তব্য... হিন্দু জাতি ভিন্ন পৃথিবীতে অন্য অনেক জাতি আছে, তাহাদের মঙ্গল হওয়া মাত্রই আমাদের মঙ্গল হওয়া সম্ভব নহে। যেখানে তাহাদের মঙ্গলে আমাদের অমঙ্গল, সেখানে তাহাদের মঙ্গল যাহাতে না হয় আমরা তাহাই করিব।'' এই উক্তিটিতে সরাসরি মুসলমান সম্প্রদায়ের উল্লেখ নেই। কিন্তু এর সুস্পষ্ট ধর্মীয় জাতীয়তাবাদী তথা সংখ্যাগরিষ্ঠতাবাদী সুরটি চিনে নিতে ভুল হয় না। অবশ্য বঙ্কিম এ ধরনের জাতীয়তাবাদের ত্রুটির কথাও মনে করিয়ে দিতে ভোলেন না। এই উক্তির ঠিক পরের অনুচ্ছেদেই তাঁর মন্তব্য : ''দেখা যাইতেছে যে এইরূপ মনোবৃত্তি নিষ্পাপ পরিশুদ্ধ ভাব বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে না। ইহার গুরুতর দোষাবহ বিকার আছে। সেই বিকারে, জাতিসাধারণের এরূপ ভ্রান্তি জন্মে যে, পরজাতির মঙ্গল মাত্রেই স্বজাতির অমঙ্গল, পরজাতির অমঙ্গল মাত্রেই স্বজাতির মঙ্গল বলিয়া বোধ হয়।''

বঙ্কিমকে বিচার করতে গেলে ঊনবিংশ শতাব্দীর সমাজ-বাস্তবতাকে ভুললে চলবে না। পরাধীন ভারতবর্ষে জন্মে পরাধীনতার যন্ত্রণা ও বেদনাকে তিনি মর্মে মর্মে অনুভব করেছিলেন। সরকারি চাকুরি করতে গিয়ে জীবিকার স্বার্থে তাঁকে অনেক সময় আপস করতে হয়েছে। ভারতে ইংরেজ শাসনের জয়গানও করতে হয়েছে। আবার উপন্যাসের আড়ালে, কখনও কখনও অন্যত্রও ইংরেজ, ইংরেজি নিয়ে ব্যঙ্গ করতে ছাড়েন নি। মুসলমান সম্প্রদায়ের ব্যাপারেও এই দোলাচল, স্ববিরোধী মনোভাব কখনও কখনও প্রকট হয়ে উঠেছে। আসলে ধর্মীয় বিশ্বাস-অবিশ্বাস, গোঁড়ামিবদ্ধ সংস্কারের মতো স্পর্শকাতর বিষয়ে অনেকেই পুরোপুরি মুক্তমনা হতে পারেন না। তা না হলে ডিরোজিওর মতো ব্যক্তির কোনো কোনো কবিতায় মুসলমান-বিরোধী সুর থাকবে কেন?

তবুও শেষ বিচারে একমাত্র মানুষের শুভ বিচারবুদ্ধিই পারে তাকে সব ধরনের অন্ধ বিশ্বাস, বদ্ধ সংস্কারে আর সংকীর্ণতার উপরে তুলে ধরতে। বঙ্কিমচন্দ্রের বিখ্যাত ধারণাটি ধার করেই বলতে হয়, এর জন্য প্রয়োজন নিরন্তর 'অনুশীলন'। বঙ্কিমের এই অনুশীলন ছিল বলেই তিনি বার বার বিচারবুদ্ধির দিকেই পা বাড়িয়েছেন। তাই 'গৌরদাস বাবাজির ভিক্ষার ঝুলি'-তে তিনি বলতে পারেন : ''যখন সর্বত্র সমান জ্ঞান, সকলকে আত্মজ জ্ঞানই বৈষ্ণব ধর্ম, তখন হিন্দু ও মুসলমান এ ছোটোজাতি ও বড় জাতি এরূপ জ্ঞান করিতে নাই।'' অথবা বঙ্কিমচন্দ্রের সেই উক্তিটি যা তিনি বঙ্গদর্শন ১২৮০ পৌষসংখ্যায় মীর মোশারফ হোসেনের গোবাই ব্রিজ অথবা গৌরী নদীর সমালোচনা প্রসঙ্গে লিখেছিলেন : ''বাঙ্গালা হিন্দু মুসলমানের দেশ, একা হিন্দুর দেশ নহে। কিন্তু হিন্দু-মুসলমান এক্ষণে পৃথক। পরস্পরে সহায়তা শূন্য। বাঙ্গালার প্রকৃত উন্নতির জন্য নিতান্ত প্রয়োজনীয় যে হিন্দু-মুসলমানে ঐক্য জন্মে।''

এই বঙ্কিমকে, আর যাই হোক, আমরা কি মুসলমান-বিদ্বেষী বলতে পারি?

সহায়ক গ্রন্থ

১. *বঙ্কিম রচনাবলী*, প্রথম খণ্ড, সাহিত্য সংসদ
২. *বঙ্কিম রচনাবলী*, দ্বিতীয় খণ্ড, সাহিত্য সংসদ
৩. রেজাউল করীম, *বঙ্কিমচন্দ্র ও মুসলমান সমাজ*, র‍্যাডিক্যাল, জানুয়ারি, ২০১৪
৪. অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য, *বঙ্কিমচন্দ্র জীবনী*, আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৯৩
৫. উত্তরা রায়, *বঙ্কিমচন্দ্র: সমাজভাবনা ও জীবন-জিজ্ঞাসা*, রেনেসাঁস পাবলিশার্স, জুন, ২০০০
৬. শান্তনু কায়সার, *বঙ্কিমচন্দ্র*, কথাপ্রকাশ, ২০০৮
৭. সারোহার জাহান, *বঙ্কিম উপন্যাসে মুসলিম প্রসঙ্গ ও চরিত্র*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, জুন ১৯৮৪
৮. 'কোরক' সাহিত্য পত্রিকা, বিশেষ বঙ্কিমচন্দ্র সংখ্যা, ২০১৩
৯. বঙ্গদর্শন : পুনর্মুদ্রণ, রিফ্লেক্ট পাবলিকেশন, ১৯৮২
১০. কল্যাণী ভট্টাচার্য, বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের পাঠান্তর, পি.এইচ-ডি অভিসন্দর্ভ (অপ্রকাশিত)

লোকসাহিত্য ও আধুনিক বাংলা সাহিত্য—পরিপূরক, না সমান্তরাল

ভব রায়

আমাদের আধুনিক সাহিত্য-পরিমণ্ডলে, অর্থাৎ মার্জিত বা মান্য বাংলাভাষার সাহিত্যে, লোকসাহিত্যের ভূমিকা কতটুকু? লোকসাহিত্য কতখানি মাত্রা যুক্ত করতে সক্ষম হয়েছে মূলত নাগরিক রুচির বাংলা সাহিত্যের ধারায়? এই প্রশ্নগুলি কিন্তু আজও যথেষ্ট প্রাসঙ্গিক, কিন্তু বলা নিষ্প্রয়োজন— এসব প্রশ্নের যথাযথ উত্তর সম্ভবত কারও জানা নেই। বাংলা সাহিত্যের মূল ধারায় লোকসাহিত্য প্রায় নিরবচ্ছিন্ন ভাবেই অপাঙ্‌ক্তেয় থেকেছে, যদিও মাত্র কয়েকজন উজ্জ্বলতর সাহিত্যিক-ব্যক্তিত্ব হয়তো বা ব্যতিক্রমীভাবেই লোকসাহিত্যের আনুষঙ্গিকতায় সুনির্দিষ্ট অবদান রেখেছেন। অথচ ঘটনা হল—বাংলা সাহিদ্যের দূর অতীত থেকে নাতিদূরেও লোকসাহিত্যের একটা উজ্জ্বল ট্র্যাডিশন ছিল। তাহলে তার ধারাবাহিকতা আধুনিকতর যুগে রইল না কেন?

যাই হোক, আলোচ্য বিষয়টি নিয়ে রয়েছে হাজারো বিতর্কের অবকাশ। আপাদত সেই বিতর্কে প্রবেশ না করে, কিছু প্রাসঙ্গিক অনুসন্ধান ও পর্যবেক্ষণে আসা যেতে পারে। যেমন, 'লোকসাহিত্যের পরিকাঠামোর মধ্যে আধুনিক বা নাগরিক সাহিত্য' অথবা 'আধুনিক সাহিত্যের পরিকাঠামোর মধ্যেই লোকসাহিত্যের অবস্থান'—তাত্ত্বিকভাবে কোন্ ধারণাটি সঠিক? এ প্রশ্নেরও স্পষ্ট মীমাংসায় না পেঁছিছেও কিন্তু আমরা লোকসাহিত্যের সঙ্গে আধুনিক সাহিত্য বা তথাকথিত উচ্চতর সাহিত্যের পারস্পরিক সম্পর্ক-নিরূপণের দিকে অনেকটাই এগিয়ে যেতে পারি। বিশ্বখ্যাত সাহিত্য-সমীক্ষক R.V. Williams লোকসাহিত্যকে তুলনা করেছেন এক 'সুবিশাল, বন্য মহীরুহের সঙ্গে। তাঁর ভাষায়, "It is like a forest-tree with its roots deeply buried in the past but which continually puts forth new branches, new leafs, new fruits." এই মন্তব্যের প্রায় কাছাকাছি অভিমত দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ 'লোকসাহিত্য' সম্পর্কে। তিনি লিখেছেন, "গাছের শিকড়টা যেমন মাটির সঙ্গে জড়িত এবং তাহার অগ্রভাগ আকাশের দিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে তেমনই সর্বত্র সাহিত্যের নিম্ন-অংশ স্বদেশের মাটির মধ্যেই অনেক পরিমাণে জড়িত হইয়া ঢাকা থাকে—তাহা বিশেষ রূপে—সংকীর্ণ রূপে দেশীয় স্থানীয়। তাহা কেবল দেশের জনসাধারণেরই উপভোগ্য ও আয়ত্তগম্য, সেখানে বাহিরের লোকে প্রবেশের আধিকার পায় না।"

রবীন্দ্রনাথ কিন্তু লোকসাহিত্য সম্পর্কে 'তাত্ত্বিক অভিমত' দিয়েই ক্ষান্ত থাকেননি, উচ্চতর সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ ও আধুনিকতম লেখক হয়েও তিনি রীতিমতো লোকসাহিত্যের চর্চাও করেছিলেন। লোকসাহিত্যকে পূর্ণ মর্যাদা দিয়ে তাঁর সামগ্রিক সাহিত্যকর্মে প্রতিস্থাপিত করেছিলেন। '...রাজার ছেলে ফিরছি দেশে দেশে/সাতসমুদ্র তেরো নদীর পার।/যেখানে যত মধুর মুখ আছে/বাকি তো কিছু রাখিনি দেখিবার।'—লোককথা তথা লোকসাহিত্যের ভাবনায় সমৃদ্ধ রবীন্দ্রনাথের কবি-মানসের এইরকম স্পষ্ট প্রতিফলন আমাদের মাঝেমাঝেই চোখে পড়ে। তাঁর 'ছেলেভুলানো ছড়া' নামক অসামান্য প্রবন্ধ ও আগডুম বাগডুম' বা 'শিবঠাকুর' বিষয়ক ছড়াগুলিও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। বিশেষ করে তাঁর লেখা 'লোকসাহিত্য' শীর্ষক প্রবন্ধ গ্রন্থটি তো এক্ষেত্রে 'আকর গ্রন্থ' হিসেবে স্বীকৃত। এইসব প্রত্যক্ষত লোকসাহিত্য-বিষয়ক বিশেষ রচনাবলি ছাড়াও তাঁর গল্প-কবিতা-সংগীত-নাটক ইত্যাকার যাবতীয় সাহিত্যকর্মের ইতিউতি ছড়িয়ে রয়েছে অজস্র লোক-অনুষঙ্গ। অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ লোকসাহিত্য-বিশেষজ্ঞ না হয়েও স্বাভাবিক সৃজনী-স্বতঃস্ফূর্ততায় লোক-সাহিত্যকেও যথাযোগ্য মর্যদা দিয়ে তাঁর সামগ্রিক সাহিত্যকর্মের মধ্যে অন্বিত করেছেন।

অথচ দুর্ভাগ্যের কথা, রবীন্দ্রোত্তর যুগে বাংলা সাহিত্যের অনেক স্রষ্টাই বহু বিষয়ে রবীন্দ্রানুসারী হয়েও লোকসাহিত্যের ক্ষেত্রে তাঁর ভূমিকা ও দৃষ্টান্তের গুরুত্ব বেমালুম ভুলে গেলেন। অবশ্য, এক্ষেত্রে দু-চারজন ব্যতিক্রমও ছিলেন। ঘুরে-ফিরে আবারও সেই একই প্রশ্ন : বাংলা সাহিত্যের সাধারণ চৌহদ্দির মধ্যেও অতীতে লোকসাহিত্যের একটা গৌরবময় পরম্পরা ছিল, পরিপূর্ণ মর্যাদায় যা অটুট ছিল রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত—তাহলে রবীন্দ্রোত্তর বা নাগরিকতার সাহিত্যে কেন তা এতখানি উপেক্ষিত রয়ে গেল? এই প্রসঙ্গে এই কৈফিয়তও হয়তো আসতে পারে, আমাদের পঞ্চাশ-ষাটের গণনাট্যের দিনগুলিতে তো লোকসাহিত্য তথা লোকসংস্কৃতি একটি মুখ্য ভূমিকা পালন করেছিল। এর উত্তরে সবিনয়ে বলা যায়, গণনাট্যের বিশেষ আদর্শবাদী রাজনৈতিক উদ্দেশ্যমুখিতার পথ ধরেই সেই আমলে লোকসাহিত্য ও লোকসংস্কৃতি এসেছিল। মূল ধারা বা সাহিত্যের স্বাভাবিক সৃজনশীলতার পথ ধরে সেই আমলে লোকসাহিত্য বা লোকসংস্কৃতি কতটুকু চর্চিত বা বিকশিত হয়েছিল?

রবীন্দ্রোত্তর যুগে অনেক দিক্‌পাল সাহিত্যিক আমাদের বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন, একথা যেমন সত্য—তেমনই এও-তো সত্য যে, তাঁদের মধ্যে কেবল দু-তিনজনই এই দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন যে, সামগ্রিক সাহিত্যিক সৃজনশীলতার

পরিসরেই সার্থকভাবে বলা যায়, তারাশঙ্কর ব্যাপ্তভাবে (তারাশঙ্করের লোকসংস্কৃতি-সম্পর্কিত কথাসাহিত্যের সমীক্ষা সু-বিশাল আলোচনা-সাপেক্ষ, যা আপাতত আমাদের আলোচ্য নয়) এবং আংশিকভাবে সতীনাথ ভাদুড়ি, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, অদ্বৈত মল্লবর্মণ ছাড়া আর বিশেষ কেউ লোকসংস্কৃতিকে আধুনিক বাংলা গদ্য সাহিত্যের সামগ্রিকতায় বিধৃত করেননি। 'দাদার বিয়ে যেমন তেমন/আমার বিয়ে রায়ঁশে/আয় ঢকাঢক মদ খেসে'—দরিদ্রতম নিরক্ষর গ্রামীণ মানুষের এই স্বতঃস্ফূর্ত আবেগের অমার্জিত অথচ ছন্দময় প্রকাশকে কদ অবলীলায় তাঁর কালজয়ী সাহিত্যে প্রতিস্থাপিত করেছেন তারাশঙ্কর। এইভাবেই তারাশঙ্করের রসোত্তীর্ণ গল্প-উপন্যাসের নায়কের কণ্ঠে নির্ভেজাল গ্রাম্য সাংগীতিক এই সংলাপও কত সুন্দর ও সার্থক রূপ নেয়, ''...এই খেদ আমার মনে মনে/ভালবেসে মিটল না আশ/কুলাল না এ জীবনে/হায়, জীবন এত ছোট কেনে?/এ ভুবনে।" ভাবতে অবাক লাগে—লোকসাহিত্যকে এত পূর্ণমাত্রায় প্রয়োগ করেও তো তারাশঙ্করের অন্যতম শ্রেষ্ঠ আধুনিক সাহিত্যিক হয়ে উঠতে কোনো অসুবিধা হয়নি। আর নাগরিক জীবনাশ্রয়ী প্লট নিয়ে অসংখ্য গল্প-উপন্যাস লিখতেও তাঁর লেখনীকে কোনও বাধা-বিপত্তির মুখে পড়তে হয়নি।

আবার, রবীন্দ্রোত্তর আধুনিক বাংলা কবিতাচর্চার জগতেও লোকসাহিত্য কোনও উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলেছিল, তেমন সামগ্রিক দৃষ্টান্তও চোখে পড়ে না। অবশ্য, সমকালীন গদ্যে যেমন কয়েকজন সাহিত্যিক ব্যতিক্রম ছিলেন, তেমনই সেই সময়ে কবিতার জগতেও এমন দু-এক জন বিশিষ্ট স্রষ্টা ছিলেন, যাঁরা তাঁদের অনেক কবিতায় উল্লেখযোগ্যভাবে লোক-অনুষঙ্গ ব্যবহার করেছিলেন সার্থকভাবে, অথচ তাঁদেরও 'নাগরিক' বা 'আধুনিক' কবির শিরোপা পেতে কোনও অসুবিধাই হয়নি। এই ধারায় উঠে অসে দুটি বিশেষ নাম—জীবনানন্দ দাশ ও বুদ্ধদেব বসু। পদ্য-গদ্যে 'সব্যসাচী' বুদ্ধদেব বসু ছিলেন, রবীন্দ্রনাথ-ব্যতিরেকে, বাংলা সাহিত্যে সবচেয়ে দীর্ঘপরিসরের (১৯২০-র দশক থেকে ১৯৭০-দশক—প্রায় পঞ্চাশ বছর) সক্রিয় সৃজনশীল শিল্পী, সাধারণ্যে যাঁর পরিচিতি আপাদমস্তক নাগরিক কবি, সম্পাদক তথা সাহিত্যিক হিসেবেই। আর, রবীন্দ্রোত্তর যুগে, জীবনানন্দের চেয়ে আধুনিকতর কোনও কবি সম্ভবত আজও দুর্লভ। সবচেয়ে বড় কথা—জীবনানন্দকে 'লৌকিক' বা 'নাগরিক' বা 'আধুনিক'—এ হেন ছকবন্দী খোপে আটকে রাখাও যায় না—বিশেষত, কবিতার নন্দনতত্ত্বের নিরিখে। লৌকিক বা নাগরিক অনুষঙ্গ নিয়েও জীবনানন্দ অনেক সময়েই পাঠকমনের গভীরে এক অব্যক্ত, প্রায় অলৌকিক সংবেদনশীলতার 'পরশ' রেখে যান!

যাই হোক, কবিতার 'ব্যাকরণ' বা নন্দনতত্ত্বের বিষয়কে আপাতত সরিয়ে রেখে, আমরা বরং তাঁর প্রাসঙ্গিক কবিতাগুচ্ছের বহিরঙ্গ বা আক্ষরিকতার উপরেই চোখ রাখব এবং চিনে নেওয়ার চেষ্টা করব—লোকসংস্কৃতির রকমারি অনুষঙ্গকে কী অসাধারণ নৈপুণ্যে তিনি ব্যবহার করেছেন তাঁর সৃষ্ট বিভিন্ন কবিতার পরতে পরতে। 'ডেকে লব আইবুড়ো পাড়াগাঁর মেয়েদের সব/মাঠের নিস্তেজ রোদে নাচ হবে—/শুরু হবে হেমন্তের নরম উৎসব।' জীবনানন্দের এই ধরনের কাব্যময় গ্রামীণ চিত্রকল্পের মাধ্যমে কত সহজে একাকার হয়ে যায় লোকসাহিত্য ও মার্জিত সাহিত্যের ভেদরেখা। এইভাবেই তিনি স্বাভাবিক ছন্দময়তায় লিখে যান, 'কাঁচা বাতাবির মতো সবুজ ঘাস' অথবা 'সূর্যের আলোর দিন ছেড়ে দিয়ে পৃথিবীর যশ পিছে ফেলে/শহর-বন্দর-বস্তি-কারখানা দেশলাইয়ে জ্বেলে/আসিয়াছি নেমে এই খেতে,' আধুনিক কালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ এই কবি আরও কত যে লোক-অনুষঙ্গ দিয়ে তাঁর অজস্র কবিতাকে সাজিয়েছেন, তার সঠিক সমীক্ষা সম্ভবত আজও হয়নি। মণিমুক্তোর মতো আরও কিছু লোকাভরণের নমুনা এখানে উল্লেখ করা হচ্ছে, যেগুলিকে খুঁটিয়ে দেখলে বোঝা যাবে কবি জীবনানন্দ কেন আজও অনন্য, অননুকরণীয়— 'হীরেমন পাখি', 'শঙ্খমালা-চন্দ্রমালা' উপকথা, 'ধানসিঁড়ি নদী', 'মধুকর ডিঙা', 'ভাসানের গান'। এখানে আরও যেটা বলার কথা—তাঁর কবিতায় ব্যবহৃত লোক-অনুষঙ্গের উৎস গ্রামকে ওপরে-ওপরে বা ভাসা-ভাসা দেখা নয়, বরং বাংলার গ্রাম ও গ্রামজীবনের গভীরে ও অন্তরঙ্গ আনাচে-কানাচে ব্যাপ্ত। পরিভ্রমণ ও নিখুঁত পর্যবেক্ষণ ছাড়া কবিতায় এ ধরনের সার্থক ও রসোত্তীর্ণ প্রয়োগ সম্ভব নয়।

এবার কবি বুদ্ধদেব বসু। জীবনানন্দের মতো এতটা ব্যাপকভাবে না হলেও বুদ্ধদেব বসুর কবিতা-সৃজনেও লোকসংস্কৃতি অনেকটাই জায়গা করে নিয়েছে। তবে, লোক-অনুষঙ্গ প্রয়োগে বুদ্ধদেবের আঙ্গিক অনেকটাই আলাদা। জীবনানন্দ যেখানে লৌকিক উপাদান ব্যবহার করতে করতে পাঠককে মাঝে মাঝে এক ধরনের লোকাতীত, হয়তো বা অসংজ্ঞাত আবেশের (obsession) জগতে নিয়ে যান, সেখানে বুদ্ধদেব বসু এক্ষেত্রেও কাব্যিকতার মাঝেই মূলত সরাসরি স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ—অনেকটাই যেন বাস্তবানুগ (realistic) কবিতা-কাঠামোর অনুসারী। যেমন, 'দ্রৌপদীর শাড়ি' কবিতায় বুদ্ধদেব লিখছেন—'...ঘোলা জল ধোবার ডোবায়/গলা-ডোবা কালো মোষ ভাদ্রের রোদ্দুরে, গলা-ফোলা, গলা-খোলা ব্যাং,/বৃষ্টিশেষ বিকেলের হলুদ রোদ্দুরে, মেঘলা দুপুরে/আকাশে এক পা কাক, কার্তিকের রাত্তিরের পোকা, মারীমত্ত মাছি/ রাক্ষস টিকিটিকি : সকলের রাজত্ব দিয়েছো প্রভু, সকলেরই প্রভুত্ব নিয়েছো মেনে।... এ স্বরাজ্য-সাম্রাজ্যে শুধু কি/—অন্য প্রভু।'

পল্লী বাংলার বর্ষাশেষ-ভাদ্রের প্রকৃতি-চরাচরে নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর কীট-পতঙ্গ, 'গলা-ফোলা গলা-খোলা' ব্যাং—সবাই যেন স্বরাজ্যে সম্রাট, এসবের যে নিখুঁত চিত্রায়ণ ঘটিয়েছেন বুদ্ধদেব তাঁর কবিতার বুননে—একজন পরিপূর্ণ নাগরিকতা-সম্পৃক্ত কবির মধ্যে এ যেন এক ধরনের চরম বৈপরীত্যের সমন্বয়। উল্লিখিত কবিতার মধ্যেও লক্ষণীয়—তাঁর ব্যবহৃত সব লোক-অনুষঙ্গই প্রকৃতিতে ও ব্যঞ্জনায় সবটাই সরাসরি—কোথাও কোনও প্রতীকী আলোছায়া নেই।

বুদ্ধদেব বসুর এরকম অনেক কবিতাই রয়েছে, যেগুলি প্রধানত লৌকিক চিহ্নবাহী—আরও কয়েকটির উল্লেখ এই পর্যায়ে : 'মাছধরা', 'গাঁয়ের মেয়েরা', 'মৃত্যুর পরে জন্মের আগে' ইত্যাদি। আর রয়েছে এই পর্যায়ে, সর্বোপরি তাঁর লেখা 'ইলিশ', যে কবিতায় অর্ধ শতকেরও বেশি সময় ধরে 'কিংবদন্তি'-রূপক হয়ে রয়েছে '...জলের উজ্জ্বল শস্য...'। এই কবিতায়, নদী-নালা-সমুদ্র-মোহনা-বেষ্টিত যে বিশেষ লোকায়ত-প্রকৃতি চরাচর, সেই সঙ্গে হতদরিদ্র গ্রামীণ প্রান্তিক-বর্গ জেলে-ধীবর-মৎস্যজীবীদের জীবনসংগ্রাম এবং সবশেষে মধ্যবিত্ত নাগরিক 'কলকাত্তাই' 'ভোজন-বিলাসে'র আপাত ছোঁয়া—সব মিলিয়ে বুদ্ধদেব বসুর 'ইলিশ' আজও চিরনতুন, অপ্রতিদ্বন্দ্বী। দেখা যাক, কবিতার ছন্দ-বয়ানে সেই ইলিশের রূপ-রস-গন্ধ : আকাশে আষাঢ় এলো, বাংলাদেশ বর্ষায় বিহ্বল।/ মেঘবর্ণ মেঘনার তীরে তীরে নারিকেল সারি/বৃষ্টিতে ধূমল;

পদ্মাপ্রান্তে শতাব্দীর রাজবাড়ি বিলুপ্তির প্রত্যাশার দৃশ্যপাটসম অচঞ্চল।/মধ্যরাত্রি; মেঘ-ঘন অন্ধকার; দুরন্ত উচ্ছল/আবর্তে কুটিল নদী; তীর-তীব্র বেগে দেয় পাড়ি/ ছোটো নৌকাগুলি প্রাণপণে ফ্যালে জাল, টানে দড়ি/অর্ধনগ্ন যারা, তারা খাদ্যহীন, খাদ্যের সম্বল/রাত্রিশেষে গোয়ালন্দে অন্ধ কালো মালগাড়ি ভরে/জলের উজ্জ্বল শস্য, রাশি রাশি ইলিশের শব,/নদীর নিবিড়তম উল্লাসের মৃত্যুর পাহাড়।/তারপর কলকাতার বিবর্ণ সকালে ঘরে ঘরে ইলিশ ভাজার গন্ধ; কেরানির গিন্নির ভাঁড়ার/সরস সর্ষের ঝাঁজে। এলো বর্ষা, ইলিশ উৎসব।'

এমন নয়, জীবনানন্দ ও বুদ্ধদেব ছাড়া সমকালীন আর কোনো কবি একটিও লোকায়ত ছত্র অন্তর্ভুক্ত করেননি তাঁদের নাগরিক সৃজনে। কালেভদ্রে একটি-দুটি লাইনে লোকায়ত মিশেল ঘটিয়েছেন হয়তো তাঁদের কেউ কেউ কেউ। যেমন, সুধীন্দ্রনাথ দত্তের '...বাজায় মোহনবেণু শীর্ণকুঞ্জে কালের রাখাল...', অথবা বিষ্ণু দে-র '...শিবঠাকুরের দেশে গুমোটে বন্ধ দম...'।

এসব সত্ত্বেও, রবীন্দ্রোত্তর বিপুল, বিস্তৃত আধুনিক কবিত তথা সাহিত্যের ভুবনে বৈপরীত্যের লোকায়ত সম্বল বলতে মূলত জীবনানন্দ ও বুদ্ধদেব বসু। আর, লোকায়ত ও আধুনিক সাহিত্য—পরিপূরক হওয়া, না-হওয়ার মীমাংসা আদৌ সম্ভব কি না—সেটা আজও এক বিশাল প্রশ্নচিহ্ন।

তথ্যসহায়তা

১. *বাংলার লোকসাহিত্য*, আশুতোষ ভট্টাচার্য
২. *লোকসাহিত্য*, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
৩. বিভিন্ন আধুনিক কবির কবিতা সংগ্রহ
৪. *বাংলার লোকবৃত্ত ও লোকসংস্কৃতি বিচিত্রা*, ভব রায়

With best compliments from

Arup Arogya Niketan

Surekalna, Purba Bardhaman

Sl. No. 109

With best compliments of

JAISHREE TIMERS

MILL
Amrasota More, Suri Road
P.O. Searsole Rabari-713358
Phone : 0341-2444002
E-mail : jaishreetimbers@rediffmail.com

RESI
18/1, N.S.B. Road
P.O. Raniganj (W.B.)
Phone : 0341-2449707
Fax : 0341-2444019

Sl. No. 106

With best compliments of

SUPARNA TRADING

CONTRACTOR & EARTHMOVERS

REGD. OFFICE : 2/18, Derojio Path, SAIL Co-Operative
City Centre, Durgapur-713216, Phone : (0343) 2566021

CITY OFFICE : Urvashi Commercial Centre, 1st Floor, Unit No. 017
Bengal Ambuja Housing Dev. Ltd., City Centre, Durgapur-713216
Mobile : 93337 46254

Sl. No. 108

শারদ শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন

এ.এম.সি. এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি লিমিটেড

রেজি. নং : ১৮১ তাং : ১১-০৮-১৯৮৮

বার্নপুর, পশ্চিম বর্ধমান

Sl. No. 122

এ-সময়ের বাংলা ছড়ায় দেশ ও সমাজ

বিনয়েন্দ্রকিশোর দাস

বিশ্ব সাহিত্যের বিভিন্ন শাখার উদ্দেশ্যকে মূলত দুই শ্রেণিতে ভাগ করা যায়। এক ধারার সাহিত্যে দেখা যায় art for art's sake। অন্য ধারায় প্রতিফলিত art for the sake of life. বাংলা ছড়াও এর ব্যতিক্রম নয়। এই ছড়াতেও আছে লাগামছাড়া কল্পনার আজগুবি জগৎ, কল্পলোকের গজদন্তমিনার। এই ধরনের ছড়াকে বলা যায়, ঘুমপাড়ানি ছড়া। বিপরীত ধারার ছড়ায় দেশ ও সমাজের যন্ত্রণা, সমস্যা, দুর্নীতি, অনাচার, সংগ্রাম, প্রতিরোধ, আনন্দ, বিস্ময়, জিজ্ঞাসা—সব কিছু মেলে। এই ধরনের ছড়াকে চিহ্নিত করা যায় ঘুমতাড়ানি ছড়া হিসেবে। আধুনিক শিল্পিত ছড়াকারদের কলমে সমাজ ও দেশ কত গভীর ও সার্থকভাবে উঠে এসেছে তা দেখা যেতে পারে।

আধুনিক বাংলা ছড়াতে যিনি রাজনীতি থেকে শুরু করে নানা বিষয়ের সার্থক প্রতিফলন ঘটিয়েছেন এবং বাংলা ছড়া-মাকে যিনি নানা মণিমাণিক্যে ভূষিত করেছেন তিনি হলেন অনন্য ছড়াশিল্পী অন্নদাশংকর রায়। ভারত ভাগ করার যন্ত্রণাকে তিনি 'খুকু ও খোকা' ছড়াতে কালজয়ী মর্যাদা ও সমীহের আসন দিয়েছেন। তার কয়েকটি লাইন উল্লেখ করা যেতে পারে—'তেলের শিশি ভাঙল বলে/ খুকুর পরে রাগ করো/তোমরা যে সব ধেড়ে খোকা/বাংলা ভেঙে ভাগ করো/তার বেলা?' একটা সময়ে নানা রাজনৈতিক দল দেশের অনেক বিড়ম্বনা ও অনিষ্টের মূলে কমিউনিস্টরা আছেন বলে মন্তব্য করতো। এই ঐতিহাসিক অপপ্রচারটি কত সার্থকভাবে, ব্যাঙ্গাত্মক ভঙ্গিতে ছড়াকার তুলে ধরেছেন তাঁর 'গিন্নি বলেন' ছড়াতে। কয়েকটি লাইন উদ্ধৃত করা যেতে পারে—'যেখানে যা কিছু ঘটে অনিষ্টি/ সকলের মূল কমিউনিষ্টি/মুর্শিদাবাদে হয় না বৃষ্টি/গোড়ায় কে তার? কমিউনিষ্টি।/ পাবনায় ভেসে গিয়েছে সৃষ্টি?/তলে তলে কেটা? কমিউনিষ্টি।' রাজনীতি সচেতন ও দায়বদ্ধ কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে বিস্তর প্রভেদ, বৈষম্য সাবলীলভাবে তুলে ধরেছেন তাঁর 'পুরোনো ধাঁধা' ছড়াতে। কয়েকটা লাইন উল্লেখ করা যেতে পারে—'বলতে পার ধনীর মুখে যারা যোগায় খাদ্য/ধনীর পায়ের তলায় তারা থাকতে কেন বাধ্য?/হিং টিং ছট প্রশ্ন এসব মাথার মধ্যে কামড়ায়/বড়লোকের ঢাক তৈরি গরীব লোকের চামড়ায়।'

পূর্ণেন্দু পত্রী মার্টিন লুথারের মতো কিংবদন্তী ও বরেণ্য ব্যক্তিত্বকে হত্যা করার বিরুদ্ধে কী চমৎকারভাবে বক্তব্য রেখেছেন তাঁর ছড়ায়। তিনি লিখেছেন—'হাট্টিমা টিম টিম/ওদের খাড়া দুটি শিং/ওরা এমন ঘোড়ার ডিম/নিজেকে খুন করে বলে মার্টিন লুথার কিং।' বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ছড়াতেও সমাজের নানা ভ্রষ্টাচার, অত্যাচার, শোষণের ছবি ও প্রতিবাদের সুর পাওয়া যায়। তাঁর 'বাঘা ছড়া'র কয়েকটি লাইনে নির্মম নরহত্যাকারীর গর্ব চমৎকারভাবে প্রকাশ পেয়েছে : কুমায়ুনের বাঘ/হুমায়নের কে?/এত যে তার রাগ/বাদশা নাকি সে?/ এক যে আছে মানুষ খেকো/কেবল বলে আমায় দেখো/তোকে দেখবো কি?/মানুষ খেয়ে বাঘ হয়েছিস/আরে ছিঃ ছিঃ ছিঃ।'

> ছড়ায়, লিমেরিকে লেখকরা সমাজের, দেশের নানা যন্ত্রণা, সমস্যা, প্রতিবাদ, শোষণ, ব্যভিচার, অসাম্য, অসঙ্গতি মুন্সিয়ানার সাথে তুলে ধরেছেন। লেখকদের মসি আরও ধারালো অসি হয়ে উঠছে এটাই আশার কথা। লিমেরিক যতই জীবনের, সমাজের প্রকৃত দর্পণ হয়ে উঠবে, ইতিবাচক বক্তব্য তুলে ধরবে, ততই পাঠক ঋদ্ধ হবেন, পাঠে বেশি আগ্রহী হবেন এবং ছড়া-লিমেরিকও ফুলে-ফুলে আরও বেশি পল্লবিত হয়ে উঠবে।

দূষণ সমাজের সবচেয়ে বড় অভিশাপ। কারখানার ধোঁয়া, শব্দদূষণ, পরিবেশদূষণ মানুষকে কত বিড়ম্বনায় ফেলছে, অতিষ্ঠ করে তুলছে তারই একটি নিষ্ঠুর ও জীবন্ত ছবি পাওয়া যায় সরল দে-র ছড়ার লাইনগুলোতে—'যন্তর মন্তর/এক হাত অন্তর/ঝক ঝক ঝক্কর/ঘোরে চাকা-চক্কর।/ দাউ দাউ চুল্লি/ওড়ে ঝুল-ঝুল্লি।/দম নিতে কষ্ট/কলজেটা নষ্ট/ভ্যাঁপ ভ্যাঁপ ভ্যাঁপ্পর/ শব্দের থাপ্পড় / চাও যদি বাঁচতে/আহ্লাদে নাচতে/নাকে দাও ছাঁকনি/কানে দাও ঢাকনি/টরে টরে টক্কা/নেই তবু রক্ষা/হও নীলকণ্ঠ/পরমাণু ছাই মেখে/খাও কচুঘণ্ট।' অনাচার, অশুভ শক্তির শুকনো পাতাকে জ্বালানোর জন্য শুভ দাশগুপ্ত আহ্বান করেছেন তাঁর 'অরুণ বরুণ' ছড়ায়। দেখা যাক কয়েকটি লাইন : 'অরুণ বরুণ কিরণমালা/তোমাদের পাঁজর জ্বালছে কারা?/সেই আগুনে কাদের আলো?/সেই আগুনে কাদের ভালো? ধার দে নখে ধার দে দাঁতে/ঘুমোস না এই অন্ধ রাতে/ এ দেশ জুড়ে আগুন জ্বালা/এদেশ জুড়ে আগুন জ্বালা/অরুণ বরুণ কিরণমালা।'

ধনী লোকের পেছনের বেঞ্চে বখাটে, অবাধ্য ছেলেরা কোটিপতি প্রোমোটার হয়ে ওঠে নানা চালাকি, চাতুরি ও কায়দায়। পবিত্র সরকার তাঁর 'ছেলেটা' লিমেরিকে অত্যন্ত সাবলীলভাবে এই ব্যাপারটি তুলে ধরেছেন—'ছেড়েছিল স্কুল ব্যাটা, বুদ্ধিও কম ওটার/কারও কথা শুনতো না, মাথাটা গরম ওটার/কিন্তু কে জানত/এই অঘাকান্ত/ একদিন হয়ে যাবে কোটিপতি প্রোমোটার।'

নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলেমেয়েদেরও ব্যাঙের ছাতার মতো গজানো ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে ভর্তি করে অভিভাবকরা দামি বই, টিফিন, পোশাক, জুতো কিনতে গলদঘর্ম, তবুও বুকে গর্ব ও অহংকার—ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে ছেলেমেয়েকে পড়াচ্ছেন। শ্রীসরকারের 'উত্তম মধ্যম' লিমেরিকটিতে এই মনোভাবটি সার্থকভাবে প্রতিফলিত হয়েছে : বাপের হেঁচকি ওঠে ছুটে যায় মার দম/বই খাতা টাই জুতো কিনি যথা সাধ্যম/যদি মরি মরব হে/থেকে যাবে গর্ব এ—/ছেলেকে দিয়েছি স্কুলে ইংরেজি মাধ্যম।'

অসৎ মানুষদের দাপট রমরমা এই সমাজে। ভবানীপ্রসাদ মজুমদারের ছড়াতে পাই এমন অশুভ দাপট দেখে মা দুর্গার অবাক হওয়া। তিনি 'দুর্গাদেবী অবাক হেভি' ছড়াতে লিখেছেন—'দুর্গা মা খুব অবাক হলেন মর্ত্যে এবার এসে/দেখেন অসৎ মানুষরা বেশ ঘুরছে বীরের বেশে/সৎ পথে রোজ চলছে যারা যাচ্ছে তারাই ফেঁসে/সত্যি বাপের বাড়ির দেশে কাণ্ড সর্বনেশে।' দেশ থেকে কম কম চাপযুক্ত শৈশব, কৈশোর হারিয়ে গেছে। এই দুর্ভাগ্যকেই শ্রীমজুমদার সাবলীলভাবে প্রকাশ করেছেন তাঁর 'জারি হল ডিক্রি কৈশোর বিক্রি' ছড়াতে। কয়েকটি লাইন দেখা যাক—কিন্তু এ খেলা আর কতদিন চলবে?/শোষণের জাঁতাকল আর কত ডলবে?/ব্যথার পাহাড়গুলো বলো কবে গলবে?/খেটে খাওয়া মানুষই শেষ কথা বলবে।/চারিদিকে শোন আজ ভেসে আসে ওই শোর/ফিরিয়ে দিতেই হবে শৈশব ও কৈশোর/হাসিমাখা শৈশব খুশি আঁকা কৈশোর/শৈশব শৈশব কৈশোর কৈশোর।'

বর্তমানে সুবিধাবাদী কিছু রাজনীতিবিদের ছত্রছায়ায় আশ্রিত একশ্রেণির দুষ্কৃতীরা অপরের ক্ষতি, বিরুদ্ধ রাজনীতির লোকদের নানা দুর্দশা নিয়ে আসে। এই অপকর্মে রপ্ত দুষ্কৃতীদের কথা প্রদীপ আচার্য তাঁর 'ভালোবাসি, ভালোবাসি' ছড়াতে বেশ নিপুণভাবে, সাবলীলভাবে তুলে ধরেছেন। দেখা যাক কয়েকটা লাইন— 'ভালোবাসি বিন ছেঁচে কই নিতে/ভালোবাসি পাকা ধানে মই দিতে/ভালোবাসি নিরীহের প্রাণ নিতে/ভালোবাসি ঘর ভেঙে ত্রাণ দিতে।' বর্তমানে মিডিয়ার বিজ্ঞাপনে অর্ধনগ্ন নারীদেহ দেখানোর ঢল নেমেছে। এই নিম্নরুচির প্রভাব বলিষ্ঠভাবে ভাষা পেয়েছে নীতীশ চৌধুরীর ছড়া 'হালচাল'-এ। আট লাইন উল্লেখ করার লোভ সংবরণ করতে পারছি না—'দেশটা গেল রসাতলে/চেঁচাস তোরা কয়জনে/করছে কে আর তোদের কেয়ার/ভরছে স্বদেশ পয়জনে।/মগ্ন স্নানে নগ্ন শরীর/খাচ্ছে চেটে সাবান জল/দৃশ্য দেখে নিঃস্ব লোকের/শুকোয় না আর জিভের জল।'

অনেক অট্টালিকা, সেতু তৈরি হতেই বা তৈরির অল্পদিন পরেই ভেঙে পড়ছে। এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনার পেছনে নানা দু-নম্বরি টাকার লেনদেন, অনেক লবির কুকর্মের প্রভাব সক্রিয়। এই নির্মম সত্যটি সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন সালেহা খাতুন তাঁর চার লাইনের ছড়ায়—'গড়ার পরেই ভাঙছে সেতু/তৈরি করার কায়দা কি!/ভাঙা মানেই পকেট চাঙ্গা/নইলে ওঠে ফায়দা কি?' অনেক উচ্চাকাঙ্ক্ষী, তরুণ ধান্দাবাজ এখানে ওখানে ছুটে সুযোগ খোঁজেন মন্ত্রী হবার, জনপ্রতিনিধি হবার। এই চতুরদের মনের সাধ নিখুঁতভাবে স্পন্দিত করেছেন শ্যামাপ্রসাদ ঘোষ তাঁর এক লিমেরিকে। লিমেরিকটি দেখা যাক—'গয়েশপুরের মহেশ শুরের চয়েস খুবই খাসা/বয়েস কাঁচা ভয়েস চাঁ চাঁ মনেতে উচ্চাশা/দিল্লী গিয়ে সুযোগ বুঝে/ধরেন গুরু অনেক খুঁজে/বলেন প্রভু, দিন শিখিয়ে মন্ত্রী হবার ভাষা।'

নানা পুজো উপলক্ষে এক শ্রেণির মানুষ অপরের কাছ থেকে জোরজুলুম, ভয় দেখিয়ে নানা কায়দায় অঢেল টাকা তোলেন, সেই অবৈধ কড়িতে তাঁরা অনেক ব্যক্তিগত শখ মেটান। তেমন বাস্তব ঘটনা তপন চক্রবর্তীর 'ভক্ত' লিমেরিকে বাণীরূপ লাভ করেছে। দেখা যাক লিমেরিকটি—'মায়ের সেবায় মন দিয়েছে নকুল চন্দ্র ভক্ত/চাঁদার নামে বার করে নেয় পাড়ার লোকের রক্ত/পুজোর শেষে নতুন বেশে/বন্ধুরে কয় হেসে হেসে/মায়ের দেওয়া মোটা টাকায় মিটবে কিছু শখ তো।' বর্তমানে থানাতে কিছু হারানোর/চুরির কথা এফআইআর করতে গেলে প্রায়ই নানা হুমকি, ভয় প্রদর্শনের শিকার হতে হয় মানুষকে। এমনি একটি ছবি ঝলমল করে উঠেছে ষষ্ঠীপদ পালের লিমেরিক 'আরো কিছু হারানো'তে। লিমেরিকটি পড়া যাক—'সেই দিন ভিড় বাসে মোবাইল হারালাম/থানাতে আসবো বলে যেই পা টা বাড়ালাম/ডেকে বলে এক ছেলে/এ ব্যাপারে থানা গেলে/আরো কিছু হারাবেন এই কথা জানালাম।' বন, গাছ কেটে লোভী মানুষ এমন অমানবিক কাজ করছে, নিজেই নিজেদের সর্বনাশ ডেকে আনছে, মানুষ হয়েও অমানবিক কাজ করছে, পশুর মতো কাজ করে চলেছে এই নির্মম সত্যটি বিজন দাস তাঁর 'জয় পশুদের জয়' ছড়াতে বেশ চমৎকারভাবে তুলে ধরেছেন। দেখা যাক আটটি লাইন—'নাইবা পেলুম বনজঙ্গল/তবুও আছি সুখে/সবজান্তা মানুষজনের/মনের ভেতর ঢুকে/দেখছে সবাই পথে ঘাটে/এবং ঘরে ঘরে/মানুষ এখন তাই করছে/যা পশুরাই করে।'

অভাবের তাড়নায় বা অসৎ মানুষের খপ্পরে পড়ে স্বাভাবিক জীবন হারিয়ে অনেক মেয়ের জীবন দুর্বিষহ হয়ে ওঠে। তেমনই এক বাস্তব সমাজচিত্র ধরা আছে বর্তমান লেখকের 'পাবি' শীর্ষক লিমেরিকে— 'বর পাবি, ঘর পাবি, কত যে কদর পাবি/কাজ পাবি, সাজ পাবি, পেয়ে যাবি নাকছাবি/বলে মাসি মেয়েদের নিয়ে/দেয় কিছু টি এ আর ডি এ/তারপরে পাচার যে করে দেয় আবুধাবি।' পণপ্রথা নামক সামাজিক অপরাধটি আজও বিরাজ করছে বহাল তবিয়তে। ধনীরাও নানা কায়দায় পণ নেন এখনও। এই নির্মম সর্তটি বাঙ্ময় হয়ে উঠেছে আর একটি লিমেরিক 'পন চাস'-এ। পাঁচটি লাইন দেখা যাক—'পার করে দিলি ভাই বয়সটা পঞ্চাশ/আফিস করেও আছে ধান টন টন চাষ/তুই এত গুণী/তবু একি শুনি/দুবেলাই কনে দেখে লাখ টাকা পণ চাস?'

ছড়ায়, লিমেরিকে লেখকরা সমাজের, দেশের নানা যন্ত্রণা, সমস্যা, প্রতিবাদ, শোষণ, ব্যভিচার, অসাম্য, অসঙ্গতি মুন্সিয়ানার সাথে তুলে ধরেছেন। লেখকদের মসি আরও ধারালো অসি হয়ে উঠছে এটাই আশার কথা।

উপসংহারে বলা যায় ছড়া, লিমেরিক (সাহিত্যের অন্যান্য শাখার মতো) যতই জীবনের, সমাজের প্রকৃত দর্পণ হয়ে উঠবে, ইতিবাচক বক্তব্য তুলে ধরবে, ততই পাঠক ঋদ্ধ হবেন, পাঠে বেশি আগ্রহী হবেন এবং ছড়া-লিমেরিকও ফুলে-ফুলে আরও বেশি পল্লবিত হয়ে উঠবে।

সংস্কৃতি কি শুধুই আবেগ না শিকড়?

সুরঞ্জিতা ভট্টাচার্য

বাঙালির সাথে জড়িয়ে আছে কৃষ্টি, সংস্কৃতি, আবেগ, উষ্ণ অনুভূতি, শেকড়ের সন্ধান, কবিতা, নাটক, সাহিত্য, থিয়েটার, গান, মেধা, নস্টালজিয়া এবং উৎসব। বৈচিত্র্যের মাঝে ঐক্য, যার পরতে পরতে রয়েছে ভালোবাসা, উষ্ণতা, প্রেম, বিরহ। রয়েছে এক অমোঘ উদ্দীপনা। নিজের সংস্কৃতির ধারাকে বয়ে নিয়ে চলাতে। পরকে আপন করে নেওয়ার দক্ষতাতেও বাঙালি পিছপা নয়। আন্তরিকতা ও আতিথেয়তা বাঙালির আর এক বৈশিষ্ট্য। তার মধ্যে খাদ্যরসনা বা খাবারের প্রতি অতি মনোযোগী হওয়াটা কোনো নতুন কথা নয়। আমি বা আপনি যদি বাঙালি হয়ে থাকি, তবে খুব সহজেই এই পালকগুলি আমাদের সমগ্র বাঙালি জাতির মুকুটে শোভা পাবে।

মাঝে মাঝে মনে হয়, এই তেরো বছর প্রবাসী বাঙালি হিসেবে মার্কিন মুলুকে স্থায়ীভাবে থাকতে থাকতে, অতি সমৃদ্ধ জীবনযাপনে অভ্যস্ত হয়ে গিয়ে কি নিজের সংস্কৃতি থেকে দূরে সরে গেছি বা যাচ্ছি? তবে নিজের শহর বাঁকুড়ার লালমাটির রাস্তা, বিষ্ণুপুরের বালুচরি ও টেরাকোটা শিল্পের গৌরব, ঐতিহাসিক আভিজাত্য, রামকিংকর বেজের তুলির টানকে উপেক্ষা করে কীভাবে আছি? কিংবা খুব সন্তর্পণে শিকড়কে মনের মণিকোঠায় রেখে প্রবাসজীবনের পথ চলাতে নিজেকে অভ্যস্ত করেছি? প্রশ্নটা আমার নিজের কাছেই ছিল। উত্তরও পেয়ে গেলাম তৎক্ষণাৎ। আমরা যারা প্রবাসে থাকি, তা সে কিছুদিনের জন্যই হোক বা সারা জীবনের জন্যই হোক না কেন, আমার উপলব্ধি, সংস্কৃতির শিকড় আমাদের সাথেই অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত, যা হাজার চেষ্টা করেও উপেক্ষা করা যায় না, আমার মতে উপেক্ষা করা উচিত নয়। নিজের সংস্কৃতির ধারাকে সাথে নিয়ে চলি বলেই হয়তো রোজ সকালে কাজে যাবার সময় রবীন্দ্র বা নজরুলের গানের সিডিতে হাত চলে যায়। যখন দূরে কোথাও বেরিয়ে পড়ি সঙ্গী করি বব ডিলান, নেল ডায়মন্ড, কেনিজি-র পাশাপাশি পুরোনো বাংলা গানের সম্ভারকে। তার মধ্যে রামকুমার চট্টোপাধ্যায়ের পুরাতনী ও টপ্পার পাশাপাশি শচীন দেব বর্মণ, জটিলেশ্বর মুখোপাধ্যায়, সলিল চৌধুরী, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, মান্না দে, সনৎ সিংহ, প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়, নির্মলা মিশ্র, শ্যামল মিত্রের গানের অফুরন্ত ভাণ্ডার নতুন করে জীবনকে চিনতে শেখায়, কৈশোর-যৌবনের প্রেমের স্মৃতিকে নাড়া দেয়। স্মৃতির ভাঁড়ারে ভেসে ওঠে কত মিষ্টি সকাল বা বিকেল বা সোনালী সন্ধের রোজনামচা, যা স্মৃতিকে নতুন করে চিনতে শেখায়, ভাবনা-আবেগ অনুভূতিকে রঙিন রোমাঞ্চে নাড়া দিয়ে যায়। এখনও রবিবারের অলস সন্ধ্যায় বসে পড়ি সত্যজিৎ, তপন সিংহ, ঋত্বিক ঘটক, মৃণাল সেন ছাড়াও 'দাদার কীর্তি', 'মেঘমুক্তি', 'বিপাশা', 'পথে হল দেরী', 'নীল আকাশের নীচে' আরও কত নামি নামি বাংলা ছবির সম্ভার। আমাদের রোজকার জীবনে বাংলা সংস্কৃতি ও কৃষ্টি এতটাই জীবন্ত, প্রাণবন্ত—তা যেন ফুসফুসের বাতাস, নতুন প্রেরণা ভাবাবেগে আলোড়িত এক বর্ণময় জীবন। প্রবাসে থাকি বলেই হয়তো, নিজের সংস্কৃতিকে আবার নতুন করে চেনার চেষ্টা করি। এর অফুরন্ত সম্ভারকে উপলব্ধি করি নিজের মস্তিষ্ক ও আবেগের তাড়নায়।

বাঙালি বলেই হয়তো, নিজের অভিজ্ঞতাকে যাচাই করে নিতে, উৎসব ও সংস্কৃতির সন্ধানে আর খাওয়া-দাওয়ার হুজুগে প্রায়ই মেতে উঠি। সংস্কৃতির সন্ধানের সূত্র ধরেই খোঁজ মেলে বাঙালিদের অভিনব সংস্থা বেঙ্গলি অ্যাসোসিয়েশন অব পিটস্‌বার্গ (সংক্ষেপে বি.এ.পি.)। এই সংস্থার যাত্রা বা পথচলা শুরু হয়েছিল আশির দশকের মাঝামাঝি সময়ে ১৯৮৫ নাগাদ। তখন এই অঞ্চলে এত বাঙালি ছিল না। ১৯৮৫ সালে শুরু হওয়া এই পথচলা সংস্কৃতির ও কৃষ্টির ধারাকে আজও বয়ে নিয়ে চলেছে। এক অদমনীয় প্রচেষ্টায় বি.এ.পি. বাংলাভাষী মানুষ ছাড়াও দক্ষিণ ভারতীয়, উত্তর ভারতীয়, কেরালা, পাঞ্জাব, এমনকি বাংলাদেশ থেকে আসা মানুষদের নিয়ে এই সংগঠনের ঐতিহ্যকে ধরে রেখেছে। এ যেন বি.এ.পি. ছাতার তলায় এক অভিনব ভারতীয় সংস্কৃতির মেলবন্ধন, বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য। বেঙ্গলি অ্যাসোসিয়েশন প্রতি বছর নিয়মমাফিক দুর্গাপুজো, সরস্বতী পুজো, পয়লা বৈশাখ, দোল উৎসবের আয়োজনের পাশাপাশি নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজনও করে থাকে। এর মধ্যে বাংলা গান, নাচ, কবিতাপাঠ, নাটক ও বিভিন্ন আলোচনাসভা ও সিনেমা প্রদর্শনের ব্যবস্থাও করে থাকে। শুধু বাঙালি বা বাংলা সংস্কৃতিকেই নিয়ে চলা উদ্দেশ্য হলেও অ্যাসোসিয়েশন চায় আরও সমাজসেবা মূলক কাজের সঙ্গে যুক্ত থাকতে। সেখানে ধর্ম, বর্ণ, জাতি, ভাষার ঊর্ধ্বে 'মানবিক ধর্ম'কে গুরুত্ব দেওয়া, নতুন প্রজন্মের কাছে নিজের ঐতিহ্য তুলে ধরা। বিভিন্ন পরিবারের সদস্য বিভিন্ন পেশায় যুক্ত। মহিলাদের কর্মজগতে ব্যাপ্তি ও প্রসারতা

যথেষ্ট। অ্যাসোসিয়েশনের ছাতার তলায় বিভিন্ন বাঙালি পরিবারের মেলবন্ধন এই সংস্থাকে এক অন্য মাত্রা দিয়েছে।

নিজের অভিজ্ঞতার কথা জানানোর তাগিদে এক একান্ত আলাপচারিতায় পাওয়া গেল বি.এ.পি-র এক প্রবীণ সদস্যকে। ড. ফাল্গুনী গুপ্ত। ১৯৮৫-তে কর্মসূত্রে মার্কিন মুলুকে তাঁর পা রাখা। ইউনিভার্সিটি অব পিট্সবার্গ-এ মাইক্রোবায়োলজিতে দীর্ঘদিন শিক্ষকতা করেছেন। এখন অবসর নিয়েছেন। ফাল্গুনীবাবুর কাছে বি.এ.পি. একটি পরিবারের মতো। ১৯৮৬ থেকে এই সংস্থার সঙ্গে, এর সমস্ত ভালোমন্দ, পরিবারের সদস্যদের সুখ, দুঃখ, উৎসবের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে পড়েছেন। ওনার মতে, বাঙালিরা প্রবাসী হলেও নিজেদের সংস্কৃতিকে খুবই সুন্দরভাবে ধরে রেখেছেন। তাঁর স্ত্রী ও মেয়েরাও এই সংস্থার বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছেন। 'ঘরোয়া' নামের আর একটি সাংস্কৃতিক শাখা। প্রতি মাসে বিভিন্ন সদস্যদের বাড়িতে নাটক, গান, কবিতা, নাচের চর্চা নিয়মিতভাবে হয়। ড. পি. গুপ্ত যদিও উত্তর কলকাতার মানুষ, কিন্তু দেশ ছেড়েছেন বহুদিন, তাই বন্ধুরাই প্রবাসে পরিবারে পরিণত হয়েছে। যৌথ পরিবারের একজন প্রবীণ সদস্য হিসেবে তাঁর গর্ব অপরিসীম। তিনি এখনও নিয়মিত কলকাতার কুমোরটুলি থেকে দুর্গাপ্রতিমা নিয়ে আসেন এবং তাই দিয়েই বাঙালিরা মেতে ওঠেন দুর্গাপুজোর আনন্দে। ওনার কাছে এ এক অন্য আনন্দ, অন্য পাওয়া। দীর্ঘদিন দেশের পুজো দেখেননি। যখন দেশে যান, কলকাতার থিম পুজো ও সাড়ম্বরতা তাঁকে কোনো আনন্দ দেয় না। বরং প্রবাসে সাবেকি ও পুরোনো ধাঁচে প্রতিমা পুজোতেই সবচেয়ে বেশি তৃপ্তি পান। আগে ভোগরান্না হত বাড়িতে। তখন সদস্য সংখ্যা ছিল অল্প। গত ৪০-৪৫ বছরে সংখ্যাটা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৫০০-র কাছাকাছি। এখন তাই ভোগ রান্না পুজোর জায়গাতেই হয়। যুক্ত থাকেন কমিটির প্রায় সকল সদস্য। এই পরিশ্রমে ক্লান্তি থাকলেও আনন্দ জুড়ে আছে শতভাগ। দেশের পুজোতে এখন যেন আর সেই আন্তরিকতা অনুভব করেন না। বি.এ.পি-র পুজো যেন পরিবারের পুজো, পুজোতে অন্য কোথাও যান না।

স্মৃতিচারণায় আর এক প্রবীণ সদস্যার সঙ্গে কথা হচ্ছিল। শ্রীমতী মীরা ব্যানার্জি। বেঙ্গলি অ্যাসোসিয়েশনের যাত্রাপথের গোড়াতে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত ছিলেন শ্রীমতী ব্যানার্জির স্বামী। তিনি এখন প্রয়াত। কিন্তু ঐতিহ্যের ধারা থেমে থাকেনি। স্মৃতির পাতা থেকে উঠে এল কত কথা—১৯৬৩-তে এসেছিলেন বিবাহসূত্রে। আমেরিকায় তখন বেঙ্গলি অ্যাসোসিয়েশন শুরু হয়নি। নিজের সংস্কৃতি, ভাষা ও পোশাক নিয়ে এক অভাব অনুভব করতেন। যেখানে থাকতেন, বাঙালি কেন, কোনো

ভারতীয়ও ওই সময়ে ওই অঞ্চলে চোখে পড়ত না। নিজে ছিলেন উচ্চশিক্ষিতা। ৩২ বছর এডুকেশনাল সাইকোলজিতে শিক্ষকতা করেছেন। নতুন প্রজন্মের ছেলে-মেয়েদের মানুষ করতে বেশ কষ্ট করতে হয়েছে। সন্তানদের সাথে মাতৃভাষায় কথা পর্যন্ত বলতেন না। পাছে তাদের বাইরের পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নিতে অসুবিধা হয়। এখন স্মৃতিচারণায় জানালেন, ভুল করেছেন। সন্তানদের সঙ্গে নিজের ভাষায় কথা বলেননি। বঞ্চিত করেছেন তাদের নিজেদের সংস্কৃতিকে জানাতে। এখন তাই যেন বেশি করে অ্যাসোসিয়েশনের সঙ্গে জড়িত। নতুন প্রজন্মকে উৎসাহ দেন। তাঁর মতে নতুন ও প্রবীণ যারা এখন প্রবাসে আসে, তারা যেন অনেক পরিণত, সংস্কৃতির ধারাকে ধরে রাখতে বদ্ধপরিকর। তবে বড় পরিবারে যেমন বন্ধন আছে, মাঝে মাঝে তা আলগাও হয়ে যায়। সেই আন্তরিকতা ও বন্ধনের অভাবও অনুভব করেন মাঝে মাঝে যা অনাকে ভাবায়। তবে ঘরোয়া নিয়মিত সংস্কৃতি চর্চার ধারাবাহিকতাকে উৎসাহ দেন। ওনার বাড়িতেও সাংস্কৃতিক কর্মশালা হয়। উনি খুবই আগ্রহী ও আনন্দিত এই সংস্থার সঙ্গে জড়িত থাকতে পেরে। দেশে মাঝে মাঝে যান, কলকাতার নতুন প্রজন্মকে দেখে খুবই অবাক হন, যেন জোর করে বাংলাকে ভুলতে চাওয়ার প্রচেষ্টা।

বি.এ.পি-র বর্তমান সভাপতি মৌমিতা কুণ্ডু ও তাঁর স্বামী শুভ কুণ্ডুর কাছে জানা গেল অ্যাসোসিয়েশন তাঁদের কাছে একটি বড় পরিবারের মতো, অতীতের যৌথ পবিবারের মতো। একান্নবর্তী পরিবারে যেমন ঝড়-ঝাপটা-বিপদ-আপদ-বিষাদকে মিলে মিশে ভাগ করে নেওয়ার শিক্ষার চল ছিল, মৌমিতা কুণ্ডুও সেই ধারাকেই বয়ে নিয়ে চলতে চান। তাঁর মতে, নতুন প্রজন্মের ছেলেমেয়েদের কাছে নিজের শিকড় ও শিকড়ের মাধুর্য ও প্রয়োজনীয়তাকে তুলে ধরার সময় এসেছে। এ কাজে অ্যাসোসিয়েশনের অবদান অনস্বীকার্য। মৌমিতা নিজে পশ্চিমবঙ্গের বাইরে জয়পুরে বড় হয়েছেন। তাই বিয়ের পর স্বামীর উৎসাহে ও সংস্পর্শে বাঙালি সাহিত্য, গান, রবীন্দ্রচর্চাকে সঙ্গী করেছেন। ছেলেকে গানে, বাংলা ভাষায় প্রশিক্ষণ দিয়েছেন। ছেলে এখন কলেজ পড়ুয়া, কিন্তু সে কলকাতায় গেলে ঠাকুমার আদর, বাংলার পুজো বা বিভিন্ন উৎসবের তাৎপর্য বুঝতে শিখেছে। শিকড়ের টান যেন আরও নিবিড়। এ যেন চলমান স্রোত না শেষ হওয়া এক পথচলা। সংস্কৃতির গভীরতাকে ধরে রাখতে, তাই এই সংস্থা প্রতি বছর নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান 'আনন্দসন্ধ্যা'র আয়োজন করে থাকে। এই অনুষ্ঠানে, এখানে নতুন প্রজন্মের প্রতিভাকে তুলে ধরা হয়। রবীন্দ্র গীতিনাট্য, ছোটোদের নাটক (সুকুমার রায়), লোকগীতি ও লোকনৃত্য পরিবেশনা অন্য মাত্রা পায়। ছোটোদের উৎসাহ দিতে বড়োদের প্রচেষ্টাই যেন বেশি। অত্যন্ত দক্ষতা ও পরিশীলিত ভঙ্গিতে ফুটিয়ে তোলা হয় কখনো 'অবাক জলপান' নাটকের দৃশ্য, লোকনৃত্যের পরিবেশনা ও রবীন্দ্র-নজরুলের নানা সৃষ্টিকে। বাঙালি হিসেবে বিদেশের মাটিতে এ যে কত বড় পাওনা তা ভাষায় বলে বোঝানো কঠিন। শুভ কুণ্ডু নিজে একজন সাংস্কৃতিক কর্মী। নাটক ও কবিতাপাঠের আসরে যোগ দেন। নিয়মিত ঘরোয়া সাংস্কৃতিক পরিবেশকে আরও উন্নত করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। কলকাতায় ছেলেবেলার পুজোর স্মৃতির সঙ্গে বর্তমানের পুজোর কোনো মিল

পান না। কোথাও যেন সুর কেটে গেছে। তিনি নিজে রবীন্দ্রসঙ্গীত ভালোবাসেন, ছেলেকেও অ্যাসোসিয়েশনের সমস্ত অনুষ্ঠানে নিয়ে যেতেন ছেলেবেলায়। বলা যেতে পারে, ছেলের মাতৃভাষার প্রতি আগ্রহ তৈরি করার পেছনে বি.এ.পি-র অবদান অনস্বীকার্য। ছেলে এখন কলেজপড়ুয়া। উনি একজন গর্বিত বাবা। প্রবাসে কোনো আক্ষেপ নেই।

শেকড়ের কথা বলতে গিয়ে যেন আরও আবেগজড়িত নিদ্রিতা মিত্র সিনহা। স্বামী ও দুই ছেলে নিয়ে বহু বছর পিট্‌স্‌বার্গের বাসিন্দা। শুধু বাংলা নয়, সিন্‌হা পরিবার ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের ধারাকেও বজায় রেখেছেন। নিয়মিত শাস্ত্রীয় সঙ্গীতচর্চা সিনহা পরিবারের প্রাণের সম্পদ। শ্রীমতী সিনহা নিজে ভারতীয় মার্গসঙ্গীত পরিবেশনার পাশাপাশি নতুন প্রজন্মের প্রতিনিধি তাঁর সন্তান ঋভুকে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের নিয়মিত তালিম দিয়েছেন। ঋভু এখন কলেজপড়ুয়া। অতি দক্ষতার সঙ্গে ঋভু উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত পরিবেশনায় ইতিমধ্যেই নিজের শিল্পীসত্তার পরিচয় রেখেছে ও নিজের জায়গা তৈরি করেছে। তার বাবা আশিস সিন্‌হা অত্যন্ত গুণী শিল্পী ও তবলায় বোল তুলে দর্শকের মনোরঞ্জন ও প্রশংসা কুড়িয়েছেন।

সিন্‌হা দম্পতির সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, ১৯৯০ সালে কর্মসূত্রে মার্কিন মুলুকে পা রাখা। ১৯৯১ থেকে ২০১২ এই পিট্‌সবার্গে তাঁদেরই উদ্যোগে প্রখ্যাত রবীন্দ্রসঙ্গীতশিল্পী বনানী ঘোষ নিয়মিত রবীন্দ্রসঙ্গীত চর্চাকে বাঁচিয়ে রেখেছেন। মাসে একবার উনি এখানকার সঙ্গীতপ্রেমী মানুষদের রবীন্দ্রসঙ্গীতের শিক্ষা দিয়েছেন, বাংলার চলমান সংস্কৃতিকে কাণ্ডারী হিসেবে বয়ে নিয়ে চলেছেন। তৈরি হয়েছে নতুন প্রজন্মের বহু শিল্পী। রবীন্দ্রসঙ্গীত শিক্ষার পাশাপাশি শ্রীমতী নিদ্রিতা সিন্‌হার অনুপ্রেরণা পণ্ডিত যশরাজ ইনস্টিটিউটের সদস্য ও গুণী শিল্পী পণ্ডিতা তৃপ্তি মুখার্জি। ১৯৯৫ থেকে ধারাবাহিকভাবে এই মার্গ ও উচ্চাঙ্গসঙ্গীত চর্চার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে আছে সিন্‌হা পরিবার। শ্রীমতী নিদ্রিতা সংস্কৃতির অভাবকে কোনোদিন অনুভব করেননি কারণ সাংস্কৃতিক পরিবেশকে ধরে রেখেছেন, সাংস্কৃতিক পরিবেশের মধ্যে নতুন প্রজন্মকে বড়ো করেছেন। তাঁর দুই পুত্রই তবলা ও উচ্চাঙ্গসঙ্গীতে তালিম নিয়েছে।

পিট্‌স্‌বার্গের বৃহৎ বাঙালি পরিবারে আর এক সদস্য হলেন শালিনী মিত্র। দীর্ঘ দিন ধরে গবেষণার কাজে নিজেকে যুক্ত রেখেছেন। স্বামী আর ছোট্ট আরিতকে নিয়ে সুখের সংসার। গবেষণার পাশাপাশি শিল্পকলাকে বাঁচিয়ে রেখেছেন রঙ-তুলি-ক্যানভাসে। তাঁর তুলির টান পড়ে তেলরঙে। নিজের শিল্পীসত্তাকে তুলির টানে বার বার জীবন্ত করে তোলেন ক্যানভাসে। সেখানে কখনো ধরা পড়ে বৃষ্টির রঙিন গভীরতা, মুগ্ধ করে নারী-সন্তানের যুগল তৈলচিত্র, কখনো ধরা পড়ে নারীর শক্তি, প্রতিবাদ, একাকীত্ব বা যন্ত্রণার কথা। কোথাও আবার রাধাকৃষ্ণের অসমাপ্ত প্রেমের কাহিনি।

দুবার সরস্বতী এবং দুর্গাপুজোতে মণ্ডপ সজ্জার ভার পড়েছিল শ্রীমতী মিত্রের ওপর। নিজের সৃষ্টিশীলতার অসামান্য নজির রেখেছিলেন এই বাঙালি মহিলা। বিদেশে থেকেও ছেলের নাম রাখার ক্ষেত্রে কিন্তু পুরোনো ঐতিহ্য বজায় রেখেছেন শালিনী। সাত বছরের 'আরিত'-এর নাম এসেছে সংস্কৃত শব্দ থেকে, যার অর্থ 'যে মানুষ এক দিকনির্দেশ মেনে চলে'। কলকাতায় বিড়লা অ্যাকাডেমিতে শিল্পের হাতেখড়ি হয়েছিল কিন্তু পড়াশোনার চাপে তা বেশিদূর এগোয়নি। কিন্তু সৃষ্টিশীল মানুষ কখনো থেমে থাকে না, আবহমান কলার নতুন নতুন প্রকাশ বিন্যাস শালিনীর তেলরঙের মিশ্রণকে প্রতিনিয়ত জীবন্ত করে তোলে তার ক্যানভাসে। কখনো 'পার্ণবী' নারীর তুলিতে অর্ধেক আকাশ, কখনো ফেনিংস পাখির ডানায় খুঁজে পাওয়া মুক্তি ও প্রতিবাদের ভাষা ফুটে ওঠে তাঁর শিল্পকলায়। নারীকে অসহায় নির্যাতিতা দেখতে রাজি নন এই শিল্পী। তাই মা দুর্গার রূপ 'শক্তি' সবচেয়ে বেশি প্রাধান্য পায় তাঁর কাছে। শিল্পের ব্যাপারে নতুন প্রজন্মকে নিয়ে খুব বেশি আশাবাদী নন তিনি। তাঁর মতে নতুন প্রজন্ম এত দ্রুত গতিতে এগোচ্ছে, সেখানে নিজের শেকড়কে বাঁচানোর তাগিদ বা আগ্রহ কতটা থাকবে, তা তিনি এখনই বলতে পারছেন না। তবে কলকাতার বাঙালিসমাজকে নিয়ে খুব বেশি উচ্ছাস দেখালেন না তিনি। শ্রীমতী মিত্রের মতে, সৃষ্টি ও কৃষ্টির ধারাবাহিকতা কোথাও যেন বেশ নড়বড়ে। বাংলা, হিন্দি ও ইংরেজি ভাষায় মিশ্রণে যে বিকৃত ভাষার প্রচলন চলছে, তার তিনি ঘোরতর বিরোধী। তাই প্রবাসে সময় পেলেই রবীন্দ্রসঙ্গীত চর্চা, কবিতা বা সাহিত্যে নিজের অস্তিত্বকে খুঁজে ফেরেন, সযত্নে ধরে রাখতে চান। নিজের সংস্কৃতির যে কোনো বিকল্প হয় না তা স্বীকার করলেন।

বেঙ্গলি অ্যাসোসিয়েশনের আর এক গুরুত্বপূর্ণ সদস্য শ্রীমতী নন্দিনী মণ্ডল। নৃত্যশিল্পী। সৃষ্টির সাথেই ওঁর যোগাযোগ। 'নান্দনিক' তাঁর নাচের সংস্থা। সেখানে বহু নতুন প্রজন্মের ছেলেমেয়ে তাদের সংস্কৃতিকে নতুন করে চিনতে শেখে নন্দিনীর সৃষ্টির হাত ধরে। ছোটো থেকে নাচে আগ্রহী ছিলেন তিনি। বহু গুণীজনের কাছে নাচে তালিম নিয়েছেন। বিবাহসূত্রে প্রবাসে আসা। স্বামীর উৎসাহে নাচকে নিয়েই এগিয়ে চলা। দুই সন্তান—রুসা আর রাকা। দুজনকেই সমস্ত নাচে তালিম দিয়েছেন। বেঙ্গলি অ্যাসোসিয়েশনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কর্মশালায়, অনুষ্ঠানে নন্দিনী মণ্ডলের একাগ্র পরিবেশনা মানুষকে আনন্দ দেয়। শ্রীমতী মণ্ডলের কাছে নৃত্য একটি কলার মাধ্যম, তার কোনো সীমারেখা তিনি টানতে চান না। তাই তাঁর সৃষ্টিতে রবীন্দ্র-নজরুল- লোকনৃত্যের পাশাপাশি উঠে আসে সলিল চৌধুরীর গানে 'ধান কাটা'র গল্প। কেরলীয়, মারাঠি, গুজরাতি, মাড়োয়ারি ও বাংলাদেশি ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে তাঁর পরিবেশনা অনবদ্য। জীবনকে তিনি খুঁজে পান তাঁর সৃষ্টিতে। নতুন ভাবনাচিন্তা তাঁর সৃষ্টিশীলতাকে এক অন্য মাত্রা দিয়েছে। শুধু বাঙালিরা নয়, আমেরিকার অধিবাসীরাও নন্দিনীর সৃষ্টিকে বার বার স্বাগত জানিয়েছে। বিদেশিদের অকুণ্ঠ সমর্থন ও বাঙালি এই বিরাট পরিবারের সদস্যদের সহযোগিতা 'নান্দনিক'-এর শিল্পকর্মকে এক অন্য মাত্রা দিয়েছে। নতুন নতুন সৃষ্টির মধ্যে এক অভিনবত্ব লুকিয়ে থাকে। দেশের কথা প্রসঙ্গে বললেন, আন্তরিকতার অভাব সব জায়গায়। ভালো গান, সিনেমা, নাটক হলেও সংস্কৃতির মূল শেকড় যেন একটু নড়বড়ে। তাই প্রবাসে তার লড়াই আরও কঠিন।

লেখার শেষে এসে বার বার মনে হচ্ছে রবীন্দ্রনাথের 'রাখীবন্ধন' উৎসব হয়ে উঠুক আপামর বাঙালির আন্তরিকতা ও বন্ধনের উৎসব, সব ভেদাভেদ ভুলে। আমরা প্রবাসীরাও যেন বাঙালি সংস্কৃতির ধারাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারি সব দীনতা ও মলিনতা মুছে।

শারদ শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন

উত্তর শ্রীরামপুর এস.সি.এস. লি.

পোঃ শ্রীরামপুর, পূর্ব বর্ধমান
পূর্বস্থলী ১নং ব্লক

বুদ্ধদেব দাস
সেক্রেটারি

Sl. No. 5

শারদ শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন

জনৈক হিতৈষী

Sl. No. 14

বেকারির বিরুদ্ধে সংগ্রাম : সংগ্রামের পথেই মিলবে মুক্তি

চন্দন সোম

১৪ আগস্ট ২০১৮, বিকেলে ফিরছিলাম শক্তিগড় থেকে বর্ধমান আপ হাওড়া বর্ধমান লোকালে। ট্রেনের কামড়ার সামনের দিক থেকে এক সমবয়সী যুবক আমার দিকে এগিয়ে এলো জাতীয়-পতাকা হাতে। ট্রেনে জাতীয় পতাকা বিক্রি করছিল ছেলেটি। ট্রেনে তো অনেকেই ফেরি করে? কিন্তু এ তো আর চার-পাঁচটা ফেরিওয়ালার মতো নয়? প্রশ্ন জাগছিল আমার মনে। ছেলেটিকে জিজ্ঞেস করলাম, তোমার নাম কী? উত্তর এলো, হীরক ব্যানার্জি। ছেলেটি বিজ্ঞান বিভাগের স্নাতকোত্তর। ফার্স্ট ক্লাস পাওয়া ছাত্র। চাকুরি না পাওয়ায় অভাবি সংসার হওয়ায় পেটের টানে ট্রেনে হকারি করছে। হকারি করছে দেশের জাতীয় পতাকা। পরের দিন ১৫ আগস্ট। দেশের স্বাধীনতা দিবস। ৭১ তম স্বাধীনতা দিবস। আর এই স্বাধীনতার ৭১ বছরেও দেশের একজন উচ্চশিক্ষিত ফার্স্ট ক্লাস পাওয়া ছাত্রকে বেকারত্বের যন্ত্রণায় ট্রেনে জাতীয় পতাকা বেচতে হচ্ছে!

কত স্বপ্ন নিয়ে দেশটা স্বাধীন হয়েছিল! ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী জাতীয় মুক্তির সংগ্রামে 'জীবন-মৃত্যু পায়ের ভৃত্য' করে নতুন একটা দেশ গড়ার লক্ষ্যে একটা নতুন সমাজ গড়ার লক্ষ্যে এগিয়ে এসেছে হাজারে হাজারে যুবক-যুবতী। সংগ্রামের ময়দানে কত প্রাণ বলিদান দিয়েছে। স্বপ্ন ছিল দেশে বেকার সমস্যার দ্রুত সমাধান হবে। ছাত্রদের জন্য শিক্ষার সুব্যবস্থা করা হবে। নিরক্ষরতার মতো ব্যাধি দেশে থাকবে না। পেটের জ্বালায় কাউকে অনাহারে মরতে হবে না। শিক্ষা-স্বাস্থ্য-কর্মসংস্থানের সোনালী স্বপ্নের দেশ হবে আমার ভারতবর্ষ। এই স্বপ্নের স্বাধীনতা ছিল প্রত্যাশিত। কিন্তু প্রত্যাশা পূরণ হল না। স্বাধীনতার অল্প কিছু দিন পর থেকেই দেশের সরকার উল্টো পথে চলতে শুরু করলো। আসলে কংগ্রেস দলের শ্রেণিচরিত্র এবং রাজনৈতিক ভাবে সমাজের উচ্চ অংশের প্রতিনিধিত্ব করায়—দেশের সাধারণ জনগণ যে অর্থে স্বাধীনতাকে বুঝতে চেয়েছিল সেই দৃষ্টিভঙ্গির সাথে সমাজের ধনী শ্রেণির প্রতিনিধিত্বকারী দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য থেকেই যায়। কিন্তু প্রাক্-স্বাধীনতা যুগে সাধারণ শত্রু হিসেবে সাম্রাজ্যবাদ থাকায় এই প্রশ্নগুলি বা পার্থক্যগুলি ততটা স্পষ্ট ছিল না। তাই স্বাধীনতা যত এগিয়ে এলো এই পার্থক্য ততই স্পষ্ট হতে থাকলো। একটা সময় তো প্রশ্নটা এরকমই হয়ে দাঁড়ালো—স্বাধীনতার ফল কে ভোগ করবে? ভারতবর্ষের শ্রমজীবীরা, না কি মুষ্টিমেয় ধনিক সম্প্রদায়? কিন্তু কংগ্রেস দল দেশের স্বাধীনতার ফসল ধনিক সম্প্রদায়ের স্বার্থেই সুরক্ষা করে। বেড়ে চলে ভারতবর্ষের আজন্ম সমস্যা বেকারত্ব। ক্ষুধা-দারিদ্র্য। দেশের স্বাধীন সরকার স্বাধীনতার শুরু থেকেই দেশকে নিয়ে যেতে শুরু করলেন ধনতন্ত্রের পথে।

২০১৪ সালে দেশের সরকারে পরিবর্তন ঘটে। সবকা সাথ-সবকা বিকাশের পোস্টার-বয় নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে দেশে সরকার তৈরি হয়। তিনি ঘোষণা করেন নিজেকে জনগণের চৌকিদার বলে। কিন্তু বাস্তব এটাই মোদি সরকার আরো বেপরোয়াভাবে, আরো হিংস্রভাবে নয়া উদারনীতির তাবেদারি করছে। এই সময়ে দেশে বেকারির হার আগের সমস্ত রেকর্ড ছাড়িয়ে গেছে।

একানব্বই সালে সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে যাওয়ায় গোটা পৃথিবীর শক্তির ভারসাম্যের পরিবর্তন ঘটে। ফ্রান্সিস ফুকুয়ামার ইতিহাসের অবসানের তত্ত্ব বিশ্ব পুঁজিবাদের নতুন যুগের সূচনা করে। পৃথিবীজুড়ে একচ্ছত্র পুঁজিবাদের বাধাহীন ভাবে এগিয়ে চলা শুরু হল। আমাদের দেশের সরকার ১৯৯১ সালে নয়া উদার অর্থনীতির নীতি গ্রহণ করে। পুঁজিপতি-স্বার্থবাহী এই নীতির ফলে দেশে ধনী-দরিদ্রের ব্যবধান বাড়তে শুরু করে। বৃহৎ বহুজাতিক সংস্থার স্বার্থ সুরক্ষা করতে গিয়ে বন্ধ হয় দেশীয় সংস্থা। বাড়তে থাকে ছাঁটাই। ক্রমবর্ধমান হারে বেড়ে চলে বেকারত্ব। স্বাধীনতার পর বেশির ভাগ সময় দেশের সরকার চালিয়েছে কংগ্রেস। উদারবাদী নীতির ফলে ২০০৮-র বিশ্ব পুঁজিবাদী সংকটের প্রভাব পড়ে এ দেশের অর্থনীতিতেও। অর্থনীতির সংকটের হাত থেকে রেহাই-এর পথ হিসাবে গরিবের ঘারে করের মাত্রাতিরিক্ত বোঝা চাপে। বাড়তে থাকে ছাঁটাই, সংকুচিত হয় কর্মসংস্থান। ধনী-দরিদ্রের বৈষম্য বাড়ে। নয়া উদারনীতির এই ২৫ বছরে দেশের বেকারি বেড়েছে সর্বোচ্চ হারে।

২০১৪ সালে দেশের সরকারে পরিবর্তন ঘটে। সবকা সাথ-সবকা বিকাশের পোস্টার-বয় নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে দেশে সরকার তৈরি হয়। তিনি ঘোষণা করেন নিজেকে জনগণের চৌকিদার বলে। কিন্তু বাস্তব এটাই মোদি সরকার আরো বেপরোয়াভাবে, আরো হিংস্রভাবে নয়া উদারনীতির তাবেদারি করছে। এই সময়ে দেশে বেকারির হার আগের সমস্ত রেকর্ড

ছাড়িয়ে গেছে। আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা রিপোর্ট দিচ্ছে, দেশে বেকারত্বের হার, যা ২০১৭ সালে ১ কোটি ৭৭ লক্ষ ছিল তা ২০১৮-তে ১ কোটি ৮০ লক্ষে পৌঁছাবে। দেশের গ্রামাঞ্চলে বেকারত্বের হার ৫.১ শতাংশ এবং শহরাঞ্চলে ৪.৯ শতাংশ। দেশের পুরুষ বেকার ৪.৩ শতাংশ, মহিলা বেকার ৮.৭ শতাংশ। কথা ছিল দেশে বছরে ২ কোটি বেকারের কর্মসংস্থান হবে। কিন্তু নির্মম সত্য এটাই, কেন্দ্রীয় সরকার নতুন করে কর্মসংস্থানের কোনো সুযোগ তো করেনই নি বরং কেন্দ্রীয় সরকারি দপ্তরগুলিতে ১৩ লক্ষ ৭৮ হাজার শূন্য পদের অবলুপ্তি হয়েছে। একা রেল দপ্তরেই ৩ লক্ষ শূন্য পদের অবলুপ্তি ঘটানো হয়েছে। আসলে 'মেক ইন ইন্ডিয়া'-র সোনালী প্রচারের পিছনে বাড়ছে কাজ হারানোর মিছিলের সংখ্যা। পিছিয়ে নেই বাংলাও। শ্রীমতী ব্যানার্জির রাজ্যে ১০০-র বেশি বৃহৎ শিল্প বন্ধ হয়েছে। কাজ হারিয়েছেন ১ লক্ষ ৪০ হাজার মানুষ। ছোটো আর মাঝারি শিল্প মিলিয়ে বন্ধ হওয়া সংখ্যাটা প্রায় ৪৫ হাজার। রাজ্যে নতুন শিল্পে কোনো বিনিয়োগ নেই। শিক্ষক নিয়োগের নামে চলছে দুর্নীতি। অপরাধ-প্রবণতা রাজ্যে বাড়ছে। বাড়ছে বেকারত্বের জ্বালায় অসামাজিক কাজের প্রবণতা।

এখন প্রশ্ন হল, তাহলে এখানেই কি দাঁড়িয়ে থাকব আমরা? উত্তরটা সবার জানা—অবশ্যই না। আমরা দাঁড়িয়ে থাকব না। স্বাধীনতার পর থেকে অনেক স্বপ্নভঙ্গের যন্ত্রণায় বিদ্ধ হয়েছে দেশের যুবসমাজ। দেশের শাসক শ্রেণির তৈরি যুবজীবনের প্রতিদিনের জ্বলন্ত সমস্যাগুলির বিরুদ্ধে যুবজীবনের সমস্যা সমাধানের জন্য স্বাধীনতা-উত্তর ভারতে সুগঠিত হয়েছে যুব আন্দোলন। যে সমাজবদলের স্বপ্নের মোহ জাগিয়ে দেশের যুব অংশকে ব্যবহার করে দেশের স্বাধীনতার ফসল তুলেছিল দেশের শাসক শ্রেণি নিজের সিন্দুকে সেই স্বপ্ন সেই সমাজবদলের স্বপ্নকে বাস্তবায়নের তাগিদ থেকেই আর তার সাথে সাথে যুবজীবনের জ্বলন্ত সমস্যাগুলি সমাধানের দাবিকে সামনে রেখে প্রথমে ১৯৬৮ সালে এ রাজ্যে, এবং পরে ১৯৮০ সালে সারা দেশে যুব ফেডারেশন লড়াই করছে। জন্মলগ্ন থেকে লড়াই করছে সকলের জন্য কাজের দাবিকে সামনে রেখে। এত বড় শ্লোগান এ দেশের বুকে আর কোনো যুব সংগঠন তোলে না। এই যে সবার কাজ চাই—যে ছেলে অস্ত্র হাতে রামনবমীর মিছিলে হাঁটে তারও কাজ, আর যে ছেলে তৃণমূলের ঝাণ্ডা ধরে কাজের দাবির মিছিলে বোমা ছোঁড়ে, তারও কাজ চাই। আসলে বেকারত্বের যন্ত্রণাকে তো আর রাজনীতির রঙে ভাগ করা যায় না। তা হবেও না। যুব ফেডারেশন সেই জন্যই একথা বলার বুকের পাটা রাখে, সব বেকারের কাজ চাই। চাইলেই তো আর সব পাওয়া যায় না। অধিকার লড়ে নিতে হয়। পৃথিবীর কোনো দেশের কোনো শাসক শ্রেণি বিনা লড়াই-এ কোনো অধিকারে স্বীকৃতি দিয়েছে এ উদাহরণ নেই। তাই কাজের অধিকারকে সংবিধানের মৌলিক অধিকারের স্বীকৃতির লড়াই ছাড়া কখনোই সব বেকারের কাজ সম্ভব নয় তা যুব ফেডারেশনের সংগঠকেরা জানে। তাই সকলের জন্য কাজের দাবি পূরণ সম্ভব একমাত্র এই ব্যবস্থার পরিবর্তনের মাধ্যমেই। ব্যবস্থার পরিবর্তনের অতন্দ্র প্রহরী যুব ফেডারেশনের কর্মীরা জানে কঠিন কিন্তু বাস্তব সেই লড়াই-এর পথেই মিলবে বেকার সমস্যা থেকে মুক্তি।

With Best Compliments from

FRIENDS CONSTRUCTION

DURGAPUR, PASCHIM BARDHAMAN

Sl. No. 103

বড় দুঃখ হয়

সুশীল পাঁজা

আমি আর প্রতিবাদী কবিতার, সেইসব সুন্দর দিনের
ধূসর স্মৃতির টুকরো জলছবি এখনও মলিন-বিষণ্ণ জনগণ নিয়ে আসে
যেখানে চারিদিকে ফুটে আছে নীল-সাদা বনফুল, আর
গাছ-পালার বাগানে বসে পড়ে, কিশোরী-কিশোর
যেদিকে একদা গিয়েছি, জঙ্গলে-পাহাড়ে সতেজ শরীরে...

সেই ঘ্রাণ কেঁপে ওঠে, প্রৌঢ় বয়সে ধরে রাখে
সে-সব মুখ টানে, যথাযথ দীর্ঘতর হয় আরেক অন্তরে
তাঁদের অবিরল স্বরধ্বনি আজও ভাঙে, অ-আ-ক-খ পাঠে
সে-সময়ে আমিও গোপনে শিক্ষক, উৎফুল্ল পাঠশালায়...
বড় দুঃখ হয়, গর্বিত লক্‌আউট সঙ্গী, সে তো আর নেই!

ভিতরে ভিতরে নেভে-জাগে গোধূলী বেলায়
পাখিরা ওদিকে মনখারাপে উড়ে যায়!
সে-সব বুকের গভীরে ইদানীং দলিত করে
আস্তে আস্তে কালো মেঘ ঢাকে, চোখের জলের সূর্য...

যেন কিছু অচেনা পঙ্‌ক্তি, প্রিয় পাখি হয়ে ওড়ে বৃত্তাকারে
আমার দুঃখ-শোকের, প্রকৃত শব্দ-বর্ণ-অক্ষরে...

আমার জন্য

মিনতি গোস্বামী

আমার জন্য কখনও বিষাদের কবিতা লিখো না
চেয়ার ফাঁকা হলে আবার চেয়ার ভরে যায়
ঘর তো শূন্য থাকে না!

বহতা নদীর থেকে নিজেকে আমি
আলাদা করে ভাবি না কখনো

স্মৃতি বরাবরই ছোঁয়াচে
আমি চাইনা আমার জন্য তুমি সংক্রামিত হও।

পারলে শ্রাবণের অবিরাম বর্ষণে
জল থৈ থৈ মাঠে যে রাগিনী বাজে
যে কদম ছড়িয়ে দেয় মিলনের আভাস
তার পাশে থেকে মনকে পূর্ণ কোরো।

আমার জন্য কখনো চোখের জল ফেলো না।

একদিন কবিতার সূর্য উঠবে

দ্বারকানাথ দাস

একদিন কবিতার সূর্য উঠবে,
রক্তপলাশের রাঙা কৃষ্ণচূড়ায়।
লাল টকটকে আবির মাখা রাঙাবেলী।
তোমার আবর মুখে বয়ে।
একদিন ভোরের পাখিদের গুঞ্জনে
ভাঙবে চেতনার ঘুম।
নীল আকাশের ডানামেলা পাখনার রঙে
পরশ পড়বে আলতো ছোঁয়া।
তোমার কপালে দিগন্তে সিঁদুরের টিপ।
হাতে রক্তপলাশের শাঁখায় টেরাকোটা,
সন্ধ্যাপ্রদীপের ঘোমটা টানা আলো ঢাকা মুখ।
মধুমাসে সীমান্ত ফাল্গুনের নিশীথ।
একদিন কবিতার ভোর আসবে।
সূর্য উঠবে রাঙাচেরি বনফুলে।
আঙিনা জোড়া দমকা বাতাসে।
রোদ্দুরে কৃষ্ণচূড়ার কলতানে,
কবিতার সূর্য উঠবে।

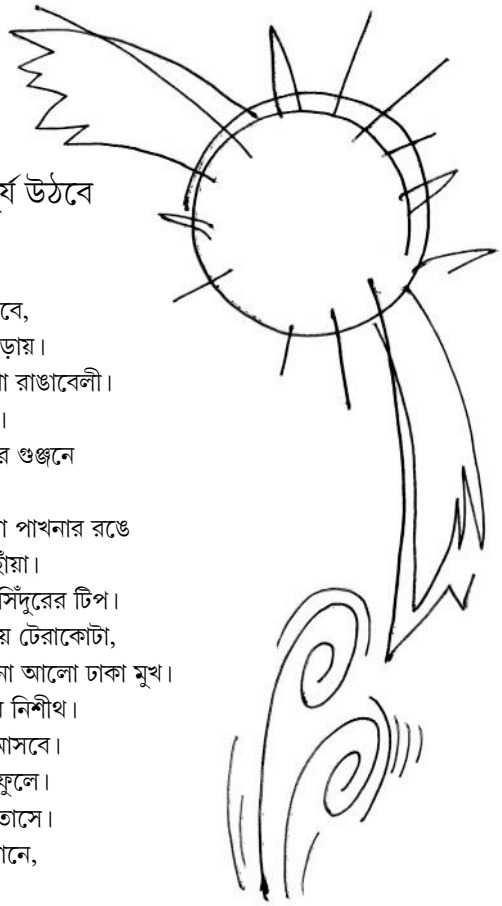

দেখ মাদারি কা খেল্

অভিজিৎ ঘোষ

সরকার বাহাদুর আপনাকে সেলাম
জব্বর একখান দিয়েছেন নাম
—গরিবি রেখা

মাঝখানে এক ফিনফিনে দড়ি
এদিকে-ওদিকে ভাসছে মানুষ
কেউ-বা দড়ির উপর দিয়ে
খুব সন্তর্পণে হেঁটে চলেছে...
একটু বেসামাল হলেই... ঝপাৎ

দড়ির এপার-ওপারে বসে
আমরা সবাই ব্যালেন্স ঠিক রাখার
ব্যায়াম করে চলেছি
করেই চলেছি...
জানি না কখন
হয়ে যাবে দিক বদল

বাজাও ডুগডুগি...

উফ্—সরকার বাহাদুর
আপনার বুদ্ধিকে সেলাম
সেলাম
সেলাম।

প্রতিবন্ধী

রণেশ ভট্টাচার্য

আমরা এগিয়ে চলেছি
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির হাত ধরে
আমাদের সময় নেই বৃদ্ধ মা-বাবার সাথে
চায়ের আসরে বসে দু-দণ্ড কথা বলার।

আমরা এখন ব্যস্ত সোস্যাল সাইটে
ঝড় তোলার মতো সেলফি, প্রতিবাদ
নিন্দা ও প্রশংসায়।
স্ট্যাটাস আপডেটেই শুভ উদ্বোধন
পোশাক-পরিচ্ছদ, ডিনার-লাঞ্চ এবং ইত্যাদির!

বেডরুমে টিপয়ের ওপরে স্মার্টফোনের ভূমিকা
সমষ্টিগত কিন্তু কমরেডেরিক নয়!
উত্তরাধুনিকতার ফ্যালোপিয়ান টিউবে
বেড়ে উঠছে
সমাজ বহির্ভূত সম্পর্ক
খেসারত দিচ্ছে
গোটা এক নিষ্পাপ জেনারেশন!

সবুজ ল্যান্ডস্কেপ, খোলা মাঠ, বুকভরা বিশুদ্ধ বাতাস
হয় স্থান নিয়েছে ইতিহাসের পাতায়
নতুবা আটকে গিয়েছে
ফেসবুক, হোয়াটস অ্যাপ, ইনস্টাগ্রাম, উই চ্যাটে।
আমরা আজ প্রতিবন্ধী...

যুদ্ধটা কোথায়

নরেশ মণ্ডল

হাতের অর্গল ভেঙে
পিঁপড়েরাও ডিম পাড়ে জানি।
তবুও হিসাব কষে এগোতে হয়
যুদ্ধটা কোথায়
সঠিক চিহ্নিতকরণ চাই।
নচেৎ ফিরে আসা
হিরোশিমা নাগাসাকির বীভৎস উল্লাসে
লক্ষ শিশুর মুখ ছুঁয়ে
বিকলাঙ্গ শরীর।
আজীবনের ক্ষয় নিয়ে
স্রোতহীন কোনো হ্রদের সম্মুখে
আহত মানুষ।

আসলে যুদ্ধটা কোথায়
সঠিক চিহ্নিতকরণ চাই।

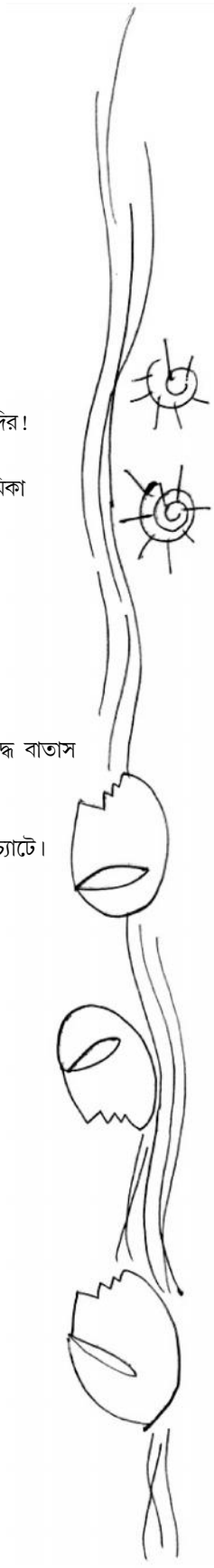

বদলে যাবার গান

প্রভাত ঘোষ

আপনি যেমন ছিলেন থাকুন
আমরা এখন বদলে যাবো,
অন্তবিহীন এই অসুখে
ভালোবাসা কোথায় পাবো!

ভালোবাসার বললে কথা
খয়েরি টিপ, কাচের চুড়ি
আধো ঘুমের স্বপ্ন কাড়ে
বর্ণচোরা অত্যাচারী।

ঢাকছে চোখ, মুখের আগল
রাজ্য জুড়ে হাত আনাড়ি—
এমন দিনের পৃথিবী নয়
খুব সনাতন শান্ত বাড়ি।

ভালোতো নয়, দ্বিধার বাঁধন—
যখন তখন যাচ্ছি যাবো—
এমন কি আর ইচ্ছে হলেই
অহল্যা গায় পা ছোঁয়াবো!

অর্বাচীনের শক্ত থাবায়
শয্যা নিলে দেয়াল লিপি
হাতের মুঠোয় হাত ছোঁয়ালে—
কথা বলার ভাবনাটা কী!

বীতস্পৃহ সুখের আশা
কবেই আমার ফুরিয়ে গেছে
গভীরতা বাড়াক না রাত—
আগামীকাল বাঁধাই আছে।

চোখের জলের বদলে আজ—
তপ্ত দুপুর মুঠোয় নেবো,
আপনি যেমন ছিলেন থাকুন—
আমরা এখন বদলে যাবো।

শিল্পজ

বিশ্বজিৎ মণ্ডল

একদিন ক্ষণজন্মা পাখিটাও তাচ্ছিল্য করেছিল অমরতা

এ-সময় উন্মাদ শিল্পীর পৃষ্ঠা ছিঁড়ে
উড়ে গেল—পরিযায়ী...
শূন্য পড়ে আছে, সুদৃশ্য ইজেল, মায়াময় তুলি...

কেবল বিধর্মী একটা আরশোলা
প্রতিদিন এঁকে যাচ্ছে, প্রত্ন টান

যেজন গেছে আপন পথে

গৌতম হাজরা

যে জন গেছে আপন পথে
আমরা জানি কয় জনা
কোন নদীতে স্নান করে সে
নাই বা হল জানাশোনা।

জানাশোনার শেষ কী আছে?
যা বলি তাই বুক জুড়ায়ে
কুড়িয়ে যে নিই বকুল গন্ধ
নয়ন যে তার যায় ফুরায়ে।

ফুরায় যদি, কী লাভ তাতে?
ছড়িয়ে আছে খোলামকুচি
ভিজিয়ে ফেলি সকল শান্তি
আকাশ জোড়া সকল সূচি।

দুঃখ আছে? থাকেই যদি
একটু একটু বদলে ফেলুন,
দেখবেন সব ঠিকই আছে
দোকানবাজার সরাই সেলুন।

সবই আছে একথা ঠিক
সবার মাঝে নেই যে আলো,
মিলিয়ে গেছে অন্ধকারে
সকল ভালো, সকল ভালো।

ভালোমন্দ মিলিয়ে নিয়ে
যাচ্ছি চলে যে যার মতে,
জোনাক জ্বলা অন্ধকারে
যে জন গেছে আপন পথে।

প্রতীক্ষা

মলয়কান্তি মণ্ডল

গোলাপের কুঁড়ি ঠিকই ফুটে উঠবে একদিন
সৌন্দর্য আর সৌরভে ভরিয়ে দেবে চারপাশ।
কোনো তাড়াহুড়ো নয়,
কুঁড়ি প্রস্ফুটিত হওয়ার সময় দাও।
ওর ফুটে ওঠার জন্য প্রভাতী আলো প্রয়োজন।

এসো, সবাই আঁধারকুণ্ডে হাতুড়ির ঘা মারি।

অন্ধকারের সুজন

সংঘমিত্রা চক্রবর্তী

কবির স্বভাব নিয়ে কিছু গুজগুজ, ফুসফুস
কিছু গল্প কথা থাকতেই পারে
ওরা ডিসিপ্লিন মানে না এটাও ঠিক
সবুজ একটু অক্সিজেন পেতে ওরা ফরিদপুরের
বাড়িঘর ভুলে ছুটে আসে দুরন্ত পাখায়
পাসপোর্ট, ভিসা নেই তবু অন্ধকারের সুজন যারা
সেইসব দালালের হাত ধরে, ভালোবাসার গভীর টানে
ঝাঁপ দেয় ইচ্ছামতীর বুকে
তারপর কাঁটাখোঁচায় রক্ত ঝরিয়ে,
পুলিশের তাড়া খেয়ে ছুটতে ছুটতে এক সময়
পৌঁছে যায় প্রিয় জীবনের বাড়ি।

কবির কাছে এসেছে আর এক দূরের কবি
খুব প্রতিশ্রুতিমান এই সময়ের কবি
সবাই বলছে ভীষণ ট্যালেন্ট
একদিন দেখো বুড়োগুলো সরে গেলে
ওর কত নাম হবে
তরুণ প্রজন্ম ঘুরবে তখন ওর পায়ে পায়ে
ঢাকায় কবির বাসা হবে, হতেও পারে গাড়ি
এখন যেমন ভাঙা সাইকেল
বিবর্ণ ছেঁড়াখোঁড়া ঝোলায় বয়ে নিয়ে বেড়ায়
অপমানের অসহ্য জ্বালা
কত রকমের সূক্ষ্ম রাজনীতি
বাড়িতেও ঠিক মতো খরচ দিতে পারে না
ছেলেমেয়ে নষ্ট হয়ে যায় মায়ের মুখ ঝামটা শুনে
কবি সব বোঝে কিন্তু কবিতার পোকা
তার মাথা কুরে কুরে খায়
সব ভুলে খাতা আর পেন নিয়ে বসে
পেটে ভাত নেই!

তবু স্বপ্ন আছে কবির ভাষায়
জেদ আছে, সঙ্গে আছে তার মতো আর এক ছন্নছাড়া কবি
সেও তার নিজের দুঃখ কষ্ট লেখে সহজ কথায়
ভাবে একঝাঁক খুশি নিয়ে তার প্রত্যাশাও একদিন
ছাপিয়ে যাবে আকাশ ছোঁয়া!

বিজয়মিছিল

কৃষ্ণপ্রসাদ মাজী

ভারতবর্ষের প্রান্তদেশ জুড়ে হেঁটে চলে মিছিল
গণতন্ত্রের বিজয়মিছিল।
পায়ে পা রেখে মেলাতে পারেনি যারা এ-মিছিলে
তারা গণতন্ত্রের কোন পথে হেঁটে যাবে
অসংখ্য প্রশ্নচিহ্নে পথ হারায়।

আদিম বন্যহিংস্রতায় উল্লাস জয়ধ্বনি
মূক ম্লান মুখে চেয়ে থাকে এ-ওর দিকে
চারিদিকে উন্নয়নের খণ্ডচিত্রে রক্ত বারুদের ঘ্রাণ
প্রতিবাদ মাথা ঠোকে, কারাগারে শিকল পায়
রাত্রির নিস্তব্ধতা ভেদ করে কান্না ভয় দীর্ঘশ্বাস
মিশে গাঢ় অন্ধকারে।

মুখ ও মুখোশ পরে, স্বার্থ-মোহে স্বপথে শব্দের মিছিল
প্রতিদিন বিক্রি হয়ে যায় গণতন্ত্রের বাজারে বোধ ও বুদ্ধি
রাত্রি গভীর হলে গণতন্ত্রের ইতিহাসে খুঁজি
বোবা হয়ে গণতন্ত্রের দিকে চেয়ে ক্রমশ ছোটো হয়ে যাই
প্রশ্ন রাখি একদিন গণতন্ত্রে সবাই কি অদৃশ্য হয়ে যাবে
না, একবার সোজা হয়ে সকলের পায়ে পায়ে
হেঁটে যাবে মিছিল।

নাসিক থেকে মুম্বাই

স্বরাজ ঘোষ

কৃষ্ণচূড়া পলাশ রঙে
মুষ্টিবদ্ধ লক্ষ হাত
'ভারত' এলো 'ইন্ডিয়া'তে
জানিয়ে গেল মন কি বাত।

নাসিক থেকে মুম্বই
রক্ত ঝরানো পথের শেষে
কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারী
সেই পথেই মিলল এসে।

ভিক্ষে চাইতে আসেনি ওরা
চায়নি দয়া জোড় হাতে
'ভারত' এলো 'ইন্ডিয়া'তে
রক্তঘামের হিসেব নিতে।

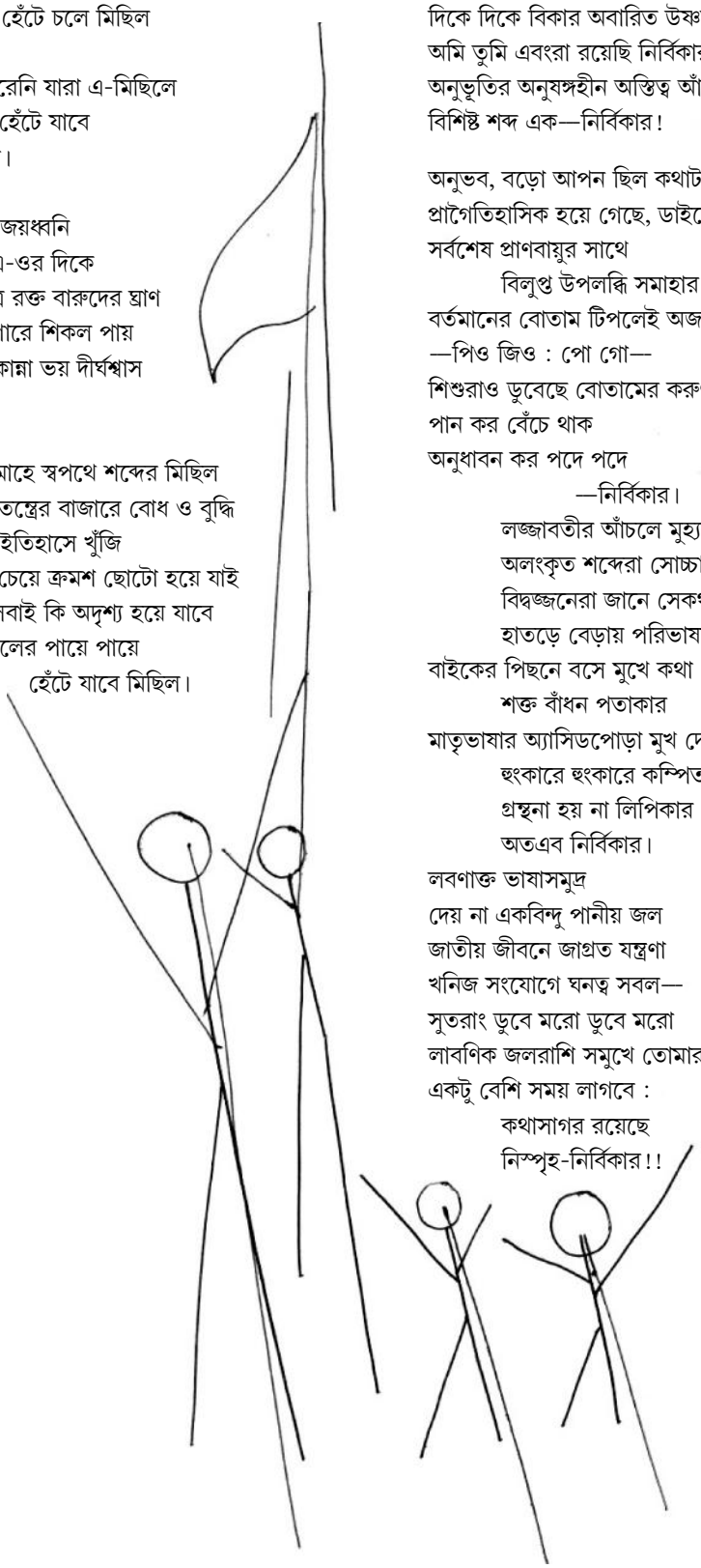

যন্ত্রণার কবিতা

নির্মল নিয়োগী

দিকে দিকে বিকার অবারিত উষ্ণতার
অমি তুমি এবংরা রয়েছি নির্বিকার—
অনুভূতির অনুষঙ্গহীন অস্তিত্ব আঁকড়ে থাকা
বিশিষ্ট শব্দ এক—নির্বিকার!

অনুভব, বড়ো আপন ছিল কথাটা—
প্রাগৈতিহাসিক হয়ে গেছে, ডাইনোসরের
সর্বশেষ প্রাণবায়ুর সাথে
বিলুপ্ত উপলব্ধি সমাহার
বর্তমানের বোতাম টিপলেই অজস্র করুণা
—পিও জিও : পো গো—
শিশুরাও ডুবেছে বোতামের করুণা রসে,
পান কর বেঁচে থাক
অনুধাবন কর পদে পদে
—নির্বিকার।
লজ্জাবতীর আঁচলে মুহ্যমান
অলংকৃত শব্দেরা সোচ্চার
বিদ্বজ্জনেরা জানে সেকথা
হাতড়ে বেড়ায় পরিভাষার...
বাইকের পিছনে বসে মুখে কথা নেই
শক্ত বাঁধন পতাকার
মাতৃভাষার অ্যাসিডপোড়া মুখ দেখা নিষেধ
হুংকারে হুংকারে কম্পিত ব্যাকরণ
গ্রন্থনা হয় না লিপিকার
অতএব নির্বিকার।
লবণাক্ত ভাষাসমুদ্র
দেয় না একবিন্দু পানীয় জল
জাতীয় জীবনে জাগ্রত যন্ত্রণা
খনিজ সংযোগে ঘনত্ব সবল—
সুতরাং ডুবে মরো ডুবে মরো
লাবণিক জলরাশি সমুখে তোমার,
একটু বেশি সময় লাগবে :
কথাসাগর রয়েছে
নিস্পৃহ-নির্বিকার!!

আমি বন্দুকের ব্যবহার শিখিনি, তাই লিখি...

রাজকুমার রায়চৌধুরী

আমি খুব রোগা লোক। ওজনের হিসেবের মধ্যে পড়ি না। ভারি কাজও করতে পারি না, একটু ভীতু প্রকৃতির। তাই একার সঙ্গে একা-একা আমার বেঁচে থাকা। বন্দুকের ব্যবহার শিখিনি। যদি শিখতাম তাহলে মূর্খ কলমকে নিয়ে এভাবে বোকা বোকা খেলায় মেতে উঠতাম না। কলমের চেয়েও বন্দুক শক্তিশালী, এমনই মনে হয় আজকাল। আমার বিপজ্জনক ভাঙাচোরা ঢেউগুচ্ছকে সামলাবার কোনো ক্ষমতা নেই।

তাই রাত্রির নিভৃতে উড়ি... মায়াবী পিয়ানোর মধ্যে খুঁজে পেতে চাই জীবনের উষ্ণতা। অন্ধকারের মধ্যে ডুবে মরব বলে স্তব্ধতার মধ্যে আমার চলাফেরা। এ সময় দু-ফোঁটা চোখের জল ঝামেলা করে খুব। ওই জলে লিখি, দু-একটি নিঃসঙ্গতার কথা। ওকে পদ্য বলা যেতে পারে, কিছুতেই কবিতা বলা যায় না। শুধু আঙুলের চাপে আমার লেখার মধ্যে লেগে থাকে ব্যথার কালো ছায়া। উদ্বিগ্ন কলম শুধু কাঁপে মধ্যরাত্রি জুড়ে...

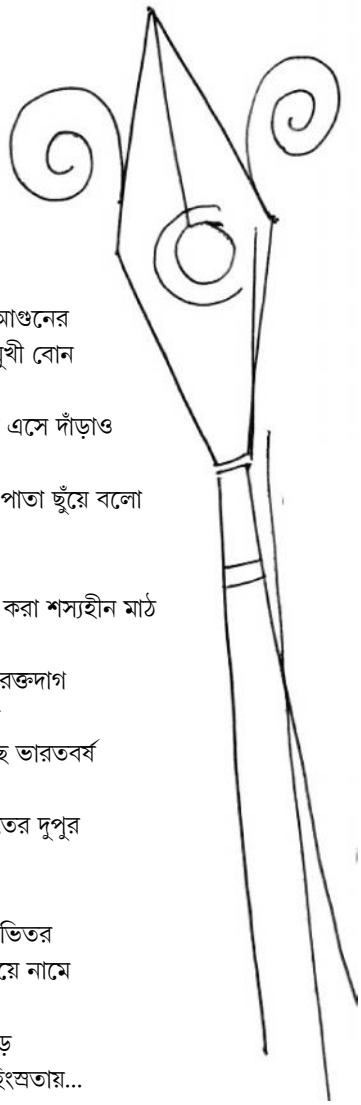

রক্তাক্ত স্বদেশ সময় গাথা

সৌম্য দত্ত

দক্ষিণের বাতাস থামো
তফাৎ যাও ফায়ার ব্রিগেড, এসো আগুনের
চারপাশে দাঁড়াও আমার ভাই, সূর্যমুখী বোন
আমার আশালতা মা—
ছেঁড়া ইতিহাসের পাতা থেকে উঠে এসে দাঁড়াও
হে পিতা—
বহ্নিশিখার মতো কৃষ্ণচূড়া চোখের পাতা ছুঁয়ে বলো
একদিন ফিরে আসবেই...

চারিদিকে এতো রক্তপাত, হাড়হিম করা শস্যহীন মাঠ
শ্যাওলা পড়া লোহার কঙ্কাল
ফুটপাতে ছেঁড়া স্তন, হায়নার নখে রক্তদাগ
চাপচাপ অন্ধকারে ঘরের দেওয়ালে
লাট খাছে ভারতবর্ষ

এভাবেই বেঁচে থাকি পাতাখসা শীতের দুপুর
বেঁচে থাকি বর্ষামঙ্গল রাত
শিউলী মাখা ভোরের শিশির...
বেজে ওঠে পাগলা ঘণ্টি, গরাদের ভিতর
থেমে যাওয়া সময় বেয়ে রক্ত গড়িয়ে নামে

রক্তের ভিতর ফুঁসে ওঠে খ্যাপা ষাঁড়
আদিম হিংস্রতায়...

যুগলবন্দী

সূর্য মণ্ডল

রাকেশ চৌরাশিয়া আর জাকির হোসেনের যুগলবন্দী
বাঁশি তবলা, তবলা বাঁশি
চড়াই উৎরাই, উৎরাই চড়াই
তন্ময় দর্শক ঘাড় নাড়ছে
হাততালি দিচ্ছে, কিয়া বাত বলছে
রাগ দরবারি কানাড়া

অনুষ্ঠান শেষ করে একে অপরকে জড়িয়ে ধরলেন
রাগ :
ভারতবর্ষ...

বোবা স্মৃতির টান

ত্রিদিবেশ চৌধুরী

সেই বেলাটি মনে পড়ে—ছেলেবেলার গান
আদুর গায়ে গরমকালে—আমের বোলের ঘ্রাণ
পাঁচিল-ভাঙা ডুমুর গাছের ফাঁক দিয়ে কেউ ডাকছে কাছে
আম-চুরি আর কালোজামের গাছে চড়ার টান
কুকুর ছিল, মালি ছিল, দারোয়ানের কান
সজাগ ছিল—ধরতে চুরি, তবু এমন টান—
প্যান্ট ছিঁড়েছে, গা ছড়েছে—কুকুর কামড় দাগ
তবুও এক ছেলেবেলা—কয়লা ট্রেনের কাল
মীনাদিদির গান শুনতাম—রবি ঠাকুরের গান
ঠাকুরতলায় সন্ধ্যাকালে—হরির লুটের টান
সেই বাতাসের গন্ধ এমন—মায়ের স্মৃতির টান
এখন কেমন সোয়াদ ছাড়া—জীবন টানে ছেলেবেলা
মেঘলা দিনে ময়ূর নাচে—বৃষ্টি ভেজার তান
সন্ধ্যা হলেই ঝিঁ ঝিঁ ডাকে—বোবা স্মৃতির টান।

আলো ভেবে আলেয়ার পেছনে...

প্রদীপ্ত সামন্ত

আলো ভেবে আলেয়ার পেছনে—
ছুটেছি আমরা, চোরা গলি ঘুলি পথে
গোপন সিঁড়িতে অন্ধকারে একাকী,
দপদপে জোনাকি বা মিটিমিটি তারা
চাঁদ জোছনায় বিমূর্ত প্রকৃতি
স্নিগ্ধতায় আলো চেনালেও
মেনে নিতে পারিনি—ছুটে গেছি
যেখানে জ্বলন্ত ফসফরাস
প্রতিনিয়ত জ্বলে শ্বাপদের চোখে...
আলো ভেবে আলেয়ার পেছনে...

‘বারিশকর’কে

সুকান্ত দে

যন্ত্রণায় দু-চোখের পাতা এক করতে পারিনি
সারা রাত
মনে রাখতে পারছি না কিছু
শুনতেও পাচ্ছি না ভালো

তবু তুই গলায় আহ্লাদ শুনলি! মেঘ!
যন্ত্রণায় বয়স কমে যায়!
খুলে যায়! জমানো কথার স্লুইস গেট!

গৃহবধূর জলে-পোড়া ডায়েরি নিয়ে
বিতণ্ডা হবে না জানি।
তিরিশটা বছর যত নাগকেশর ফুটেছে
মেয়ের আধো বোলে কানঝুমকো মাধবীলতা
কপালের ভাঁজে বালি জমা, মানুষটার হাসি
শুধু এইটুকু নিয়ে
পাড়ি দেবো অমরাবতী?

সংসার স্বার্থপর বললে
যোজনগন্ধা ডাকনামে কী হবে আমার?

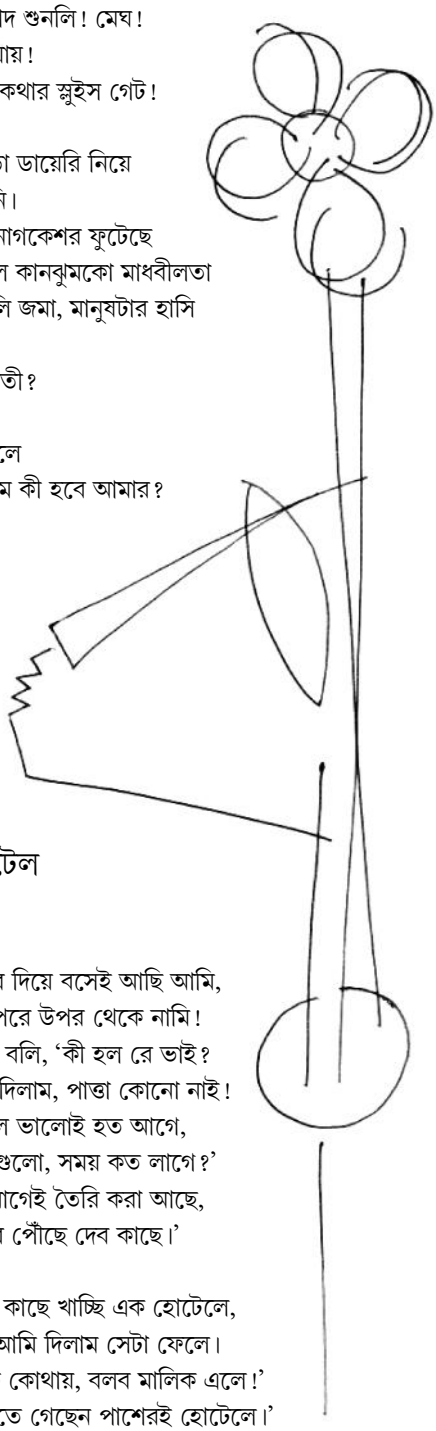

দুটি আদর্শ হোটেল

দেবব্রত দত্ত

এক হোটেলে অর্ডার দিয়ে বসেই আছি আমি,
ঘণ্টা দু-এক বসার পরে উপর থেকে নামি!
বয়কে ডেকে ধমকে বলি, ‘কী হল রে ভাই?
তখন থেকে অর্ডার দিলাম, পাত্তা কোনো নাই!
দেরি হবে বলে দিলে ভালোই হত আগে,
তৈরি করতে খাবারগুলো, সময় কত লাগে?’
বয় বলল, ‘দু’দিন আগেই তৈরি করা আছে,
এখন শুধু গরম করে পৌঁছে দেব কাছে।’

মানিকতলা মোড়ের কাছে খাচ্ছি এক হোটেলে,
মাছটা পচা দেখেই আমি দিলাম সেটা ফেলে।
বয়কে বলি, ‘মালিক কোথায়, বলব মালিক এলে!’
‘তিনি তো স্যার খেতে গেছেন পাশেরই হোটেলে।’

কল্পকথা

বিকাশ পণ্ডিত

অনুর দিদা, সনুর পিসি, তরুণ ছোটো মাসি
কলতলাতে ঠিক বিকালে জল আনতে এসে
গল্প করে, তর্ক করে, কখনও ওড়ায় হাসি।

তুমি বলবে, ভুল বলছি, এসব নাকি গল্প
দেখতে যদি খগেন খুড়োয় দুপুর বেলা খেতে
দিস্তে দুয়েক লুচির সাথে বালতি ডালও অল্প।

তুমি ভাববে, বলছি মিছে, মনগড়া সব কথা
সাগরদিঘির দখিন পাড়ে ভুবন দাদুর বাড়ি
ভূতরা নামে টপ্পা গেয়ে পায়ে বেঁধে কাঁথা।

জানি তুমি দুলিয়ে মাথা বলবে এসব থাক
কোজাগরীর জোছনা মেখে হাসবে যখন রাত
কল্পকথায় জমুক খুশি, দুঃখ ভেসে যাক।

আগমনী বার্তা

হ্রশিখা ঘোষ

এখন ফুটছে রাস্তার ধারে ঝাঁকঝাঁক কাশফুল
আর আছে কিছু ঝরাপাতা
যদিও আকাশে মেঘ ওড়ে ছন্নছাড়া
তবু আকাশবীণায় বাজে আগমনী বার্তা

পিঁপড়ে দৌড়

মনোজিৎ কুইতি

লাল হলুদে ফুলের মেলা
নানা সাজে গন্ধ ভরা ফুল
হাসি কান্না দুষ্টুমিতে
ভরে ওঠে প্রতিদিনের স্কুল
ছোটোরা সব যাচ্ছে স্কুলে, ঢাউস ব্যাগটি তার কাছে
মিষ্টি হাসি শুকিয়ে যায় ম্যাম বকে দেয় পাছে।
খেলার মাঠে উচ্ছাসে তার, মুখের ওপর মুক্ত পড়ে ঝরে
গাছপালাতে আদর ভরা, মন বসে না বদ্ধ পড়ার ঘরে।
চলছে যেন পিঁপড়ে দৌড়,কোটি পিঁপড়ের মাঝে
সবাই যাবে এক নম্বরে, চাপের মাঝে সোনার আমার
পথ হারিয়ে সাঁঝে
শিশুসুলভ চঞ্চলতা কিশোর বেলার স্বপ্নগুলো
পথের মাঝে হারিয়ে যায় কবে
বোঝার আগে প্রৌঢ় হয়ে
আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ফেলে সবে
তাই তো বলি প্রিয় বন্ধু, প্রিয় কিশোর, ঝড়ের মাঝে
স্বপ্ন ভরে রেখো
পিতা মাতা তোমরা সবাই পিঁপড়ে দৌড়ে না পাঠিয়ে
ভরসা রেখো ভবিষ্যতে মানুষ হবে দেখো।

সোজা নয়

মৈনাক মুখোপাধ্যায়

এই সব চেনা ছবি, মাঠ ঘাট ঠাকুরদালান
প্রিয় সোয়েটার, টিপ, কাঁচপোকা, শীতের বাগান
লাল নীল মাছ, বাজি, ধ্রুবতারা, শব্দছক, ঘাম
পদ্মবীজ, হাইওয়ে, ধাবা-রুটি, নবান্নের ঘ্রাণ

অবিরত বৃষ্টি শেষে প্রথম রোদের ঝঙ্কার
মেঘে মেঘে ঢাকা পড়া আমাদের বিষণ্ণ আষাঢ়
বইমেলা, খুদকুড়ো, নদীতীরে রবীন্দ্রগান
চপল বিনুনি থেকে অতল খোঁপায় অন্তর্ধান

এইসব ছেড়ে যাওয়া সোজা নয়, তবুও নির্দয়
সময় গড়িয়ে যায় অভ্রান্ত, শেষ নিশানায়

শূন্যের বয়নপ্রণালী থেকে এই মনে করা

তাপস রায়

আমি যেখানে থাকি সেই ঠিকানা আমাকে চেনে
খানিকটা দূর থেকে সে আমার আসা টের পেতে থাকে
আর ক্রমে পথ হ্রস্ব হয়ে আমাকে গৃহে ডেকে নেয়

তুমিও দ্বিত্ব হতে হতে ফিরে আস, ঘুঙুরের টানে
যেভাবে নাচ, যেভাবে বেহালায় ছড়ের ভেতর দুঃখ
এক একবার দৃশ্যহীনতায় গিয়ে টের পাওয়া যায়
কত যে নদী মন্দিরের ভগ্নাবশেষ রেখে ফিরে গেছে উৎসের কাছে
চুলের খোঁপায় এসে সেজে ওঠে নিঃস্ব গোলাপ

এরকমই শিরার ভেতরে রক্তের প্রস্তাবনা দিতে ভুলে গিয়ে
এক একদিন মৃত্যুবতী হলে ভোরের আলোর কথা মনে হবে
আমাদের পাড়ায় গ্রীষ্ম বকুল ফোটাবে

জীবন জাগবে এবার

রবীন বসু

কী যেন উড়ছে হাওয়ায়
কী যেন ভিজছে ভিতর বাড়িতে
কারা চলে গেল গ্রাম ছাড়িয়ে
নদী পেরিয়ে কালভার্টের ওপারে

কারা উঁকি দিচ্ছে স্মৃতির চৌকাঠে
মনমরা পালক সে কেন ইতিউতি চায়
কী খুঁজছে জলহীন এই মধ্যদুপুর
আমাদের সব ফেলে আসা সম্পর্ক-সেতু

সেতুর ওপারেই তো যাবতীয় চলে যাওয়া
হারিয়ে ফেলা হাতের লাটিম
সমস্ত ঘূর্ণনে দেখি অবিরত স্রোত
বহমান জীবন পালের হদিশ জানে না

জানে না সুখ-চাবি কী করে ছুঁয়ে নিতে হয়
কী ভাবে ভাঙতে হয় দুর্ভাগ্যের পাঁচিল
সব স্থাবরতার দিনলিপি পড়া শেষ করে
নতুন জঙ্গমতার পাঠ নিতে হয়

না-পড়া দিনলিপির আবছা অন্ধকার থেকে
মুখ বাড়ায় যে প্রত্যাশা-উন্মুখ সকাল
তাকে দু-হাতে আগলে রাখাই ভালো, কেননা
জীবন জাগবে এবার অনন্ত উদ্ভাস নিয়ে দ্রুত।

অশ্রু মেশা বৃষ্টি

রূপ দাস

পায়ের পাতায় ছিল না তার অলক্ত-আলপনা,
ভ্রুপল্লবে সুর্মা কাজল, রোদ-চশমা কিছুই ছিল না,
ঠোঁটে ছিল না রুজের প্রলেপ, পদ্ম-পরাগ হাসি,
ছাই-রাঙা লজ্জাবাসে, আগুন ছিল কি না
বাইশে যুবার নেকনজরে যাচাই করিনি।
পুরুষ হতে পারিনি আমি, অষ্টাদশী সন্ন্যাসিনীর কাছে,

অতঃপর চলার পথে ধমনী কেটে রক্ত ছড়িয়েছি,
তাম্রকূটের কুটিল ছ্যাঁকায় নিজেকে পুড়িয়েছি।
এখন অশ্রু ঘামে ভেজা রুমাল
নিকষ কালো অন্ধকারে শুকিয়ে নিতে পারি,
মরুদেশে মুণ্ডিত-কেশ হাঘরে সন্ন্যাসী
অগ্নিপথের যাত্রী হওয়ার মন্ত্র শিখেছি
হাজার মাইল পথ হাঁটছি মরুদ্যানের খোঁজে,
আদুল শরীর পরম বালুর চাবুকে জেরবার
বুকের তৃষ্ণা মুখে উঠে ছড়ায় রক্তফাগ
অশ্রুমেশা দুচার ফোঁটা বৃষ্টি পাবো ভেবে
ধুমল মেঘের ছায়ার কাছে দুহাত পেতেছি।

প্রায়শ্চিত্ত

খেয়া সরকার

কার কাছে যাবো বলো
হাত বাড়ালেই হয়তো
স্তম্ভ-দম্ভ-অহংকারে
ছোঁয়াছুঁয়ি হয়ে যেতে পারে
তাই হাত গুটিয়ে স্থির
পাঁজর জ্বালিয়ে বসে আছি
মাথায় বটের ঝুরি
সঙ্গে নৌকার ছেঁড়া পাল,
ভাঙা দাঁড় আর হ্যাঁ, জল
এভাবেই দেখি কোন বুলেট ছুটে গেল
হৃৎপিণ্ড ঘেঁসে
কিংবা ছুরি কানের পাশ দিয়ে
নয়তো ব্লেড, আলপিন ছিটকে আসে
এদিক-ওদিক থেকে
তারপরেও আমার আঙুলে জড়িয়ে
তোমার বিষাদ
আমার ভুলের প্রায়শ্চিত্ত

বিগত যাপনে—

মাণিক পণ্ডিত

সরু বারান্দায় অদ্ভুত সিকোয়েন্স
কোনো জ্যামিতিক বোধ ছাড়া
লেপ্টে আছে একখণ্ড জীবন
ছিল যা সঞ্চরণশীল বিগত যাপনে—

শাখানদী উপনদী বলে
নেই কিছু এখন—
জলাশয়ও সে, নদীও সে,
রাতভর স্তাবকের হাততালি—

টেররিজ়ম ইনসাইড আউটসাইড,
কৌতুকদীপ্ত সরস অবয়বী
অসামান্য দক্ষতায় আঁচড় কাটে।

আরও একটা ব্যর্থ বিষণ্ণ দিন
একটেরে ফ্ল্যাটে,
কাঠফাটা এ শহরে
রোদে ভিজে থাকে ফুটপাথ।

সময় পটের গায়ে
ঐতিহ্য-অন্বিত জ্যামিতিক মূর্ততা
পুঁজি-শ্রমের দ্বন্দ্ব, ঘনীভূত সৌন্দর্য
উজ্জ্বল করেছে পৃথিবী।

গন্তব্য

অচিন মিত্র

গন্তব্য তো ঠিক করাই ছিল
ছিল না কি প্রথম থেকেই

স্তব্ধ হয়ে যেতে পারে
বহমান জলধারা কচুরিপানায়
সে-কারণে চলাচল
মাস্তুলে বসেছিল পাখি

ঠিক চলে যাওয়া নয়
এই ঘর থেকে শুধু পর্দা সরিয়ে
ওই ঘরে যাবার মতন
অজ্ঞাতসারে এক আন্তরিক
অভিনয় শুধু

গন্তব্য তো ঠিক করাই ছিল
ছিল না কি প্রথম থেকেই

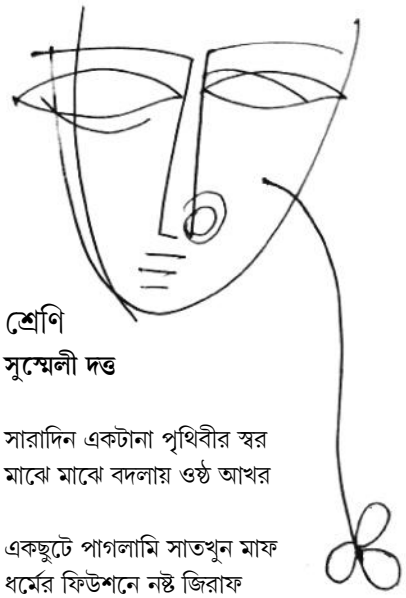

শ্রেণি

সুস্মেলী দত্ত

সারাদিন একটানা পৃথিবীর স্বর
মাঝে মাঝে বদলায় ওষ্ঠ আখর

একছুটে পাগলামি সাতখুন মাফ
ধর্মের ফিউশনে নষ্ট জিরাফ

ডামাডোল ছলাকলা ভালো থাকা ইতি
রাজনীতি টাজনীতি কী এমন ক্ষতি

বাড়ি থেকে রাজপথ হেঁটে কেন মরি
তন্ত্রসাধন ছেড়ে পোখরাজ পরি

লাট খায় সুতো ঘুড়ি বন্দুকবাজ
সমাজের মাথা ছুঁয়ে সুশীল সমাজ

পাথর ভাঙার গল্প

মাধুরী অধিকারী

সাত সমুদ্রের জোয়ার যার সুঠাম গালে
সে বাড়ি ফেরে গভীর রাতে
ফিরে আসে কাকভোরে
ওরই মাঝে ছেলেকে ঘুমপাড়ায়।
পাথর ভাঙার গল্প বলে।
সেই পাথর ভাঙতে ভাঙতে
পাঁজর ভাঁঙে যুবকের
এক বুক আশার সাথে মেয়ে
তারই গল্পের নায়ককে নিয়ে
চলে আসে একদম শহরে।

সেই থেকেই তার দু-চোখে
সমুদ্র বাসা বেঁধেছে।
কান্নাটাকে আকাশে উড়িয়ে
বুঝে বুঝে পা ফেলছিল সে।
দানের বাসন, হাতের কানের
এমনকি খোকন সোনার কোমর বিছে
শেষমেষ নুন আনতে পান্তা ফুরোয়।

আজ শুনেছে খোকার বাবা
কাল ঠিক ঘরে ফিরবে
শুনেই আবার এক পশলা বৃষ্টি!
আজ তাই ঘুম তার দুচোখ ছাড়েনি...

যক্ষপুরীর মতো বাড়িটা
আজও দাঁড়িয়ে আছে
কোলের ছেলে নিয়ে সে এসে
দাঁড়িয়েছে ভাঙা কাচের ওধারে
কালো ধোঁয়া...
'কত বড় বড়ি মা'—
খোকনের আধো কথায় ঘুরে দেখে
ছেলের ঠোঁটের হাসি চোখের জলে
ভিজিয়ে দিয়ে বলে—
'হ্যাঁ বাবা, বাড়িটা কেমন
সব্বাইকে নিয়ে
আকাশের গায়ে ঠেকে রয়েছে!!

অমৃত

মানিকলাল অধিকারী

‘যেনাহম্ নামৃতং স্যাম্ তেনাহম্ কিং কুর্য্যাম্”

সমুদ্রমন্থনে নাকি অমৃত উঠেছিল, গরলও।
তারপর?
তারপর, সেই নিয়ে কী ধুন্ধুমার কাণ্ড!
অমৃতে ভাগু নিয়ে দেবতাদের পৃষ্ঠ প্রদর্শন।
অথচ, যারা মাথার ঘাম পায়ে ফেলে
কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সমুদ্র মন্থনে সহযোদ্ধা
দিতির সেই সন্তানেরা অবাক, হতবাক।
তাদের জন্য অমরত্বের পিপাসু ভাইয়েরা
রেখে গেল পূর্ণকুম্ভ গরল।

এরকম কাহিনি কতবার নীলু শুনেছে বাবার কাছে।
পরাণ বাগ্‌দি মজুর খাটে বাবুদের বাড়ি
সমস্ত দিনের শেষে সূর্যাস্তে
প্রায় শূন্য হাতে বাড়ি ফেরে পরাণ;
টলোমলো পা, অবিন্যস্ত কথা, অস্পষ্ট উচ্চারণ
তবে, নীলু বোঝে পরাণের অমৃতের পিপাসা
অমরত্বের জন্য তার দুরন্ত বাসনা।

এখন মনে হয়, এই তো সেদিন—
পরাণ তো ছিল না এমন
তাদের ফুপড়ির পাশ পড়ে থাকা রুক্ষ নিষ্ফলা জমি
এই ছিল তাদের আজন্ম অধিকারে।
কী অসম্ভব পরিশ্রম আর পাথর কঠিন হাতে
অবাঞ্ছিত কাঁটাঝোপ সরিয়ে রুখু জমির বন্ধ্যাত্ব মুক্তি
আর পরাণের আদর আর ভালোবাসায় জন্ম নিয়েছিল
কচিকাঁচা সবুজ সবুজ প্রাণ।
সূর্যের দিকে দুহাত বাড়িয়ে উত্তাল হাওয়ায় বেড়ে উঠে সূর্যমুখী।
ভরা বর্ষার শেষে সোনালী ধানের ঐ যুবতী জমি
কারা এসে কেড়ে নিয়েছিল
কেন, নীলু তা বোঝেনি।
ওরা কি তবে ঐ অদিতির সন্তান?

নীলু দেখেছিল
যে জলাভূমিতে হাবুল শেষ মাছ ধরত
কাঁটাতারের বেড়া আর পাহারার বাড়াবাড়ি
কেড়ে নিয়েছিল তার মুখের গ্রাস।
বনের ঝরাপাতা, বনমুরগি কিংবা শুকনো কাঠে
আর কোনো অধিকার রইল না

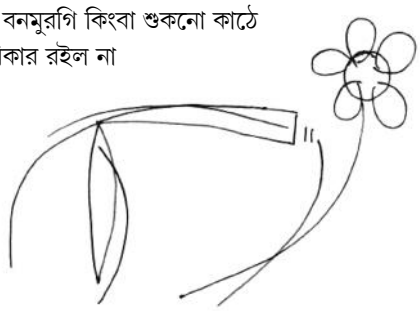

নিঃসহায়, নিরুপায় ভূমিপুত্র মানুষগুলোর।
হাবুল শেখ, পরাণ বাগ্‌দি এবং আরো আরো অনেকে
হতাশাকে ডুবিয়ে দিতে, ভুলে থাকতে
হাজির হল সরকারি ছাড়পত্র পাওয়া ভাঁটিখানায়।
নীলুরা বুঝতে পারে না—
কেন এভাবে ভূমিসন্তানেরা উৎখাত হল
উদ্বাস্তু হল আজন্ম অধিকৃত ঊষর জমি,
জলক্ষেত্র আর বনবাদাড় থেকে।

দেবাসুরের গল্পে একজন নীলকণ্ঠ ছিল
নীলু তার অভাব টের পায় এখন
দিনমজুর বাবা তার
আর পরের বাড়ি বাসন মাজে মা।
নীলুর দুচোখ জুড়ে স্বপ্ন—
বইয়ের পাতা থেকে মুখ তুলে নীলু দেখ
দিনের শেষে আলো আঁধারিতে মা ফিরে এল ঘরে।
মায়ের মলিন মুখ, ক্লান্ত স্বর
নীলুর বুকের ভিতর তির তির করে চুঁইয়ে পড়ে
বই ফেলে দুহাতে আষ্টেপৃষ্ঠে মাকে জড়িয়ে ধরে
“মা, বড় হয়ে আমি তোকে অমৃত এনে দেব।”

দিস্ বাবা,
তবে, দু-মুঠো ভাতও।

কোনো এক আগুন ভাইকে মনে করে

সৌরভ দত্ত

আগুনকে কখনো মাপতে যেও না!

আগুনকে কখনো বরফ চাপা দিও না!

হে নন্দিত নেতৃবৃন্দ,
শুধু দেখো যেন সে আগুন কখনো জ্বলে পুড়ে ছাই না হয়ে যায়!

তোমরা প্রত্যেকে সারা জীবন ধরে
অন্ততঃ একটা করে এমন প্রদীপ বানাতে পারো না
যেখানে এক একটা আগুনকে চিরকাল ধরে রাখা যায়?

চিরকাল!

হ্যাঁ, সূর্য ফুরিয়ে যাবার পরেও!

আর, তোমাদের তো জানারই কথা—

মেঘলা আকাশে সূর্য ডুবলে পরে—
ছোটো ছোটো দীপই আঁধার ঘোচাতে পারে!

যখন বর্ষা আরম্ভ হয়

কেদারনাথ সিংহ

হিন্দির প্রখ্যাত কবি কেদারনাথ সিংহ এ-বছরই প্রয়াত হয়েছেন। তাঁর কবিতা অনুবাদ করেছেন আর এক কবি **জমর সাহানী**

যখন বর্ষা আরম্ভ হয়
পায়রাগুলো ওড়া বন্ধ করে
গলি কিছুটা দূর পর্যন্ত ছুটতে যায়
আবার ফিরে আসে

গরু-মোষেরা ভুলে যায় চরে খাওয়ার দিশা
এবং বাঁচিয়ে রাখতে চায় সেই
বিলম্বিত লয়ের গুনগুন সুর
যা পাতা থেকে ঝরে পড়ে
সিপ্ সিপ্ সিপ্ সিপ্...

যখন বর্ষা আরম্ভ হয়
একটি অনেক পুরোনো খনিজ গন্ধ

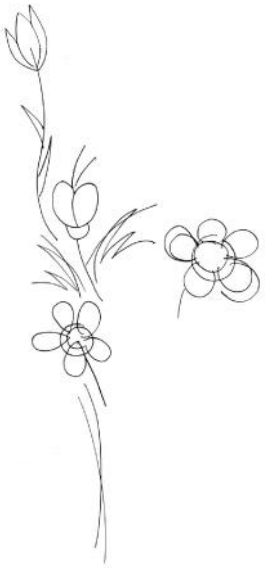

সার্বজনিক ভবন থেকে বেরিয়ে
অবশেষে পুরো শহরে ছড়িয়ে পড়ে

যখন বর্ষা আরম্ভ হয়
তখন কোথাও কিছুই দেখা যায় না
শুধু বর্ষা ছাড়া

মানুষ এবং গাছ
যেখানে দাঁড়িয়ে ছিল সেখানেই দাঁড়িয়ে থাকে
শুধু পৃথিবী ঘুরে যায় সে-দিকে
যেদিকে অবিরাম জল পড়তে দেখা যায়।

With Best Compliments from

A
Well Wisher

RAJIGANJ

Sl. No. 125

স্বাধীনতা, উতল হাওয়ায়

রূপক মিত্র

সকাল থেকে আমার ইচ্ছে / এক ধরনের সাহস দিচ্ছে / উড়ে না যাই। ঘর থেকে বাইরে বেরিয়ে, চারদিকে চোখ মেলে ও কান পেতে, সাতসকালে, শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের পদ্যের ঐ লাইনগুলোই পরিমলের মাথার ভেতর ডানা ঝাপটালো! এমনিতে পরিমল যে খুব কবিতাপ্রেমিক, তা নয়। তবে সে জানে, মানুষের ব্যাপার-স্যাপার অতীব রহস্যময়। কোত্থেকে কখন যে কীসব হয় বোঝা মুশকিল। কোনো কিছুই পুরোপুরি হারিয়ে যায় না, সবই থাকে নিজের জায়গায় ঘাপটি মেরে, গভীর গোপন অবচেতনে। এ যেন লক্ষকোটি নক্ষত্রখচিত রাত্রির আকাশ, অথবা আপাত শান্ত অতলান্ত মহাসমুদ্র। হঠাৎ কখনো ঘটে যায় মোহিনী উল্কাপাত, নয়তো অতল জলের আহ্বান শুনিয়ে অকস্মাৎ ভেসে ওঠে অতিকায় তিমি বা হাঙর, একবার করাল বদন দেখিয়ে পরক্ষণেই ফিরে যায় ঘুমের দেশে। আর কখনো তারা জেগে উঠবে কিনা কেউ তা জানে না।

এই তো দিন দশ আগে, এক রিমঝিম বৃষ্টির রাতে পরিমল স্বপ্নে দেখলো, তাদের গাঁয়ের বাড়ির খিড়কি পুকুরের জলে সেই সাদা হাঁসটাকে। অন্ধকার হয়ে আসা শেষ বিকেলে, পুকুরের কালো জলে হাঁসটা বারবার ডুব দিচ্ছিলো মাথা থেকে গড়িয়ে আসা ফোঁটা ফোঁটা রক্ত ধুয়ে ফেলার জন্যে। সাদা পালকে ঢাকা তার লম্বা গলা বেয়ে গড়িয়ে নামছিল তাজা রক্ত। এদিকে পুকুরের পাড়ে তখন কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে দশ বছরের পরিমল। তারই ছুঁড়ে মারা ঢিলে মাথা কেটে গেছে হাঁসটার। সেদিন তাদের অন্য সব হাঁস ঘরে ফিরে এলেও ঐ লম্বাগলা সাদাটা ফেরেনি। খুঁজতে গিয়ে পরিমল দেখে, পুকুরের ঠিক মাঝখানে স্থির হয়ে ভেসে আছে সাদা হাঁস। কিছুক্ষণ ডাকাডাকি করে ওকে নড়াতে না পেরে পরিমল ঢিল মেরেছিল। তারপর ঐ রক্ত। থামছে না, থামছে না! ঐ ঘটনা অবিকল ফিরে এসেছিল পরিমলের স্বপ্নে! এমন আবার হয় নাকি কখনো? প্রায় চল্লিশ বছরের পুরনো অতীত হুবহু স্বপ্ন হয়ে ফিরে আসতে পারে! সেদিন রাতে স্বপ্ন ভাঙার পর পরিমল অনেকক্ষণ চুপচাপ বসেছিল অন্ধকার ঘরে। প্রবল তেষ্টা পাওয়া সত্ত্বেও সে জল খেতে পারছিল

না। গত দশ বা কুড়ি বছরে একবারও ঐ ঘটনা তার মনে পড়েনি, পরিমল নিশ্চিত। সেদিন কী হয়েছিল তাদের ঐ সাদা হাঁসটার? মনখারাপ? বোঝেনি পরিমল। পাপ হয়েছিল তার?

আজ সাত সকালে বাইরে এসে পরিমল দেখে সবই কেমন যেন অন্যরকম। অবশ্য অভিধানে যা-ই থাক, পরিমলের কাছে সাতটা সাড়ে সাতটার আগে সাতসকাল শুরু হয় না। আজ ছুটি, ঘড়ি না দেখলেও চলবে। রাস্তায় কিছুক্ষণ অলস পায়ে হাঁটার পর মন ভালো হয়ে গেল পরিমলের। একটুখানি ঝড়ের গন্ধ মেশানো উতল হাওয়ার দিন আজ, নীল আকাশে সাদা মেঘ উড়ে যাচ্ছে। ভোরবেলা বৃষ্টি হচ্ছিল। পরিমল তখন পাশ ফিরে শুয়ে আবার ঘুমিয়ে পড়ে। এখন বৃষ্টি নেই, কেবলই মেঘ রোদ্দুরের খেলা। গাছপালারা মাথা দোলাচ্ছে অবিরাম, না-হ্যাঁ, না-হ্যাঁ। শক্তির ঐ পদ্যেই যেমন আছে—ভালো এবং মন্দ যতো / হয় না আমার মনোমতো—সেইরকম আরকি। আজ পনেরোই আগস্ট। আজ স্বাধীনতার দিন।

পরিমলদের পাড়াটা এখনো বেশ ফাঁকা, খুব বেশি ঘরবাড়ি তৈরি হয়নি। তার অবশ্য একটা কারণ আছে। দুটো বড়ো দিঘি, পাঁচিল ঘেরা একটা প্রমাণ সাইজের খেলার মাঠ, অনেকখানি সরকারি জমি—ওখানে কোনো কিছু হবার কথা কেউ কেউ আগে বলতো এখন আর বলে না। চারদিকে অনেক গাছপালা, এমনকি গোটা কুড়ি তালপাছও, আজ ওদের মাথাই দুলছে বেশি, না-হ্যাঁ। একটা দিঘির ঘাটের পাশ থেকে পিচ রাস্তা চলে গেছে পুব-পশ্চিম বরাবর। বাঁদিকে খেলার মাঠ, রাস্তার ডানদিকে টিন, পলিথিন, অ্যাসবেস্টসের ছাউনি দেওয়া অনেক ঝুপড়ির দোকান। সবই পাওয়া যায় এখানে। কেউ যদি বলে শহরের প্রধান বাজারগুলোয় যাবো না, তাতেও কোনো অসুবিধে নেই। সচ্ছন্দে চলে যাবে পনেরো কুড়িদিন। পরিমলও ঐভাবেই চালায়। বয়ঃসন্ধির সময় এপাড়ায় এসেছিল পরিমল। এখন সে প্রৌঢ়। ইতিমধ্যে পাড়ার ছেলে হিসেবে কতোখানি সফল হয়েছে সে, জানেনা পরিমল। তবে ঝগড়াঝাঁটি, ল্যাং মারামারি জ্ঞানত সে করেনি কখনো, এরকমই তার বিশ্বাস। অন্যদিক দিয়ে দেখলে, খুব যে সে মিশুকে ধরনের লোক তাও নয়। আবার পাড়ার সব কাজে পরিমলকে ডাকো, ও না এলেই নয়, এমনও কেউ কখনো ভাবেনি তার সম্পর্কে। আজ স্বাধীনতার দিন। কেউ পরিমলকে ডাকেনি। সে আজ তাই স্বাধীন, মহোৎসব থেকে দূরে, আপনমনে ঘুরছে, ফিরছে, দেখছে চারদিক।

পুকুরঘাটের মোড় থেকে পাড়ার দিকে না গিয়ে পরিমল সোজা উত্তরের রাস্তা ধরলো। বেশ একটা তরতাজা বেড়াতে বেরোনোর মুডে পেরিয়ে এলো সে এক মাইল রাস্তা। এরই মধ্যে স্বাধীন ভারতের দুষ্টুমিষ্টি তাজা যুববাহিনীর তিন তিনটে বাইক মিছিল তাকে ক্রশ করে গেল। অন্যমনে থাকতে পারবে না তুমি, চমকে যেতে হবেই। এ রাস্তায় এমনিতে ভিড় থাকে না। দুপাশে কিছু গাছপালা, সামনে অনেক দূর অব্দি দেখা যায়। পরিমল থামলো এসে দুখীরামের চায়ের দোকানে। তিন রাস্তার মোড় এটা। দুটো সরু রাস্তা ঢুকেছে দুটো গরিব মানুষদের পাড়ায়, অন্যটা সোজা চলে গেছে শহরের ভেতরে। একটা কৃষ্ণচূড়া গাছের নিচে দুখীরামের চায়ের দোকান। তিনটে নড়বড়ে বেঞ্চ, দোকানে কেক, বিস্কুট, পাঁউরুটির যোগান তেমন নেই। তিন রাস্তার মোড় হলে কী হবে, লোকজন নেই বললেই চলে। দোকানে একজন মাত্র খদ্দের। সেও দোকানদারের মতো বুড়ো। পরিমল মাঝেমাঝে এখানে আসে, নিরিবিলিতে কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থাকার জন্যে। স্বাধীনতার দিনেও দোকানটা আরো নিরিবিলি হয়ে এমন খাঁ খাঁ করবে পরিমল ভাবতে পারে নি।

দুখীরাম পরিমলের জন্যে চা তৈরি করছিল, ঐদিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে পরিমলের মনে হলো, স্লো মোশনের সিনেমা চলছে যেন। সমস্ত তৎপরতা, জীবনের সব ধরনের গতি এবং বেঁচে থাকার উদ্দেশ্য দুখীরামকে ছেড়ে চলে গেছে। এটা তো পরিমল আগে খেয়াল করেনি। এখন ওর বিশ্রাম দরকার। কিন্তু সেটা ওকে দিচ্ছে কে? তুমি ছাড়বে বললেই তো হলো না, জীবন তোমাকে ছাড়বে কি? দুখীরাম বেঁচে নেই, নাছোড়বান্দা জীবন ওকে বাঁচিয়ে রেখেছে। এই অবস্থা আমি এখন ঠিক কতোখানি দূরে? দুখীরামের কাছ থেকে চায়ের গেলাসটা নিয়ে পরিমল নিজেকে ঐ ভাবনায় নিয়ে যায়। ভাবতে ভাবতে সে ক্রমশ নিঝুম হয়ে বসে থাকে কিছুক্ষণ। একটা বাইকবাহিনী তার ভাবনাচিন্তা তছনছ করে দিয়ে চলে যায়। কোন্‌দিকে যায় ওরা? দিগন্তজয়ের অভিযানে? সেই দিগন্ত কোথায়? আজ ওরা যদি সবাই মিলে দুখীরামের দোকানে চা খেতে আসতো? কে জানে, হয়তো সত্যিই তেমন হলে রক্তস্রোত একটু চঞ্চল হতো দুখীরামের বলা যায় না, স্লো মোশনের কাঠামো ভেঙে একবার গা ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়াতেও পারতো সে। পরিমল নিজেকে বাস্তববুদ্ধিহীন বোকা লোক হিসেবেই জানে। অনেক সাবধানতা সত্ত্বেও কখন যে সে নিজের অজান্তেই পা পিছলে অলীক অসম্ভবের দেশে চলে যায়, বুঝতে পারে না। ফিরে আসতে সময় লাগে পরিমলের, কষ্ট হয়।

আধঘন্টা পর, আরো একটা বাইকবাহিনী যাচ্ছে। পরিমল মুখ তোলে নি। ওখান থেকেই প্রবল চিৎকার করে কেউ, অ্যাই পরিমলদা, চলে এসো।

মোহন টগবগ করছে। এক পা মাটিতে রেখে দাঁড়িয়েছে মিছিলের বাইরে। মোহন আবার বলে, চলে এসো!

—না রে, হাঁটতে বেরিয়েছি।

—হাঁটবে কেন? তোমাদের পাড়া দিয়েই যাবো আমরা।

—কোথায় যাবি?

—তা জানি না। আজ সারাদিন মস্তি। এসো, পাড়ায় নামিয়ে দেবো।

—না, তোরা যা। চা খাবি?

অদ্ভুত একটা হাসি দেখায় মোহন, ধুৎ, চা? আজকের দিনে? চলি, দেখা হবে।

পাড়ার রাস্তায় ঝুপড়ি দোকানগুলোর পাশে একটা গাছতলায় আসর জমিয়েছে অবনীদা। গাছতলায় অবশ্য বসার জায়গা নেই। অবনীদা এবং আরো চারজন মুগ্ধ শ্রোতা নিয়ে ঐ আসর। সবাই দাঁড়িয়ে। পাড়ায় ঘোরাফেরা করার সময় অবনীদার পরনে থাকে ঢোলা পাজামা আর ফতুয়া। আজ ফতুয়ার বদলে হাত গোটানো সাদা পাঞ্জাবি। হাতে ভাঁজ করা তিন চারটে খবরের কাগজ। সুঠাম চেহারা, এক মাথা সাদা চুল, উল্টে আঁচড়ানো।

—দাঁড়া, কথা আছে।

পরিমল জানতো, দাঁড়াতে হবেই। দু-চার পা এগিয়ে গাছতলায় সে দাঁড়ায়। আট-দশ মিনিটের মধ্যে অন্য চারজন, পাড়ারই লোক ওরা, চলে যায়। এবার অবনীদার একমাত্র শ্রোতা পরিমল।

—আজ আমার জন্মদিন।

—অ্যাঁ?

—অ্যাঁ নয়, হ্যাঁ। পনেরোই অগাস্ট

উনিশশো সাতচল্লিশে আমার জন্ম। আজ আমার একাত্তর পূর্ণ হলো।

—এটা জানতাম না।

—কোনোদিন জিজ্ঞেস করেছিস যে জানবি?

—তুমিও তো বলোনি কখনো। কেউ বলেনি।

—তুই মুখচোরা, কথাই তো বলিস না কারুর সঙ্গে ভালো করে।

—অতোটা বোধহয় নই।

—হ্যাঁ, অতোটাই। মানুষের সঙ্গে মিশবি, নইলে কিছুই শিখতে পারবি না। মানুষই সবচেয়ে বড়ো ইসকুল। শোন, আজ তোর আমাদের বাড়িতে নেমতন্ন। জমিয়ে বাজার করলাম। তোর পছন্দের খাবার কী বল, সেটাও আজ হবে।

—তেমন কিছু নেই। আমি যা পাই তাই খাই।

—আহাম্মক কোথাকার। পছন্দের খাবার নেই, বিশ্বাস করতে হবে?

—তোমার জন্মদিনে কি খারাপ কিছু হতে পারে? যা হবে সবই ভালো, মন্দ কিছুই নাই।

—তেমন কখনো হয় না, মনে রাখবি। আজই তো মন্দ ব্যাপার একটা হয়েছে। পানু, দাস পাড়ার পানু আজ মরে গেল।

—কখন?

ধরে নে রাত বারোটায়, স্বাধীনতার মাহেন্দ্রক্ষণে। তারপর কী হলো? পোড়াবার টাকা নাই। ক্লাবের ছেলেরা তো আজ ভোরবেলা থেকেই মহা ব্যস্ত। আমরা কজন কিছু চাঁদা তুলে...। পাড়ায় তো থাকিস না, মানুষের খোঁজখবরও রাখিস না। আহাম্মক কোথাকার। কোথায় ঘুরিস? মনে খুব দুঃখ? তারও তো কোনো যুক্তিসঙ্গত কারণ আছে বলে জানা নেই আমার।

—নাঃ।

—অবশ্য অকারণ মনখারাপ ব্যাপারটা আমি ঠিক বুঝি না। ওটা খুব উচ্চ মার্গের বিষয়। তাই তো, নাকি?

—সেটা আমারও জানা নেই। আমি খুব সাধারণ অবনীদা, বড়ো বড়ো বোঝা ঘাড়ে চাপালে নড়তে চড়তে পারবো না।

—তাই পালিয়ে বেড়াস? এস্‌কেপিস্ট।

—তথাস্তু, সব মেনে নিলাম। একবার চা হবে কি? স্বাধীন চা, তোমার জন্মদিনে।

—তুই তো দেখছি আমাদের সবাইকে ছাড়িয়ে যাবি!

—অসম্ভব। যা বলবে বলো, অতোটা আশা কোরো না, ভেঙে পড়বো।

—ঠিক আছে, তরজা ছাড়। চা খেয়ে বাড়ি যা। এগারোটা বাজছে। চান-টান করে সাড়ে বারোটার মধ্যে আমাদের বাড়িতে চলে আয়।

—নেমতন্নটা সত্যি? আমি তো ভাবলাম—

—মারবো মুখে এক থাবড়া। কোনোবার হয় না, এবছরই হচ্ছে ছেলেমেয়েদের চাপে।

বাড়ি ফিরে মাকে অবনীদার জন্মদিন ও নেমতন্নর কথাটা বললো পরিমল। মাও জানতো না। মায়েরও সাতচল্লিশ সালেই জন্ম, জানুয়ারি মাসে। বেঁচে থাকলে পরিমলের বাবার বয়েস হতো আটাত্তর। অবনীদাকে কাকা বলাই পরিমলের কাছে স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু না, অবনীদা পরিমলের বাবাকেই বলতো চাঁদুকাকা। কী এক প্রায় অদৃশ্য সুতোয় নাকি আত্মীয়তার খোঁজ পাওয়া গিয়েছিল, সেখানের হিসেবে পরিমলের বাবা অবনীদার কাকা। এই একটা ব্যাপার—গ্রাম, জেলা, জাতপাত এসব নিয়ে খোঁড়াখুঁড়ি শুরু করলে কিছু না কিছু মিলবেই। অনেক সময় অনাবিল স্বাধীনতার পক্ষে এগুলো বেশ বাধা হয়ে দাঁড়ায়। মানুষের জীবনে সীমাহীন লড়াই। জাত, ধর্ম, দেশ, লোভ, লালসা, শোষণ, বৈষম্য, দারিদ্র্য অজস্র যুদ্ধক্ষেত্র ছড়ানো বিশ্বময়। যুদ্ধ থামে না কখনো। মানুষ আসে যায়, যুদ্ধ চলতেই থাকে। যুদ্ধ চলতেই থাকবে, যতোদিন জীবন।

হ্যাঁ, অবনীদা। অবনীদাদের যোগাযোগেই পরিমলের সরকারি চাকুরে বাবা এই পাড়ায় জমি কিনে বাড়ি করেছে। এ পাড়ায় সবচেয়ে পুরনো বাড়িটা অবনীদাদের। বেশ বড়ো বাড়ি, সম্পন্ন ব্যবসায়ী পরিবার। অবনীদাই ঐ পরিবারে প্রথম চাকরি করা লোক। সরকারি অফিসার ছিল অবনীমোহন। ক্ষীণ আত্মীয়তা থাকলেও ওদের পরিবারের সঙ্গে পরিমলদের খুব যে মাখামাখি ছিল, তা নয়। এক রকম আত্মীয় অবনীদাদের সারা শহর জুড়েই ছড়ানো। বেশ দাপট আছে ওদের। অবনীদার তো সর্বত্র অবাধগতি। শুধু ঐ একবার, বছর পাঁচেক আগে পাড়ায় একটা অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে গিয়ে ধাক্কা খেল অবনীমোহন। এমন প্রতিবাদ এর আগে অনেকবারই করেছে অবনী এবং জিতে বেরিয়ে এসেছে। এবার তেমন হলো না, রাস্তা আটকে অশ্রাব্য গালাগালি, বাড়ি ঘেরাও হবার উপক্রম। তিনদিন বাড়ি থেকে বেরোয়নি অবনীদা। তারপর বেরোলো একদম স্বাভাবিক মুডে। শুধু ছেড়ে দিল কিছু কিছু বিষয়ে কথা বলা। ঘটনাটা হজম করতে পারেনি অবনীদা, মাঝেমধ্যে বুঝতে পারে পরিমল।

এই শহর থেকে বাইশ মাইল দূরে একটা গ্রামে হাই ইসকুলের মাস্টারমশাই পরিমল। চাকরি পেতে দেরি হয়েছিল, বিয়ে করতেও। এগারো বছরের একটি মেয়ে, ছেলেটা নয়ে পড়বে ডিসেম্বরে। দেখশুনোর বিয়ে, তেমন কোনো অভিযোগ আছে বলে মনে হয় না। একমাত্র বোনের শ্বশুরবাড়িও এই শহরেই। বাকি রইলো কী? মাঝে মাঝে এতো যে ফাঁকা ফাঁকা লাগে, ঘুম আসে না রাতে, এরকম কি সব মানুষেরই হয়? কোথায় যেন যাবার কথা ছিল, কতো কী সব করার অঙ্গীকার, কিছুই তো হলো না। যার সঙ্গে এসব নিয়ে প্রাণ খুলে আলোচনায় বসা যাবে, সে কোথায়? তাকে খুঁজে পাবার আগেই কি ঢলে পড়বে জীবন? মনে মনে পরিমল হয়তো একটা সরলরেখার জীবনই চেয়েছিল, যা কখনো হয় না। হয়তো যাকে সে দুরারোগ্য অসুখ বলে ভাবছে, সেসব আসলে তার দুঃখবিলাস।

অবনীদার বাড়িতে গিয়ে পরিমল দেখলো সে ছাড়াও আরো জনা দশ পাড়ার লোক নিমন্ত্রিত। পঁচিশ থেকে পঁচাত্তর। সেই সঙ্গে অবনীদার চারজন বন্ধু, সপরিবার। একান্নবর্তী সংসার। চার ভাই, অবনীদা মেজো। দুই বোনও এসেছে। তিনতলা বাড়ি সরগরম। বাড়ির ভেতরের দিকের লম্বা বারান্দায় খাওয়ার ব্যবস্থা। রান্নাও চমৎকার। পরিমলদের খাওয়া শেষ হতে তিনটে বেজে গেল।

গেট পেরিয়ে কুড়ি-পঁচিশ ফুট হেঁটে বাইরের বারান্দাটা বেশ বড়ো এবং অর্ধ-বৃত্তাকার। বারান্দার ডানদিকের বসার ঘরটাও বেশ বড়ো। ওখানেই আড্ডা জমলো। জনা চার চলে গেলেও ঘরে হৈ চৈ কম নয়। কে কার উদ্দেশ্যে কী বলছে বোঝা মুশকিল। এতো জন আধচেনা বা অচেনা লোকের সামনে পরিমল একটু ঝিমিয়ে পড়ে। চলে যাবার জন্যে দাঁড়িয়ে পড়েছিল সে একবার, অবনীদা অন্যজনের সঙ্গে কথা বলতে বলতেই তা টের পেয়ে হাতের ইশারায় পরিমলকে বসিয়ে দিল আবার।

তুমুল আড্ডার মাঝখানেই দরজায়

এসে অবনীদার ছোটোবোন বললো, এই মেজদা, শুনছিস? অর্জুন এখনো ফেরেনি।

—ফেরেনি মানে? কোথায় গেছে?

—তা জানি না। বন্ধুদের সঙ্গে গেছে হয়তো।

—ফোন কর।

—ফোনটা সঙ্গে নিয়ে যায় নি।

অর্জুন অবনীদার ছোটো ভাইয়ের ছেলে। কলেজে পড়ে।

—সন্তু কী বলছে?

—সন্তু ফাজলামি করছে!

—ফাজলামি মানে?

—বলছে, অভিমন্যু তো নয়, অর্জুন। ঠিক কেটে বেরিয়ে আসবে।

সন্তু অবনীমোহনের ভাইবোনেদের মধ্যে সবার ছোটো। যাইহোক, ব্যাপারটা ঠিক ঠাট্টা-ইয়ার্কির জায়গায় রইলো না। পাঁচটা বাজলো, সাড়ে-পাঁচটা বাজলো। অর্জুন তখনো ফেরেনি। সবাই এসে ভিড় করেছে বাইরের বারান্দায়, গেটের কাছে। এখানে ওখানে ফোনও যাচ্ছে। কোনো হদিশ নেই অর্জুনের। উদ্বেগ এমনকি অবনীমোহনের চোখেমুখেও।

প্রায় ছটার সময় একজনের মোটরবাইকের পেছনে চেপে অর্জুন ফিরলো। কেমন যেন নেতিয়ে পড়া, সিট থেকে নামতেও পারলো না ঠিকমতো। বসে পড়লো রাস্তায়।

বাইকচালক এদের চেনা, অর্জুনের বন্ধু।

—কী হয়েছে ওর, অতনু?

—একটু অসুস্থ হয়ে পড়েছে।

—অসুস্থ মানে?

—ঐ একটু। চান করলে ঠিক হয়ে যাবে।

—কোথায় গিয়েছিলে তোমরা?

—ঐ তো, প্রথমে মিছিলে। তারপর শ্মশান।

—শ্মশান কেন?

—ঐ যে পানু দাস। ওরই জন্যে। ওখানেই একটু অসুস্থ হয়ে পড়লো। ও কিছু নয়, চান করলেই—

অতনু আর দাঁড়ায় না। চলে যাবার সময় বাইকে বেশ জোর শব্দ হয়।

অর্জুনকে ধরে ধরেই বারান্দাই তুলতে হয়। সন্তুদা বললো, বুঝতে পারছিস না তোরা, শ্মশানে গিয়ে মদ খেয়েছে।

এতোগুলো লোক বাক্যহারা। একটু সামলে নিয়ে অবনীদার ছোটোবোন বললো, কোনো গন্ধ পাচ্ছি না তো!

—সবেতে গন্ধ হয় না।

কথাটা কে বললো? সবাই ফিরে তাকায় অর্জুনের বোন দিয়ার দিকে। ঢাউস একটা ফোনে মুখ গুঁজে আছে সে। এবছর কলেজে ভর্তি হয়েছে দিয়া।

—তুই কী করে জানলি?

আমি জানি, মুচকি হেসে অর্জুনের বোন বলে। ফোন থেকে মুখ সরায়নি মেয়েটা। হঠাৎ বোধহয় ওর খেয়াল হয়, সবাই কেমন যেন চুপচাপ। মুখ তোলে ফোন থেকে। ওর মা বলে, তুই কী করে ওসব জানলি, বল।

আবার একটু মুচকি হেসে ঘরের ভেতর চলে যায় সুদর্শনা দিয়া। এতোগুলো চোখ ওর দিকে, খেয়ালই নেই মেয়েটার।

With best compliments from

KASTHA BIPANI

KUSMGRAM, BURDWAN

BIDYUT: 89725057385/9732082232
TARIT: 9732083773/9433080206

Authorised Stockist

EVEREST, TATA SHAKTEE, LAFARGE CEMENT, TATA TISCON

Sl. No. 31

বাড়তি

কার্তিকচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

এক

—শোন।

—বল দাদা।

—বাবাকে তো তোর হকের পাওনা বাবার অর্ধেক সম্পত্তির না-দাবি লিখে দিয়েছিস। বাবা চলে গেছে, এখন তো তোর ন্যায্য দাবিটা করতে বাধা নেই। চল, সম্পত্তির লেখাপড়া সেভাবেই করে নি।

—না দাদা। বাবার মুখ চেয়ে আমি সম্পত্তির না-দাবি লিখে দিই নি। ভেতর থেকেই দিয়েছি।

—কারণ?

—সত্যি বলতে কি, দিনের পর দিনের বাবা-মাকে দেখভাল তো তোরা স্বামী-স্ত্রীতেই করেছিস। আমি আর কটা দিন তাদের দেখতে পেরেছি। তাছাড়া সম্পত্তিও এমন কিছু আহামরি নয়, তোদেরও ঘরসংসার আছে। তাছাড়া তোদের কাছে আসব যাব মন খুলে। সম্পত্তির খিঁচে সম্পর্কটাও গোলমালে পড়তে পারে।

—শোন, তোর তিনটে যুক্তিই পলকা। প্রথমত বাবা-মাকে আমরা এক তরফা দেখভাল করি নি। বাবা-মা আমাদেরও ভালোমন্দ দেখার জন্যে তাদের বয়েস অনুযায়ী গতর খাটিয়েছে। পয়সাকড়িও কিছু যেমন দিয়েছে। সংসারে মেয়েদের আমরা বিয়ে দিয়ে শ্বশুরবাড়ি পাঠাই। তাদের পক্ষে শ্বশুরবাড়ি আর বাপের বাড়ি একসঙ্গে সমান দেখভাল করা সম্ভব নয়। এই যে তোর বৌদির বাপের বাড়ির কথাই ধর। ওর ভাই আর ভায়ের বউ তো কবে থেকেই বুড়ো বাপ-মাকে ছেড়ে দে-কাট। তোর বৌদি তাদের জন্যে কী করতে পারছে!

—না দাদা, আমি দেখেছি তুই যখনই দরকার পড়ে তখনই বৌদিকে পাঠিয়ে দিস। অনেক অসুবিধে তুই হাসিমুখে মেনে নিস।

—ঠিক আছে। কিন্তু সত্যি করে বল তো, আমার শ্বশুর শাশুড়ির ভালো থাকার জন্যে যা যা করা দরকার, তোর বৌদি কি সেসব করতে পারে! সেরকম করতে হলে আমাদেরও তো বাবা-মাকে ফেলে ওখানেই সংসার পাতা দরকার। যাক সে কথা। তোর পরের যুক্তিটাও ঠিক নয়। সম্পত্তি সম্পত্তিই, তা সে কম বেশি যাই হোক। দেখিস নি, দু-এক বিঘে জমির জন্য ঘরে ঘরে কত লাঠালাঠি ফাটাফাটি হচ্ছে। তাছাড়া তোর যা মনে হচ্ছে তোর ঘরের লোকও যে তা মনে করবে তার কি কোনো মানে আছে। তখন তো ওই সামান্য সম্পত্তি নিয়েই তোদের মধ্যে ঝামেলা ঝঞ্ঝাট হবে।

—আমি আমার স্বামীকে চিনি দাদা। এ'নিয়ে আমাদের মধ্যে কোনো অশান্তি হবে না। তুই দেখে নিস।

—অশান্তি পরিস্থিতি তৈরি করে। পরিস্থিতি সব সময়েই বদলাচ্ছে। বদলি পরিস্থিতিতে তুই ছার, তোর স্বামী-ই কি করবে তা কি তুই জানিস, না সে জানে। তাছাড়া ধরেই নিলাম নাহয় পরিতোষ লোক ভালো। কিন্তু তোর ছেলে মেয়ে? তারা এখনও ছোটো। তারা বড় হলে ব্যাপারটা কী চোখে দেখবে তা কি তোদের পক্ষে এখনই বলা সম্ভব!

—তোমার সঙ্গে কথার প্যাঁচে আমি পারব না। অত ভাবলে আর সংসার করা চলে না।

—এবার আসি তোর পরের কথায়। তুই কী করে জানলি যে তোরা এলে আমরা ভালো ব্যবহার করব যেহেতু তুই সম্পত্তির ন্যায্য দাবিদাওয়া ছেড়ে দিয়েছিস? করলেও তোদের মনে একটা সন্দেহ খচ্‌খচ্‌ করবে। আসবে না-দাবি সম্পত্তিই ভালো ব্যবহার করছে না আমরাই করছি।—তা নিয়ে তোদের ধন্দ কাটবে না। সুতরাং ওসব ছেঁদো কথা ছাড়। সংসার বড় খতরনাক। বুদ্ধ গান্ধি ডাঁহা ফেল হয়ে যাচ্ছে আমাদের কাছে। আমাদের ক্ষমতাটা ভেবে দ্যাখ।

—কথা কাটাকাটি করার ধাত তোমার জন্ম থেকেই পাওয়া। অত কথায় কাজ নেই। সম্পত্তি দিলেও নেব না। ব্যস।

দুই

—মামা!

—কে অনীত! আয়। তোর মা ভালো আছে তো?

—ভালো, তবে হাঁটুর ব্যথাটা একটু বেড়েছে। তোমরা কেমন আছ, মামা?

—চলছে। তারপর তোরা সব কে কেমন আছিস?

—ভালো।

—হ্যাঁ রে মাকে ঠিকঠাক দেখিস তো?

—মাকেই জিজ্ঞেস করে নিও মামা।

—ভালো লাগল তোর উত্তর। আসলে সুদেব মারা যাবার পর তোর মা তো খুব একা হয়ে গেছে। তারপর তোর আর সোমার কোনো সংসার এখনও হয় নি যে তোদের ছেলেপুলে নিয়ে ভুলে থাকবে। যাক সে কথা। ভেতরে যা।

—যাচ্ছি। তার আগে একটা কথা আছে মামা।

—বল কী বলবি?

—চেকটা দাদা দিয়ে এল। অত টাকা! মা তোমায় চেকটা ফেরৎ দিতে বলল।

—তোর মায়ের মরে গেলেও বুদ্ধি গজাবে না। মা বলল আর চলে এলি। বলিহারি তোর মাতৃভক্তি! আরে বোকা, টাকাটা আমি কোথায় তোদের দিলাম! তোদেরই টাকা তোদের ফেরৎ দিয়েছি।

—আমাদের টাকা?

—নয়তো কী? তোর মা তোর দাদামশায়ের সম্পত্তির আধাআধি তো পেত। সে সম্পত্তি বিক্রি করে জমা রাখলে তো সেই টাকা সুদেমূলে আজ প্রায় ও জায়গাতেই দাঁড়াতো। অবশ্যি দীপুর কিছু টাকা ওই টাকার সঙ্গে যোগ হয়েছে। তা দীপু ডাক্তার। রোজগারপাতি তো কম করে না। আর তা ছাড়া তোর ডাক্তারি পড়ার খরচখরচাকে টেনে নিয়ে যেতে হবে। ও টাকা তো লাগবেই। অবশ্য নিজে পড়তে পড়তেও রোজগারের কিছু চেষ্টাচরিত্র করবি। চিঠিতে তো সে কথা লিখে দিয়েছি। যতটা পারবি ওই টাকা থেকে যদি কিছু কেমন সাশ্রয় করতে চেষ্টা করবি। বোনের বিয়ে থা-র ব্যাপার আছে তো! পড়তে গিয়ে যেন পাখা না গজায়। ভালো কথা, চিঠিতে লিখেছিলাম, তোর মায়ের হাতে সব টাকা জমা রাখতে। রেখেছিস তো।

—হ্যাঁ মামা।

—ভালো। মায়ের হাত থেকে মাসে মাসে টাকা নিবি। প্রতিমাসের পাইপয়সার খরচার হিসেব মায়ের কাছে লিখিতভাবে দিবি। হ্যাঁ, যেমন লিখে দিয়েছি, তোর দাদা কয়েক মাস অন্তর অচলার কাছে গিয়ে খেপে খেপে হিসেবের কাগজগুলো আমাকে জমা দেবে। একটু এদিক ওদিক হলে বাকি টাকা তোর দাদা আবার আমার কাছে নিয়ে আসবে। তৃপ্তির বিয়ে থা-তে সেই টাকা কাজে লাগবে। আর ডাক্তার হয়ে গেলে ও টাকা তোর মাকে আবার শোধ করতে হবে। বলতে পারিস, তোকে পড়ার জন্যে মেয়াদি ঋণ দিল তোর মা। এলি ভালো হল। কথাগুলো ফের তোকে সরাসরি বলার সুযোগ পেলাম।

তিন

—বাবা, আমায় ডেকেছো?

—হ্যাঁ, শোন, তোমায় বলা হয়নি। অচলার সব টাকা আমি অচলাকে দিই নি। তাই তোমার কাছ থেকে মোটা টাকা আমাকে ধার করতে হল সুলগ্নর পড়ার খরচের জন্যে।

—ধারের কথা কেন তুলছ বাবা? আমি তোমায় টাকার ব্যাপারে একটা কথাও বলেছি!

—বলনি বলেই তো আমায় বলতে হল। কিছু বললে তো বাড়তি টাকাটা আমি তোমার কাছে নিতাম না। যেমন করে হোক, ব্যবস্থা করতাম। যাই হোক, যেজন্য ডেকেছি, সেটা শোন। বাকি টাকাটা আমার সঙ্গে তোমার নাম যোগ করে ব্যাঙ্কে জমা রাখতে চাই।

—কেন বাবা, যেমন আগে করেছিলে, তেমনি পিসিমার নাম ও তোমার নামে করলেই তো পার। পিসিমাকে আগেও জানাও নি, খালি সইটা প্রথমেই করে নিয়েছিলে। এবারেও তেমনি না জানিয়েই...

—না। শোন, কারণ ছাড়া আমি কোনো কাজ করি না। আমি বললে ও সই করে দেবে। আগের মতই কিছু জিজ্ঞেসই করবে না। কিন্তু মেয়েটার বিয়ে এখনও বেশ কয়েক বছর দেরি হবে। তখন আমি বেঁচে থাকতে নাও পারি। সুলগ্না ডাক্তারি পড়তে যাচ্ছে। জানিনা, ওর স্বভাব চরিত্র এই চরম বদলি পরিবেশে কেমন থাকবে! শেকস্‌পীয়ার বলেছেন, চরম খারাপ ভেবে রাখলে তুলনামূলক খারাপটা হয়ত এড়াতে পারা যায়। চরম খারাপটাই ভেবে রেখে এই ব্যবস্থা করলাম। যদি তেমন হয়, তবে তার আঁচ বুঝে তুমি ওই টাকাটা তুলে তৃপ্তির বিয়েতে দিবে। বলবে, বোনের বিয়েতে তুমি টাকাটা দিচ্ছ। বললে, দোষও হবে না। মনের দিক থেকে তুমিও কোনো ধাক্কা খাবে না। কারণ তুমি অনেক কটা টাকা এখন দিয়েছ বলেই না, ওই টাকাটা আমি জমাতে পারছি। তুমি আমার ছেলে। তোমাকে অনেক বাজিয়েও বিশ্বাস আমার আছে যে তুমি ও টাকা ওদের ঠিক সময়ে দিয়ে দেবে। আর সুলগ্ন যদি ঠিকঠাক থাকে, বোনের বিয়ের সব রকম দায়দায়িত্ব যদি কাঁধে নেয়, তবে তোমার সামনে দুটো রাস্তা খোলা থাকবে। একটা হচ্ছে যা ধার দিয়েছ তা শোধ করে নেওয়া আর একটা হচ্ছে বোনের বিয়েতে বাড়তি কিছু টাকা পয়সা দেওয়া। দুটোর মধ্যে যে কোনো রাস্তা তুমি বাছতে পার। কোনোটাই অন্যায় হবে না। তবে বোনের বিয়েতে বাড়তি কিছু টাকা দিলে, স্বর্গেই থাকি আর মর্ত্যেই মরা-বাঁচা হয়ে থাকি, বাড়তি একটু খুশি তো আমি হব। বুঝলে।

হাটে কেনা খেতমজুর

স্বপন পাঁজা

কাটোয়া রেলব্রিজে দাঁড়িয়ে খেতমজুরদের হাটটা জরিপ করে নিলো অশোক সামন্ত। এর মধ্যেই বেশ কয়েকটা দল বসে পড়েছে স্টেশন চত্বরে। প্লাটফর্মেও রয়েছে কয়েকটা। একটা ছোটোখাটো দলকে কব্জা করতেই হবে। এবারে আর দালালের খপ্পরে পড়তে চায়না। তাই ধান পাকতে না পাকতেই, কালীপুজোর পরের দিনই, সকাল সকাল সে এখানে এসেছে মুনিষ নিয়ে যেতে।

স্টেশন চত্বরে এসে দেখে তার গ্রামের বন্ধু বৃন্দাবন ঘোষ একটা দলের সঙ্গে দরদাম করছে। আদিবাসীদের দল। মরদ-কামিনী-বাচ্চাকাচ্ছাদের নিয়ে জনাকুড়ি হবেই। আদিবাসীদের দল এখানে বেশি আসে না। আগে ভিনরাজ্যের দুমকা থেকেই এদের আনতে হতো। মনিববাড়ি পছন্দ হলে এরা নিজেরাই চলে আসে। সেসময় ওরা অপেক্ষা করতো একটি পোস্টকার্ডের, আর এসময় মোবাইলে ফোন করে জেনে নেয় কবে যেতে হবে।

তিন-চারটে পরিবারের এক-একটি আদিবাসী দল সাধারণত এক মনিববাড়িতে যেতে পছন্দ করে। রাতে ওরা ভাত রান্না করে খায়, সকালে সেই পান্তা খেয়ে কাজে যায়, দুপুরেও সেই পান্তা। মনিবের দেওয়া কোনো এক চালাঘরে তাদের বাচ্চাদের সারাদিন দেখভাল করে ওদেরই নয়-দশ বছরের ছেলেমেয়েরা।

অশোকের মাত্র সাত-আট বিঘের চাষ। তাই পাঁচ-ছয় জনের মুর্শিদাবাদী দল নিতে চায়। এইসব মুনিষরা মুর্শিদাবাদের বালিচরের। ওই অঞ্চলেই জন্ম বালুচরী শাড়ির। এখন আর তাঁত নেই। সেইসব তাঁতিদের বংশধরেরা কবে থেকেই পরিযায়ী খেতমজুর। বর্ষায় এদের চর বন্যায় ভেসে যায়। তাই বর্ষায় ও হেমন্তে আশেপাশের জেলায় খাটতে যাবেই ওরা। তবে গ্রীষ্মে ওঠা ফসলের চাষে এরা বেশি যায় না। তখন চরেই ওদের অনেকের মজদুরির সুযোগ ঘাটে। খাটতে এসে মনিবের দেওয়া চালাঘরেই এরা থাকে, খায় মনিবের বাড়িতেই। তবে মনিবের বাড়ির সব রান্না যে ওদের জোটে না, তা ওরা জানে। আদিবাসীদের মতো এরাও সকাল থেকে সন্ধে শ্রম বিক্রি করে, কোনো মে' দিবসের আট ঘণ্টা নেই ওদের।

অশোক ও বৃন্দাবন পছন্দমতো মুনিষ নিয়ে বাড়ি ফেরার বাসের ছাদে তুলে দিলো তাদের। বাস ছাড়তে দেরি আছে। দু'জনেরই চোখে তৃপ্তির হাসি। অশোক বলে, 'তুই তো আদিবাসী কামিনী না নিয়ে ছাড়বি না! তা মজুরি কতো হল?' বৃন্দাবন বলে, 'মরদ তিনশো আর কামিনী আড়াইশো। আর দু'কেজি চাল তো আছেই। এই চালই তো ওরা অনেকটা বাঁচিয়ে বাড়িতে নিয়ে যাবে।' অশোক বলে, 'লাভ কী হল? আমিও তো তিনশো টাকা মজুরি চুক্তি করলাম। তবে বাড়িতে খাবে, এই যা!' বৃন্দাবন বলে, 'আমি যে দুটো ফাউ পেলাম, দেখলি না?'

—'ফাউ?'

—'ওই যে, আদিবাসীদের দলে দুটো নয়-দশ বছরের ছেলে রয়েছে না? কেজিখানেক চাল বেশি দিলেই ওই দুটোকে বিনা মজুরিতে খাটিয়ে নেওয়া যাবে! কথা বলে নিয়েছি।'

রাম-ধাক্কা

তপোময় ঘোষ

তৃতীয় সিগারেটটা ধরানোর সঙ্গে সঙ্গে ও ঘর থেকে প্রিয়া যেন ধমকের সুরে জিগ্যেস করল, কী হচ্ছে দাদু? আবার সিগারেট! ঘুম আসছে না? খুব টেনশন করছ...

—তুই-ও তো ঘুমোস নি! আমাকে লক্ষ করছিস! পড়া নেই!

—পড়ছিলাম তো! তোমার ঘরের দরজা খোলা; বাইরে বারান্দায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে একের পর এক সিগারেট ধরাচ্ছো আর টানছো, আমি লক্ষ করছি না ভাবছো? যাও। সিগারেট ফেলে ঘুমিয়ে পড়ো গে!

প্রিয়ার কথা ফেলে দেওয়ার ক্ষমতা এই মুহূর্তে এ বাড়ির কারোর নেই। রামকান্তির তো নেই-ই। প্রিয়া এবার মাধ্যমিক পরীক্ষা দেবে। ক্লাস টেনে স্কুলে ফার্স্ট হয়েছে। সেই সেভেন থেকে, দাদু যেবার থেকে অঞ্চলের প্রধান হয়েছে, দাদুর গাড়িতে স্কুল যায়। আসে। দাদু জানে, যতই বলা হোক, রাজ্যে যা দিনকাল চলছে, তাতে এই বয়সের মেয়েদের একা একা স্কুলে পাঠানো যাবে না। এলাকার বাঘ, নির্ভীক রামকান্তিও তাই, রাজনৈতিক বক্তৃতামঞ্চে যা-ই বলুক, নিজের নাতনিটাকে স্কুলের গেটের কাছে ড্রপ করে তবে কুসুমপুর যায়।

পাশের ঘর থেকে আবার ধমক আসে নাতনির, কী হলো, ঘরে যাও। ঘুমিয়ে পড়ো..., যা ভাবার আবার কাল সকালে ভাববে। যাও...। এবার আরো স্পষ্ট, জোরালো ধমক। ঘরে ঢুকতে বাধ্য হয় রামকান্তি। বিছানায় উঠে, আলোটা নেভায়। তার স্ত্রী নীরারানি ঘুমিয়ে কাদা। রাম বিছানায় বসে সেই টেনশনই করে। আজও রাত এগারোটা পর্যন্ত ফোনটা এলো না...

রামকান্তির সঙ্গে তার কথা ছিল, এবারও কুসুমপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের মহামান্য প্রধান হবে সে-ই। এই জমানায় একজনকে প্রধান হতে গেলে যা যা করতে হয় রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিকভাবে রামকান্তি অক্ষরে অক্ষরে তা পালন করে এসেছে। এই পঞ্চায়েতটিকে পরিচালনার জন্য দলের যখন যে নেতা দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়েছেন, রামকান্তি তাকেই সন্তুষ্ট করেছে। নিদেনকালে গোটা পঞ্চায়েতটাকে আনকনটেস্টেড করিয়ে দিল, নিজস্ব ক্যারিস্মায়। এ ঘটনায় নেতারা, সবাই তো সন্তুষ্ট। প্রধান পদের দাবিদার সুতরাং রামকান্তি হতেই পারে। হয়েছেও। মনে মনে সে তো এখনও কুসুমপুর গ্রাম পঞ্চয়েতের প্রধানই। এখনও এই আগস্টেও ওই অফিসিয়াল কাগজে-কলমেও প্রধানই। তবুও সংশয়? না-কি প্রত্যয়? এই দ্বন্দ্বে চোখে ঘুম আসে না। টেনশনটা ধরে ফেলে প্রাণের অধিক নাতনি, প্রিয়া।

যত রাত গভীর হয়, রামকান্তির ভাবনাও। যুক্তির পর যুক্তি উদয় হয় তার মনে। পাল্টা গোষ্ঠীর নেতা তো ওই ভবা মানে ভবতারণ পাল। আজকে রামকান্তিকে যে দাদা ফোন করে দলের সর্বশেষ সিদ্ধান্তের কথাটা জানাবে বলেছিল, তেমন এক দাদা তো ভবারও আছে। আছেই তো! কোনো সন্দেহ নেই, তারও যথেষ্ট

প্রভাব আছে ওপর মহলে। যে-কোনো সময়ে দলীয় স্তরে সিদ্ধান্ত হয়ে যেতে পারে, কুসুমপুরের এবারের প্রধান হবেন ভবতারণ পাল। টেনশন, দুশ্চিন্তা, গায়ে ঘাম তার জন্যই। প্রিয়া বকলেই তো আর হবে না। তার ঘুম এখন আসবে না।

দুই

কাঁকুরহাটি গ্রামে পাঁচ নম্বর ট্র্যাক্টরটা আজই ঢুকিয়েছে পুষ্পেন পাল। সেই আনন্দে নিজেই আনাড়ি হাতে চালাতে চেয়েছিল। বাগদি পাড়ার মোড়ে চাপা পড়ে গেল ছেলেটা। অল্পের জন্য বেঁচেছে। তাণ্ডব দেখাতে ছাড়ে নি বাগদিরা। পুষ্পেনকে মেরেই ফেলত। পালিয়ে বেঁচেছে সে। ভবা পালের ছেলে বলে এখানে খাতির নেই। বাচ্চা ছেলেটাকে চাপা দেওয়ার অপরাধ, বাবা নেতা বলে যে কমে না, সেই সত্যটা পাড়ার লোকে জানিয়ে ছাড়তো। কুড়ো ডোমের ঘুটের মাচায় লুকিয়ে সারাটা বিকাল কাটিয়ে রাত্রে বেরিয়ে নদির গাবা পেরিয়ে ছুট লাগিয়েছিল পুষ্পেন।

আরে বাবা ট্র্যাক্টর চালাতে জানিস না, তো চালাতে গেলি কেন? গেলাম ড্রাইভারকে পুষবো না বেশিদিন বলে, লখা বরিগ্যির বেটার কাছে শিখে নিয়ে নিজেই চালাবো, তবেই তো লাভ হবে! ট্রাক্টর কিনেই বা লাভ করতে হবে কেন, আর কিছু ছিল না? না, ছিল না। ক'বিঘে জমি আছে গাঁয়ের মাঠে যে ট্র্যাক্টরের ফালে চষবি? না রে বাবা, জমি চষার জন্য নয়—এ ট্র্যাক্টরে ডালা লাগিয়ে বালি তুলে বেচবো।

কে কিনবে তোদের বালি? সবাই কিনবে। এই তো গাঁয়ের যারা 'আবাসন যোজনা'-র টাকা পেয়েছে তাদের পাকা বাড়ির বালিটা তো এবার আমিই দোব। একদিন তো এসব বাড়ি তৈরির বালি সাপ্লাইটা রাম পাঁঠার সাগরেদরা করত। আমার বাবাও ওই পার্টির নেতা। শুধু কি বাবার দৌলতে? আমি নিজেই তো দেখেছি। ওই সব ভেতরের গায়েঁর। যে গাঁগুলো নদীর ধার থেকে অনেক দূরে থেকে এই অজয়ে বালি তুলতে আসে, আমাদের ঘাটে। তারা যখন পুলিশের তাড়া খেয়ে আমাদের আখের জমির আড়ালে লুকোতো, তখন তো আমরা পুলিশের সঙ্গে কথা বলে জেনেছি, কিন্তু ওরা থানায় দেখা করেনি, মানে টাকা ঘুষ দিয়ে আসে নি তাই... 'রেইড' করতে আসতে হয়েছে। পুষ্পেন ছুটতে ছুটতে আপন মনে আওড়ায় এসব কথা।

কাঁকুরহাটির পাশ দিয়ে চলে গেছে অজয় নদী। বালিতে পরিপূর্ণ। বছরের আট মাসই জল থাকে না। শুধু ধু ধু বালি। পুষ্পেনদের মনে হয়েছে, তাদের সেই বালি, অন্য গ্রাম, শহরের বালি-মাফিয়ারা তুলে নিয়ে গিয়ে ব্যবসা করছে। ল্যান্ড অফিসের পারমিশন নিয়ে যে বৈধ ঘাট আছে, তার বাইরে এখান-ওখান থেকেও চোরা-গোপ্তা বালি তুলে চম্পট দেয় ওই সব বাইরের পার্টি। কাঁকুরহাটির যুবকদের মনে হয়েছে, তা হবে কেন? আমরাও তো এই বালির ব্যবসা করতে পারি! নদী তো আমাদেরই!

তাই তো যে কাঁকুরহাটিতে মাত্র একটা ট্র্যাক্টর জমি-চষার জন্য ছিল, তা বেড়ে এখন পাঁচটা হয়ে গেল। এ গাঁয়ের ছেলেরা নিজেদের জমির ধারে, নদীতে ঘাট বানিয়ে তুলছে বালি। পাঠাচ্ছে এ দিক, ওদিক। হ্যাঁ, দরকারে দেখা করছে থানাতেও। বড়বাবু-মেজবাবুদের সঙ্গে হয়ে যাচ্ছে চুক্তি। এভাবে এই ছোট্ট গাঁয়ের নদীর ধারে বাঁশতলায়, পাকুড়তলায়, এ-তলায় সে-তলায় ঘাট তৈরি হয়ে গেছে। গাড়ি, বিশেষত ট্র্যাক্টর উঠছে, নামছে।

পুষ্পেনের খুব হিসেব ছিল সরকারের 'আবাস যোজনা'-র টাকা পাওয়া লোকগুলোকে বালি দেবে। এ বছর এই গ্রামে বাহান্নটা ঘরের টাকা বেরিয়েছে! আগের বছরগুলোর তুলনায় অনেক বেশি! এ কাজটা করার জন্য বাবার প্রভাব লাগবে না।

তিন

রামকান্তি খবরটা পেয়ে বেশ খুশিই হল। বাগদিদের ছেলেটা মরলে হয়ত একটু দুঃখ হতো। আঘাত পেলেও ছেলেটি মরেনি অথচ ভবার বেটা তাড়া খেয়েছে, শুনে খুব সুখী সে। গত রাতের টেনশন আজ সকালে উধাও। ফুরফুরে মেজাজে নাতনি প্রিয়ার সঙ্গে ব্রেকফাস্টের টেবিলে একটু ইয়ার্কি-ফাজলামো-খুনসুটি।

—ওভাবে টেনশন করো না দাদু! টেনশন বাড়লে সুগার বাড়ে দাদু!

—ঠিক বলেছিস! আর টেনশন করব না। আজ আমার মনে আবার শান্ত। কোনো টেনশন নেই! মেজাজ আজ একেবারে ফুরফুরে।

—কী এমন ঘটলো গো, রাতারাতি মেজাজ ফুরফুরে হয়ে গেল?

—বুঝতেই তো পারিছস আমরা রাজনৈতিক মানুষ। দেশের দশের ঘটনা-দুর্ঘটনার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। তাদের দুঃখে দুখ তাদের সুখে সুখ...

—বেশ। ঠিক আছে। ডিম সেদ্ধ খেয়েছ? এবার চা টা খেয়ে নিয়ো। আমি উঠলাম। পড়তে যাব।

চা খেয়ে রামকান্তি যথারীতি তার বসার ঘরে এসে বসল। অঞ্চলের এক নম্বর মানুষ হওয়ার সুবাদে, দর্শনার্থীদের ভিড় তো লেগেই আছে। আজ সকালটাও তার ব্যতিক্রম নয়। এ গাঁ, ও গাঁ, সে গাঁ, থেকে বেশ কয়েকজন এসেছে। শহরের চকচকে লোকও আছে, দু একজন। ওরা কনট্র্যাক্টর। সবার দরকার রামকান্তিবাবুর সঙ্গে।

খোদ কুসুমপুরের রতু দত্ত এসেছিল তার বেটাদের নামে নামে আলাদা আলাদা ট্রেড লাইসেন্স করানোর কাগজে সই করাতে। শিমূলডাঙার পেঙা বাউড়ির ঘরের টাকা বের করে দেওয়ার জন্য পঞ্চাশ হাজার টাকা চেয়েছে, রামের দলের ওই গাঁয়ের ছেলেরা। তাকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে বাড়ি পাঠাতে হিমসিম খেতে হলো। হাসু সেখ এসেছিল, তার শালির ওপর অত্যাচার করছে তার ভায়রা। তাকে ডেকে মীমাংসা করার ভার নিতে হল রামকান্তিকে। গুরুপদ রায় পাকা বাড়ি তুলবে, তার সীমানা নির্ধারণ পঞ্চায়েত ছাড়া হবে না। গতকাল ভাই তার রামদা দেখিয়েছে। এদের সবাইকে ছাড়ার পর শহরের প্রদীপ সরকারকে নিয়ে বসল রাম।

—হ্যাঁ, বলুন!

—কী আর বলবো, এখন আপনারই তো বাজার দাদা?

—কী রকম?

—আর কাউকে ধারে কাছে দেখছি কই!

—না গো, আছে... ভবতারণ এখনও লড়ে যাচ্ছে...

—তার কী হয় দেখুন! এখনই সে আপনার কাছে আসছে...

—গতকাল কাঁকুরহাটিতে কী হয়েছে, জানেন না?

—খুব জানি! কিন্তু কোনো কেস তো হয় নি। পুলিশের কাছে তো বাগদিরা যায়-ই নি।

—পুলিশ তো বালির টাকা আনতে গেছিল। কিছু টাকাও পুষ্পেন দিয়েছে। আরে ব্যাপারটা থানা পুলিশের নয়। সে

আপনাকে ভাবতে হবে না। এ যাত্রায় আপনার পথ নিষ্কণ্টক! তৈরি থাকুন আবার শপথ নেওয়ার জন্য।

—সে দেখা যাক।

—কিছু দেখতে হবে না। বাজারে আর কেউ নাই। তৈরি থাকুন। হ্যাঁ, এবার বলুন, আমার ব্যাপারটা কী ভাবলেন?

—হয়ে যাবে গো...

—কাগজটা তো এনেছিলাম, সইটা...

—কই দিন। প্রদীপ সরকারের এগিয়ে দেওয়া কাগজটা হাতে নিয়ে সই করতে যাওয়ার আগে হঠাৎ ঝটকা মেরে হাতটা সরিয়ে নিয়ে বলল, আর বাকিটা...?

—ঠিক পেয়ে যাবেন, সইটা লাগান তো...। আপনাকে সন্তুষ্ট না রাখলে হবে? আরও পাঁচ বছর আপনার কাছে আসতে হবে, আর আপনাকে সন্তুষ্ট রাখবো না!

চার

সমস্ত ঝামেলা কাটিয়ে পুষ্পেন সাত দিনের মধ্যে আবার একটা ট্র্যাক্টর কিনে ফেলল। এটা পুরনো শিমুলডাঙার ফণী মোড়লের। নিজেদের জমির ধারে, পগার কেটে বাঁশতলা ঘাটের কাছেই একটা বালি-তোলার পথ-ঘাট বানিয়ে ফেলল ভবতারণের বেটারা।

পুলিশ ভবতারণকে তো বটেই রামকান্তিকেও বলল, ব্যাপারটা ভালো হচ্ছে না। বি.এল.আর.ও সাহেবের চাপ আছে। আমাদের সঙ্গে দেখা করতে বলুন। না হলে আমরা স্টেপ নিতে বাধ্য হবো। জানেন তো এস.ডি.ও. সাহেবকে।

ভবতারণ একদিন থানায় গিয়ে বড়বাবুকে জানিয়ে এলো তার পুত্র বালির কোনো বে-আইনি ব্যবসা করছে না, করবেও না। এখন গাঁয়ের গরিবদের ঘর হচ্ছে তো, সেজন্যে বালিটা দিচ্ছে। বুঝতেই তো পারছেন, লোকগুলো ভোটটা তো আমার কথাতেই দেয়।

—ধ্যৎ, ভোট কোথা মশাই...! আপনারা তো মেজবাবু কথাটা বলতে যেতেই, বড়বাবু চোখ টিপে ইশারায় থামালেন। অপ্রিয় সত্যি কথা শুনতে কেউ ভালোবাসে না। বলতেও অনেকে ভয় পায়।

নির্ভয়ে বালির ব্যবসা চলতে থাকল পুষ্পেনদের। নিজেদের নদী, নিজেদের গাঁ, নিজের জমির পগাড় কেটে ঘাট, কে থামাবে? এ কি ওই ভেতরে কেতুগ্রামের কোনো গাড়ি নাকি? কাঁকুরহাটিতে এখন দশ দশটা ট্র্যাক্টর। রামকান্তি অনেক চেষ্টা করেছিল, ভবতারণের এ কারবারটা বন্ধ করে দিতে। পারে নি।

পাঁচ

রামা-ভবার দ্বন্দ্ব যখন চরমে চলে যায়, তখন প্রণব স্যারকে ময়দানে নামতে হয়। ওপরের কোনো বড় নেতাকে এনে আলাদা আলাদাভাবে বসে তাদের দুজনেরই পিঠ চাপড়ে বলতে হয়, ঠিক আছে যাও, এই ভোটটা যাক তারপর ও (কখনও ভবতারণ, কখনও রামকান্তি) কোথা যায় দেখছি! এভাবে প্রায় প্রতিটি ভোটেই ওরা দ্বন্দ্ব ভুলে সিপিএম সহ বিরোধীদের হটিয়ে ভোট করেছে আর পরে আফশোষ করেছে। অবশ্য এ বছর ভোট না করে ভোট বন্ধ করতে হয়েছে। তা-ও এক সঙ্গেই করেছে। পরে আবার দ্বন্দ্বে জড়িয়েছে।

এবার এখন তো প্রধান নির্বাচনের মতো খুবই ভাইটাল প্রশ্নে দ্বন্দ্ব, একেবারে মুখোমুখি। দু-জনই ওই এক পদের দাবিদার। খুব মুশকিল তাই প্রণব মাস্টারের। যদিও দলে কোথা কী তত্ত্ব আছে জানা নেই, তবুও নাকি প্রণববাবু এখানকার তাত্ত্বিক নেতা। তার ওপর স্থানীয় হাইস্কুলে পড়ায়, মাস্টার। তার প্রভাব নাকি রামা-ভবার চাইতে বেশি। দলের ভেতরে বাইরে। প্রণবের বউ-বিটি অবশ্য বলেছে, তুমিই আগে খুন হবে!

এলাকার মানুষেরও আশঙ্কা, এবার প্রধান নির্বাচনটা নিরামিষ হবে না। আগেরবার তো রামকান্তিরাই গরিষ্ঠতা পেয়েছিল। রামকান্তি তখনও তো...

সে যাই হোক, ভোল বদলে এখন ও শাসক দলের ছোটো শাসক, অঞ্চলের রাজা। দীর্ঘদিনের প্রধান। পুরনো অভ্যাসের মধ্যে আছে যারা, তাদের ভোট দেয় না, মিটিং-এ মিছিলে আসে না, তারা কোনো কাজে এলে এক রাউন্ড বকে দেওয়া : এ্যাই তোরা তো ভোট দিস না...

প্রিয়া একদিন হাসতে হাসতে বলল, দাদু, এবার তুমি প্রধান হলে, ভোট দিসনি কথাটা তো আর বলতে পারবে না। তোমরা তো ভোট করতেই দাও নি। তাহলে কীভাবে ভোট না-দেওয়া পাবলিক তোমাদের বকা খাবে?

ব্যাপারটা ভাবালো রামকান্তিকে! সত্যি তো! তারা তো ভোটই চায়নি। মাথা চুলকোতে চুলকোতে রাম প্রণববাবুর কাছে গেল! যে কোনো সমস্যায় সে যায়। ভবাও আসে। কথাটা পাড়তেই প্রণব খুব খুশি হয়ে বলে, তার মানে তুমি আর প্রধান হতে চাইছ না! ভালো তো, এই টার্মটা ভবা হোক!

—না তো, আমি প্রধান হবো না, তা তো বলি নি। বলেছি 'তোরা ভোট দিস নাই' বলে যে প্রথমেই একচোট আমি বকে নিতাম, সেটা কীভাবে বকবো?

—অ, তার মানে তুমিই প্রধান হচ্ছো, ধরে নিয়ে এগুচ্ছো!

—হ্যাঁ, তা তো বটেই।

—তাহলে, তুমি এবার সে ধরনের পাবলিককে বলবে, তোরা আমাদের মিটিং-এ মিছিলে যাস না! এই বলে বকবে।

—আরে, আমাদের মিটিং মিছিল আর হচ্ছে কোথায় যে ডাকবো?

—যেদিন হবে সেদিন ডাকবো।

ফেরার পথে মাথা চুলকোতে চুলকোতে হিসাব কষে রামকান্তি। সারা পঞ্চায়েত এলাকায় ১৬,০০০ লোক বাস করে। ভোটার প্রায় দশ হাজার। তার মধ্যে নমিনেশন আটকাতে ব্লকে ওই দিন কটা গেছিল—বড় জোর একশো দেড়শো ছেলে। তাও ডিম-ভাত, মাংস-ভাতের লোভে! তাদের বাদ দিয়ে সবাইকে বকতে হবে? এ তো কঠিন কাজ।

গোঁজ হয়ে বাড়ি ঢোকে রামকান্তি। নাতনি প্রিয়া বলে, দাদু, আবার তোমার কী হলো?

রাম বলে একটা অঙ্ক মিলছে না!

—কী অঙ্ক গো? খুব কঠিন?

—তা বটে বৈ কি!

নাতনি বলে, তবে যে জানতাম তুমি টাকা পয়সা মারো নি, মারো না... সৎ....

—না, না, না, টাকা পয়সার ব্যাপার নয়... রে...

—তবে অঙ্ক মিলছে না বলছ কেন? আমি কচি খুকি? যাও তোমার সঙ্গে আর যাবো না! একটা চোর কোথাকার...।

স্তম্ভিত রামকান্তির কান্তিটা যেন কালো হয়ে গেল!

জীবনের কামারশালা

গৌরাঙ্গ চ্যাটার্জি

সামনে ভোট, সকাল বেলাতে প্রচারে বার হতে হবে, গজানন সেজে গুজে রেডি, যাবে পায়রাডাঙাতে প্রচার করতে। গতকালই কথা হয়েছে রাবণের সাথে, রাবণ মানে রাবণ টুডু, ও আজ সকালে গজাননকে পায়রাডাঙা যেতে বলেছে। এমনিতে রাবণ কথা দিলে কথা রাখে, তবে সময়জ্ঞান খানিকটা কম, সকাল দশটা বললে এক থেকে দেড়ঘণ্টা দেরি হওয়াটা ওর কাছে কোনো ব্যাপারই নয়। সময়ে কোনো সভাতে হাজির না হওয়াটা ওর কাছে বরাবরের অভ্যাস। গজাননও রাবণের কাজ কারবার বুঝে গিয়েছে এখন কোনো সভা করার কথা হলেই গজানন দেড় থেকে দু ঘণ্টা আগে সভার সময় ঠিক করে। যেমন কোনো সভা সকাল দশটার সময় করার কথা হলে রাবণকে বলতে হবে সকাল আটটা। কারণ আটটা না বললে দশটায় কিছুতেই সভা শুরু করা যাবে না। আজও ঠিক সেভাবেই সকাল আটটায় সভার কথা বলে রেখেছিল গজানন। গজানন সকাল বেলাতেই মনে মনে ঠিক করে পায়রাডাঙা তো আধ ঘণ্টার পথ, সাড়ে নটার সময় বের হবে। তাই সেজে গুজে গজানন সামনের কালী মন্দিরের দাওয়াতে বসে কয়েক জনের সাথে কিছু জরুরি আলোচনা সেরে নিচ্ছে।

এমন সময় গজানন লক্ষ করে রাবণ হাতে একটা খাঁচা ও তাতে একটা ঘুঘু পাখি, আর-এক হাতে একটা ফুট দশেকের বাঁশ, বাঁশের মাথায় বাখারি দিয়ে বানানো একটা গোল চাকা বাঁধা—সেটা কাঁধে নিয়ে হন হন করে গজাননদের বাড়ির পাশ দিয়ে দার্জিলিং ডাঙার দিকে যাচ্ছে। এভাবে রাবণকে দেখে গজাননের চক্ষু চড়কগাছ! ভাবে এ আবার কোথায় চলল? তা হলে তো আজকের মিটিং-এর বারোটা বেজে গেল। ব্যাটা ভুলে গিয়েছে নাকি। হড়বর করে কালী মন্দিরের দাওয়া থেকে উঠে গজানন দৌড়ে পৌঁছে যায় রাবণের কাছে। একেবারে রাবণের সামনে গিয়ে রাবণের পথ আটকে বলে, 'এই, কোথায় যাচ্ছিস? আজকে সভা আছে জানিস তো? এই ঘুঘু পাখি নিয়ে কোথায় যাচ্ছিস? ১০টার সময় মিটিং আর এসব নিয়ে কোথায় চল্লি?' রাবণ উত্তর দেয়—'আরে তোমার মিটিং তো সাড়ে দশটায়।' আবার গজানন ভুল শুধরে দিয়ে বলে—'সাড়ে দশটা নয়, দশটা।' রাবণের সাথে সাথে উত্তর—'হাঁ হাঁ দশটা সাড়ে দশটা একই হল—এখন চললাম শিকারে—দেখি কিছু হয় কি না। আমি ঠিক সাড়ে দশটার মধ্যে চলে যাব, তুমি তো ঠিক সময় যাও! আমি ঠিক পৌঁছে যাব। সবাইকে বলা আছে, দেখবে তুমি যাওয়া মাত্র সবাই চলে আসবে।' গজানন ভাবে, আর চলে আসবে! হল, আজ মিটিং-এর বারোটা বাজল। প্রচণ্ড রাগ ধরে যায় রাবণের ওপর। তাও নিজেকে সামলে নিয়ে গজানন রাবণকে জিজ্ঞাসা করে, 'তা এই ঘুঘুপাখি নিয়ে চললি কোথায়?' চটজলদি রাবণের উত্তর, 'চললাম তুমাদের দার্জিলিং ডাঙার দিকে, যদি দু-চারটা ঘুঘু শিকার করতে পারি!' 'পারবি শিকার করতে? জানিস ঘুঘু কত চালাক পাখি?' রাবণ বলে ওঠে, 'জানব না ক্যানে? তবে আমিও কম চালাক লই—এই যে তুমি দেখছ এই বাঁশ

দিঁয়ে। ইয়ার মাথায় বাখারির গোল চাকাটো বাঁধা থাকবেক, ইবার বাখারির চারিদিকে ডালপালা বেঁধে দিব, বাঁশের গায়েও ডালপালা বেঁধে দিব। এবার বাঁশটো দেখতে গাছের মতন লাগবে। তারপর ঐ ডালপালার ওপরে একদম বাঁশের মাথায় খাঁচার দরজা খুলে ঘুঘুটাকে বসিয়ে রাখব। পায়ে সরু সুতো দিঁয়ে ঘুঘুটো বাঁধা থাকবেক। আর ঘুঘুটো তো কানা, উয়াকে কানা করে রেখেছি। উ দেখতে পায় না। ইবার খাঁচার ভিতরে এমন করে দরজা খুলা থাকবেক যে অন্য ঘুঘু ঢুকলেই খাঁচার দরজা বন্ধ হয়ে যাবেক, তকুন গিয়ে সেটা ধরে লিব।'—বলেই বিজ্ঞের মতো রাবণ তাকিয়ে থাকে গজাননের দিকে, যেন কত জানে!

অবাক হয়ে গজানন প্রশ্ন করে, 'সবই তো বুঝলাম, তা তোর ঐ ঘুঘু এই খাঁচার ভিতর ঢুকবে কেন?'—'ঢুকবেকেই', রাবণ বলে ওঠে, 'আমি খানিক দূরে গিয়ে ঠিক ঘুঘুর ডাক ডাকব, কানা ঘুঘু ভাববেক, উয়ার কুনু সাথী ডাকছে, খানিক পরে আমার এই কানা ঘুঘু নিজেই ডাকতে থাকবেক। তকুন আমি ডাকা বন্ধ করে দিব—কিন্তু কানা ঘুঘু একনাগারে ডেকে যাবেক—তখুন অন্য ঘুঘু যারা মাঠে চড়ছে তারা উয়ার জাত ভাইয়ের ডাক শুনে—এই কানা ঘুঘুটোর কাছে চলে এসে আমার বানানো গাছে বসবেক, আস্তে আস্তে উর খাঁচার ভিতর ঢুকবেক। আর তখুন দরজা আপুনি বন্ধ হয়ে যাবেক, আমি গিয়ে ধরে আনব। তারপর আবার গাছটোকে সামান্য সরিয়ে আবার একই কাজ করব। এরকম ৫-৬ বার করে ৫-৬টা ঘুঘু ধরে লিব, কী এমুন কঠিন কাজ।' গজানন বলে, 'ওরে দেখ এখন ৭টা বাজে, হাতে মাত্র আর ৩ ঘণ্টা, এর মধ্যে তোর শিকার হবে?' রাবণের উত্তর, 'আলবাত হবেক। তুমি চল, দেখবে আমি ঠিক সময়ে হাজির হব আর তোমাকে দেখাব কটা শিকার আজ ধরেছি।' গজানন এবার রাবণকে বলে ওঠে, 'দ্যাখ, শিকার বিকার যা করার কর বাধা দেব না, কিন্তু ভোটের প্রচারের কাজটা ঠিক করে করতে হবে। তোদের পাড়াতে ঐ রাম মাঝি কিন্তু একটা কানা ঘুঘু, ওর চালচলন ঠিকঠাক নাই, দেখবি ও যেন পাড়াতে ডেকে ডেকে যেন তোদের ঘুঘু বানিয়ে না ফেলে—ভালো করে দেখবি।' সাবধান করে দেয় গজানন। পথ আটকে দেওয়াতে এমনিই মনে মনে খানিক বিরক্ত ছিল রাবণ, ওদিকে যেতে দেরি হচ্ছে। বিরক্ত হয়েই রাবণ বলে ওঠে, 'এই রাবণ মাঝিকে অত মুখ্যু ভাবো না, ঠিক সামালে লিব। তুমি যাও তো তোমার কাজে! এমনিতেই দেরি হয়ে গেল।' আর দাঁড়াল না রাবণ, হন হন করে দার্জিলিং ডাঙার দিকে যাত্রা শুরু করে দিল।

গজানন গজ গজ করতে করতে এসে কালী মন্দিরের দাওয়াতে বসে বাকিদের সাথে নিজের কাজ করতে লাগল। গজানন নিশ্চিত ছিল আজ আর রাবণ পড়াতে আসবে না, সারাদিন ঘুঘু শিকার করেই দিন কাটাবে। তবুও দশটা নাগাদ গজানন পায়রাডাঙাতে হাজির হল। এক এক করে আদিবাসী পাড়ার মানুষজন জড়ো হতে শুরু করল, কিন্তু রাবণ না আসলে সভা শুরু করা যাবে না। রাবণের অপেক্ষায় সবাই বসে আছে। বেলা প্রায় বারোটা বাজে, বিরক্ত হয়ে হাতঘড়ির দিকে ঘন ঘন চাইছে গজানন। কিন্তু অবাক হয়ে লক্ষ করছে এই আদিবাসী মানুষগুলোর মধ্যে কোনো তাড়া নাই, সবাই কেমন শান্তভাবে বসে আছে, যেন 'কিসের এত তাড়া?' মিটিং-এ যখন এসেছি তখন তো মিটিং হবেই। বস্, খানিক গল্প-সল্প করা যাক! তারপর না হয় ধীরে সুস্থে আলোচনা হবে? অবাক করা ধৈর্য! আর আশ্চর্য এদের কমিউনিটি সেন্স! এমনভাবে নিজেরা পরস্পরের সাথে কথা বলে, তখন বিশ্ব-ব্রাহ্মণ্ডে কী হল না-হল তা নিয়ে এদের কোনো মাথাব্যথা থাকে না! নিজেদের ভাষায় কী যে আলোচনা করে তা ওরাই জানে। এই আলোচনায় অংশ না নিয়ে গজানন অবাক হয়ে এসব দেখছিল। মনে মনে হতাশ হয়ে গজানন এবার বলে ওঠে, 'তোমরা তো বলছ রাবণ এলে ভালো হতো, ওর বুদ্ধি নাকি অনেক, ওর মতামত ছাড়া মিটিং করা যাবে না, তাহলে কী করব?' এমন সময় মঙ্গলা সোরেন বলে ওঠে, 'ঐ দেখ রাবণ আসছে।' গজানন দেখে, সত্যি রাবণ! ওর সেই কানা ঘুঘু আর বাঁশের যন্ত্রটা নিয়ে আসছে। এসেই একটা বিড়ি ধরিয়ে বসে পড়ল, পাশে ঘুঘুর খাঁচা, আর একটা গামছাতে পুঁটলি করে কী যেন বাঁধা। গজানন বলল, 'ঐ পুঁটুলিতে কী আছে রে?' চোখ টিপে রাবণের উত্তর, 'ঘুঘু দেখছে না, লড়ছে।' এবার রাবণ মঙ্গলাকে নির্দেশ দেয়, 'এই মঙ্গলা, এই গুলান দশরথের দুকানে দিঁয়ে আয় আর ভালো করে ঝাল ঝাল করে রাঁধতে বল। তারপর মিটিন শেষ হলে আমরা উর দুকানে যাব খেঁয়ে দেঁয়ে আপুন আপুন ঘর পালাব।' এবার গজানন বুঝতে পারে ওরা মিটিং শেষে দশরথের মাড়ি মদের দোকানে যাবে, দু-চারটা যা ঘুঘু ধরেছে তার মাংস আর মাড়ি মদ খেয়ে তারপর যে যার ঘরে ফিরে যাবে। গজানন এতদিন এদের সাথে মিলে মিশে বেশ বুঝতে পেরেছে এসব মাঝ-বয়সীদের মাড়ি মদের নেশা ছাড়ানো কঠিন! কতবার বলেছে কিন্তু কে শোনে? তাও বেহায়ার মতো আবার বলল, 'আজকে ওগুলো খেতেই হবে? না খেলেই নয়?'

ভীম মাঝির বয়স হয়ে গিয়েছে—ঘুঘুর মাংস আর মাড়ি মদ জমবে ভালো বলে বেশ খুশ ছিল। গজাননের এই কথা শুনে খানিকটা বিরক্ত হয়ে বলে উঠল, 'তুমি কী বুঝবে, আমরা কি এত সহজে মদের নিশা ভুলতে পারি? না পারব না। কবে থেকে মদ খেচি জান? যখুন মুখে কথা বাহির হয় নাই তখুন থেকে। যখুন মা-বাবা মাঠে মালিকের কাজ করত তখন ভ্যাঁ ভ্যাঁ করে কাঁদতুম আর আমাদিকে চুপ করাবার জন্য মা ঠুটে খানিক মহুয়ার মদ মামান দিত—মিষ্টি মদ জিভ দিঁয়ে চাটতুম—নিশা লাগত, ঘোরে চুপ করে থাকতুম। ই নিশা কি সহজে যায়? তবে হ্যাঁ, তুমি এই ছেলে-ছোকরাগুলোকে বারণ করতে পার আর ইয়ারা পড়া লিখা করছে ইয়ারা খায় না।' বলেই ১৮-২০ বছরের যারা বসে ছিল তাদের দিকে তাকিয়ে বলল, 'হ্যাঁ রে তোঁরা কেউ মাড়ি খাস নাকি?' ওরা সবাই সমস্বরে জবাব দিল, 'না দাদু—আমরা ইস্কুলে কলেজে পড়ছি—ক্যানে খাব?' বেশ গর্বের সাথেই এবার ভীম গজাননকে উপদেশ দিল, 'আমাদের সাত কাল গিয়ে আর এককালে ঠেকেছে—আমাদিকে আর বারণ করিস না। এই ছিলা-ছুকরাগুলানকে বল, ইয়াদের মানুষ করা সহজ হবেক। লাও লাও ইবার মিটিংটা শুরু কর, অখুন অনেক কাজ আছে।' দশটার মিটিং একটার সময় করা যাচ্ছে ভেবে মনে মনে খুশিই হল গজানন।

এবার গজানন শুরু করে—'আপনাদের এই গ্রামে আর লাগোয়া গ্রামগুলোতে মোট দশটা আসন, তার মধ্যে এমন আটটা আসন আছে যেগুলোতে শুধু আমাদের আদিবাসী আর তপশিলি জাতির ভোটার অনেক বেশি, এদের সাথে কিছু কলিয়ারির শ্রমিক, আর আমাদের মতো কিছু বামুন কায়েত সমর্থক আছে যারা ভোট দিলেই আমরা এই পঞ্চায়েত দখল করতে পারব—সে জন্যেই আজকের মিটিং, আপনারা কী বলছেন?' কেউ কিছু উত্তর দেবার আগেই দেখা গেল সভাস্থলের পাশ দিয়ে মোটর সাইকেলে করে রামকানাই পেরিয়ে যাচ্ছিল। গজাননকে দেখে মোটরসাইকেলটা আস্তে করে দাঁড় করায়। গজানন জিজ্ঞাসা করে,

‘কী খবর রাম দা? আজ মিটিং-এ থাকবেন না?’ রামকানাই মোটর সাইকেলে বসে বসেই বলে, ‘না ভাই, আজ একটু এখন স্টেশন দিয়ে যাবো, জামাই আসবে, নিয়ে আসতে যাচ্ছি।’ গজানন হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলে, ‘এখনও তো ঘণ্টাখানেক ট্রেনের দেরি আছে, খানিক বসুন, একটুপরেই যাবেন।’ মোটর সাইকেল স্টার্ট দেওয়াই ছিল, রামকানাই গাড়িটাকে গিয়ারে ফেলে সামান্য এগিয়ে বলে, ‘না ভাই আমাকে যেতেই হবে, কাজ আছে, তোমরা কর, আমি পরে সব জেনে বুঝে নেব।’ আর উত্তরের অপেক্ষা করে না রামকানাই, সোজা মোটরসাইকেল চালিয়ে বেরিয়ে পড়ে। একরাশ মোটর সাইকেলের ধোঁয়া ছড়িয়ে পড়ে উপস্থিত জনতার মুখে। রামকানাই চলে যেতেই ভীম মাঝি গজাননকে খানিকটা ক্ষোভের সাথেই বলে, ‘দেখলে তো এই লুকটো তুমাদের কত বড় নেতা ছিল, অখন কমন গা বাঁচাই চলছে। কুনু ঝুট ঝামেলায় থাকবেক নাই। অপিক্ষা করছে আবার কবে ভালো দিন আসবে তার লেগে।’ মুণ্ডলি মেঝান ভীমার কথায় সায় দিয়ে বলে ওঠে, ‘ভীমা দাদা ঠিক বলেছে, উয়ার ঘরে গিয়ে দেখ উ বাসকোতে পাজামা পাঞ্জাবি কেচে ইস্ত্রি রেডি করে রেখেছে, আবার যখুন ভালো দিন আসবেক দেখবে তুমাদের আগে আগে জিন্দাবাদ করতে করতে বেরোছে। সাবধান কিন্তু। এই সব লুকের জন্য ভুট ক্যানে কুনু কিছু করাই খুব মুসকিলের। কী করে লড়ব আমরা?’ গজানন ভাবে ঠিকই বলছে মানুষগুলো। এসব গা বাঁচিয়ে চলা লোকগুলোকে নিয়ে খুবই মুশকিল। কী উত্তর দেবে খুঁজে পায় না।

এমন সময় একজন কলেজ পড়ুয়া ছাত্র উঠে দাঁড়িয়ে বলল, ‘পিসি ঠিকই বলেছে, কীভাবে ভোটে লড়ব?—দেখছেন তো কী রকম জুলুমবাজি চলছে, ওরা এর মধ্যেই আমাদের সব পাড়াগুলোতে হুমকি দিয়ে গিয়েছে—ভোটে দাঁড়ানো যাবে না, ভোট দিতেও যাওয়া যাবে না—গেলেই নাকি বিপদ হবে। আমাদের তো ইচ্ছা যোলো আনা কিন্তু গুণ্ডা, থানা-পুলিশ, সরকার সব ওদের হাতে, আমাদের কী আছে? আমরা কি পারব?’ গজানন উত্তর দেয়, ‘সে জন্যেই তো আমাদের এই সভা, তোমরা যেমন বলবে তেমনই হবে!’ উপস্থিত গ্রামগুলো থেকে আসা সবাই এ ওর মুখ চাওয়া চাওয়ি করতে লাগল, কী বলবে কিছুই বুঝতে পারছে না। অথচ এবারের নির্বাচনে লড়াই করার ইচ্ছে যোলো আনা। সবাই চুপ! রাবণ উঠে দাঁড়াল, বলতে শুরু করল, ‘দেখ আমরা লড়ব, আমরা সব আসনে প্রার্থী দিব—যদি আমরা কেউ ভয়ে দাঁড়াতে না চাই তাহলে আমাদের আশেপাশের এই চার-পাঁচটা গেরাম থেকে লুক দিব। আর শুন, আমরা যদি সবাই এক না থাকি তাহলে আমাদের ইলাকার ঐ কানা ঘুঘু সবাইকে ভয় দেখাবে। ওর কিছুই ক্ষমতা নাই—আমরা যেন ঐ কানা ঘুঘুর পাল্লাতে না পড়ি, তাহলেই হবে।’ সবাই বুঝতে পারে রাবণ কানা ঘুঘু বলতে রাম মাঝির কথাই বলছে। খানিকক্ষণ দম নিয়ে রাবণ আবার বলতে শুরু করে, ‘ঐ রামা তো সবাইকে হুচকাচ্ছে, বলছে আমি তো কত কষ্ট করে পার্টি করেছিলাম, মাইলো ঘাঁটা খেয়ে পার্টি করেছি, মুনিস খেটেছি, দ্যাখ আমার কী অবস্থা করেছে। আমাকে আর পার্টি দেখে না, পার্টিতে আমার কুনু মর্যাদা নাই, আমরা যারা এক সময় না খেঁয়ে কষ্ট করে পার্টি করেছি তাদের কুনু দাম নাই—এই সরকার খুব ভালো, আমাদিকে কত দাম দিছে।’ রাবণের কথা শেষ হয়নি, তার মধ্যেই ভীম মাঝি বলে ওঠে, ‘ছাড় উয়ার কথা, উয়াকে প্রধান কে করলেক? পার্টি! উয়ার ঘরবাড়ি কে করে দিলেক? পার্টি। উয়ার ছিলাগুলান মানুষ হল, কে করলেক—পার্টি। পার্টির নাম নিয়ে চাকরি বাকরি হল, তারপর মানুষের সাথে ব্যবহারই পাল্টাই গেল। একদিন উয়ার ঘর গেইছিলাম, ঘর-দুয়ারের যা চমক! গদিওয়ালা চিয়ার, টেবিল, কী নাই? আমাদের কেঁচের গিলাসে এক কপ চাঁ দিলেক, লিজেরা চিনামাটির কপে চাঁ খেছিল, দেখলুম কপের ইধার থেকে কপে কতটা চাঁ আছে দেখা যেছে। কেঁচের গিলাসে বাহির থেকে গিলাসে কত চাঁ আছে দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু চিনামাটির কপের চাঁ বাহির থেকে কপে কতটা আছে তা আমি বাপু উহার ঘরে এই প্রথম দেখলাম! গজব ব্যাপার! আরও কত গজব ব্যাপার উয়ার ঘরে আছে তা কে জানে? উয়ার ব্যবহারে তো অনেক লুক আমাদের বিরুদ্ধে চলেই গেল, কুনু কিছুর হিসাব দিথ? কুছু বলতে গেলেই তো বলত তুদিকে দিব না, সাব কমিটিকে বলব—তুরা কে?’ এ পর্যন্ত বলেই ভীম গজাননকে উদ্দেশ্য করে বলে ‘তা তুমাদের সাব কমিটিটো কী বটে? উখানে কী হয়? প্রধান, সভাপতি, ইয়ারা উখানে কী বলে, কী করে? তুমরা দেখছো না ক্যানে?’

কী উত্তর দেবে গজানন ভাবতে থাকে। গজাননের উত্তরের আগেই আবার ভীম বলতে শুরু করে, ‘তুমরা শুন, কে কখন কত ঘি খেঁয়েছে তার গল্প এখুন করলে চলবেক নাই। কে কত দিন না খেঁয়ে পার্টি করেছে সেটোও বড় কথা লয়, বড় কথা হল অখুন কে না খাওয়া ওয়ালাদের হয়ে লড়ছে সেটোই। অখুন কে লড়ছে না উয়াদের চামচাবাজি করছে দেখতে হবেক সেটোই, মুখে বড় বড় কথা বললে তো হবেক নাই—এই যি চারিদিকে এত কাণ্ড এত মিছিল মিটিন্ হছে এই সব লুকেরা আসছে? আর উয়াদের যদি বলি তুরা মিটিনে যাচ্ছিস না কেনে? তখন উরা বলবেক ‘আমাদিকে কেউ জানায় না’। আরে তুমাকে কে বলবেক? তুমি কানা, দেখতে পাও না? দিয়াল লিখন, পোস্টার কত কিছু চলছে, তুমার চোখে পড়ছে না? ক্যানে যাবে না? বেশি কুছু বললেই বলবেক ‘তুদের নিতারা আমিদিকে কেউ খবর দেয় না। ‘এ সব ফাঁকিবাজি কথা, আসলে লিজের গুছানো মালকড়ি যদি চলে যায় সেই ভয়ে ইয়ারা গা বাঁচাছে—সাবধান ইয়াদের থেকে।’ গজাননকে সাহস দিয়ে ভীম বলে ‘তুমি ঠিক কর আমরা লড়ব।’ আবার নবীনদের মধ্যে থেকে দু-এক জন বলে ওঠে, ‘তাহলে তুমাদের সামনে থাকতে হবেক।’ শুনে রাবণ আর ভীম এক সাথে বলে ওঠে, ‘থাকব। আমরা তুদের সাথে ঘুরব, তুরা থাকবি তো? ঐ কানা ঘুঘুর গুজুর গুজুর কথা শুনে নাচবি না তো?’

উপস্থিত সবাই ঠিক করে, লড়াই হবে। সবাই লড়বে এবারের নির্বাচনে। আজকের এই সভা থেকেই ১৩ জনের নাম ঠিক করার জন্য উপস্থিত গ্রামের লোকেরা পরপর নাম বলতে থাকে। গজানন খানিকটা ইতস্তত করতে থাকে, বলে, ‘ঠিক আছে আপনারা ২০-২৫ জনের নাম ঠিক করুন, পরে না হয় আবার মিটিং-এর থেকে ১৩ জনকে বেছে নেব।’ ভীম বলে ওঠে, ‘পরে ক্যানে, এখুনি করে লাও। পরে মানে আবার কার সাথে কথা বলবে? ইখানে তো আমরা সবাই আছি। ইখানেই কর।’ গজানন বলতে চেষ্টা করে, ‘না, মানে একটু আলোচনা করে তারপর না হয়—’ গজাননের কথা মুখেই থাকে। রাবণ গজাননের কানের কাছে মুখটা এনে বলে, ‘তুমরাই ঐ সাবকমিটিতে আলোচনা করে তারপর ঠিক করবে নাকি? রাখ তুমার সাবকমিটি—জনগণের উপরে কমিটি?

ইয়ারা বেলছে, করে ফেল, না হলে পরে কিন্তু পস্তাবে।' ঠিক হল এখনই নাম ঠিক হবে। এক এক করে বিভিন্ন পাড়ার লোকেরা পায়রাডাঙা পঞ্চায়েতের প্রার্থীদের নাম ঠিক করে ফেলল। ঠিক হল গোটা গ্রাম এদের নিয়ে নমিনেশন করাতে যাবে।

নমিনেশনের দিন ঝামেলা করেছিল ঠিকই, কিন্তু মানুষের একরোখা মনোভাবের জন্য রাস্তা রুখতে পারেনি। সেদিন নমিনেশন অফিসেও খুব বাধা এসেছিল রামার দলবল থেকে, কিন্তু ভীম, বুড়ো আর রাবণ অদ্ভুত দক্ষতায় সবাইকে একসাথে নিয়ে গিয়েছিল নমিনেশন করাতে, আর ফেরৎও নিয়ে এসেছিল সময় মতো। অনেকগুলো গ্রাম পঞ্চায়েতে নমিনেশন পুলিশ-গুণ্ডাদের নানা বাধার জন্য গজাননদের দল দিতে না পারলেও এই পায়রাডাঙা পঞ্চায়েতে সব আসনে প্রার্থী দিয়েছিল গজাননেরা। প্রার্থী দেওয়ার শেষে গজানন বিশ্রাম নিচ্ছিল।

ওদিকে রাবণ মাঝি তাদের পায়রাডাঙার সবাইকে নিয়ে গিয়ে গাছতলায় সভা করছে। সবারই হাতে শালপাতায় এক ঠোঙা করে মুড়ি আর একটা করে চপ। মুড়ি খেতে খেতেই গাছতলায় সবাই রাবণের কথা শুনছে। রাবণ বলে চলেছে আর সবাই উবু হয়ে গাছ তলায় বসে বসে শুনছে।—'দেখ আজ আমরা কত কষ্ট করে নমিনেশন জমা করলাম, কিন্তু ইটোই সব লয়—আমাদের জিততে হবেক, প্রচার করতে হবেক, সব কিছু করতে হবেক। উয়ারা বাধা দিবেক, হয়রানি করবেক, কিন্তু আমাদের থামলে চলবেক নাই। সব কাজেই তো বাধা আসে। এই যি ক্যাঙারু ভোটে দাঁড়াল, মাধ্যমিক পাশ করে অখুন কলেজে পড়ছে, ইবার ফাইনাল দিবেক, উ কি সহজে মাধ্যমিক পাস করতে পেরেছে? কত বাধা, আমরা সবাই মিলে উকে সাহায্য না করলে, পাশে না দাঁড়ালে উ কি পারত মাধ্যমিক পাশ করতে?' জিজ্ঞাসা করে খানিক দম নেয়। রাবণের পাশেই ক্যাঙারুর মাসি বসে ছিল—উঠে দাঁড়িয়ে এবার একবার রাবণ, একবার ভীম, আরো অনেকের দিকে আঙুল দেখিয়ে বলে ওঠে, 'ঠিকই তো, ক্যাঙারুর ছুটতে মা মরে যাওয়ার পর, ইয়ারা যদি পাশে না দাঁড়াত ছিলাটো এত বড় হতই না।' আরো কিছু বলতে যাচ্ছিল মুঙলী। ভীম ওকে ধমকে ওঠে, 'তুই থামতো, রাবণ কী বলছে শুন।' মুঙলী বসে পড়ে। রাবণ বলতে শুরু করে, 'অখুন সব নির্বাচন আমাদের কাছে মাধ্যমিক পাশের মতো—পড়তে হবেক, চেষ্টা করতে হবেক, না হলে হবেক নাই।' বলেই সবাইকে প্রশ্ন করে, 'জানিস কথাটো বললাম ক্যানে?' সবাই সমস্বরে জিজ্ঞাসা করে ওঠে, 'ক্যানে?' আবার রাবণ বলতে শুরু করে, 'দেখ আমরা তেরোটা লুক ঠিক করলাম দাঁড়াবার জন্য, তাথে কত বাধা, ঘরে ঘরে হুমকি। তা সত্ত্বেও আমাদের তেরো জনকে নিয়ে এলাম নমিনেশন করাতে, ইটো কী পাশ হল?' সবাই আবার সমস্বরে জিজ্ঞাসা করে, 'বল কি পাশ?' রাবণের উত্তর, 'কী, ওয়ান পাশ হল তো? হল কি হল না বল।' সবই সমস্বরে বলে, 'হ্যাঁ ঠিক বলেছে, এবার টু পাশটো কঁরাই দাও।' রাবণ আবার বলে ওঠে, 'টু পাশ তো হোঁয়েই গেলি। এই যি ইয়াদের এত হুমকি, বাধা পার হঁয়ে নমিনেশন করে হাতে সরকারি চুটকা ধরে রেখেছিস—মানে ইটো টু পাশের সার্টিকফিকিট।' উপস্থিত শ্রোতারা এবার পাশে বসা তেরো জনের হাতে ধরা কাগজটার দিকে হুমড়ি খেয়ে দেখতে চাইছে—কেমনতর টু পাশের সার্টিকফিকেট।

মুঙলী মাঝখান থেকে বলে ওঠে, 'ইবার তাহলে ফোর পাশটো কঁরাই দাও।' ভীম আবার খেঁচিয়ে ওঠে, 'একবারে ডবল প্রমোশন লিবি নাকি?' বাকি সবাই বলে ওঠে, 'ক্যানে লিব না? ইখানে যখুন একবার এসেছি তখুন ফোর পাশটো লিতেই হবেক। চল আমরা সবাই অফিসে গিয়ে জিজ্ঞাসা করি, আর কে কে আমাদের গাঁ থেকে নমিনেশন করলেক।' পরিস্থিতি বেগতিক দেখে রাবণ উঠে দাঁড়িয়ে বলতে শুরু করে, 'দ্যাখ শুধু ফোর পাশ লয় আমাদিকে অখুন মাধ্যমিক পাশ করতে হবেক।' খানিক দম নিয়ে বলল, 'জানিস কমুন করে? এই অখন টু পাশ হল। ইবার গাঁয়ে যাওয়ার পর উয়ারা ঘরে ঘরে যাবেক নমিনেশন তুলাবার জন্য হুমকি, লোভ কত কিছু দেখাবেক, তখুন ঠিক থাকতে পারলে থিরি পাশ হবেক। তারপর ঠিকঠাক প্রচার করতে পারলে ফোর পাশ হবেক। তারপর ভুটে এজেন্ট ঢুকাতে পারলে ফাইভ পাশ, তারপর আমাদের সবাইকে ভুট দিতে হবেক—উয়ারা বাধা দিবেক, ভুট দিতে পারলে সিক্স পাশ। ইবার গুনতির দিন গুনতিতে যেতে বাধা দিবেক, ঐদিন যে গুনতি করতে যাবেক তাকে লিখাপড়া হতে হবেক, আর সাহস থাকতে হবেক—যদি উয়াকে গুনতিতে ঢুকাতে পারি আর ঠিকমতুন গুনে বাহির হতে পারে তাহলে সেভেন পাশ হল। কে যাবি গুনতে?' রাবণ জিজ্ঞাসা করাতে পাড়ার কলেজ পড়ুয়ারা সবাই বলে ওঠে, 'আমরা সবাই যাবো।' এবার রাবণ উত্তর দেয়, 'তাহলে সেভেন পাশ করতে পারব। ইবার যে জিতবেক সরকার থেকে তাকে জিতার সার্টিকফিটিক দিবেক—উয়াকেও সার্টিফিকেটটো লিয়ে আসতে হবেক। আসার সুময় কেড়ে লিতে পারে, ঠিকমতো বাহির হয়ে আসতে হবেক। ইটো করতে পারলেই এইট পাশ হব।'

রাবণের বলার মাঝপথে ভীম বুড়ো উপস্থিত সবাইকে উদ্দেশ্য করে বলে, 'হ্যাঁ রে আমাদের তেরো জুনকে সার্টিকফিটিক লিয়ে ঠিকমতুন বাইরে নিয়ে আসতে পারবি তো?' ভীড়ের ভেতর থেকে কে বলে ওঠে, 'পারব না মানে? বাধা দিলে তিরান দিব—বুঝবে ঠ্যালা!' রাবণের উত্তর—'তাহলে তো আমরা এইট পাশ করবই। ইবার সব থেকে বড় সমিস্যা হবে পঞ্চায়েত বোর্ড গঠনের দিন, এই জিতা মেম্বারগুলানকে লিয়ে একসাথে পঞ্চায়েত অফিসে ঢুকানো—কারণ উয়ারা বাধা দিবেক, যদি আমরা ঢুকান দিতে পারি তাহলে কেলাস নাইন। ইয়ার পর আমরা কাকে প্রধান করব তা তো তুমরা ঠিক করে দিবে।' কথাটা শেষ হল না রাবণের, সবাই সমস্বরে বলে উঠল, 'আমরা কিন্তু ক্যাঙারুকে প্রধান করব।' কী আর বলবে রাবণ? চুপ করে থাকে, খানিক পরে বলে, 'ঠিক আছে।' এবার চড়বড় করে হাততালি পড়ে। ভীম বুড়ো ততক্ষণ সব চুপচাপ শুনছিল। সবাইকে উদ্দেশ্য করে বলে, 'বুঝলি তো টেনে মানে অখুনও আরো আটটা পাশ দিতে হবেক তা হলেই মাধ্যমিক পাশ হবেক ক্যাঙারু—হুঁ হুঁ বাবা ইটো ইস্কুলে পড়া লয়, জনতার ইস্কুল, ইখানে পাশ দিয়া অত সহজ লয়, কিন্তু পাশ আমাদিকে দিতিই হবেক। শুধু পঞ্চায়েত লয় আরও বহুদূর যেতে হবেক, যুদ্ধ ছাড়া জীবনটই অচল—জংধরা। জংধরা জীবন লিয়ে বাঁচবো ঠিকই কিন্তু ইজ্জত থাকবেক নাই।'

ভীম বুড়োর কথাগুলো সবাই শুনছিল না গিলছিল বোঝা গেল না, কিন্তু ততক্ষণে ভীমবুড়োর আওয়াজ চাপা পড়ে সভাস্থলে আওয়াজ উঠেছে, 'ই লড়াই চালু থাকবেক, ইজ্জতের লড়াই চালু আছে, চলবেক, তাতে জান যায় যাবেক, পরোয়া নাই।' পায়রাডাঙার সবাই কাঁধে তুলে নিল লালঝাণ্ডা, ফিরে চলল সবাই, আগামী দিনগুলোর পরীক্ষা পাশের কঠিন শপথ নিয়ে।

ফেলে আসা পথ

গীষ্পতি চক্রবর্তী

জীবনের পথে হাঁটছি অনেকদিন। এই চলা যখন থমকে যায় তখন সংজ্ঞাহীন কোন একটা ব্যাপার ঘটে যায়, যাকে মৃত্যু বললে সবটা বলা হল না বলে আমার মনে হয়; আবার এর চেয়ে বেশি কিছু বলার কোন উপায় নেই। তাই ছোটো একটা শব্দের মধ্য দিয়ে জীবনের সব চলাচল নাকচ হয়ে যাওয়ার পর যা থাকে তা পূর্ণও নয় আবার শূন্যও নয়। জীবনের চলার পথের ছবি হয় হাজারটা। এইসব ছবি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখার মধ্যে একটা আবেগ আছে। স্মৃতি হাতড়ানো মানুষের স্বভাব। এইসব স্মৃতির মধ্যে কোন ফাঁকে বিস্মৃতির জায়গা ভরাট করে প্রায় স্মৃতির তুল্য কল্পনা তা বোঝা কঠিন। এই কল্পনাকে কী বলব? মিথ্যা? তাই বা বলি কী করে? কল্পনা এখানে আসে স্মৃতির রূপ ধরে। তাকে তো মিথ্যা বলে চেনাই যায় না। তাই এখানে যিনি স্মৃতি হাতড়ে ছবি তৈরি করেন তিনি মিথ্যার আশ্রয় নিয়েছেন বলা যায় না। তিনি, তাঁর মস্তিষ্ক তাকে যা স্মৃতির মধ্য দিয়ে দিয়েছে তাই-ই তুলে ধরেন সবার সামনে। তাই তাকে দোষ দেওয়া ঠিক নয়। কোনো ভিন্ন তথ্য যদি তার স্মৃতির ভ্রান্তি দূর করে, তাকে তা মেনে নিতে হবে। সত্যনিষ্ঠ লেখক এই ব্যাপারটা মানিয়ে নিলে বহু ভুলের হাত থেকে তার মুক্তি ঘটে। তবে আমাদের মতো সাধারণ মানুষের এসব দায় প্রায় নেই বললেই চলে। কৌতূহল নিরসনের জন্য কেউ যদি আমাদের মতো সাধারণ মানুষের কোনো লেখা নাড়াচাড়া করেন, সেখানে কোনো ভুল চোখে পড়লে তার জন্য বড়জোর লেখককে সাবধান হতে বললেন। তার চেয়ে বেশি কিছু হওয়ার নেই। আমার লেখা কোনো ঐতিহাসিক মূল্য দাবি করে না। ফলে আমি অনেকটা হালকাভাবে লিখতে পারি। হালকাভাবে লিখতে পারি বলে, যা খুশি লিখতে পারি না। আমাকে বসে ভাবতে হয়; বারবার নিজেকে প্রশ্ন করতে হয়। অতীতের ধূসর স্মৃতিকে হাতড়াতে হয়। বিচার-বুদ্ধির আলোয় ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সেসব ধূলোপড়া ছবি দেখে বুঝে নিতে হয় সেই হারিয়ে যাওয়া দিনগুলিকে। মনের গভীর থেকে কলমের ডগায় উঠে আসা শব্দগুলি প্রাণ পেল কিনা তা বিচার করবেন পাঠক। আমি তাকিয়ে থাকি অবাক হয়ে সেসব ছবির দিকে। মনে হয় এসব সত্যি ঘটেছিল? এসব ছবি সত্যি কি হারিয়ে যাওয়া দিনের স্মৃতিচিহ্ন?

এসব ভাবতে ভাবতে কখন পৌঁছে গেছি ভুবনেশ্বরের লালমাটির রাস্তায়। সেসব রাস্তা তখন খুঁজে পাবনা জানি। ভুবনেশ্বর ছাড়ার পর আবার ভুবনেশ্বর গিয়েছি চল্লিশ বছরেরও বেশি সময়ের তফাতে। সেসব লালমাটির রাস্তা মুখ লুকিয়েছে পিচঢালা কঠিন আবরণে। তার ওপর দিয়ে এখন যায় কত টনের মালবাহক গাড়ি তার হিসেব আমার অজানা। শুধু জানি সেইসব লালমাটির রাস্তা আর নেই। নেই সেই সাতানব্বই নম্বর সরকারি একতলা কোয়ার্টার। যেখানে কেটেছে আমার শৈশবের প্রথম কটি বছর। আবছা মনে পড়ে কনভেন্ট স্কুলের সেই অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান মিসকে যিনি হলদে রঙিন কাগজের ওপর হাঁস এঁকে দেখিয়ে দিয়েছিলেন, কীভাবে সেই দাগ বরাবর আলপিন দিয়ে ফুটো করে চৌকো বড় কাগজ থেকে একটা হাঁস কেটে বেরিয়ে আসে। সে আনন্দ স্মৃতিতে আছে অমলিন হয়ে। হয়তো সেই হাঁস ক্লাসের শেষে খুন হয়েছিল সহপাঠীদের হাতে। তার ছোঁড়াখোঁড়া মৃতদেহ জোড়া লাগানোর ছিল না কোনো উপায়। হয়তো আমি কেঁদে বুক ভাসিয়েছিলাম। সেসব হয়তো ঘটেছিল। বিস্মৃতির কোলে তারা সব আশ্রয় নিয়েছে। স্মৃতিতে ভেসে আছে আলপিন দিয়ে দাগ বরাবর ফুটো করে রঙিন কাগজ থেকে কেটে নেওয়া হাঁসটা। সে এখনও ভেসে চলেছে মনের জলাশয়ে। সে বেঁচে আছে কতদিন? হাঁসেরা কতদিন বাঁচে? তবে ওই একটি হাঁস বেঁচে থাকবে আমার সঙ্গে ততদিন, যতদিন আমি সচল স্মৃতির ঝোলা নিয়ে হেঁটে চলে বেড়াবো জীবনের পথে পথে। সেসব দিনের কত কী হারিয়ে গেছে। কিন্তু হারায় নি একটা মেঘলা আকাশ; অর্ধেক আকাশ জুড়ে মেঘ। সূর্যের অর্ধেক ওই মেঘের মধ্যে পশ্চিম আকাশের ওই আধডোবা সুর্যটা অর্ধেক আঢাকা টুকরো থেকে চারিদিকে আলো দিতে দিতে মিলিয়ে গেছে কতদিন আগে। আজও তার সূর্যাস্ত হয়নি আমার স্মৃতিতে। জানিনা ঘটনাটা আদৌ ঘটেছিল কিনা! জানিনা সন-তারিখহীন ওই হারিয়ে যাওয়া দিনটি আমার জীবনে এসেছিল কিনা। শুধু জানি স্মৃতি এখনও আমাকে ওই ছবিটাই দেখায় বারেবারে। উড়িষ্যা, ভুবনেশ্বরের কথা উঠলে কোথা থেকে উঠে আসে ওই আকাশ আমার মনশ্চক্ষে। তবে ওই মেঘলা আকাশের চেয়ে স্কুলের স্মৃতি অনেক স্পষ্ট। আসলে প্রতিদিনের যাওয়া-আসা ওই স্কুলটাকে গেঁথে দিয়েছে আমার মনের গভীরে। তার বিরাট ইমারত, স্কুলগেট, মেলার মাঠ সব ধরা আছে মনে।

মনে পড়ে, বিকেলের পড়ন্ত রোদ্দুরে চৌকো টিনের বাক্স নিয়ে, যার একদিকে কাঁচ লাগানো, আসত একজন। তার বাক্স খোলার সঙ্গে সঙ্গে বেকারি বিস্কুট আর কেকের গন্ধে ভরে যেত আমাদের কোয়ার্টারের ছোটো বারান্দা। সেই স্বাদ, সেই গন্ধ, সেই ভালোলাগার স্মৃতি আজও আমাকে আনমনা করে। কেন মনে পড়ে জানিনা। শুধু জানি, নানা রঙের প্রজাপতির ওড়াওড়ি, তার ডানার রঙ, এইসব অপ্রয়োজনীয় বিষয় আমার মস্তিষ্কের কোষে কোষে আজও টিকে আছে। আমি ও আমার

পাশের কোয়ার্টারের গোপাল ওদের পেছনে ছুটতাম। কোয়ার্টারের সামনের ছোটো বাগান। সেখানে আমাদের দাপাদাপি। এত তুচ্ছ একটা ব্যাপারকে আমার স্মৃতি এত গুরুত্ব কেন দিল জানিনা। জানিনা কেন মনে আছে সেই কলকে ফুলের গাছটাকে, যা আমাদের দুটো কোয়ার্টারের মধ্যে সীমারেখার মতো ছিল। ওই গাছের ওপর কার অধিকার বেশি তাই নিয়ে কতবার ঝগড়া করেছি; তারপর কখনও তা গড়িয়েছে হাতাহাতিতে। সাদা চুল মোতিদাদুর চেহারাটাই শুধু মনে আছে। কালো, রোগা, ধুতি পরা ওই চেহারাটা যেন জগতের সব দাদুদের প্রতিচ্ছবি। দুর্গাপুজোর আগে ভোরের হিম যখন মিঠে মিঠে ঠাণ্ডায় জড়িয়ে ধরে সদ্য ঘুম থেকে ওঠা আমার ছেলেবেলার 'আমি'-কে, তখন মনে হয়, এই তো সেদিনের ব্যাপার। কী বলব? অতীত? চেতনায় সব যেন বর্তমান হয়ে ফিরে আসে। ওই অত বছর আগের হিমের পরশ আজও কেন পাই শরীরের প্রতিটি বিন্দুতে?

এসব ব্যাপার অনেকের কাছে দুর্বল অলস মনের আঁকিবুকি বলে মনে হতে পারে। কিন্তু আমার কাছে এসব খুব মূল্যবান স্মৃতি। সেই নিস্তরঙ্গ দিনগুলো গড়গড়িয়ে নানা হাসি খেলায় কেটেছে। কোথাও কি কোনো নিরানন্দ ছিল না? হয়তো ছিল। আমার সে বয়স শুধু আনন্দ পাওয়ার সময়। কোনো বেদনা, ক্লেদ মনে জমে না ওই শিশু বয়সে। মনে পড়ে যায় টেলিভিশনে এই সেদিন দেখা ছোট্ট ছেলেটাকে। সমুদ্রের তীরে ভিজে বালিতে মুখ গুঁজে জামা-জুতো সমেত কেমন নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে আছে। সারা বিশ্বে ওই ছবি ছড়িয়ে পড়ল। আমার মনে হল—ওই তো আমি! হঠাৎ জীবনটাকে ছুটি দিয়ে এমন নিরুপদ্রব ঘুমে তলিয়ে গেলাম কীভাবে? ওই ছেলেটা কি শেষ মুহূর্তে কোনো নিরাপদ হাত খুঁজে ছিল? আমার শৈশব আঁকাবাঁকা পথ পেরিয়ে কোনো এক নিরাপদ জীবনের সিধে রাস্তায় এসে মিশেছে। আমি কি আর কোনোদিন বন্ধুর পথে পা বাড়াতে পারব?

ভুবনেশ্বরের লালমাটির রাস্তা, লম্বা ঘাসে ঢাকা মাঠ, যার দূর প্রান্ত মিশেছে আকাশে, সেসব ছেড়ে একদিন এসে পড়লাম দক্ষিণেশ্বরের উপকণ্ঠে গঙ্গার কাছে এক আধা শহরের কোলে। ঠিকানায় কলকাতা লেখা থাকলেও আমরা আমাদের ওই আধা শহর আধা গ্রামের চৌহদ্দি পেরিয়ে শ্যামবাজারের হৈ-হট্টোগোলোর ভিড়ে এসে পড়লে ভাবতাম কলকাতায় এসেছি। তখন গঙ্গার ধার বরাবর গড়ে ওঠা বসতির চেহারা ছিল গাছ-গাছালি ভরা, ফাঁকা মাঠ আর কোথাও কাঁচা, কোথাও পাকা রাস্তার দুপাশে খুব সাদামাটা বাড়ির সারি। মনে পড়ে বিরাট বটগাছের পায়ের কাছে ছোটো পুকুর, বটের ঝুরি, জঙ্গলে আঁধার করা রহস্যে ঘেরা একটা জায়গা, যেখানে ঢুকতে সাহস লাগে। ছোটোবেলায় দূর থেকে দেখতাম ওই জঙ্গল, যেখানে মাঝে মাঝে কিছু লোক লাঠি সড়কি হাতে ঢুকত, কিসের খোঁজে জানিনা। তবে সন্ধ্যে হলে শিয়ালের ডাক প্রতিদিন শুনতে পেতাম। সেসব এখন আর নেই। চল্লিশ বছরেরও বেশি সময়ের ব্যবধানে একটু একটু করে ছবিটা পাল্টেছে। শেয়ালের ডাক আর নেই। নেই সাঁওতালদের সেই ছোটো খড়ের চালের মাটির বাড়িগুলো, যার ছবি আমার মনে আজও অমলিন। হাতে গোনা চার ছয় ঘর বড়জোর। কিন্তু ওদের মাটির ওই ছোট্ট কুটীরের সামনেটা ছিল পরিষ্কার। কয়েকটা কুকুর ছিল ওদের। আমাদের ছোটো একতলা বাড়ির প্রায় উল্টোদিকে রাস্তার ওপারে ছিল ওরা। হঠাৎ একদিন কোনো এক যাদুকরের যাদুদণ্ডের ছোঁয়ায় ওরা সব মিলিয়ে গেল কোথায় কে জানে! মাটির বাড়িগুলো মাটিতে মিশে গেল। সেখানে খোঁড়া হল। আমাদের চোখের সামনে একটা পাকাবাড়ি উঠল। তার পাশে আরও একটা পাকা বাড়ি গজিয়ে উঠল। কত গাছ কাটা পড়ল। তখনও গাছকাটা নিয়ে কোনো বিধিনিষেধ কোথাও ছিল না। ফলে এসব নিয়ে কোনো কথাও হত না কোথাও। আমাদের বাড়ির চারপাশটা একটু একটু করে সবুজের ঘেরাটোপ থেকে কংক্রিটের ঘেরাটোপে ভরে উঠতে লাগল।

একদিন দেখি আমাদের বাড়িতেও সেকি ধুন্ধুমার কাণ্ড। একতলা বাড়ি হৈ হৈ করে ওপরের দিকে বাড়তে লাগল। স্কুল থেকে ফিরে আমরা ছোটোরা বাঁশের মই দিয়ে উঠতাম ওপরে। যদিও ছাদে যাবার সিঁড়ি ছিল; কিন্তু কেন জানিনা ওপরে ওঠার ওই কঠিন পথটাই ছিল আমাদের ছোটোদের কাছে মহা আনন্দের। ওই সিঁড়ি দিয়ে সারাদিন মিস্ত্রিরা উঠত নামত। বাড়ির ঠিক বাইরেটায় ইঁট ভেঙে মোয়া তৈরি হত। মেয়েরা জল বেঁধে সুর করে গান করতে করতে ছাদ পেটাতো। বিকেলে আমরা ছোটোরা হাজারবার উঠতাম, নামতাম ওই মই বেয়ে। পাড়ার আর সব বন্ধুরা জুটত আমাদের দলে। খবরদারি করতাম আমরা। কারণ বাড়িটা আমাদের। সেসব খবরদারি সবাই মেনেও নিত। এভাবে আমাদের অনেক বন্ধুর বাড়িও বাড়তে লাগল। সেখানে তাদের খবরদারি। কত নতুন লোক আসতে লাগল। ধীরে ধীরে আমাদের ছোটো পাড়াটা বড় হতে লাগল ওই নির্দিষ্ট সীমানার মধ্যে বহু মানুষের সমাগমে। এভাবেই ওই অঞ্চলের গ্রাম বদনাম ঘুচে গেল একটু একটু করে। বহুতল ফ্ল্যাট তখনও দখল করেনি এলাকা। আশ্চর্যভাবে পুকুরগুলো টিকে গিয়েছিল। অনেকটা জঙ্গল তখনও চারিদিকে। শেয়ালের ডাক তখনও শোনা যায় প্রহরে প্রহরে। আমরাও বড় হচ্ছি একটু একটু করে প্রকৃতির নিজ নিয়মে। আমাদের একতলা বাড়ি বেড়ে তিনতলা হল। বহু মানুষের বাস সে বাড়িতে। সকাল থেকে সদর দরজা খোলা। বন্ধ হত রাতে। আজকাল হাটখোলা সদর দরজার দেখা পাওয়া সম্ভব নয়। পরিবেশ পরিস্থিতি পাল্টে গেছে। হুটহাট অন্য বাড়ির ছেলে-মেয়ে ঢুকে পড়ত আমাদের বাড়িতে। আমরাও যেতাম পাড়ার কাকিমা, মাসীমাদের বাড়ির খোলা দরজা দিয়ে সিধে ভেতরের বারান্দায়, ঘরে সর্বত্র। এখন সেসব সম্ভব নয়; ছোটো-বড় নানা ফ্ল্যাট হোক, বাড়ি হোক, তিন-চার জনের হাত পা ছড়িয়ে থাকার মতো সাজানো গোছানো ঘরে, সোফায়, দামি ফুলদানি, নানা ঘর সাজানোর উপকরণে ঠাসা সুন্দর ঘরে, ডাইনিং স্পেসে হুট করে ঢোকা যায় না। মানুষের রুচির পরিবর্তন হয়েছে। ভালোভাবে থাকার ধারণা, স্বচ্ছন্দ জীবনযাপন, গুছিয়ে রাখা, পরিচ্ছন্ন ঘর, ঘরের আশপাশ, অবশ্যই উন্নতি; জীবনমানের উন্নতি। আমাদের ঠাসাঠাসি, গাদাগাদি করে থাকা ছেলেবেলা এখন মধ্যবিত্ত, উচ্চবিত্তদের ঘরে দেখা যায় না। রুচির এই বিবর্তন একদিনে ঘটেনি। অর্থনৈতিক সচ্ছলতার সঙ্গে এর সম্পর্ক নিবিড়। সাধ্যে না কুলালে সাধ থাকলেও সে সাধকে ধামাচাপা দিতে হয়। আমাদের অনেক সাধ ভবিষ্যতের জিম্মায় তোলা ছিল। পুজোর বাজার হত সবার একসঙ্গে। বাড়ির সব নিয়মকানুন চলত যার কথায়, তিনিই সব ঠিক করে দিতেন। তিনি আমাদের জেঠামশাই। একটি জামা, একটি হাফপ্যান্ট, একজোড়া জুতো। বাকি নানা উপকরণ আমাদের কল্পনায়, স্বপ্নে নানা রঙে রাঙিয়ে দিত আমাদের মন। ভাবতাম বড় হয়ে কতো জামা, প্যান্ট, জুতোয় ভরিয়ে রাখব আমার ঘর।

এসব ভাবনার মধ্যে কোথা থেকে

অচেনা অজানা ঝোড়ো বাতাস হু হু করে ঢুকল আমাদের মনের আঙিনায়। পুরোনো রূপকথার সব নায়ক-নায়িকারা ওই দমকা বাতাসে কোথায় উড়ে চলে গেল বুঝতেও পারলাম না। নতুন নতুন শব্দ বাজতে লাগল আমাদের কানে। আমাদের ছোটোদের মনেও তোলপাড় করতে লাগল নানা নতুন নতুন শব্দ। বিপ্লব, শ্রমজীবী, বুর্জোয়া, শোষক, শোষিত, পাতি-বুর্জোয়া, কৃষক-শ্রমিক ঐক্য, রাশিয়া, চীন, ভিয়েতনাম—এইসব নানা চেনা-অচেনা শব্দের ধাক্কায় আমাদের মনে হতে লাগল নানা ওলট-পালট। ছোটো হলেও আমি তখন খুব ছোটো নই। ক্লাস সিক্স, সেভেন, এইটে এইসব নানা শব্দের ধাক্কায় আমাদের টালমাটাল অবস্থা। আমিও ঘুরপাক খাচ্ছি এইসব ঝোড়ো শব্দের ধাক্কায়। তখন কোন পাড়ায় কোন ছেলে মস্তান হয়ে উঠেছে তার খবর উড়ত বাতাসে। কোন মস্তানের দাপটে গোটা এক-একটা পাড়া কাঁপত তার গল্পে মশগুল হয়ে থাকতাম আমরা। খবরের কাগজ, রেডিওর খবরের চেয়ে অনেক বেশি খবর ঘুরত মুখে মুখে। মনে পড়ে, দুর্গাপুজোর ভাসানের প্রসেশন আসবে বেলঘরিয়া থেকে। সে মিছিল সশস্ত্র। বড়োরা পই পই করে বাধা দিত। বাড়ি থেকে তখন বেরোনো নিষেধ। আমরা নানাভাবে, গেট টপকে, পাঁচিল টপকে দেখতে যেতাম সেই ভয়ঙ্কর মিছিল। কাছ থেকে মস্তান দেখার আনন্দই আলাদা। আমার বন্ধুদের অনেকেরই ভেতরে ভেতরে একজন মস্তান হওয়ার শখ ছিল। পাড়ার মস্তানরাই তখন একদিকে বীর, পাড়ার রক্ষাকবচ, আবার আরেকদিকে ত্রাস। এসবের মধ্যে উত্তেজনার আগুনে নিজেকে গরম করার এক খেলায় মেতে থাকতাম। কোথা দিয়ে সময় কেটে যেত। হঠাৎ চমকে দেখতাম দুয়ারে কড়া নাড়ছে পরীক্ষা। একবার হাফইয়ার্লি পরীক্ষা ভণ্ডুলের কথা মনে পড়ে। পরীক্ষার প্রশ্নপত্র দেওয়ার মিনিট কয়েকের মধ্যে একতলা থেকে হৈ হট্টগোল। আমাদের বসার ঘর ছিল দোতলায়। তারপর একদল ছেলে চেঁচাতে চেঁচাতে ঢুকে পড়ল ঘরে। পরীক্ষার দফারফা। স্যার জানলার দিকে তাকিয়ে। একজন বলল, দেখছিস কী? বেরিয়ে আয়। পরীক্ষা হবে না। নির্দেশ মানলাম বিনা প্রতিবাদে। মুখে বলছিলাম, এসব অন্যায়। ভেতরে ভেতরে পরীক্ষা ভণ্ডুলের নতুন অভিজ্ঞতা মন্দ লাগেনি। ওই বয়সে নিয়ম ভাঙার এক আশ্চর্য আনন্দ ছিল। কিছু বুঝিনি। শুধু নতুন কিছু হাতে পেয়ে যেন অবাক হয়ে দেখছিলাম চারিদিকটা।

এভাবেই অবাক হয়ে দেখলাম, হেডস্যারের ঘরে গান্ধীর ছবি ভাঙা, নেহরুর ছবি আছড়ে ফেলা; বিদ্যাসাগরও রেহাই পায়নি। তখন শুনলাম, বুর্জোয়া শিক্ষা-ব্যবস্থা নাকি ভালো নয়। শুনলাম নকশালরা সব ওলট-পালট করে, নতুন কিছু করতে চাইছে। ভালোমন্দ বুঝি, না বুঝি, আমাদের আলোচনার, ছেলেমানুষি আড্ডায় খোরাকের কোনো অভাব রইল না। দেয়ালে দেয়ালে দেখলাম কালো কালিতে বাঁকাচোরা হাতের লেখায়—নকশালবাড়ি জিন্দাবাদ, ইত্যাদি ইত্যাদি। চিনের চেয়ারম্যান নাকি আমাদেরও চেয়ারম্যান। মাও-সে-তুং-এর নাম দেওয়ালে দেওয়ালে। শুনলাম আমাদের দেশের অনেক শ্রদ্ধেয় মনীষী নাকি আসলে শ্রদ্ধা পাওয়ার যোগ্য নয়। নানা তর্কে-বিতর্কে কেটে যেত সময়। তখনই শুনলাম কলকাতার কফি-হাউসে বসে ভালো ভালো ছেলেমেয়েরা সমাজটাকে বদলাবার শপথ নিচ্ছে। তারা নাকি সব বড়বড় বাড়ির ছেলে; তারা নাকি যাচ্ছে গ্রামে গ্রামে লড়াই করতে। কিসের লড়াই! সেসব বোঝার মতো পাকাবুদ্ধি আমাদের ছিল না। আমার মতো বয়সের সব ছেলেরা তখন চারিদিকটা দেখছে অবাক হয়ে। ধাঁধাঁয় পড়ছে। সুকান্তর কবিতা নিয়ে দাপাদাপি হত মাঝে মাঝে। সুকান্তের অসময়ে মৃত্যু তাকে আমাদের কাছে আকর্ষণীয় করে তুলেছিল। কংগ্রেস, সি পি আই, সি পি এম, নকশাল এইসব শব্দ শুধু রাজনীতির বিষয় ছিল না, ছিল নানা মানুষকে নানাভাবে চেনার, বোঝার মাধ্যম। অহিংসা, হিংসা, যুদ্ধ, বিদ্রোহ—এইসব শব্দ নিয়ে নাড়াচাড়া করত সে সময়ের স্কুল-কলেজের ছেলে-মেয়েদের একটা বড় অংশ। এসবের বিপরীতে অন্য এক চোরা স্রোতও কাজ করত চারিদিকে। সেই বিপরীত স্রোতের টানে বহু ছেলে-মেয়ে ভেসে গেল অচেনা জগতে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তখন পরীক্ষায় ভালো ফল করা ছেলে-মেয়েদের জন্য কাঙ্ক্ষিত জগত। সেই বিপরীত স্রোত টেনে নিল অনেক মেধাকে পশ্চিম দুনিয়ায়। এদের অভিভাবকেরা হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। ছেলেটা বদ সঙ্গে পড়ে জীবনটা নষ্ট করে নি। আর মেধাবী অথচ 'বোকা' যারা, তারা কী এক অবাস্তব স্বপ্নের পেছনে ছুটতে গিয়ে পড়ল জেলের গরাদের ওপারে। কেউ মরল, কেউ বাঁচল আধমরা হয়ে; কেউ বা ভুল শুধরে 'ঠিক পথে' ফিরে এল। আবেগের ধাক্কায় যারা বুদ্ধির পরামর্শ অগ্রাহ্য করল, তাদের মুখে মুখে তখন—তোমার নাম আমার নাম, ভিয়েতনাম-ভিয়েতনাম। এদের কাছে তখন দেশ-বিদেশ একাকার। এদের চিন্তায় গঙ্গা, মেকং একাকার। এদের বিপরীতে যারা বলত—ভুলে যাবে বাপের নাম, ভুলবে নাকো ভিয়েতনাম—তাদের অনেকে এই পরিণত বয়সে দেখা হলে পরস্পরকে চিনতে পারলে পুরোনো শত্রুতা ভুলে সে সময়ের আবেগকে দায়ী করে সবকিছুর জন্য। তবুও আজও দেখি সেইসব আবেগকে আঁকড়ে ধরে বেঁচে আছে অনেকে। সেসব অন্য ব্যাপার। সেই সময়ে কেরিয়ার তৈরি করে শুধু নিজেরটা বুঝে নেওয়ার রেওয়াজ তেমন জোরালো ছিল না। অচেনা পথে, অজানা কিছুর টান যেন মাতাল করে তুলেছিল ছেলে-মেয়েদের। বাপ-মায়েরা ভয়ে ভয়ে থাকত। কার ছেলে বাড়ি ফিরল না? কার ছেলে নিরুদ্দেশ? কার বাড়িতে পুলিশের হানা? কার লাশ পাওয়া গেছে রেল লাইনের ধারে? সকলের মুখে মুখে এসব খবর। এর মধ্যেও চলত ইস্টবেঙ্গল, মোহনবাগান, বাঙাল-ঘটি, লুকিয়ে সিগারেট খাওয়া, স্কুল পালিয়ে সিনেমা যাওয়া, সিনেমার পঁচাত্তরের লাইন, সে লাইনে মারপিট ইত্যাদি ইত্যাদি। আমরা জানতাম, এর মধ্যেই স্কুলে যেতে হবে, বাজার যেতে হবে; দোকান যাওয়া, রেশন তোলা, গম ভাঙানো সব করতে হবে। বন্ধুদের সঙ্গে দেখা হত এসব বাজার-দোকানের ভিড়ে, স্কুলে, খেলার মাঠে, রকের আড্ডায়। এসবের সঙ্গে ছিল শীতকালের পাড়ায় পাড়ায় ক্রিকেট ম্যাচ. ডাংগুলি ম্যাচ, কুল পেড়ে খাওয়া, বিনা কারণে পাড়ায় পাড়ায় টো টো করে ঘুরে বেড়ানো। খালি পা, পাজামা, হাফ-সার্ট, হাফ সোয়েটার তখন চেনা পোষাক। আমাদের স্কুলের ইউনিফর্ম ছিল না। যে যেমন পারত তেমন পোষাকেই স্কুলে আসত। শুধু লুঙ্গি পরে স্কুলে ঢোকা বারন ছিল। পরে আমাদের স্কুলে ইউনিফর্ম চালু হল। এখন সব স্কুলেই ইুনিফর্ম চালু হয়েছে। আমাদের ছেলেবেলায়ও কোনো কোনো স্কুলে ইউনিফর্ম চালু ছিল।

রাতের অন্ধকারে বোমের আওয়াজ গা-সওয়া হয়ে গিয়েছিল সকলের। বাড়ির খুব কাছে বোমের আওয়াজ হলে জানলা-দরজা বন্ধ হত তাড়াতাড়ি। গভীর রাতে তার কাটার জন্য একদল লোক নেমে পড়ত রাস্তায়। তাদের চেনার উপায় ছিল না। ট্রাকে করে গোছা গোছা মোটা তামার

ইলেক্ট্রিক তার কেটে নিয়ে যেত তারা। দু-চারটে বোমের আওয়াজে সবাইকে সতর্ক করে দিত তারা। সারা অঞ্চল নিষ্প্রদীপ। সকালে পাড়ার মোড়ে মোড়ে জটলা। তামার তারের বদলে এল অ্যালুমিনিয়ামের তার। তার কাটার দল কোথায় মিলিয়ে গেল। অ্যালুমিনিয়ামের তার কেটে তেমন লাভ নেই। এসবের সূত্র ধরেই মুখে মুখে উঠে আসত অর্থনীতির কথা, বেকারির জ্বালার কথা, সমাজবিরোধী তৈরির কথা; কথায় কথায় শুনতে পেতাম, চারিদিকে নাকি নানা ভাঙন শুরু হয়েছে। দেশের হাল-চাল নাকি ঠিকঠাক নেই।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ এসবের মধ্যে নতুন কিছু এনে ফেলল যেন। যুদ্ধের রোমহর্ষক বর্ণনা কাগজের পাতায় পাতায়। প্রতিদিন খবরের কাগজ খুললেই নানা ধরনের লড়াইয়ের বিবরণ। ভারত-পাকিস্তান শত্রুতার ব্যাপারটা আমরা তখন বুঝে গেছি। পাকিস্তান আমাদের শত্রু। ওদের বোমারু বিমান বোমা ফেলে যাতে কোনো ক্ষতি করতে না পারে তার জন্য জানলার কাঁচে খবরের কাগজ কেটে আঠা দিয়ে সাঁটার ভার পড়ল আমাদের ওপর। অদৃশ্য শত্রুর বিরুদ্ধে এমন লড়াইয়ের দায়িত্ব পেয়ে আমরা পুলকিত। মনে হত. একটা দুটো বোমা এখানে সেখানে পড়ে না কেন? সাইরেনের আওয়াজে সব আলো নিভিয়ে কী হয় কী হয় ভাব নিয়ে চুপ করে বসে থাকা, ফিসফিস কথা, যেন শত্রু এসে গিয়েছে দুয়ারে। উত্তেজনায় টগবগ করে ফুটতাম আমরা ছোটোরা। অল ক্লিয়ারের সাইরেনের শব্দে যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচত সবাই।

একদিন স্কুল থেকে এসে দেখি, অনেক অপরিচিত মানুষের ভিড় আমাদের বাড়িতে। আমাদের সমবয়সী ছিল কজন। শুনলাম তারা আমাদের আত্মীয়, পূর্বপাকিস্তানে থাকে। পূর্বপাকিস্তান তখনও বাংলাদেশ হয়নি। তারা মিশে গেল আমাদের সঙ্গে। চার পাঁচজন মানুষ হঠাৎ এসে মিশে গেল আমাদের সঙ্গে। এখন এসব ভাবাই যায় না। যুদ্ধের ঢেউয়ের ধাক্কায় যারা এসেছিল, যুদ্ধ শেষে তারা হুট করে চলে গেল একদিন। আমাদের জীবন যেমন চলছিল তেমনই চলতে লাগল সময়ের তালে তালে।

স্কুলের ছেলে খুন হল। সে ছিল আমার সহপাঠী। কেন খুন বোঝা গেল না। সে ছিল ডাকাবুকো প্রকৃতির, বেপরোয়া। কোনো মস্তানকে সম্মান জানতো না। এগারো ক্লাসের ছেলে। ভয় পেত না সে সময়ের নাম করা মস্তানদের। নানা ঝামেলায় জড়িয়ে পড়েছিল সে কারণে। একদিন ওর মৃতদেহ পাওয়া গেল রেল লাইনের ধারে। হল না হায়ার সেকেন্ডারি পরীক্ষা দেওয়া। পরীক্ষার তিন কি চার মাস আগের ঘটনা। আরও এক সহপাঠীর ডান হাত উড়ে গেল, হাতে বোমা ফেটে। তখন অনেক বাড়িতে, ক্লাবে বোমা বাঁধা হত গোপনে। সেসব বোমা ঘুরত মস্তানদের হাতে হাতে। কোনোভাবে বোমা এসেছিল ওই ছেলেটির হাতে। অনভ্যস্ত হাতে বোমা ফেটে বিপর্যয়। হাসপাতাল-পুলিশ ইত্যাদি মিটল এক সময়ে। আমরা বন্ধুরা পালা করে যেতাম হাসপাতালে। সান্ত্বনা দিতাম। ওর জীবনটা গেল বদলে ওই ঘটনার পর। অনেক লড়াই করে সেই ছেলে জীবনে দাঁড়ালো নিজের পায়ে; যদিও ওর ডান হাত নেই। এখনকার কোনো বাবা-মা হাসপাতালে ভর্তি, পুলিশের হাতে ধরা পড়া বোমা ফেটে জখম বন্ধুকে দেখার জন্য তার ছেলে বা মেয়েকে ছাড়বে? জানি না। চারিদিকে ইঁদুর দৌড়ের হিড়িকে কে বাঁচল, কে মরল, তার খবর রাখে কে? মাঝে মাঝে মনে হয় একটা নতুন সমাজ জন্ম নিচ্ছে পুরোনো সমাজের গর্ভ থেকে। সেই জন্ম-যন্ত্রণার সাক্ষী আমরা সবাই। আমাদের জীবনও পাল্টে যাচ্ছে এই নতুন হাওয়ায়। এই হাওয়ার গতি কোন দিকে জানি না। শুধু অবাক হয়ে দেখি, আমরা সবাই জীবনের পথে হাঁটতে হাঁটতে যেন নতুন দুনিয়ায় এসে পড়েছি। সেই স্কুল জীবনের পথ ছেড়ে নতুন যে পথে পা রেখেছিলাম, তাও পুরোনো হয়েছে এত দিনে। এক বিস্ময়ের বাতাবরণ থেকে যেন এক নিরেট বাস্তবের মাটিতে এসে পড়লাম কোনো এক অচেনা মুহূর্তে। এই জগতটা আমাদের সকলের চেনা রাজপথ। এখানে প্রতিদিন যেন আগের দিনটার প্রায় পুনরাবৃত্তি। মনে হয়, এই জীবনটা কি আমার স্বপ্নের মধ্যে ছিল? বোধ নয় না। আমরা যে সময়ে স্বপ্ন দেখতাম, সে সময়ের অবাস্তব স্বপ্নগুলো ছিল আসল সম্পদ; মনের সম্পদ। এখন যেন এক গল্পের উপাদানহীন, বিস্ময়হীন, সিধে পথে গড়িয়ে চলাকে পথ চলা বলি কী করে? এ যেন স্বেচ্ছায় চলা নয়; নেহাতই অভ্যাসের দাসত্বে আবদ্ধ এক ইচ্ছাহীন চলা। হয়তো সকলের জীবনেই এমন হয়। নাকি, কেউ কেউ নিরন্তর পথচলার আনন্দে বিভোর থাকে? জানি না। মনে হয় নতুন হাওয়ার ঝাপটা থেকে বাঁচবার জন্য ক্ষণিকের জন্য বসে আছি পথের ধারে। জীবন তো কারও জন্য থেমে থাকে না। চারিদিকের এই নতুন হাওয়ার স্বাদ বুক ভরে নিতে পারি না কেন? চারপাশটা কি এতটা অন্যরকম হয়ে গেল? তবুও চলাটা হয়তো ধীর হলেও, গড়িয়ে হলেও, আছে। পেছন ফিরে তাকানো আমাদের মজ্জায় মজ্জায়। ক্ষণিক দাঁড়িয়ে যখন পেছন ফিরে দেখি, তখন এক ফেলে আসা পথ যেন নীরবে ডাক দেয়। কিন্তু বিপরীত পথে তো কেউ যেতে পারে না; এ চলার প্রাকৃতিক নিয়ম এটাই। ফেলে আসা পথটা ফেলেই আসতে হয় চিরতরে। জীবনের পথে ভ্রমণ তো শুধু একবারের জন্য, একথা বলাই বাহুল্য।

With best compliments from

A Well Wisher

Sl. No. 2

হবসন জবসনের বিচিত্র জগৎ

সঞ্জীব চক্রবর্তী

ভারত সম্পর্কে ইউরোপের মুগ্ধতা বহুকালের। খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতকে ম্যাসিডোনিয়ার রাজপুত্র আলোকজান্ডারের বিজয় বাহিনী ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে থেমে গেলেও যোগাযোগের সেতু বন্ধ হয়নি। চন্দ্রগুপ্তের রাজসভায় আগত দূত মেগাস্থিনিসের লেখা বই কবে লুপ্ত হয়ে গেছে। কিন্তু তাঁর বই থেকে ভারতবর্ষ সম্পর্কে নানা মন্তব্যের উদ্ধৃতি দিয়েছেন বহু মুগ্ধ লেখক। নিছক সেই উদ্ধৃতি সংকলন করেই সৃষ্টি হল 'ইন্ডিকা' গ্রন্থ।

ভারতবর্ষ তথা প্রাচ্য দেশ সম্পর্কে মুগ্ধ ছিলেন রোমান ঐতিহাসিকরা। তেরো চোদ্দ শতকের ইতালির পর্যটক মার্কো পোলোর ভ্রমণবৃত্তান্ত ইউরোপের কল্পনাকে আরো উসকে দেয়। ফলে দলে দলে ভাগ্যান্বেষী স্বপ্নের দেশ ভারতবর্ষে আসার পথ খুঁজতে দিকে দিগন্তরে যাত্রা করে। ভারতবর্ষে আধিপত্য বিস্তারের জন্য ইউরোপীয় শক্তিদের লড়াইয়ের কাহিনি পড়তে পড়তে ক্লান্ত হয়ে পড়ে স্কুল পড়ুয়া। তবে বাণিজ্য বা লুণ্ঠন যাই উদ্দেশ্য হোক না কেন ভারতবর্ষ সম্পর্কে মুগ্ধতা আচ্ছন্ন করে রেখেছে অনেককেই। এদেশের বিপুল ঐশ্বর্য, খাদ্যাভ্যাস, পোষাক, বিচিত্র প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, সাপ, বাঘ, যাদু, ফকির ও প্রাচীন সভ্যতার অবশেষ সম্পর্কে ব্যক্তিগত অনুভূতি লিখিত হয়েছে পাতার পর পাতা ভরে। ঘরের খেয়ে এদশকে বোঝার মতো বনের মোষ তাড়ানোর ইচ্ছা ছিল বলেই পাক্কা নীলকর সাহেব জেমস ফারগুসন ভারতবর্ষে নানা মুল্লুক ঘুরে রচনা করলেন মহাগ্রন্থ 'হিস্টরি অব আর্কিটেকচার অব ইন্ডিয়া অ্যান্ড ইস্ট'। তাঁদের লিখিত এই জাতীয় বই আর কাজকর্মের পুরো ইতিহাস বোধহয় আজো রচনা হয়ে ওঠে নি।

রুচিভেদে মুগ্ধতার প্রকারভেদ হয়। তাই গ্রন্থের বৈচিত্র্যও হয়েছে অসীম। এমন একটি আশ্চর্য বই হল 'হবসন জবসন'। মহরমের সময় মিছিলের মধ্য থেকে ইয়া হাসান ইয়া হোসেন ধ্বনি কৌতূহলী ইউরোপীয় কানে হবসন জবসন বলে পৌঁছল। এই বিচিত্র শিরোনামটি তাঁরা বাছাই করেছিলেন বইয়ের চরিত্র নির্দেশ করে দেবার জন্য। লেখক কর্নেল হেনরি ইয়ুল ও এ সি বার্নেল। হবসন জবসনের মতো এমনি নানা বিচিত্র রূপান্তর নিয়ে তৈরি হয় অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান শব্দ ভাণ্ডার। অসীম আগ্রহ ও পরিশ্রমে রচিত বইটির প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৮৮৬ সালে। আর্থার বার্নেল ছিলেন মাদ্রাজ সিভিল সার্ভিসের পদাধিকারী, অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান শব্দ ভাণ্ডার সম্পর্কে চিরকালই খুব আগ্রহী। ১৮৭২ সাল নাগাদ আরেক আগ্রহী ব্যক্তি কর্মেল হেনরি ইয়ুলের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। একই বিষয়ে আগ্রহ দুজনকে বেঁধে ফেলে এবং যৌথ প্রচেষ্টা চলতে থাকে বিচিত্র শব্দভাণ্ডার গড়ে তোলার জন্য। ১৮৮২ সালে বার্নেলের মৃত্যু হলেও কাজ থামান নি কর্নেল

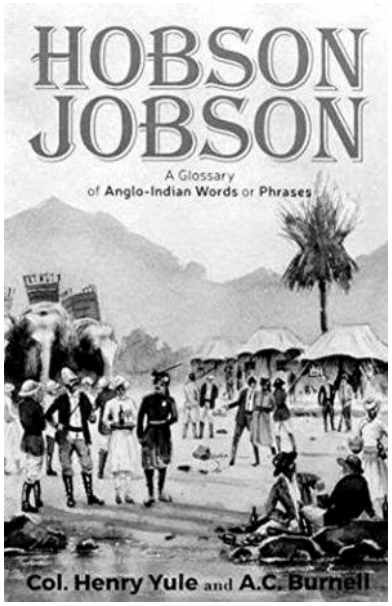

ইয়ুল। অবশেষে, ১৮৮৬ সালে প্রকাশিত হল বইটি। ঔপনিবেশিক বিদেশীর চোখে দেখা বৃহৎ প্রাচ্যভূমির ভূগোল, ইতিহাস, ভাষা, খাদ্যাভ্যাস সম্পর্কে অনুসন্ধানের এক অনবদ্য প্রদর্শনী হল 'হবসন জবসন—আ গ্লসারি অব অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান ওয়ার্ডস অ্যান্ড ফ্রেজেস'।

প্রশাসনিক কাজ চালাবার জন্য সরকারের পক্ষ থেকে মাঝে মাঝেই পরিভাষা সংলকন প্রকাশিত হত। কিন্তু কেজো কথার সীমানা ছাড়িয়ে হবসন জবসন হয়ে উঠল সেকালের ভারত তথা প্রাচ্যের জীবনদর্পণ।

কথায় বলে তত্ত্বকথার থেকে উদাহরণ বেশি কার্যকরী। তাই বইটি থেকে কিছু নমুনা পরিবেশন বরং বেশি উপাদেয় হবে।

ক্যালকাটা করপোরেশনের প্রতীকে একটি পাখির ছবি অনেকেই খেয়াল করে থাকবেন। সেটি হল সেকালের কলকাতার মাঠেঘাটে ঘুরে বেড়ানো লম্বা গলা লম্বা ঠোঁট হাড়গিলে পাখি। তাদের চালচলন দেখে হয়তো গম্ভীর স্বভাবের কোনো সামরিক কর্তার কথা মনে পড়ে গিয়েছিল। তাই মজা করে হাড়গিলে পাখির নাম দেওয়া হল অ্যাডজুটান্ট বা অ্যাজুটান্ট বার্ড।

সেচ বা অন্য কোনো কাজে নদীর থেকে খাল কেটে জল নিয়ে যাওয়ার প্রাচীন কৌশলকে তামিল ভাষায় বলা হত আনি-কাট্টু। অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান ভাষায় তাই হল অ্যানিকাট। বর্ধমানের কাঞ্চননগরের অ্যানিকাটটি অনেকেই দেখে থাকবেন।

ভারতীয় নীলের কদর বহু প্রাচীন কাল থেকে। তাই সংস্কৃত নীল থেকে আরবি ভাষায় গৃহীত হল আল-নিল। পর্তুগিজ ভাষায় তাই হল আনিল। বর্তমানে ইংরেজি ভাষার অ্যানিলিন ডাই হল আদতে সংস্কৃত নীল শব্দের হাত ফেরৎ। নীলকরদের নাম ছিল নীল-ওয়ালা এবং তাদের ঘাঁটি হল নীলকোঠি।

উইপোকার জ্বালায় অস্থির হয়ে যেতেন

সাহেব ও বিবি উভয়েই। পিঁপড়ের সঙ্গে সাদৃশ্য দেখে শীতের দেশে অজানা গরম শুকনো দেশের এই শত্রুর নাম হল হোয়াইট অ্যান্ট।

ভারতীয় পুরাণের একটি মৌলিক উপাদান হল অবতারবাদ। ১৫৯০ সালে করা আইন-ই-আকবরির অনুবাদে অবতার শব্দের সঙ্গে পরিচিত হল পাশ্চাত্য সভ্যতা।

গ্রামেগঞ্জে ঘোরার সময় সাহেবরা লক্ষ করেন যে এক বিশেষ ধরনের মস্ত গাছের তলায় দোকানপাট বসিয়ে বিকিকিনি করছে দেশীয় বানিয়া বা বণিকরা। তাই বটগাছের নাম হয়ে গেল বানিয়াদের গাছ বা বানিয়ান ট্রি।

সাহেবের বাড়িতে তো বেয়ারা থাকবেই। চাকর অর্থে বেয়ারা সংস্কৃত ব্যবহারিক শব্দ থেকে জাত বলে অনুমান করা হয়। আবার বেয়ারা বলতে পাল্কিবাহকও বোঝায়। তবে দেশীয় মহলে কাহার শব্দটি বেশি চালু বলে মন্তব্য করা হয়।

পানীয় জল সংগ্রহ করে আনত ভিস্তি। সে ছিল মিশরের জলসরবরাহকারী সক্কার সমার্থক। মশক বা চামড়ার তৈরি থলিতে ভরে বাড়ি বাড়ি জল যোগান দিত সে।

নানা স্থানের নাম ও সেখানকার বৈশিষ্ট্য নিয়েও নানা নতুন ডাক-নাম সৃষ্টি হয়। মাদ্রাজ শহরের নাম ছিল ব্ল্যাক টাউন। হাসপাতালের দেশি ড্রেসারদের বলা হত ব্ল্যাক ডক্টর। বম্বে প্রেসিডেন্সির সিভিলিয়ানদের ভারি পছন্দের খাবার ছিল বামেলো বা বম্বে ডাক, যা আসলে আমাদের পরিচিত সামুদ্রিক লটে বা লইট্যা মাছ। এই মাছের প্রতি প্রীতির কারণে বম্বে প্রেসিডেন্সির সিভিলিয়ানদের ঠাট্টার নাম হয়ে যায় বম্বে ডাক। মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির সিভিলিয়ানদের নাম হয় মুলি। কারণ তারা মুলিগাতাওয়ানির ভক্ত। মুলিগাতাওয়ানি মানে হল মিলাগু-তান্নির বা লঙ্কার জল। কনজি হল ভাতের ফেন বা কাঁজি। কনজি-হাউস হল অস্থায়ী জেল। ১৭৮৪ সালে নেভির এক জেন্টলম্যান হায়দার আলির জেলে বন্দী হয়ে আছেন। তাঁর দুঃখ থেকে একটা গান রচনা হয়ে যায়, যার সারমর্ম হল—শুধুই আমরা ভাগ্যকে দোষ দিই, বাঙ্গালোরের জেলে হয় মুলিগাতাওয়ানি নয় কনজি খাই। বেঙ্গল প্রেসিডেন্সির গল্প আবার একটু অন্য রকম। এখানকার সিভিলিয়ানরা একটু বেশি বাবু ধরনের হওয়ায় কথায় কথায় কোই হ্যায় বলে খিদমতগারদের হাঁক পাড়তেন। তাই তাঁদের ডাক নাম হয়ে যায় কুই হ্যায়জ।

হুগলির আদি পর্তুগিজ উপনিবেশ হল ব্যান্ডেল। ব্যান্ডেল আসলে বন্দর শব্দের বিকৃত রূপ। কাছেই চন্দননগর বা চান্দেরনগর। নামের ব্যাখ্যা দেওয়া হল কখনো স্যান্ডাল উড সিটি কখনো বা মুন সিটি বলে। ১৭২৭ সালের একটি লেখায় তাকে চার্নগর ও ১৭৫৩ সালে শ্যান্ডেরনগর বলে উল্লেখ করা হয়েছে। নেটিভরা অবশ্য এসব গবেষণার ধার ধারতো না। তারা জানতো এটি হল ফরাসি উপনিবেশ ফরাসডাঙা। হুগলি নাম নিয়ে খানিক চর্চার নমুনা আছে। পর্তুগিজ বণিকদের পদার্পণের পর হুগলির নাম উল্লিখিত হয়েছে নান সূত্রে। ১৫৯০ সালে সাতগাঁও ও হুগলি এই দুটি বন্দরের উল্লেখ হল। ১৬১৬ সালে হুগলির নাম লেখা হল ওগোলিম। ১৬৬৫ সালে তাই হল গোলিম। ১৭৫৩ সালে উল্লিখিত হল ডি'উগলি নামে।

ব্যাঙ্কশাল নামের সম্ভাব্য উৎস নিয়ে অনেক চর্চা হয়েছে। ব্যাঙ্কশালের একটি অর্থ মালপত্র রাখার স্থান। দক্ষিণ ভারতে এই অর্থে প্রযুক্ত। বাংলায় জাহাজের দপ্তর বন্দর কর্তৃপক্ষ। হয়তো হুগলি নদীর ব্যাঙ্কে অবস্থিত বলে। জাভায় ব্যাঙ্কশাল মানে খুঁটির ওপর চারদিক খোলা মস্ত চালা। সংস্কৃত শব্দ বণিকশালা থেকে বঙ্কশালা না ভাণ্ডশালা অর্থাৎ মালপত্র রাখার স্থান থেকে ব্যাঙ্কশাল শব্দের উৎপত্তি হয়েছে তা সঠিক বলা গেল না।

খাবার টেবিলের পাশে হাজির থাকত কনসামা বা খানসামা। বাকি কাজের জন্য খিদমতগার। বাড়ির চাকরকে বয় বলে সম্বোধন করা হত বয়স তার যাই হোক। অনেক সময় বয়স্ক বয়ের মুখে—আপ মা-বাপ হ্যায় খুদাবন্দ—শুনে তরুণ সিভিলিয়ানের ভিরমি খাওয়ার অবস্থা হত। পরে অবশ্য কানে সয়ে যায়। মালিক বাড়ি নেই। নেটিভ বেয়ারা অভ্যাগত সাহেব বা বিবিকে সোজা ভাষায় বলে দিত—দরোয়াজা বন্ধ। যা বোঝার বুঝে বিদায় নিতেন তাঁরা। মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির চাকর-বাকরদের ভাষা বাটলার ইংলিশ নামে খ্যাতি অর্জন করে। আগে ধারণা ছিল পিয়ন হল হিন্দি পেয়াদা শব্দের বিকৃত রূপ। কিন্তু পিয়ন হল এক খাঁটি পর্তুগিজ শব্দ এবং স্প্যানিশ ভাষাতেও শব্দটি আছে। পিয়নের সমার্থক শব্দ হল চাপরাশি ও বরকন্দাজ।

রান্নাঘরে স্থান পেত ব্রিঞ্জেল, আমাদের পরিচিত বেগুন, সংস্কৃত শব্দ বায়গন। ব্রিঞ্জেল শব্দের উৎস পর্তুগিজ ভাষা। ইংরেজি নাম হল এগ প্ল্যান্ট। সাহেবরা ছেঁচকির স্বাদ পেয়েছিলেন। তাই শুকনো তরকারির নাম হল চিটচকি। বান্ডিকয় হল হিন্দি ভেন্ডি বা সোজা বাংলায় ঢ্যাঁড়শ। ঢ্যাঁড়শ সেদ্ধ খেয়ে ফ্যানি পার্কসের ভালো লেগেছিল বলে জার্নালে উল্লেখ আছে। আফ্রিকা সহ বহু স্থানে ঢ্যাঁড়শ পরিচিত ওকরা নামে। তারপর সজনে, সংস্কৃত শোভাঞ্জন। আমাদের পরিচিত সজনের নাম ছিল হর্স র‍্যাডিশ ট্রি। দক্ষিণ ভারতে তার সাহেবি নাম হল ড্রাম স্টিক ট্রি। সজনের তরকারির স্বাদ সাহেবের জিভে বমি আনার মত মনে হয়েছে অনেক সময়। হালোয়ার স্বাদ নিয়েছেন সাহেবরা। লক্ষ করে দেখেছেন যে কলকাতা থেকে কনস্ট্যান্টিনোপল পর্যন্ত তার কদর। আমের অপূর্ব স্বাদ অনেক শব্দের জন্ম দিয়েছে। ম্যাঙ্গো শব্দের আদিতে আছে তামিল মান-কে বা মান-গে। সেখান থেকে পর্তুগিজ মাঙ্গা, ইংরেজিতে ম্যাঙ্গো। আমের সোনালী রঙের সাদৃশ্য দেখে সোনা বৌ বা গোল্ডেন অরিয়ল পাখির নাম হল ম্যাঙ্গো বার্ড। দাড়িওয়ালা তপস্বী মাছ হল ম্যাঙ্গো ফিশ। মার্চ-এপ্রিল মাসে যখন আমের মুকুল আসে তখনকার বৃষ্টির নাম হল ম্যাঙ্গো শাওয়ার। চোখের সামনে আঁটি থেকে গাছ, গাছ থেকে মুকুল ও ফল ধরানোর বিখ্যাত ভারতীয় যাদু হল ম্যাঙ্গো ট্রিক। প্ল্যানটেন হল কলা। লন্ডনে কলার নাম হল বানানা, আরবি বনানা বা হাত অর্থে। বলার ছড়াকে এই কারণেই আ হ্যান্ড অব বানানাজ বলা হয়।

পমফ্রেট নামক সুস্বাদু সামুদ্রিক মাছটির নামের উৎস সম্ভবত পর্তুগিজ শব্দ পামপানো বা অঙুরের পাতা। আকারে সাদৃশ্য লক্ষণীয়।

কারি। স্বাদ গন্ধহীন ভাত বা হাতেগড়া রুটিতে কিচেন বা স্বাদ যোগ করা হত কারি রান্না করে। কারির উপকরণ হল মাংস, মাছ, সবজি, খানিক বাটা মসাল্লা ও হলুদ। কারি শব্দের উৎস হল তামিল কারি। কন্নড় করিন শব্দ গ্রহণ করে পর্তুগিজরা। গোয়াতে এখনো ওই শব্দ ব্যবহৃত হয়। ভারতীয় কারির ইতিহাস খুঁজতে ইয়ুল চলে গেছেন মেগাস্থিনিসের যুগে। তখন সোনার পাত্রে প্রথমে সিদ্ধ চাল ঢালা হল। তারপর ভারতীয় প্রথায় রান্না নানা রকম মাংস ঢালা হল। কারি শব্দ স্থান পেয়েছে ডাচ ও ফরাসি ভাষায়।

কেজরি, কিছেরি, হিন্দি খিজরি। খিজরির সংজ্ঞা হল চাল, মাখন, ডাল, সামান্য মশলা চেরা পেঁয়াজ ইত্যাদির ঘ্যাঁট। খিজরি ছিল সারা ভারতে অ্যাংলো ইন্ডিয়ানদের টেবিলে পরিবেশিত জনপ্রিয় খাদ্য। ইংল্যান্ডে বাসি মাছ গরম করে খিজরির সঙ্গে ব্রেকফাস্টে পরিবেশন করা

হত। খিজরি আবার মিশ্র ভাষার সমার্থক হয়ে যায়।

পওনি বা সোজা ভাষায় পানি। অর্থাৎ জল। বিলাইতি পাওনি হল সোডা ওয়াটার। ব্রান্ডি পাওনি। খুশ-বু-পাওনি। এক পাক্কা সাহেব পানির উদ্দেশ্যে কবি পিন্ডারের ঢংয়ে লেখা একটি কবিতা স্মৃতি থেকে উদ্ধার করেন। কবিতাটি হল—

পানি কুয়া, পানি তাল;
পানি আটা, পানি ডাল;
পানি বাগ, পানি রমনা;
পানি গঙ্গা, পানি যমনা;
পানি হাসতা, পানি রোতা;
পানি জাগতা, পানি শোতা;
পানি বাপ, পানি মা;
বড়া নাম, পানি কা।

পেপার, গোলমরিচ, সংস্কৃত পিপ্পলী থেকে জাত। পেপার তিন রকমের—ব্ল্যাক পেপার, লং পেপার ও হোয়াইট পেপার। ব্ল্যাক পেপার হল খাঁটি গোলমরিচ। লং পেপার হল কলকাতা থেকে চালান যাওয়া নিকৃষ্ট মানের পিপুল। খোসা ছাড়ানো গোলমরিচ হল হোয়াইট পেপার।

শহরতলিতে সাহেবরা থাকতেন বাংলো বাড়িতে। বাংলো হল আদতে বাংলা চালা-বাড়ির আদলে নির্মিত বাগান-ঘেরা বাড়ি। কলকাতা বা অন্যত্র সাহেবদের বাড়ির দরজায় হানা দিত বক্স-ওয়ালা। কাটলারি ও নানাবিধ সৌখিন জিনিস নিয়ে মেমসাহিবাদের কাছে আসত। তবে প্রবেশাধিকার পেত চাপরাসি বা সরকারদের কাছে দস্তুরি কবুল করে। ইবন-বতুতার আমল থেকে প্রচলিত দর ছিল দামের এক-দশমাংশ। তাতে অবশ্য বক্স-ওয়ালার খুব ক্ষতি হত না, কারণ সে ওই দস্তুরি দামের সঙ্গে যোগ করে পয়সা উসুল করে নিত। এই তথ্য পাওয়া যায় আর এক সুলেখিকা ফ্যানি পার্কসের জার্নালে।

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির জনদরদি কাজের নমুনার একটি নিদর্শন হল প্রধান সড়কপথে ১০-১২ মাইল অন্তর, অর্থাৎ একদিনের পথের শেষে বিশ্রামাগার ডাক-বাংলো নির্মাণ। এখানে বিশ্রামের ঘর ও চৌকিদার থাকতো। বেয়ারা বলতে পাল্কিবাহকও বোঝায়। তবে দেশীয় মহলে কাহার শব্দটি বেশি চালু বলে মন্তব্য করা হয়।

অ্যাংলো-অন্ডিয়ান সমাজের অন্দরমহলের খানিক আভাস পাওয়া যায় কিছু শব্দে। পরিবারে সবথেকে বয়স্কা সম্মানিতা মহিলাকে ডাকা হত বড়া বিবি নামে। ক্রিসমাস হল বড়াদিন। বিগ ডিনার

হবসন জবসনের প্রথম সংস্করণ আজ অ্যান্টিক বস্তুর মর্যাদা পায়। দ্বিতীয় সংস্করণের ফ্যাকসিমিলি এডিশন অবশ্য সহজেই সংগ্রহ করা যায়। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সংস্কৃতির মিলনের পর্বের অমূল্য দলিল হয়ে আছে ১০২১ পৃষ্ঠার মজাদার এই বইটি।

হল বড়া খানা। কালেকটার, কমিশনার ইত্যাদি পদাধিকারীদের উল্লেখ করা হত বড়া সাহিব নামে। আরো সম্মানের সম্বোধন হল লাট বা লাট সাহেব। লাট মানে লর্ড। বেঙ্গল প্রেসিডেন্সিতে এই অপূর্ব শব্দবন্ধের জন্ম। গভর্নর জেনারেল হলেন বড় লাট। লাট পাদ্রি সাহিব মানে বিশপ, লাট জাস্টিস সাহিব অর্থাৎ চিফ জাস্টিস—এসব সম্বোধনও চালু ছিল। বিনকি নাবোব হলেন গোলন্দাজ বাহিনির সেনাপতি। কন্নড় ভাষায় বিনকি মানে আগুন। তার নবাব তো সেনাপতি হবেনই।

বান্ডো! তাড়াতাড়ি বেঁধে ফেলো। নাবিকদের পরিভাষা তা শুনেই মালুম হয়। বাং, ভাং নামক চিরন্তন নেশার বস্তুটি সাহেবদের নজর এড়ায় নি। অন্য সূত্রে জানা যায় নেশার মাত্রা চড়াবার জন্য সাহেবদের মদে ধুতরো ও ভাঙ মিশিয়ে দিত দেশীয় মদের কারবারি। অনেক সময় ফল হত মারাত্মক। ভাং থেকে আবার ক্রিয়া বিশেষণ সৃষ্টি হল ভাঙ্গড।

পাটের ইংরেজি নাম হল গানি ফাইবার। কিন্তু পাটের তন্তুর সঙ্গে সন্ন্যাসীর জটাজুটের খুব মিল। ফলে গানি ফাইবারের বদলে তার ইংরেজি হল বিশুদ্ধ সংস্কৃত জুট। কোম্পানির প্রিয় কর্মের উপযুক্ত পরিভাষা লুট এল হিন্দি থেকে। লুটওয়ালা শব্দের ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন।

পাণ্ডে হল ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহের পর সমস্ত বিদ্রোহীর সাধারণ নাম। বিদ্রোহের আগে স্বাভাবিক অবস্থায় যে সিপাহি ঘণ্টা বাজাতো তার নাম ছিল ঘণ্টা পাণ্ডে। তুলনীয় পানি পাঁড়ে।

পারিয়া ডগ হল রাস্তার নেড়ি কুকুর। দক্ষিণ ভারতের এক নিম্নবর্গীয় শ্রেণির সঙ্গে তুলনা করে এই নামকরণ। পারিয়া কাইট হল ব্রাহ্মণী কাইটের নাম। পারিয়া আরক হল বিষাক্ত দেশী মদ, বহু তরুণ সিভিলিয়ানের মৃত্যুর কারণ।

প্যান্ডাল হল তামিল শব্দ থেকে জাত। সংস্কৃত বন্ধন থেকে জাত। পিগ-স্টিকিং বা বল্লম দিয়ে বুনো শুয়োর শিকার ছিল সিভিলিয়ানদের বিনোদন। ডাক বা বম্বের লোকেদের বল্লমের মাপ ছিল দীর্ঘ। কুই হাইজদের বল্লমের মাপ ছোটো, সাড়ে ছয় ফুট।

পিশাচী শব্দটি নিয়ে অনেক দিন ধরে অনেক তদন্ত হয়েছে। দক্ষিণ ভারতে হিন্দু উপজাতীয়রা পিশাচীর পুজো করে বলে জানা ছিল। সংস্কৃত নাটকে বিকৃত ভাষাকে পিশাচী বলা হয়। ১৬১০ সালের পর্যবেক্ষণ হল পিশাচী মানে সংস্কৃত ভাষায় রাক্ষসী। ১৭৮০ সালের পর্যবেক্ষণ হল যে পিশাচী মানে অশুভ আত্মা। ১৮১৬ সালে লেখা হল যে গ্রীষ্মের ঝড়বৃষ্টির নাম হল পিশাচী। ১৮১৯ সালে জানা গেল শিবের অনুচরেরা পিশাচী। ১৮২৭ সালের ঘটনা। একটি ক্ষুদে মেয়ে সাদা ফ্রক পরে নাচছে। আর্চ ডিকন হেয়ার তাকে আদর করে পিশাচী বলে ডাকায় সে এত খুশি হল যে আর্চডিকন থ বনে গেলেন।

অনেক ক্রিয়াপদ খুব জোরদার বলে মনে হয়েছে। যেমন পাকড়ো। পাকড়ো হল হিন্দি পাকড়ানো ক্রিয়াপদের অনুজ্ঞাসূচক রূপ। তুলনীয় শব্দ হল বানাও, লাগাও, পাকাও, দামকাও (ধমকাও), গাবরাও (ঘাবড়াও), লাগাও ইত্যাদি। লিস্টি হল লিস্ট বা তালিকা।

যানবাহনের মধ্যে ছিল পালকি। আর চিরন্তন বাইলি বা গরুর গাড়ি। হ্যাকারি হল তার যথার্থ ইংরেজি প্রতিশব্দ। কোনা বা খানা যোগ করে পাওয়া গেল বাওয়ার্চি কোনা বা রান্নাঘর, বাগি কোনা বা ঘোড়ার গাড়ির ঘর, বটলখানা বা গুদাম আর তোষাখানা। লাম্বারদার লোক হল নম্বর পাওয়া নথিভুক্ত মানুষ। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির চালু নাম জন কোম্পানি। এই জন কোনো মানুষ নন। কুম্পানি জেহান বা সারা পৃথিবীব্যাপী সাম্রাজ্যের স্বীকৃতি ইংরেজি জিভে পরিবর্তিত রূপ নিল জন কোম্পানি।

এমনি করে পাতায় পাতায় মণিমুক্তা সাজিয়ে দিয়েছিলেন হেনরি ইয়ুল আর আর্থার সি বার্নেল। হবসন জবসনের প্রথম সংস্করণ আজ অ্যান্টিক বস্তুর মর্যাদা পায়। দ্বিতীয় সংস্করণের ফ্যাকসিমিলি এডিশন অবশ্য সহজেই সংগ্রহ করা যায়। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সংস্কৃতির মিলনের পর্বের অমূল্য দলিল হয়ে আছে ১০২১ পৃষ্ঠার মজাদার এই বইটি।

With best compliments of

DURGAPUR SAW MILL

TIMBER MERCHANTS & GENERAL ORDER SUPPLIERS

G. T. Road (Main Gate), P.O. Durgapur-713203, West Bengal
Phone : 0343 2585184, 6452480, Mobile : 9832163188

Sl. No. 105

ভ্র ম ণ

হাতের কাছেই ‘পুরুল্যে’

শ্যামসুন্দর বেরা

পুরুলিয়া স্থাননাম বা জেলাকে বহু পুরোনো মানুষজন এখনও পুরুল্যে বলেন। ‘পুরুল্যে’ কেন? শব্দটির উল্লেখ পাওয়া যায় পুরুলিয়ার খ্রিস্টমণ্ডলীকে উদ্দেশ্য করে মাইকেল মধুসূদনের ‘পুরুলিয়া’ শীর্ষক সনেটে। ১৮৭২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে পুরুলিয়ার ‘জার্মান ইভানজেলিক্যাল লুথেরিয়ান চার্চ’-এর সংবর্ধনা সভায় বসে লিখেছিলেন ‘পাষাণময় যে দেশ, সে দেশে পড়িলে/বীজকুল, শস্য তথা কখন কি ফলে?/কিন্তু কত মনানন্দ তুমি মোরে দিলে, /হে পুরুল্যে!...’ সনেটটি। মাইকেলের সনেটের খবর না রাখা মানুষজন হয়তো লৌকিক বা আঞ্চলিক উচ্চারণে বা ব্যাকরণের তথাকথিত ‘স্বর-সংকোচন’-এর নিয়মে ‘পুরুল্যে’ বলেন।

পুরুলিয়া তো হাতের কাছেই। বিভূতিভূষণের অমোঘ বাণী ‘অচেনার আনন্দকে পাইতে হইলে পৃথিবী ঘুরিয়া বেড়াইতে হইবে, তাহার মানে নাই...’ সব বাঙালির মনেই উঁকি মারে। সত্যিই তো—‘আমার আগে সেখানে কেহ আসিয়াছিল কিনা, তাহাতে আমার কি আসে যায়?’ সব ‘অপু’রাই তো একদিন বড় হয়! কর্মজীবনে প্রবেশ করে। ব্যস্ততার মাঝে সুযোগ পেলেই অচেনার জগতে ফুড়ুৎ করে উড়ে যেতে মন চায়।

কাকা-জ্যাঠা হয়ে যাওয়া পাঁচ অপু—দিলীপ মণ্ডল, কৃষ্ণেন্দু মজুমদার, জয়ন্ত দাস, অলোক মণ্ডল আর বর্তমান লেখক ৯ ডিসেম্বর, ২০১৭ বেরিয়ে পড়েছিল পুরুলিয়ার পথে। অকালে ঝমঝম বৃষ্টি মাথায় নিয়ে বর্ধমান থেকে যাত্রা শুরু সকাল ৬.৪১-এ, হিসেব মতো এগারো মিনিট দেরিতে। কর্মস্থলের চালক কৃষ্ণেন্দুবাবু সেদিন ছিলেন গাড়িরও চালক। অলোককে দুর্গাপুরে তুলে গাড়ি প্রথম ছুটল আসানসোলের দিকে। চা-চা করতে করতে গাড়ি থামল নিয়ামতপুরে। টানা তিন দিনের বৃষ্টি অবশ্য থেমে গিয়েছিল আসানসোলেই। নিয়ামতপুরের পোড়া দুধের চা-য়ের প্রতি অমোঘ টান অনুভব করেন স্বাদ পাওয়া মানুষজন। পোড়া দুধের চা বিষয়টা একটু খোলসা করে বলাই ভালো। খাঁটি দুধের তৈরি চা পাতা ছেঁকে কেটলির একটি প্রান্ত আগুনের শিখায় রাখলে একটা সময় দুধটা পোড়া গন্ধ ছাড়ে। অপূর্ব স্বাদ সে চায়ের। বছর তিনেক আগেও পুরুলিয়া জেলার কলেজগুলো ছিল বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে। সেই হিসেবে নিয়ামতপুরের পোড়া দুধের চায়ের টানে পুরুলিয়াগামী বিশ্ববিদ্যালয়-কর্মীদের সাময়িক বিরতির স্থান এই নিয়ামতপুর।

আর থামা নয়, এবার সরাসরি পুরুলিয়া। দিশেরগড়ে দামোদরের ব্রিজ পেরোবার সময়ই দূরে পঞ্চকোট পাহাড়ের রেঞ্জ দেখা যায়। পারবেলিয়া, নিতুরিয়া, শর্বরী হয়ে পৌঁছানো গেল পঞ্চকোট পাহাড়ের কোলে। পঞ্চকোট রেসিডেন্সির পাশ দিয়ে বনপথে যেতে যেতে শুধুই সবুজ সবুজ উপহার। চড়াই উৎরাই পেরিয়ে গাড়ি ছুটল সটান সবুজে ঢাকা পাহাড়ের কোলে পঞ্চরত্ন মন্দিরের সামনে। ঢোকার মুখে চোখে পড়বে স্থানীয় আদিবাসী ছেলেমেয়েরা কচি তালপাতায় তৈরি নানান শিল্পকর্ম নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে বিক্রির আশায়। ‘ফেরার সময় নেব’ প্রতিশ্রুতি দিয়ে এগোলেই নজর কাড়বে ‘কালো জলে কুচলা তলে/ডুবল সনাতন/আজ সারানা কাল সারানা/পাই যে দরশন’ লেখা বোর্ড। বুদ্ধদেব দাশগুপ্তের ‘উত্তরা’ সিনেমায় ব্যবহৃত লোকসঙ্গীতটি মন ভালো করে দেয়। মাটির সুর, কুশীলবদের পরা মুখোশ মনে করিয়ে দেয় পুরুলিয়ার লোকজীবনকে। একটু এগোলেই চলে আসবে নয়ন সার্থক করা পরিবেশ। পঞ্চরত্ন মন্দিরটি সাম্প্রতিক অতীতে ধ্বংসের শেষ পর্যায়ে এসে পড়েছিল। আর্কিয়লজিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়ার তত্ত্বাবধানে মন্দিরটিকে সংস্কার করা হয়েছে। পুরোনো টেরাকোটার কারুকর্ম কয়েকটি থাম এবং কিছু জায়গায় রাখা সম্ভব হলেও শিখর রত্নগুলিতে প্রাচীন শিল্পকর্মের অবশিষ্ট কিছু নেই। সোজাসাপটা করে তৈরি করে দেওয়া হয়েছে।

মন্দিরের উল্টোদিকে বেশ কিছুটা অঞ্চল জুড়ে ইতিউতি ছড়িয়ে থাকা সিংহদুয়ার, গড়ের ধ্বংসাবশেষ, পুরোনো নজরমিনার, পঞ্চরত্ন মন্দিরের স্থাপত্য বলে দেয় যে ইতিহাস ঘুমিয়ে আছে পাহাড়ের কোলে। সুদূর অতীতে এই অঞ্চলের ভূমিজ

গড় পঞ্চকোটের পঞ্চরত্ন মন্দির

রাজারা গড়ে তুলেছিলেন পাঞ্চেত পাহাড়ের কোলে এই অঞ্চলটি। প্রচলিত বিশ্বাস অনুসারে স্থানীয় দামোদর শেখর পাঁচ আদিবাসী সর্দারের সাহায্যে গড়ে তোলেন এই রাজ্য। পাঁচ গোষ্ঠী বা 'খুঁট' বা 'কোট' থেকেই 'পঞ্চকোট' নামের উৎপত্তি। স্থানীয় প্রাচীন তেলকুপি রাজ্যের শিখর বংশ হল দামোদরের উত্তরসূরী। আবার পরবর্তীতে কাশীপুররাজ সিংদেও পরিবার নাকি শিখর বংশের উত্তরসূরী। আনুমানিক ১৯০০ বছরেরও বেশি পুরোনো ইতিহাস দীর্ঘ এবং খেই হারানো। সে দীর্ঘ ইতিহাস খোঁজার ক্ষেত্র গবেষকদের।

যাই হোক, এটা ঘটনা যে শুধু চার্চের সভায় নয়, কিছুদিন পরেই কাশীপুররাজ নীলমণি সিং দেও-এর আমন্ত্রণে মাইকেল মধুসূদন দত্ত তাঁর জীবনের শেষ প্রান্তে (প্রয়াণ ২৯ জুন, ১৮৭৩) পাঞ্চেত আসেন। তিনি যুক্ত হয়েছিলেন রাজার এস্টেট ম্যানেজার তথা আইনি পরামর্শদাতা হিসেবে। শোনা যায় পঞ্চকোট পাহাড়ের পাদদেশে কোনো স্থানে বসে লিখেছিলেন—'হেরেছিনু, গিরিবর! নিশার স্বপনে, অদ্ভুত দর্শন!..' সনেটটি—শীর্ষনাম 'পঞ্চকোট-গিরি বিদায়সঙ্গীত'। সনেটের শেষ তিন ছত্রে 'ভাঙা গড় গড়াইব, জলপূর্ণ করি/জলশূন্য পরিখায়; ধনূর্ব্বাণ ধরি দ্বারিগণ/আবার রক্ষিবে দ্বার অতি কুতূহলে' থেকে বোঝা যায় তিনি স্বপ্ন দেখতেন রাজাকে দিয়ে পঞ্চকোট গড়ের হৃতগৌরব আবার ফিরিয়ে আনবেন। সেখানেও অবশ্য টিকতে পারেননি নানা কারণে। শোনা যায় শেষ দু-মাসের বেতন না নিয়েই ফিরে গিয়েছিলেন কলকাতায়।

মধুকবি ঠিক কোনখানে বসে এই সনেট লিখেছিলেন তা জানা যায় না। গড়পঞ্চকোটের ইতিহাস জেনে বেড়াতে যাওয়া মানুষজনের মনের ঘরে কড়া নাড়বেই মাইকেল প্রসঙ্গ।

কিছুক্ষণ আগে আবার একপশলা বৃষ্টি এবং তখনও আকাশ মেঘলা থাকায় পাহাড়ের খুব উপর পর্যন্ত দেখা যাচ্ছিল না। মেঘ যেন গিলে নিয়েছে ওপরের অংশকে। অবাক বিস্ময়ে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য আর ভগ্ন গড়ের দিকে চোখ মেলতেই পাহাড়ে ওঠার

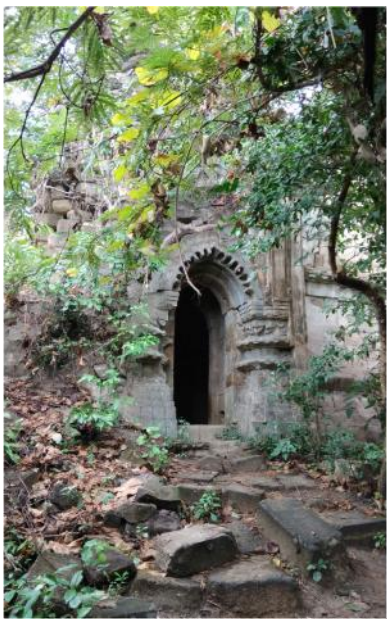

পথপ্রদর্শক-কাম-সহায়ক হবার বাসনায় এগিয়ে এল স্থানীয় দুই যুবক। এই কাজ করে পড়াশোনা বা হাতখরচের জন্য কিছু রোজগার করে তারা। সর্বাঙ্গে তাদের দারিদ্র্যের ছাপ কিন্তু কলেজ-পড়ুয়া জেনে ভালো লাগল। তারাই নিয়ে গেল পাহাড়ের কোলে গড়ে ওঠা রিসর্ট 'অরণ্যে দিনরাত্রি'তে। বড়সড় জায়গা জুড়ে গড়ে ওঠা রাত্রিযাপনের জন্য ঘর যেমন আছে তেমনই আছে টেন্টের ব্যবস্থা। দেওয়ালে আঁকা লোকচিত্রকলা চোখ টানবে। থাকার ব্যাপার আমাদের ছিল না তাই খাবার অর্ডার দিয়ে পা বাড়ানো হল পাহাড়ের দিকে।

গাছগাছালির ডালপালা হাত দিয়ে সরিয়ে, কোথাও আবার নিচু হয়ে গাছের ভেতর দিয়ে পাহাড়ে ওঠার সংকীর্ণ পথ। তখনও গাছের পাতার জল শুকোয়নি। ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহ পেরিয়েছে সবে। সবার গায়ে স্বাভাবিকভাবেই সোয়েটার। খানিক পরেই সোয়েটার ভিজে উঠল গাছের পাতার জলে আর ভেতরের গেঞ্জিজামা ঘামের জলে। এক সময় সবার সোয়েটারই গেল সহায়কদের হাতে। ক্রমশ চড়াই পথে সহায়করা অভ্যস্ত হলেও আমাদের মতো নো-ট্রেকারদের হাঁফ ধরে যাবার অবস্থা। নামজাদা না হলেও একদা ফুটবল খেলোয়াড় দিলীপদা আর কৃষ্ণেন্দুবাবু তরতরিয়ে উঠছিলেন আর আমরা মাঝে মাঝে দম নিয়ে বারবারই পড়ছিলাম পিছিয়ে। আর বেশি দূর নয়, আর বেশি দূর নয় বলে সাহস যোগাচ্ছিল স্থানীয় ছেলেদুটি। তৃষ্ণা তখন বক্ষজুড়ে! কিন্তু জল কোথায়! তাদের কথায় ঘুরতে আসা সাধারণ মানুষ শেষ যে পর্যন্ত উঠতে পারে যেখানে পাহাড় থেকে নামা একটি ক্ষীণ জলধারা আছে। কেউ কেউ তা দিয়েই তৃষ্ণা মেটায়। শেষমেষ কিছুটা সমতল সেই স্থানটিতে পৌঁছানো গেল। জলধারা দেখে ভক্তি হল না। একটি পাথরের ওপর পদচিহ্ন আঁকা দেখিয়ে গল্প ফাঁদল ছেলেদুটি। সে-গল্প শ্রবণেন্দ্রিয় খুব বেশি নিতে চাইছিল না। তাদের কথায়, এর পর ওঠে একমাত্র প্রশিক্ষিত ট্রেকাররা। আমাদের যতদূর দেখা যায় সেদিকে তাকিয়েই ক্ষান্তি। এখান থেকেই কিছু ছবি তোলার মাঝেই হল সাময়িক বিশ্রাম।

পাশের অন্য রাস্তা দিয়ে বেশ কিছুটা যাবার পর চোখে পড়বে বেশ কিছু পাথরের ব্লক দিয়ে তৈরি প্রাচীন ভাঙা মন্দির, দুর্গ এবং স্থাপত্য। চোখে পড়বে উইঢিবি, হরেক রঙের বুনো ফুল, ফল। সাপ বা অন্যান্য

প্রাণীর কথা শুনেছিলাম। কিন্তু চোখে পড়েনি কিছুই। ঘুরে আসার কয়েকদিন পর অবশ্য কাগজে চোখে পড়ল একটি হায়নাকে পিটিয়ে মারার খবর! তার মানে আছেন তাঁরা! যাই হোক, এক জায়গায় তো রীতিমতো সাবধানবাণী শুনতে হল গাইডদের কাছ থেকে। জ্বলনের ভয়ে সেখানে ভয়ে নাকি কোনো প্রাণীও ঘেষে না! দেখালো কমলা রঙের বেশ সুন্দর দেখতে রোমশ তেঁতুলের মতো এক ধরনের লম্বা ফল। সেগুলি নাকি আলকুশি!

এরপর নামার পালা। বেশ খাড়াই সংকীর্ণ পথ। এ পথ দিয়েও অনেকে ওপরে ওঠে। গাইডরা রীতিমতো গার্ড করে নিয়ে এলো সমতলে। ওঠা নামায় সময় লাগল ঘন্টা দুয়েক। এরপর রিসর্টের নজরমিনার থেকে ক্যামেরায় যেন পাখির চোখে ধরে রাখা হল প্রাকৃতিক দৃশ্য। অর্ডার দিয়ে রাখা দুপুরের খাবার খেয়ে ইতিউতি ঘুরে বেরিয়ে পড়া হল। সন্ধের আগেই পৌঁছতে হবে পরবর্তী গন্তব্যে, অযোধ্যা পাহাড়।

□

পঞ্চকোট থেকে সিরকাবাদ হয়ে অযোধ্যা পাহাড়ের কালীপাহাড়ি হিলটপের দূরত্ব প্রায় ১১০ কিলোমিটার। গন্তব্যপথে সড়কের পাশেই চোখে পড়ল শীতের বিকেলে বসা গঞ্জের বড়সড় হাট আর উল্টো দিকের মাঠে মোরগ লড়াইয়ের জমজমাট আসর। গাড়ি নিরাপদে দাঁড় করিয়ে যাওয়া হল লড়াই দেখার বাসনায়। বিশাল জায়গাজুড়ে সাইকেল মোটর সাইকেলে দড়িতে বাঁধা আছে তাগড়াই যোদ্ধারা। মেলার চেহারা নিয়েছে গোটা চত্বর। দড়ি দিয়ে ঘিরে চৌকো জায়গায় চলছে বেশ কয়েকটি দুই পালোয়ানের লড়াই—পায়ে চকচকে ধারালো বাঁকা ছুরি বাঁধা উড়ন্ত অবস্থায় একে অপরকে ঘায়েল করার চেষ্টা। তাকে ঘিরে আছে মানুষের উত্তেজনা, চিৎকার, ঝগড়া। কিছু দূরে বসেছে বড়সড় জুয়ার আসর। আগন্তুকদের দেখে এগিয়ে এসে কয়েকজন সে-দৃশ্য ক্যামেরাবন্দি না করার অনুরোধ জানায়। লড়াই দেখে শুরু হল গন্তব্যের লক্ষ্যে চলা।

বহু দূর থেকে অযোধ্যা পাহাড়ের রেঞ্জ চোখে পড়ে। ক্রমশ তার ঘনত্ব বা উচ্চতা বাড়তে থাকে। এক সময় অপূর্ব সুন্দর আঁকাবাঁকা খাড়াই পথ অতিক্রম করে পৌঁছে যাওয়া যাবে পাহাড়ের ওপর কালীপাহাড়ির সমতলে। আমাদের থাকার ব্যবস্থা করা ছিল ‘আকাশ হিলটপ রিসর্ট’-এ। পৌঁছানো গেল

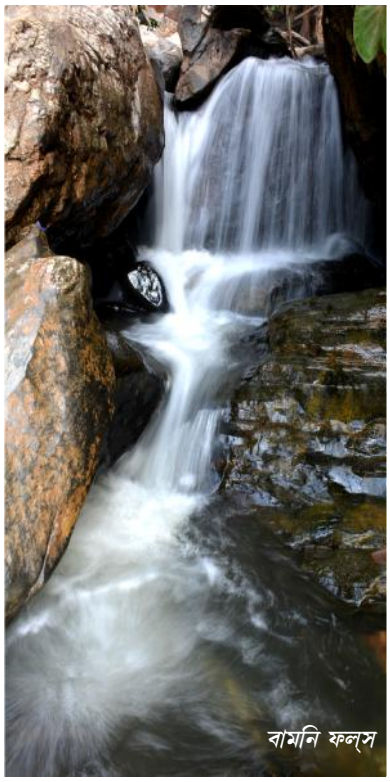
বামনি ফল্‌স

ঠিক সন্ধে নামার মুখে। সমতল থেকে বেশ কিছুটা ঢালু পথে উঠতে হবে রিসর্টে। মনোরম জায়গা।

স্নান সেরে, একটু বিশ্রাম নিয়ে পায়ে হেঁটে ঘুরে নেওয়া যায় আশপাশ। সংলগ্ন এলাকাতেই আছে রাজ্যসরকারের ইয়ুথ হস্টেল, রিসর্ট ‘নীহারিকা’, ‘মালবিকা’, ‘বিভাবরী’ ইত্যাদি বেশ কয়েকটি থাকার জায়গা। রিসর্টের ভেতরের পরিবেশ বেশ সুন্দর করে সাজানো গোছানো। আছে পুরুলিয়ার ঐতিহ্য ছৌ-মুখোশ, গালা, বাঁশ, কাঠের নানান শিল্পসামগ্রীর বিক্রয় কেন্দ্র। পাশেই আছে শিকার উৎসব ময়দান। স্থানীয় মানুষজনের কাছে শোনা গেল কখনও কখনও হাতির আগমন ঘটে এলাকায়। কে জানে, কখন আসে! অতএব পা বাড়ানো হল রিসর্টের পথে। পঞ্চকোট পাহাড়ে ওঠা, পথশ্রমে ক্লান্ত শরীরে পেয়ে বসে ঘুমের নেশা।

সাত সকালে ঘুম থেকে উঠে হিলটপ রিসর্টের চারতলার ছাদে উঠে দেখে নেওয়া যায় বিস্তীর্ণ পাহাড় আর সবুজের সমারোহ। স্নান সেরে, খাবার খেয়ে বেরিয়ে পড়তে হবে পরবর্তী দ্রষ্টব্যগুলির জন্য। যাওয়া যেতে পারে দুর্গাবেড়া ড্যাম, তুর্গা ফল্‌স, তুর্গা ড্যাম ইত্যাদি। আছে বামনি ফল্‌স, মার্বেল লেক। কালীপাহাড়ির সমতল অংশ পেরিয়ে পড়বে উচ্চাবচ ভূমিরূপ। আঁকাবাঁকা, চড়াই-উৎরাই পথ পেরিয়ে প্রকৃতিপ্রেমীদের কাছে অত্যন্ত আকর্ষণীয় বামনি ফল্‌স। এখানকার পাথরের দিকে নজর দিলে বোঝা যায় তাতে অভ্র বা মাইকা মিশে আছে। ২৫০-৩০০ ধাপ নামলে মোটামুটি উপভোগ করা যায়। আরও নিচে নামা যায় কাছ থেকে অনুভব করতে। বামনি ফলস্-এর কাছাকাছি আছে মার্বেল লেক। পরিত্যক্ত মার্বেল পাথরের খনিতে জল জমে অপূর্ব হ্রদ তৈরি হয়েছে।

পুরুলিয়ার লোকজীবনে ও লোকসংস্কৃতি চর্চায় জড়িয়ে আছে ছৌ নাচ। পালা ছৌ-এর পুরাণ, অলৌকিক বা কাল্পনিক কাহিনিকে বিশ্বাসযোগ্য করে তোলার ক্ষেত্রে মুখোশ ব্যবহৃত হয়—দুর্গা, অসুর, কালী, নানা পশুর মুখোশ। এই শিল্পগ্রাম যাওয়া যায় বাঘমুণ্ডি থেকে। সময়

মার্বেল লেক

পাখি পাহাড়

বেশি থাকলে যাওয়া যেতে পারে ময়ূর পাহাড়, মুরগুমা ড্যাম।

অযোধ্যা পাহাড় থেকে ১০ কিলোমিটারের মধ্যেই পড়ে দেউলঘাটা। আনুমানিক নবম-দশম শতাব্দীর টেরাকোটা শিল্পসমৃদ্ধ এক শিখর দেউল মন্দিরকে কেউ জৈন আবার কেউ বৌদ্ধ দেবালয় বলেন। এই চত্বরেই সাম্প্রতিক অতীতে রণবীর কাপুর-সোনাক্ষী সিনহা অভিনীত বলিউডি সিনেমা 'লুটেরা'র কিছু দৃশ্য ক্যামেরাবন্দি করা হয়।

পুরুলিয়া বেড়াতে আসা মানুষজন প্রায় সবাই যে-দুটি দ্রষ্টব্য স্থান অবশ্যই দেখেন সে দুটি হল পুরুলিয়া পাম্প স্টোরেজ প্রজেক্টের আপার ড্যাম এবং লোয়ার ড্যাম। চক্ষু সার্থক হয় অসাধারণ সুন্দর প্রকল্পদুটি এবং সন্নিহিত প্রাকৃতিক পরিবেশ দেখলে।

পরবর্তী গন্তব্য ছিল পাখি পাহাড়। অযোধ্যা হিলটপ কালীপাহাড়ি থেকে এর দূরত্ব ২৮ কিলোমিটারের মতো। মাঠা রেঞ্জের এই পাহাড়কে প্রাণহীন ভৌগোলিক বস্তু না ভেবে প্রাণবন্ত করে তুলতে খোদাই করে পাখি এঁকেছেন শিল্পী চিত্ত দে-র নেতৃত্বে একদল শিল্পী। ১৯৯২ নাগাদ পরিদর্শন করে কাজের পরিকল্পনা করেন। কেন্দ্রীয় অর্থসাহায্যে কাজ শুরু হয় ২০০৪-এ। এখনও পাহাড়ের গায়ে লোহার মই লাগানো আছে 'রক স্কাল্পচার' করার তাগিদে। কাজ চলছে এখনও। জানা গেল, খোদিত সবচেয়ে ছোটো পাখিটি ডানা মেলা অবস্থায় ৫৫ ফুট এবং বড় পাখি ১২০ ফুট।

পুরুলিয়ার নানা রূপ ধরা দেয় বছরের নানা সময়ে—গরমে রুক্ষশুষ্ক, বর্ষায় সবুজের সমারোহ আবার শীতের শেষে পলাশের সমারোহে লালে লাল। পাহাড়, জলাধার, জলপ্রপাত, প্রাচীন মন্দির নিয়ে গড়ে ওঠা পুরুলিয়ার প্রাকৃতিক পরিবেশ শুধু ভ্রমণপিপসু বা পরিবেশপ্রেমীদেরই টেনে আনে না। সত্যজিৎ রায়, মৃণাল সেন, বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত থেকে শুরু করে বলিউডের এমনকি বিদেশি চলচ্চিত্র পরিচালকও শ্যুটিং স্পট হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন পুরুলিয়াকে।

পাখি পাহাড় থেকে বলরামপুর-পুরুলিয়া শহর হয়ে ফিরতি পথে গন্তব্য ছিল রঘুনাথপুরের জয়চণ্ডী পাহাড়। সত্যজিৎ রায়ের 'হীরক রাজার দেশে' সিনেমা দেখেনি এমন বাঙালি প্রায় বিরল। এই সিনেমার চিত্রগ্রহণ হয়েছিল জয়চণ্ডী পাহাড়ে। রাজভৃত্যদের হীরকরাজের বচন 'লেখাপড়া করে যেই, অনাহারে মরে সেই', 'জানার কোনো শেষ নাই, জানার চেষ্টা বৃথা তাই' শোনানোর সময় দৃশ্যপটে যে পাহাড়টির ছবি ফুটে ওঠে সেটি জয়চণ্ডী পাহাড়। হীরকরাজের অত্যাচারে গুরুমশাই (সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়) লুকিয়ে ছিলেন এই পাহাড়ে। পাহাড়ের ওপারে হীরকের রাজ্য। গুপি-বাঘারা ছিল দুজন, আমরা পাঁচ। রাজাদের ছেড়ে যাওয়া বাড়িতে চাকরি করলেও আমরা রাজার জামাই নই! গুপি-বাঘারা দু-জনায় ছিল 'রাজার জামাই'। তারপরেও ছিল ভূতের রাজার বরে তালি মেরে পাহাড়ে ওঠার ক্ষমতা। আমাদের তো তা নেই!

সত্যজিৎ রায় স্মরণে একটি মঞ্চ নির্মিত হয়েছে জয়চণ্ডী পাহাড়ের কোলে। পাহাড়ের কোলে পৌঁছতে পৌঁছতে দেখা গেল সূর্যদেব অস্তাচলগামী। সময়াভাবে জয়চণ্ডী পাহাড়ে ওঠা হয়ে ওঠেনি। অতৃপ্তি নিয়েই আবার পঞ্চকোট পাহাড়ের কোল ঘেঁষে চলে যাওয়া সড়কপথ ধরে ফিরতে হল বর্ধমানে।

ছবি : জয়ন্ত দাস এবং শ্যামসুন্দর বেরা

জয়চণ্ডী পাহাড়

পায়ে পায়ে দয়ারা

বিলাস চ্যাটার্জি

সবুজ মখমলের মতো বিস্তীর্ণ তৃণভূমিতে বসে শুয়ে আয়েস করে দূরের জঙ্গলে ঘেরা পাহাড়ের উপর মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকা তুষারশৃঙ্গরাজি দেখা, নীল আকাশের গায়ে হাল্কা মেঘের দল একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্তে ভেসে বেড়াবে—এমন ক্যানভাস কার কাছে না স্বপ্নের হয়! এমনই স্বপ্নের জায়গায় যেতে চায় মৌ—সপরিবারে। পরিবার মানে মৌ, অভিজিৎ ও তাদের একমাত্র আট বছরের ছেলে ঋক। যাওয়া যেতে পারে? জানতে চায় মৌ। ঋকের দিকে তাকিয়ে আমি রাজি হয়ে গেলাম। এতদিন হিমালয়ে ট্রেকিং করে বুঝেছি বাচ্চাদের সেখানে নিয়ে যাওয়া সহজ। যতিসেই শিশু বা কিশোর তার মা-বাবার কাছে তথাকথিত ভাবে দুরন্ত বলে স্বীকৃত হয়, তবে সেই চঞ্চল শিশু বা কিশোরকে নিয়ে যাওয়া আরও সহজ। বদ্ধ ঘরের চঞ্চল শিশু-কিশোরদের দিয়ে অনেক কঠিন কাজ সহজেই করিয়ে নেওয়া যায়। আমি মৌকে জানালাম ঘন্টা ৩-৪ হাঁটতে হবে রোজ। তার জন্য একটু হাঁটাহাঁটি করে শরীরটাকে তৈরি করে নিতে হবে। আর ঋককে নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব আমার। আমার বিশ্বাস আছে, কারণ আমার একমাত্র কন্যা তিতুনকে নিয়ে আমি তার মাত্র আট বছর বয়সেই সান্দাকফু ঘুরিয়ে নিয়ে এসেছি—সহজেই। তাই ঠিক হল আমাদের দুটি পরিবার একসাথেই যাব দয়ারা বুগিয়াল। তিতুন এখন ১৫ বছরের কিশোরী। কয়েকটা ট্রেক করে অভিজ্ঞতা বেড়েছে। অর্থাৎ পিউ, তিতুন, আমি; আর মৌ, অভিজিৎ, ঋক—এই আমাদের দল।

আমরা যাব গাড়োয়াল হিমালয়ের দয়ারা বুগিয়াল। হরিদ্বার-গঙ্গোত্রী পথের অন্যতম জনপতউত্তরকাশী থেকে আমাদের যাত্রা শুরু হল। উত্তরকাশী থেকে গাড়ি নিয়ে চললাম বারসু-র পথে। গঙ্গোত্রীর রাস্তায় গাড়ি চলল ভাটোয়ারী পর্যন্ত। সেখান থেকে গঙ্গোত্রীর পথ ছেড়ে আমরা চললাম বাঁ-দিকে। পরিষ্কার পিচঢালা চড়াই পথে আমাদের গাড়ি চলেছে। যাত্রা শেষ হল বারসু গ্রামে। গাড়ি চলার পথ এখানে শেষ হয়েছে। বর্ধিষ্ণু এই গ্রামটিতে GMVN-এর নতুন ট্রেকার্স হাট হয়েছে। একাধিক রিসর্টও রয়েছে। প্রকৃতি তার সব রূপ যেন এই গ্রামটিকেই দিয়েছে। পূর্বদিকে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে শ্রীকণ্ঠ শৃঙ্গ, সাথে বেশ কয়েকটি শৃঙ্গকে নিয়ে। এই গ্রামেই কয়েক দিন বসে থেকে অনায়াসে কাটিয়ে দেওয়া যায়।

কিন্তু আমরা যাব উপরে। চায়ের দোকানে এক কাপ করে চা খেয়ে আমাদের হাঁটা শুরু হল। গ্রামের নিচে একটা সুন্দর চারদিক বাঁধানো তালাও আছে, যা এই গ্রামের সৌন্দর্যকে আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। আমাদের চলার পথ এই তালাওয়ের পাড় ধরে। এগিয়ে চলি। তালাও মানে জলাশয়, স্থানীয় ভাষায় তালাও বলে। তালাও-এর অপর পাড়ে এসে তুষারশুভ্র হিমালয়ের প্রতিচ্ছবি এক অপরূপ শোভা বর্ধন করে বারসু গ্রামটির। আমরা তালাও শেষে গ্রামের ভেতর দিয়ে ঢালাই রাস্তা ধরে এগিয়ে চলি। ছোট্ট গ্রামটি শেষ হওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই, আরো একটু এগিয়ে প্রবেশ করি জঙ্গলের মধ্যে। পায়ে চলা পাকদণ্ডী পথ চলেছে জঙ্গলের ভিতর দিয়ে। মাঝে মাঝে গাছের ফাঁক দিয়ে উঁকি দেয় শ্রীকণ্ঠ সহ সকল শৃঙ্গগুলি। অনেকটা উপরে এসে দূর থেকে গ্রামটি চোখে পড়ে—অপরূপ সৌন্দর্য। কিন্তু পাহাড়ের গা বেয়ে আঁকাবাঁকা পথে চলতে চলতে একসময় হারিয়ে যায় গ্রামটি। ঋক আমার সঙ্গে সুন্দর হাঁটছে, তিতুন অভিজিৎ-এর সাথে, মৌর আর পিউ জুটি বেঁধে এগিয়ে চলেছে। আর মেঘরাজ—আমাদের পথপ্রদর্শক, সে একবারও আমাদের তার চোখের আড়াল করেনি।

ঘণ্টা তিন হেঁটে পৌঁছাই একটি সুন্দর ফাঁকা জায়গায়। চারিদিকে জঙ্গল আর মাঝে একখণ্ড ক্যাম্পিং সাইড। একটি জলধারা মৃদুমন্দ গতিতে এগিয়ে চলেছে। তবে তার চারপাশটা একটু কাদা থাকায় এখানে ক্যাম্প করা সম্ভব হল না। আরও কিছুটা উপরে উঠে একটা সুন্দর বিস্তীর্ণ বুগিয়ালে পৌঁছালাম। সবুজ ঘাসে ঢাকা এই বুগিয়ালের ওপর আজকের তাঁবু পড়ল। দু-দিকে বৃহৎ বৃক্ষের বনরাজি। মঝের এই বিস্তীর্ণ তৃণভূমিতে ম্যাট্রেস বিছিয়ে সকলে বসে আড্ডা জমালাম। জায়গাটার নাম 'বারনালা ক্যাম্প সাইড'। আমাদের তাঁবু আগেই খাটানো হয়ে গিয়েছিল। বসে একটু বিশ্রাম নিতেই গরম চা, সঙ্গে স্ন্যাক্স হাজির। শরীরের ক্লান্তি নিমেষেই চলে গেল। আমরা চারপাশে ঘুরে বেড়ালেও আকাশে মেঘ থাকায় দূরে পাহাড়ের চূড়াগুলো দেখতে পেলাম না। ছোট্ট ঋক আর তিতুন দৌড়ে বেড়াচ্ছে, ওরাও এই সুন্দর জায়গার সৌন্দর্য মনপ্রাণভরে উপভোগ করছে। বিকেলের

দিকে মেঘ সরে গোধূলির রাঙা কিরণে রাঙিয়ে দিল পাহাড়ের চূড়াগুলো। সন্ধ্যা নেমে আসার সাথে সাথেই ঠাণ্ডাও তার দাপট বুঝিয়ে দিল। আমরা সকলে তাঁবুর নিরাপদ আশ্রয়ে যেতে বাধ্য হলাম।

বারনালা-দয়ারা বুগিয়াল

সকালে তাড়াতাড়ি তৈরি হলাম। আজ আমাদের লক্ষ্য দয়ারা বুগিয়াল। বুগিয়াল মানে 'চারণক্ষেত্র'। হিমালয়ের কোলে এমন অনেক বুগিয়াল বা চারণক্ষেত্র দেখা যায়। বুগিয়াল ধরে চড়াই পথে এগিয়ে চললাম আমরা। কিছুটা উপরে উঠে এসে একটি ছোট্ট তালাও-এর দেখা পেলাম। তার পাশে একটি মন্দির—কালনাগের মন্দির। কথিত আছে এখানে নাকি নাগ দেবতা বাস করেন। ডানদিকের উপরে একটা গোলাকার টিনের চালা রয়েছে। পদযাত্রীরা এখানে বিশ্রাম নেয়। আমরা বুগিয়াল পেরিয়ে কঠিন চড়াই বেয়ে গভীর জঙ্গলের পথ ধরলাম। ঘণ্টা দেড়েক হাঁটার পর জঙ্গলের পথ শেষ হল। আমরা এখন পাহাড়ের মাথায়। ডান দিকে আরও নতুন পাহাড়চূড়া মাথা তুলে আমাদের দেখা দিল—কদরপুঞ্জ ও কালনাগ শৃঙ্গ। পুবের পাহাড় চূড়াগুলো আরও দল বেঁধে আমাদের সামনে হাজির হল। এই সবুজের কার্পেটে দাঁড়িয়ে এমন নৈসর্গিক দৃশ্য, যে কোনো মানুষকেই মোহিত করতে পারে। আমরাও তু-চোখ ভরে এত রূপ, রস, সুধা পান করতে লাগলাম।

মেঘরাজের তাড়ায় আমাদের সম্বিত ফিরল। যেতে হবে ক্যাম্প সাইডে, তাই এগিয়ে চললাম। ডান দিকের পথ ধরে বেশ কিছুটা এগিয়েই দয়ারা বুগিয়ালে পৌঁছলাম। বিশাল অঞ্চলজুড়ে এর বিস্তৃতি অনেক ওপর পর্যন্ত দেখা যায়। আমরা মাঝামাঝি একটা জায়গায় ক্যাম্প করলাম। সুন্দর একটা জলধারা আমাদের ক্যাম্পের পাশ দিয়েই বয়ে চলেছে। ঢালু এই চারণক্ষেত্রের মাঝে এমন সুন্দর একখণ্ড সমতলে আমাদের ক্যাম্প হল। মাত্র ৩ ঘণ্টা হেঁটে পৌঁছে গেলাম দয়ালা বুগিয়ালে। ঠাণ্ডায় রোদে পিঠ পেতে সকলে বসে জমিয়ে আড্ডা শুরু হল। ঋক, তিতুন আর কতক্ষণ বসে থাকবে! তারা ঘুরে বেড়াতে লাগল চারদিকে। শুধু একটিই নির্দেশ ছিল তাদের জন্য যে তারা আমাদের নজরের বাইরে যেন না যায়। এই প্রশস্ত বুগিয়ালটি বেশ কয়েকটি ধাপে বিভক্ত। একদম নিচের দিকে ধাপে কিছুটা অস্থায়ী পরিত্যক্ত ঘরবাড়ি আছে। গরমের সময় নিচের গ্রাম থেকে মানুষজন গরু, মোষ নিয়ে এখানে চলে আসেন। শীতের আগে সবাই আবার নিচের গ্রামে ফিরে যায়। তার ওপরের ধাপে জঙ্গলের পাশে বেশ কিছু তাঁবু খাটানো হয়েছে। বিকেলের দিকে একটা বড় দল এসে উপরের দিকে ক্যাম্প করল। দুপুরের পর মেঘ এসে ঢেকে দিল দূরের পাহাড়চূড়াগুলো। সন্ধের পর সেই মেঘ একটু একটু করে সরে যেতেই দিনের শেষ সূর্যের আলোয় আলোকিত হল পাহাড়চূড়া। সন্ধ্যায় ঠাণ্ডার কারণে বাইরে থাকা গেল না।

দয়ারা বুগিয়াল-দয়ারা টপ

রাতেই আকাশ পরিষ্কার হয়ে গেল। আমি, অভিজিৎ অনেক রাত পর্যন্ত বাইরে ছিলাম। আসলে হিমালয়ের রাতেরও অপূর্ব এক সৌন্দর্য আছে। চাঁদের আলোয় পর্বত শৃঙ্গগুলো ও চারণক্ষেত্র এক মোহময় রূপ ধারণ করে। ভোরের আলো ফুটতে না ফুটতেই আমরা তাঁবুর বাইরে বেরিয়ে আসি। দিনের প্রথম সূর্যের আলো কদরপুঞ্জ ও কালনাগ পর্বতের ওপর এসে পড়েছে। দেখে মনে হচ্ছে যেন সোনার মুকুট পরানো হয়েছে তাদের মাথায়। সবাইকে ডেকে এই দৃশ্য দেখাই। ঠাণ্ডায় হাত জমে যাচ্ছে, তবুও সবাই তাঁবুর বাইরে শুধুমাত্র এই রূপকে উপভোগ করার জন্য। এক সময় রোদ প্রখর হয়, আমাদের ক্যাম্পে রোদ এলে শরীর গরম হতে দেরি হয় না।

আজ তাড়া নেই। গোছগাছেরও তেমন কিছু নেই। আমরা বুগিয়ালের ওপর পর্যন্ত যাব, দেখব, আবার ফিরে আসব এই ক্যাম্পেই। প্রাতরাশ সেরে যাত্রা শুরু হল। হাল্কা চড়াই বেয়ে উঠে চলা। কিছুটা উঠে চারদিক মন ভরে দেখে তবেই পরবর্তী ধাপে এগোনো। প্রতি ধাপেই দৃশ্য পাল্টায়। অপরূপ সে দৃশ্য। তাই চড়াই ওঠার জন্য দমের ঘাটতি একটু হলেও দেখার খামতি রাখতে চাই না। ধীরে ধীরে বুগিয়ালের শেষ প্রান্তে এসে পৌঁছাই। ডানদিকে একটা পথ চলে গেছে গিদারা বুগিয়ালের দিকে। পিছনের পথটা গেছে জঙ্গলের ভিতর দিয়ে ডোডিতালের দিকে। আমরা দয়ারা টপে উঠে পিছনে উত্তরকাশী শহরটা দেখতে পাই। এই দয়ারা টপের উচ্চতা ১৩ হাজার ফুট। দূরে পাহাড়ের গায়ে গ্রামগুলো দেখে মনে হয় প্রকৃতির থেকে নিখুঁত, যেন উচ্চমানের শিল্পীর সৃষ্টি। যাই হোক, সেখান

থেকে আরো বামদিকে সরে গিয়ে একটা পায়ে হাঁটা পথ ধরে আমরা নামতে থাকি। জঙ্গলের ভিতর দিয়ে একটা গিরিশিরা বেয়ে নেমে চলি। দিল্লির একদল কলেজ ছাত্র ওই পথে উপরে উঠে আসে—ওরা এই পথে যাবে ডোডিতাল।

দুপুরে আহারের আগেই পৌঁছে যাই আমাদের ক্যাম্পে। রোদে বসে দুপুরের খাবার খাওয়া হয়। পরে শুয়ে, বসে বাকি দিনটা শুধু দেখে যাই নীল আকাশের গায়ে ভেসে বেড়ানো মেঘেদের খেলা। ঋক তিতুন ছুটে আসে বার বার। আর মেঘেদের নানা বর্ণনা ব্যাখ্যা করে। ওদের গল্পে উঠে আসে মেঘদূত কাব্যের মতো নানা গল্প, যা ওদের নিজেদের মনে হওয়া, ওদের কল্পনার বুননে সৃষ্টি। যে সৃষ্টি এমন মোহময় প্রকৃতি না হলে হয়তো তৈরিই হত না।

দয়ারা-রাইথল

পরের দিন আবার সূর্যোদয়ের সাক্ষী হলাম। প্রাতরাশ সেরে ফেরার পথ ধরি। যে পথে এসেছিলাম সেই পথেই নেমে এলাম

বুগিয়ালের শেষ প্রান্তে। এখানে পথ দুদিকে চলে গেছে। বাঁ-দিকের পথ ধরে আমরা উঠেছিলাম। সেই পথ না ধরে ডান দিকের পথ ধরলাম। উৎরাই পথ ধরে নেমে চলি রাইথলের দিকে। জঙ্গলের ভেতর দিয়ে পাকদণ্ডী পথ—সুন্দর, চওড়া পায়েচলার পথ। উতরাই পথে চলার কষ্ট কম, গতি বেশি। চলার পথে মাঝে মাঝেই বিশ্রাম নেবার জন্য সুন্দর টিনের ছাউনি করা রয়েছে। আজ আমাদের দলে নেতা ঋক। সে মাঝে মাঝেই নির্দেশ দেয় আমাদের কেউ যেন এগিয়ে বা পিছিয়ে না পড়ে। সকলকে এক সাথেই হাঁটতে হবে। ঘণ্টা তিনেক হাঁটার পর জঙ্গলের ভিতরেই প্রায় সমতল এক সুন্দর জায়গায় পেহাছাই। এখানে GMUN-এর কটেজ আছে। প্রয়োজনে থাকা যেতে পারে, আবার তাঁবু খাটানোও যেতে পারে। জায়গাটির নাম ‘গুইন’। আমরা একটু বিশ্রাম নিয়ে আবার জঙ্গলের ভিতর দিয়ে এগিয়ে চলি। একসময় রাইথল গ্রামের দেখা পেলাম। এই গ্রামটিও বারসুর মতো সুন্দর। সামনেই দাঁড়িয়ে আছে ‘শ্রীকণ্ঠশৃঙ্গ’। বর্ধিষ্ণু রাইথলে পেহাছাই প্রায় দুটো নাগাদ। আমাদের দীর্ঘ পদযাত্রা শেষ হয় পাকা রাস্তায় উঠে। সেখান থেকে গাড়ি নিয়ে বিকেলে ফিরে আসি উত্তরকাশী।

শিশু ঋক ও কিশোরী তিতুনের মনে এই যাত্রা এক সুন্দর ছবির মতো আজও বিরাজ করছে। প্রকৃতি যে শিশু থেকে বৃদ্ধ সবার বন্ধু তা আবার বুঝতে পারলাম।

With best compliments from

RADISTA

Sl. No. 110

শারদ শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন

কালেখাঁতলা-২ তপসিয়া মহিলা মাল্টিপারপাস কো-অপারেটিভ সোসাইটি লি.

রেজি. নং : ৭ কে.টি. ।। গ্রাম তেলিওনিয়পাড়া, পোঃ পারুলিয়া, বর্ধমান

এখানে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের বিভিন্ন প্রশিক্ষণ দেওয়ার মাধ্যমে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হয় এবং ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থায় স্বল্প সুদে ঋণ দেওয়া হয়।

শিখা ভৌমিক
সভাপতি

শিপ্রা দেবনাথ
সম্পাদিকা

Sl. No. 34

With best compliments from

CLW CO-OPERATIVE CREDIT SOCIETY LTD.

রেজি. নং ৪৭ (২৪.০২.১৯৫২)
পোঃ চিত্তরঞ্জন, জেলা : পশ্চিম বর্ধমান-৭১৩৩৩১

'সমবায় প্রণালীই আমাদের দেশকে
দারিদ্র্য হইতে বাঁচাইবার একমাত্র উপায়।'

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আমাদের পরিষেবা

● কম সুদে ৩,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত দীর্ঘমেয়াদী ঋণ প্রদান। ● ১,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত স্বল্পমেয়াদী ঋণ প্রদান। ● ২০,০০০ টাকা পর্যন্ত উৎসব ঋণ প্রদান। ● শীততাপ নিয়ন্ত্রিত অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবা। ● কম ভাড়ায় পুরীতে হলিডে হোম। ● এলাকার কৃতী ছাত্র-ছাত্রীদের উৎসাহ প্রদান। ● বিদায়ী সদস্যদের সম্মানের সাথে বিদায় দেওয়া। ● আমরা আমাদের সদস্যদের আর্থিক মান উন্নয়নের সতর্কপ্রহরী।

সভাপতি
কার্যনির্বাহী সমিতি

সম্পাদক
কার্যনির্বাহী সমিতি

Sl. No. 82

ভেলনেশ্বর সৈকতমায়ায়

মধুছন্দা মিত্র ঘোষ

কতো যে সফর জেগে থাকে ভ্রমণ ডায়েরির খেরো খাতায়। এই এখন যেমন, মহারাষ্ট্রের কোঙ্কন উপকুলের ভেলনেশ্বর সৈকতের সফেদ বালুকাবেলা, নির্জনতা, নাতিদীর্ঘ পাহাড়টিলার অপরূপ ঘেরাটোপে। সৈকতের ধার বরাবর ঝালরের মতো নুয়ে আছে নারকেল গাছের পাতারা। শান্ত সমাহিত এক কোঙ্কনি গ্রাম ভেলনেশ্বর। হাওয়ায় সেই চেনা নোনা গন্ধ। সমুদ্র উপকুলবর্তী অঞ্চলগুলো যেমন হয় আর কি।

দু-চোখের আঙিনায় উপুড় হয়ে বিছিয়ে রয়েছে ভেলনেশ্বরের অনাঘ্রাতা প্রকৃতি। ভোর ও সন্ধের ঠির আগের মুহূর্তে তার নিজস্ব রূপ। দিগন্তবিস্তৃত গাঢ় নীলচে সাগরজলে অস্তমিত রাঙা আলোর বিচ্ছুরণ। দূর সমুদ্রে ভাসতে থাকা রঙবেরঙের নৌকাগুলোর ঘরে ফেরার এক অনাবিল সৌন্দর্য ভেলনেশ্বরের পরিমণ্ডলকে আরও যেন মহার্ঘ করে তোলে। শান্ত সমুদ্র ও তার উতল হাওয়া, ডিঙি নৌকার ঘরের ফেরার গান, বাসায় ফিরতে থাকা পাখির কুজন—সব মিলেমিশে অকপট এক দৃশ্যপট তখন। সৌম্য প্রকৃতির আলিঙ্গনে লীন হতে থাকা। কখন যেন মনে হয়, এই বেশ ভালো আছি, সঙ্গোপনে।

এখানে শাস্ত্রী নদীর উত্তরে ভেলনেশ্বর গ্রামে একটি শতাব্দী-প্রাচীন মন্দির আছে। লোকশ্রুতি রয়েছে স্থানীয় এক জেলে তার জালে একটি মূর্তি আটকে আছে নজর করেন। মূর্তিটিকে তখন সে জলে থেকে ছাড়িয়ে সমুদ্রজলে ছুঁড়ে ফেলে দিলেও, মূর্তিটি ফের তার জালে জড়িয়ে যায়। এবার কিন্তু জেলে প্রচণ্ড চটে যায় এবং মূর্তিটিকে জাল থেকে ছাড়িয়ে এনে সজোরে পাথরের গায়ে ছুঁড়ে মারে। কন্তু পরমুহূর্তেই জেলের সম্বিত ফেরে, যখন সে দেখে পাথরের আঘাতে মূর্তির অবয়ব থেকে অবিরাম রক্তক্ষরণ হচ্ছে। এবার সেই জেলে নিজের কর্মকাণ্ডে অনুতপ্ত হয়। মূর্তিটিকে সযত্নে তুলে এনে বেলনেশ্বর গ্রামের দোচালা এক মন্দিরে প্রতিস্থাপন করে। প্রতি বছর মহাশিবরাত্রি উপলক্ষে উৎসবের সাজে সেজে ওঠে ভেলনেশ্বর। দূরদূরান্ত থেকে আসেন ভক্তের দল। এই কালভৈরব মন্দিরে আছেন শ্রীবিষ্ণু, শ্রীগণেশ, শ্রীকালভৈরব ও শ্রীমহাদের মূর্তি। মইন্দরের সামনে একটি প্রাচীন অশ্বত্থ গাছ। দু একটি ঝাঁপবন্ধ ঝুপড়ি দোকান রয়েছে। একপাশে চা কফি ঠাণ্ডাপানীয় পাওভাজির দোকান। কালভৈরব মন্দিরের গা ঘেঁষে সৈকত যাবার পথ।

মন্দিরের পেছনেই সৈকত। দুটি সাধারণ মানের নিরামিষ রেস্তোরাঁ। গাড়ি পার্কিংয়ের কিছুটা ফাঁকা জায়গা, নারকেল গাছের জঙ্গল ও সিমেন্ট বাঁধানো কয়েকটি বসার জায়গা। কয়েক ধাপ পাথরের সিঁড়ি নেমে গেছে বেবাক বালিয়াড়ির বুকে। এখানে টানা মসৃণ সফেদ বালিয়াড়ি, যেখানে সাগরের ঢেউ ভাঙে আর নীরবে ফিরে যায়। পর্যটকদের সমুদ্রস্নান ও রোদস্নান তথা সানবাথের দিব্যি উপযোগী। এই সুন্দর বিকেলে বিস্তীর্ণ সৈকতে আমরা ছাড়া আর এক দম্পতি। পরস্পরের ছবি তুলে নিই, সেই সুযোগে খানিক পরিচয়ও হয়ে যায় ওই তরুণ মরাঠি দম্পতির সাথে।

নারকেল ছাওয়া চমৎকার সৈকত। ফেনায়িত ঢেউগুলো নিজের খেলায়। হালকা লয়ে গড়িয়ে এসে পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত ভিজিয়ে ফিরে যাওয়ার মুহূর্তেই অন্য একপ্রস্থ ঢেউয়ের জটলা জুটে যাচ্ছে। ফিরে যাচ্ছে নিজস্ব ছন্দে অনুপম মৃদুতায়। ঠিক এমন মুহূর্তগুলোতেই তো ভালোলাগার জন্ম হয়। খানিক দূর পর্যন্ত চলে গেছে মিহি বালুতট। অর্ধচন্দ্রাকার সৈকত। দক্ষিণ দিকে জেলেদের ঘরবাড়ি। সৈকতের উত্তর প্রান্তে কিছু প্রাইভেট বাংলো রয়েছে। আসার সময় বিচ রোডে চোখে পড়েছিল কিনারা বিচ হাউস, অতিথি রিসর্ট ইত্যাদি কয়েকটি থাকার আস্তানা। বর্ষা শেষ হতেই যদি এখানে আসা যায়, সুন্দর সাজানো প্রকৃতি-মা তখন আরও নিবিড় স্বাগত জানাবে। শুধুমাত্র সৈকত ধরেই মনমৌজি হেঁটে চলেছি। এই পড়ন্ত বিকেলে সাগরের ঢেউ ভাঙার মৃদু গান ছাড়া আর কোনও শব্দ নেই এ তল্লাটে।

একটু পরই শুরু হয়ে গেল সাগরের সাথে যেখানে ওই আকাশখানার মিলমিশ অর্কদেবের ঠিক সেইখানটাতেই লাল-কমলা রঙ-এর হোরিখেলা। তারও তো ঘরে ফেরার সময় হল। একটু রঙবাহারি খেল তো রোজ সে দেখায়ই। তার ওপর, বাংলা ক্যালেন্ডারের পাতায় আজই তো দোলপূর্ণিমা। ক্যামেরায় ভরে

নিচ্ছি অর্কদেবের ঘরে ফেরার দৃশ্যাবলী। ওদিকে নারকেল গাছের মাথায় কখন থেকে রূপালী গোলপানা চাঁদটাও ফুটে আছে। রঙিন এক টুকরো সূর্যাস্তকে ক্যামেরায় ভরতে না ভরতেই দেখি ওদিকে চাঁদটাও তখন ভেলনেশ্বরের আকাশ মাতাচ্ছে।

ঝুপ্পুস্ অন্ধকারে ক্রমশ ছেয়ে যায় চারপাশ। সঙ্গী নারকেলবীথির মাথায় দোলপূর্ণিমার রূপোর থালার মতো চাঁদটার ছবি তুলতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। কখনও নিজের মোবাইল ক্যামেরা কখনও সাধের নিক্কন ক্যামেরাকে আকাশপানে উঁচিয়ে একের পর এক ছবি তুলে যেতে থাকে। গাড়ি রাখার জায়গাটায় রেস্তোরাঁ থেকে দুটো চেয়ার চেয়ে এনে জুত করে বসে চিপ্সের প্যাকেট থেকে আলতো করে একেকটা চিপ্স মুখে তুলি আর আনমনে চেয়ে থাকি কালো সাগরটার দিকে। বস্তুত রাতের নিজস্ব রূপ দেখতেই চেয়ার টেনে বসি। এ রূপ ভেলনেশ্বরের একান্তই নিজস্ব। মহানগরের নাটুকেপনা ক্লান্ত মননে এই সন্ধ্যেটুকু বিবশ করে রাখে।

সৈকত লাগোয়া সাধারণ মানের নিরামিষ রেস্তোরাঁয় রাতের আহারের অর্ডার দেওয়া ছিল আগেই। ওদিকে আবার হিলটপে রিসর্টে ফিরতে হবে। এই দিকটা এখন পুরোপুরি শুনশান। চেয়ারগুলো ফিরিয়ে নিয়ে ভেতরে গিয়ে বসি। রান্নাঘরে দেখি পুরো পরিবারটাই আমাদের জন্য খাওয়ার তোড়জোড় করছেন। সবাই রান্নার কাজে ব্যস্ত। মালিক চাপাটি সেঁকছেন। পাশে দাঁড়িয়ে তাঁর গিন্নি চাপাটি বেলে দিচ্ছেন। কানে দুল ও কায়দার ছাঁট দেওয়া রঙ করা সোনালি চুলের মালিকের তরুণ ছেলেটি অন্য গ্যাস-চুলায় নিজে হাতে আলু-জিরা-মেথির একটা শুকনো ভাজি বানিয়ে ফেলছে ততক্ষণে। চাপাটি সেঁকা শেষ করেই রেস্তোরাঁ মালিক তুর ডালে সম্বর দিতে থাকলো। ওদিকে মালিকের স্কুল-পড়ুয়া পৃথালু মেয়েটিও পুরোদস্তুর রান্নায় বাবাকে হাত বাড়ানো থেকে শুরু করে মিক্সিতে দইয়ের ছাস্ বানিয়ে গেলাসে ঢেলে দেওয়া সবই করছিল। ওদের পুরো পরিবারের এমন ব্যস্ততা ও রেঁধেবেড়ে খাওয়ানোর কথা ডায়েরিতে লিখে রাখি।

রাত দশটা বেজে গেছে ঘড়িতে। সেই স্কুলপড়ুয়া মেয়েটি ওবার স্কুল-খাতার উল্টোপিঠে খাবারদাবারের হিসেব কষতে বসে। দোকান মালিকের কাছে কথায় কথায় জেনে নিই এই গ্রামে স্মার্ট ঐতিহ্য পরম্পরাবাহী। গ্রামবাসীদের মধ্যে আছেন সাভারকর, তুলপুলে, গোভান্দে, ঘাগ, গোখেল, গাডগিল, ভেলঙ্গরে ইত্যাদি পদবির পরিবার। এরা সকলেই হিন্দু এবং গণেশ-বিষ্ণু-সূর্য-দুর্গামাতা-শিবের উপাসক। দোকানি পরিবারটি হিন্দিতে তেমন পোক্ত নয়। নিজস্ব দেশজ মরাঠি গ্রাম্য ভাষায় কথা বলছিল। আমাদের মরাঠি ড্রাইভার তখন আমাদের মধ্যে ইনটারপ্রেটারের ভূমিকায়।

রাতে রিসর্টে ফিরেই ব্যালকনিতে চেয়ার নিয়ে বসি। ঘরের ভেতর থেকেও সমুদ্রের গর্জন টের পাচ্ছি। দোল পূর্ণিমার ভরাট চাঁদে সাগরে এখন জোয়ারের টান। রাত যত গহিন হচ্ছে জোয়ারের দৌরাত্ম্যিতে সাগরজলে উথালপাতাল ঢেউ কুলে এসে আছড়ে পড়ছে। উপকূলবর্তী গাছের সারির মাথায় লোনা হাওয়ার দাপাদাপি বাড়তে থাকে রাত বাড়ার সাথে সাথে। সমস্ত চরাচর নিশ্চিন্ত-নিরালা-নির্জন। চাঁদের আলো ঠিকরানো ঢেউয়ের মাথা ঝিক্মিক্ চমকে ওঠে। দূরে মায়াবী আলো যেন কখনও ঝলসে উঠেই মিলিয়ে যায়। আর ভেলনেশ্বরের সৈকত শোনায় ঢেউ ভাঙার গল্প...

শারদ অভিনন্দন গ্রহণ করুন

সমুদ্রগড় সার্ভিস কো-অপারেটিভ সোসাইটি লি.

শাখা : সিংহজুলী

সমুদ্রগড়, পূর্ব বর্ধমান, ফোন : (০৩৪৫৪) ২৬৬২৫৬, ৯৩৩৩২১২৬৭০

আমাদের পরিষেবা

● ন্যায্য দরে ভেজালহীন সারের ব্যবস্থা। ● ব্যাঙ্কে সকল রকম আমানতের ব্যবস্থা। ● কম সুদে চাষিদের ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা। ● অভাবি চাষিদের পাট ক্রয়। ● মিনি ডিপের সাহায্যে সেচের ব্যবস্থা। ● অ্যাম্বুলেন্স ও হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার ব্যবস্থা। ● হাসকিং মিলে ধান ভাঙানোর ব্যবস্থা। ● কৃষি ও কৃষকের স্বার্থবাহী প্রকল্প রূপায়ণে এই সমবায় সর্বদা সজাগ।

বিবেকানন্দ চট্টোপাধ্যায় *সভাপতি*

সাহাদুল খান *সম্পাদক*

আব্দুল হামিদ সেখ *ম্যানেজার*

Sl. No. 4

দুর্গাপুর : ঐতিহ্য ও তার উত্তরাধিকার

পঙ্কজ রায় সরকার

দেশে প্রথম শিল্পনীতি ঘোষিত হয় ১৯৫৬ সালে। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ঘোষিত সোসালিস্টিক প্যাটার্ন-এ সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে রাষ্ট্রের অধীনে শিল্পবিকাশের সিদ্ধান্ত ঘোষিত হয় প্রথম শিল্পনীতিতে। শিল্পনীতিতে মূলত দেশের শিল্প এবং শিল্প বিকাশের পরিকল্পনাকে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ, যৌথ উদ্যোগ ও ব্যক্তিগত উদ্যোগ—এই তিনটি ভাগে ভাগ করে কার্যক্রম গৃহীত হয়।

ভৌগোলিক অবস্থান, শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামাল এবং পরিকাঠামোগত সুবিধার জন্য ১৯৫৬ সালের প্রথম শিল্পনীতির প্রয়োগের অন্যতম একটি স্থান হিসেবে দুর্গাপুর চিহ্নিত হয়ে গেল। একদিকে দামোদর অন্যদিকে অজয়। বুক চিরে গ্র্যান্ড ট্র্যাঙ্ক রোড। শহরের প্রান্ত বরাবর রেললাইন। দামোদর-অজয়ের মধ্যবর্তী অববাহিকায় প্রায় ২৮-২৯টি গ্রামকে হয় উচ্ছেদ নতুবা অধিগ্রহণ করে ধীরে ধীরে গড়ে ওঠে এই শিল্পনগরী।

১৯৫৮ সালে দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানা স্থাপিত হয়। তারপর ১৯৫৯ সালে রাজ্যের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্র রায়ের পরিকল্পনায় 'ইন্ডাস্ট্রি ফর ইন্ডাস্ট্রি'-র লক্ষ্যে গড়ে ওঠে রাজ্য সরকারের মালিকানাধীন ডিপিএল (দুর্গাপুর প্রজেক্টস লিমিটেড)। ধীরে ধীরে গড়ে ওঠে মিশ্র ইস্পাত শিল্প, ডি.টি.পি.এস, এম.এ.এম.সি, বি.ও.জি.এল, এইচ.এফ.সি, ডি.সি.এল, জেসপ প্রভৃতি। ব্যক্তিমালিকানাধীন শিল্পের মধ্যে গড়ে ওঠে এ.ভি.পি, গ্রাফাইট, পি.সি.বি.এল, স্যাঙ্কি হুইলস সহ বেশ কিছু শিল্প। রাজ্য সরকারের পরিবহণ সংস্থা দুর্গাপুর স্টেট ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশন গড়ে ওঠে। এই সমস্ত শিল্পে কাজ করার লক্ষ্যে মেধা ও এবং শ্রমের সমাহার ঘটতে থাকে দুর্গাপুরে। শ্রমিকশ্রেণির মুক্তির লক্ষ্যে সমগ্র দুনিয়ার সাথে দুর্গাপুরে কাজ করতে আসা তরুণ শ্রমিকরাও স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছে। শ্রমিক নেতৃত্বের মুখে গল্প শুনেছি রাতের পর রাত কেটে গেছে 'লাল ফৌজের' বীরত্বপূর্ণ লড়াই থেকে রসদ আহরণ করতে করতে। তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়নের ভস্তক প্রকাশনীর বই আসত। ফটোগ্রাফি, সংস্কৃতি সবকিছু গোগ্রাসে গিলে নিত। আর একদিকে রাজ্য উত্তাল। ট্রামভাড়া বৃদ্ধির বিরুদ্ধে আন্দোলন, শিক্ষকদের আন্দোলন, বন্দিমুক্তি আন্দোলন, খাদ্য আন্দোলন, উদ্বাস্তু আন্দোলন প্রভৃতিতে উত্তাল রাজ্য।

প্রভাব পড়লো দুর্গাপুরে বিভিন্ন শিল্পে কাজ করা শ্রমিক এবং শ্রমিক পরিবারের ওপর। বিশেষত দুর্গাপুর ইস্পাত শিল্পের শ্রমিকরা সংগঠিত লড়াই আন্দোলনের বৃত্তকে প্রসারিত করার মাধ্যমে প্রতিরোধের মহাকাব্য রচনায় প্রস্তুতি নিতে থাকল। ১৯৬৬ সালের আগস্ট মাস, দুর্গাপুর ইস্পাত শিল্পের আধিকারিকদের ডেপুটেশন ডেমনস্ট্রেশন কর্মসূচিতে খুন হন জব্বর। তারপরেই আশিস দাশগুপ্তকে খুন করা হয় এ-জোন-এ, বর্তমানে তা আশিস মার্কেট নামে পরিচিত। লাগাতার আট দিন ইস্পাত প্রকল্পে ধর্মঘট চলে। এর সমর্থনে সমগ্র দুর্গাপুরে প্রতীকী এক দিনের ধর্মঘট হয়।

১৯৬৭ সালে যুক্তফ্রন্ট ভেঙে দেওয়ার কয়েক মাস পর প্রফুল্ল ঘোষ সরকারের

শ্রমমন্ত্রী গঙ্গাধর প্রামাণিকের ডিপিএল-এর শ্রমিকমঙ্গল কেন্দ্রে এক অনুষ্ঠানে আসার খবর আসার সাথে সাথেই দুর্গাপুরের সংগ্রামী মানুষ দুর্গাপুর স্টেশনে জড়ো হয়ে ঘোষণা করেন মন্ত্রীকে দুর্গাপুরে ঢুকতে দেব না। মন্ত্রী স্টেশনে নামতেই শুরু হয় হাঙ্গামা। পুলিশের সাথে খণ্ডযুদ্ধ শুরু হয়। পুলিশ বলপ্রয়োগ করে মন্ত্রীকে নিয়ে আসেন শ্রমিকমঙ্গল কেন্দ্রে। শ্রমিকমঙ্গল কেন্দ্রের চারদিক ঘিরে সংগ্রামী শ্রমজীবী মানুষ। পুলিশ লাঠি উঁচিয়ে তেড়ে এলে শুরু হয় পাল্টা ইটবর্ষণ। বিশাল পুলিশ বাহিনী বন্দুক তাক করে থাকলেও ভয় পাওয়াতে পারেনি সেদিন। প্রায় ৬-৭ ঘণ্টা টানা এই পরিস্থিতি চলার পর পুলিশ গুলি চালাতে শুরু করে। বহু মানুষ আহত হয়। ছ-জনের আঘাত ছিল গুরুতর। ডিপিএল-এর শ্রমিকরা বীরত্বের সাথে এই লড়াইতে অংশগ্রহণ করেছিলেন অন্যান্যদের সাথে। ডিপিএল কারখানার শ্রমিক শীতলেন্দু ভট্টাচার্য গুরুতর আহত হন। কিন্তু মন্ত্রী সেদিন আর কোনো সভা করার সাহস দেখাতে পারেননি।

এই রকম উত্তাল আন্দোলনের প্রেক্ষাপটেই শ্রমিক আন্দোলনের সমন্বয় সাধন করার জন্য তৈরি হয় দুর্গাপুর ট্রেড ইউনিয়ন কো-অর্ডিনেশন কমিটি। আহ্বায়ক হন এম.এ.এম.সি-র শ্রমিক আন্দোলনের নেতা রাখাল ভট্টাচার্য। ততদিনে লাল ঝাণ্ডার ইউনিয়ন এ.আই.টি.ইউ.সি-র মধ্যে শুরু হয়েছে মতাদর্শগত লড়াই। কংগ্রেসের বিরুদ্ধে লড়াই না করে আপসকামী মানসিকতা, শিল্পের কর্তৃপক্ষের শোষণ-তানাশাহির বিরুদ্ধে চুপ করে থাকা নেতৃত্বের বিরুদ্ধে অভ্যন্তরীণ লড়াই চলছে তীব্র। শাসক দল জরুরি শিল্পে ধর্মঘটের অধিকার কেড়ে নিয়েছে, অথচ এ.আই.টি.ইউ.সি-র একটা অংশ চুপ। কোনো ধর্মঘট পর্যন্ত ডাকতে দেননি এ.আই.টি.ইউ.সি-র মধ্যে থাকা নেতৃত্বের সেই অংশ। সংশোধনবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করেই ১৯৭০ সালে ২৮-৩১ মে কলকাতার রঞ্জি স্টেডিয়ামে সর্বভারতীয় সম্মেলনের মধ্য দিয়ে জন্ম নেয় সি.আই.টি.ইউ। সভাপতি নির্বাচিত হন বি.টি. রণদিভে এবং সাধারণ সম্পাদক হন পি রামমূর্তি। সিআইটিইউ গঠনের ফলে দুর্গাপুরের শ্রমিকরা যেন নিজেদের মঞ্চ খুঁজে পায়। লড়াই-আন্দোলনের তীব্রতা বাড়তে থাকে। শ্রমিক শ্রেণির আন্দোলনকে রোখার জন্য দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট সরকারের পতনের পর দুর্গাপুরে তৈরি করা হয় সিআরপি-র গ্রুপ সেন্টার। ১৯৬৮ সালে শিল্প সুরক্ষার নামে পার্লামেন্টে সি.আই.এস.এফ অ্যাক্ট গৃহীত হয়। এই আইনের ভিত্তিতে ১৯৬৯ সালের ১০ মার্চ ২৮০০ সশস্ত্র বাহিনী নিয়ে সিআইএসএফ তৈরি হয়। দুর্গাপুরে ১৯৭০ সালে ৩ আগস্ট সিআইএসএফ পোস্টিং হয় দুর্গাপুর ইস্পাত প্রকল্পে। শিল্পসুরক্ষার নামে তৈরি বাহিনীর শ্রমিক-কর্মচারীদের ওপর দমনপীড়ন চালানোই ছিল গোপন কর্মসূচি। বিক্ষোভ শুরু হয় শহরে। প্রতিবাদে তার পরদিনই (৪ আগস্ট) দুর্গাপুরে একদিনের ধর্মঘট পালিত হয়। ৩ আগস্টই তৎকালীন এভিবি কারখানায় পরিচিত এক সমাজবিরোধী নিখিল দাসকে হত্যার অভিযোগে মিথ্যা মামলায় ৫ আগস্ট গ্রেপ্তার করা হয় দিলীপ মজুমদার, সুখেন সরকার, বিনয় চক্রবর্তী, ঠাকুর দাসকে। আবার শুরু হয় বিক্ষিপ্তভাবে বিভিন্ন জায়গায় ধর্মঘট, বিক্ষোভ। পরবর্তীতে এই মিথ্যা মামলায় রবিন সেন, রাখাল ভট্টাচার্য, তরুণ চ্যাটার্জি, দিলীপ ব্যানার্জি সহ ৩২ জনের নাম যুক্ত করা হয়। জেলের বাইরে থাকা তৎকালীন নেতৃত্ব দেখা করেন জ্যোতি বসুর সাথে। সমগ্র পরিস্থিতির জন্য প্রত্যাঘাতের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ঘোষিত হয় লাগাতার ধর্মঘটের সিদ্ধান্ত। ১২ থেকে ২২ আগস্ট—১১ দিন ধর্মঘট চলে। ১৩ আগস্ট কংগ্রেস এবং সিপিআই-এর গুণ্ডারা নৃশংসভাবে খুন করে এ.বি. রায়কে। ধর্মঘট ভাঙার জন্য ৫০০-র বেশি শ্রমিককে গ্রেপ্তার করা হয়। অমানবিক প্রহার চলে লকআপে। প্রায় পঁচিশ হাজার রাষ্ট্রীয় গুণ্ডা নিয়োজিত হয় শ্রমিকদের এই ধর্মঘট ভাঙার জন্য। এক বছর ধরে কারফিউ। এই ভয়ংকর সন্ত্রাসের মধ্যেই চলেছে প্রতিরোধ। ভারি বুটের শব্দ এবং রাইফেল উঁচিয়ে চিরুনি তল্লাশি ছিল নিত্যদিনের ঘটনা। প্রতিরোধও হচ্ছিল। বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয় দুর্গাপুর ইস্পাতের টাউনশিপের মহিলাদের বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামকে। এর মধ্যেই ডিপিএল-এর জিএন টাইপে ডিপিএল এমপ্লয়িজ ইউনিয়নের নেতা বিশ্বনাথ ঘোষকে কংগ্রেস ও নকশালরা নৃশংসভাবে খুন করে। সমগ্র ডিপিএল টাউনশিপ প্রতিবাদে উত্তাল হয়ে ওঠে। পোস্টমর্টেমের পর বিশাল মিছিল শ্মশানের দিকে যাওয়ার সময় বিক্ষোভের আগুনে স্বতঃস্ফূর্ত ঘটনা ঘটে। বিশ্বনাথ ঘোষের খুনিদের ধরতে না পারা নিষ্ক্রিয় পুলিশ এবার সক্রিয় হয়ে ওঠে। শ্মশান ঘিরে ফেলে পুলিশ সুকেশ ভট্টাচার্য ও কল্যাণ রায়কে মিসায় গ্রেপ্তার করে। সেদিনই ঝর্ণা দাশগুপ্তকে খুন করার উদ্দেশ্যে আক্রমণ করা হয়। এলোপাথাড়ি ছুরি চালায় কংগ্রেস ও নকশালদের যৌথ বাহিনী। কোনোক্রমে বেঁচে যান ঝর্ণাদি। এর মধ্যেই ১৬ জুন, ১৯৭০ তৎকালীন আর.ই. কলেজের ছাত্র মধুসূদন মুখার্জিকে নৃশংস ভাবে খুন করা হয়। কয়েক দিনের মধ্যেই ১৫ নভেম্বর, ১৯৭১ ডিপিএল-এর বিশিষ্ট গণতন্ত্রপ্রিয় নাগরিক তথা এমএমএমসি স্কুলের প্রধান শিক্ষক বিমল দাশগুপ্তকে ক্লাস চলাকালীন গায়ে পেট্রোল ঢেলে আগুন লাগিয়ে জীবন্ত পুড়িয়ে মারে। দুর্গাপুরের শ্রমিক আন্দোলন তীব্র থেকে তীব্রতর হয়েছে শহিদের রক্তভেজা পিচ্ছিল পথ বেয়েই। রথীন ভট্টাচার্য, গোপাল সিংহ রায়, বিশাঙ্ক ব্যানার্জি, ষড়ানন মুখার্জি, চয়ন ব্যানার্জিদের রক্তস্নাত দুর্গাপুর তাই সবসময়ই নিজের স্বাক্ষর রেখেছে মেহনতি মানুষের লড়াই-সংগ্রামে।

এক বড় ধাক্কা নেমে আসে ১৯৯১ সালে। একচেটিয়া পুঁজির কাছে আত্মসমর্পণ করে নয়া উদারবাদের নীতি গ্রহণ করে নরসিংহ রাও-এর প্রধানমন্ত্রিত্বে থাকা কংগ্রেস সরকার। এই নয়া উদারবাদের নামে প্রথম পর্যায়ের সংস্কার নীতি গ্রহণ এবং বাস্তবায়নের নামে মনমোহন সিং প্রথম আঘাত হানেন জওহরলাল নেহরুর সময়ের গৃহীত শিল্পনীতির ভিত্তিতে গড়ে ওঠা কেন্দ্রের রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পের ওপরেই। নরসিংহ রাও-মনমোহন সিংদের সময়কার উদার অর্থনীতি আরও গতিবেগ লাভ করে অটলবিহারী বাজপেয়ির প্রধানমন্ত্রিত্বের সময়ে। দুর্গাপুরের মানুষ বুঝতে পারে নয়া উদারবাদের মানে। দুর্গাপুরের মানুষ বোঝে নয়া উদারবাদ মানে এমএএমসি, বিওজিএল, এইচ.এফ.সি কারখানা বন্ধ। দেশের বিভিন্ন মিডিয়া যখন সংস্কারের নামে জয়ধ্বনি দিচ্ছে তখন এই শহরে একটার পর একটা রাষ্ট্রায়ত্ত কারখানার শ্রমিকরা চোখের জল ফেলতে ফেলতে কারখানার গেটের বাইরে বেরিয়ে আসছেন। শেয়ার বিক্রির মাধ্যমে মালিকানার পরিবর্তন হয়েছে জেশপ কারখানার। একের পর এক ভারি রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প বন্ধের প্রভাব পড়তে থাকে দুর্গাপুরের অর্থনীতিতে। বন্ধ হতে থাকে অনুসারী শিল্প এবং বিভিন্ন ব্যক্তিমালিকানাধীন শিল্পও বন্ধ হতে থাকে। হতাশার অন্ধকারে ডুবতে থাকে সমগ্র শিল্পশহর। বাজার ঘাট ছিল ফাঁকা। প্রভাব পড়েছিল কেনাবেচায়। সেই সময়টায়ই দুর্গাপুর থেকে দলে দলে শিক্ষিত প্রজন্ম

পাড়ি দেয় ভিন্ন রাজ্যে, ভিন দেশে। দুর্গাপুর ইস্পাত প্রকল্পের আধুনিকীকরণ বাদ দিয়ে ১৯৯২-৯৩ সালে এই শহরের প্রাপ্যের ঝুলি ছিল শূন্য। এর পর কী হবে! চিন্তিত গোটা শহর।

ঠিক সেই সময়েই বামফ্রন্টের পক্ষ থেকে রাজ্যের শিল্পায়ন সম্পর্কে নতুন কিছু নীতি এবং ভাবনা ভাবা হয়। সেই ভাবনার সাথে সামঞ্জস্য রেখেই বিধানসভায় তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু ১৯৯৪ সালের ১৩ সেপ্টেম্বর রাজ্যের শিল্পায়ন সংক্রান্ত 'নীতি-বিবৃতি' পেশ করেছিলেন। মূলত বৃহৎ এবং মাঝারি শিল্পক্ষেত্রের জন্য একটি অঙ্গরাজ্যের সরকার যেহেতু স্বাধীন ও স্বয়ংসম্পূর্ণ নীতি ঘোষণা করতে পারে না, তাই এই খসড়াতে শিল্পের বাদবাকি ক্ষেত্রসমূহকেই গুরুত্ব বেশি দেওয়া হয়েছিল। ফলস্বরূপ ধীরে ধীরে অবিভক্ত বর্ধমান জেলাতে মোট ১০৪টি ক্ষুদ্র ও মাঝারি লৌহ ইস্পাত শিল্প গড়ে ওঠে। সিমেন্ট কারখানাও প্রায় ৩০টি গড়ে ওঠে। সিংহভাগ ছিল মূলত দুর্গাপুর মহকুমাতেই। আস্তে আস্তে আবার প্রাণের স্পন্দন ফিরে পাওয়া শুরু করে এই শহর। ডব্লু.বি.আই.ডি.সি, এ.ডি.ডি.এ-র যৌথ উদ্যোগে এই শহরে সফল 'এন্টারপ্রেনর মিট—হরাইজন' সংগঠিত হয়। অন্যদিকে, ২০০২ সালের পৌরসভার দ্বিতীয় নির্বাচনের পরে দুর্গাপুরকে 'নলেজ সিটি' হিসেবে গড়ে তোলার সুসংহত পরিকল্পনাও গৃহীত হয়। একে একে বিভিন্ন বেসরকারি বিদ্যালয়, কলেজ, টেকনিক্যাল কলেজ গড়ে উঠতে থাকে। 'এডুকেশনাল হাব' হিসেবে দুর্গাপুর আত্মপ্রকাশ করে। সংস্কৃতি-ক্রীড়া চর্চার বিভিন্ন পরিকাঠামো গড়ে ওঠে। তথ্যপ্রযুক্তি কেন্দ্রও গড়ে উঠতে থাকে ধীরে ধীরে। বললে অত্যুক্তি করা হবে না মেট্রো সিটির পরেই দুর্গাপুর হয়ে উঠেছিল রাজ্যের অন্যতম সেরা ঠিকানা।

□

কী অবস্থা এই শহরের এখন? ডা. বিধানচন্দ্র রায়ের স্বপ্নের দুর্গাপুর প্রজেক্টস লিমিটেড-এর অধীনে কোক ওভেন প্ল্যান্ট কুলিং ডাউনের মধ্য দিয়ে ধাপে ধাপে বন্ধ করে দেওয়া হয়। হার্ড কোক, কোল গ্যাস, আলকাতরা ইত্যাদি উপজাত দ্রব্যের চাহিদা থাকা সত্ত্বেও রাজ্য সরকার অদূরদর্শী সিদ্ধান্তে পৌঁছায়। সেই সময় বিধানসভায় বিরোধী দলের নেতা এবং সিপিআই(এম)-এর রাজ্য সম্পাদক সূর্যকান্ত মিশ্র বার বার মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ দাবি করেন। কিন্তু কা কস্য পরিবেদনা! রাজ্য সরকার আর এক শিল্প দুর্গাপুর কেমিক্যাল লিমিটেডের ১০০ শতাংশ বিলগ্নীকরণের সিদ্ধান্ত নেয়। কী হবে ডিসিএল-এর, কেউ বলতে পারছে না। রাজ্য সরকারের আর এক শিল্প 'সাউথ বেঙ্গল স্টেট ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশন'-এর অবস্থাও ভালো নয়। মড়ার ওপর খাড়ার ঘা নেমে আসে দিল্লির সরকারের গৃহীত সিদ্ধান্তের ফলে। এএসপি-র কৌশলগত বিলগ্নীকরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সংকট শুধু এএসপি-তে নয়, নেমে আসে ডিএসপি-তেও। ফেরো স্ক্র্যাপ নিগম লিমিটেড-ও সংকটে। অপরদিকে সংকটে পড়ে যায় রাজ্যে গড়ে ওঠা ক্ষুদ্র ও মাঝারি লৌহ ও ইস্পাত শিল্প। কাঁচামালের সংকট, বিদ্যুৎমাশুল বৃদ্ধি, উৎপাদিত দ্রব্যের চাহিদা হ্রাস এবং সর্বোপরি সিন্ডিকেট রাজ ও আইন শৃঙ্খলার অবনতির ফলে বন্ধ হতে থাকে এই ধরনের শিল্পগুলি। প্রায় ২০টির মতো এই ধরনের শিল্প বন্ধ হয়েছে এই সময়েই। সার্বিকভাবে শহরের অর্থনীতিতে ছাপ পড়েছে। শহরে বিভিন্ন শপিং মলে এবং বিভিন্ন বাজারে অনেক ব্র্যান্ডেড শোরুম বন্ধ হয়ে পড়েছে ইতিমধ্যেই। এমন অনেক ঝাঁ চকচকে শোরুম আছে, যাদের সারাদিন দোকান খুলে রাখার পরেও এক পয়সার বিক্রি হয় না। দেশের অন্যান্য সার কারখানাগুলিকে বাঁচিয়ে তুলতে দিল্লির সরকার পদক্ষেপ নিলেও দুর্গাপুর ফার্টিলাইজার সহ রাজ্যের আর একটি সার কারখানা হলদিয়া নিয়ে নীরব। এম.এ.এম.সি কারখানা নিয়েও উদাসীন। ২০০২ সালে কারখানাটি বন্ধ হয়ে যাবার পর তৎকালীন বামফ্রন্ট সরকারের উদ্যোগে ২০১০ সালে ভারত আর্থ মুভারস লিমিটেড, দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন এবং কোল ইন্ডিয়াকে নিয়ে একটি কনসর্টিয়াম হাইকোর্টে নিলামের মাধ্যমে ১০০ কোটি টাকায় এই কারখানা কেনে। কিন্তু এখনো পর্যন্ত নির্বাচনের সময় মাইকে কিছু ভাষণ বাদ দিয়ে ফলপ্রসূ কিছু লক্ষ করা যাচ্ছে না। ২০০২ সালে বন্ধ হয়ে যাওয়া ভারত অপথ্যালমিক গ্লাস লিমিটেড-এর শ্রমিক-কর্মচারীদের নিজেদের অধিকারের প্রভিডেন্ট ফান্ড, গ্র্যাচুইটি আজও অধরা। পি.সি.বি.এল, গ্রাফাইট বহু বার হাতবদল হওয়া জি.ই.-র মতো কিছু ব্যক্তি-মালিকানাধীন শিল্প চলছে। কিন্তু দুর্গাপুরের অর্থনীতিতে একটা সার্বিক হতাশার পরিস্থিতি হয়েছে। হতাশা রয়েছে ঠিকই। কিন্তু সংগ্রামের শহর দুর্গাপুর। আর হতাশা তো শেষ কথা নয়। ফলে লড়াই শুরু হয়, ধারাবাহিক লড়াই।

□

২০১১-র পর দুর্গাপুরে ইস্পাতনগরী, বেনাচিতি, ডিপিএল, ফুলঝোর, হরিবাজার, জেমুয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের কালীগঞ্জ-পরানগঞ্জ, লাউদোহা-গোগলা অঞ্চলে চলেছে লাগামহীন সন্ত্রাস। মারধোর, হুমকি, পার্টি অফিস এবং গণসংগঠনের অফিসে ভাঙচুর, দখল, মিথ্যা মামলা, গ্রেপ্তার কোনো কিছুই বাদ যায়নি গোটা রাজ্যের মতো। এমনকি নেপালের ভূমিকম্পের জন্য অর্থ সংগ্রহ অভিযানও আক্রান্ত হয়, রক্তাক্ত হয়। এর মধ্যেই চলছিল শহরবাসীর কাছে পৌঁছানোর কাজ। তবে ২০১৫ সালের ২-৪ ফেব্রুয়ারি মুচিপাড়া থেকে বার্নপুরের ঐতিহাসিক পদযাত্রা এই শিল্পাঞ্চলের সংগ্রামী চেতনাকে নাড়িয়ে দিয়েছিল সন্দেহ নেই। দুর্গাপুরের পূর্বাংশে 'রক্ষা কর তোমার শহর—আমার শহর দুর্গাপুর' শ্লোগান নিয়ে তৈরি হয় ১৩টি গণসংগঠনের মঞ্চ। ব্যাপক মানুষের কাছে পৌঁছানোর কাজ শুরু হয় আপসহীন ভাবে। দুর্গাপুর মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন, আসানসোল দুর্গাপুর ডেভেলপমেন্ট অথরিটি, রেশন দপ্তর, মহকুমা শাসকের অফিস, দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ, থানা, অ্যাসিসটেন্ট কমিশনারেট অফিস, স্বাস্থ্য দপ্তর, শ্রম দপ্তর সহ সমস্ত সরকারি দপ্তরে একাধিক বার বিক্ষোভ-ঘেরাও অনুষ্ঠিত হতে থাকে। অন্যদিকে এইচ.এস.ই.ইউ-র উদ্যোগে ডিএসপি-র বিভিন্ন বিভাগীয় দাবি নিয়ে ম্যানেজমেন্টের ওপর চাপ বৃদ্ধির অন্দোলন বাড়তে থাকে। এই সময়ে দুর্গাপুরে দুটি সাফল্য বামপন্থী বৃত্তের বাইরের জনগণকেও সিপিআই(এম)-এর প্রতি আকৃষ্ট করে।

প্রথমত, দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানার ইউনিয়ন স্বীকৃতির নির্বাচনে পরপর দুবার সিআইটিইউ ইউনিয়নের সাফল্য। প্রেক্ষাপট ছিল এই রকম : ২০১১-র পরে একটাও সমবায়, স্কুল, কলেজে কোনো নির্বাচন কার্যত করতে দেয়নি। প্রতিবারই রক্তাক্ত হয়েছে, আক্রান্ত হয়েছে এই শহর। দুর্গাপুর মহিলা সমবায় নির্বাচনে বামপন্থীরা আক্রান্ত হয়েও জয়লাভ করেছিল ২০১২ সালের আগস্ট মাসে (আংশিক আসনে নির্বাচন হয়েছিল)। এই পটভূমিতে ডিএসপি-র ইউনিয়ন স্বীকৃতির নির্বাচন। আক্রমণ-হুমকি অগ্রাহ্য করে আসে বড় সাফল্য। সমগ্র

দুর্গাপুরের গণতন্ত্রপ্রিয় জনগণের মধ্যে আলোড়ন পড়ে গিয়েছিল।

দ্বিতীয়ত, ১৩টি গণসংগঠনের মঞ্চের আহ্বানে ধারাবাহিক দু-মাস ধরে নিবিড় প্রচারের মাধ্যমে ১৫টি ওয়ার্ড এবং একটি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রায় ৬৮ হাজার মানুষের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে দুর্গাপুর রক্ষার ৬২ দফা দাবিপত্র সুনির্দিষ্ট করা এবং তারপরে ফুলঝোর মোড়ে সূর্যকান্ত মিশ্রের সমাবেশ। এই সভা বানচাল করার জন্য সর্বোচ্চ প্রয়াস গ্রহণ করেছিল শাসকদল। পিছু হটতে হয়েছিল ওদের। এই মঞ্চের কর্মসূচিতে নতুন নতুন মানুষ আসতে শুরু করে লড়াই-এর আঙিনায়। ভরসা বাড়তে থাকে, ভয় ভাঙতে থাকে। যন্ত্রণাক্লিষ্ট মানুষ ঐক্যবদ্ধ হওয়া শুরু করে দুর্গাপুরে।

এর মধ্যেই ডিপিএল-এর কোকওভেন প্ল্যান্টের সমস্ত ব্যাটারি কুলিং ডাউন করে বন্ধের প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার সাথে সাথেই ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলার প্রস্তুতিতে সিআইটিইউ, আইএনটিইউসি, এআইটিইউসি, টিইউসিসি, এআইসিসিটিইউ, এআইসিএলএফ, এআইইউটিইউসি-কে নিয়ে ২০১৫ সালের জুলাই মাসে তৈরি হয় 'সেভ ডিপিএল' মঞ্চ। শুধু কোকওভেন নয়, ছোটো মাঝারি লৌহ ইস্পাত শিল্পও বন্ধ হতে শুরু করে। দুর্গাপুরে একদিকে শুরু হয় শিল্পরক্ষার লড়াই, অন্যদিকে চলতে থাকে শহর রক্ষার লড়াই, শহরের গণতন্ত্র রক্ষার লড়াই। তার সাথেই পাল্লা দিয়ে শুরু হয় নাগরিক পরিষেবার ক্ষোভ নিয়ে দুর্গাপুরের সর্বত্র লড়াই। দুবার পুরসভার সামনে বিক্ষোভ সমাবেশ হয়। ২০১৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে দুর্গাপুরের দুটি আসনেই এই ধারাবাহিক লড়াই-এর ফলস্বরূপ মানুষ ভরসা রাখে লাল ঝাণ্ডাতেই। বিধানসভা নির্বাচনের পরে আবার শুরু হয় গণতন্ত্র নিধন যজ্ঞ। পাশাপাশি পাল্লা দিয়ে চলতে থাকে প্রতিবাদ-প্রতিরোধের প্রস্তুতিও। এই পর্যায়ে দুটি গুরুত্বপূর্ণ আন্দোলনের কথা উল্লেখ না করলে দুর্গাপুরের এই সময়কার লড়াই-আন্দোলনের ইতিহাস অসম্পূর্ণ থাকবে।

প্রথমত, ২০১৬ সালের ২০ সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হয় এএসপি-কে কৌশলগত বিলগ্নীকরণ করার মধ্য দিয়ে মালিকানা বদলে কেন্দ্রীয় সরকারের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে এএসপি-র শ্রমিকরা বিক্ষোভে ফেটে পড়েন, শুরু হয় প্রতিবাদ বিক্ষোভ। সমস্ত দুর্গাপুরের মানুষ চিন্তিত হয়ে পড়েন এই পরিস্থিতি নিয়ে। এএসপি-কে যদি রক্ষা করা না যায় বাঁচবে না ডিএসপি-ও। আর দুটি সংস্থাই যদি না বাঁচে দুর্গাপুরের অর্থনীতিতে তাদের প্রভাব সুদূরপ্রসারী হবে। শুরু হয়ে সিআইটিইউ-এর নেতৃত্বে আন্দোলন। তিন-চার মাস পরে আইএনটিইউসি সহ অন্যান্য ট্রেড ইউনিয়নদের যুক্ত করে তৈরি হয় যুক্ত মঞ্চ। শতাধিক কর্মসূচি ইতিমধ্যেই গৃহীত হয়েছে। অবস্থান, মিছিল, অবরোধ, ক্রীড়াপ্রেমী- সাংস্কৃতিক কর্মীদের নিয়ে সভা, এএসপি কারখানা বন্ধ। অভূতপূর্ব সাড়া পাওয়া যায় এএসপি কারখানা বন্ধে। প্রায় ৯১.৫ শতাংশ শ্রমিক ২০১৭ সালের ১১ এপ্রিল এএসপি-তে বন্ধে সামিল হয়, যা এই শিল্পের বন্ধে সর্বকালীন রেকর্ড। লড়াই-এর ময়দানে যুক্ত হতে থাকে অসংখ্য শ্রমজীবী মানুষ।

দ্বিতীয়ত, লংমার্চ। ১০৪.৫ কিমি লংমার্চ দুর্গাপুরের পূর্বাংশের ১৫টি ওয়ার্ড এবং একটি গ্রামপঞ্চায়েত এলাকার বুথে লাগাতারভাবে পরিক্রমা করে ১৩ থেকে ২১ নভেম্বর—সকাল থেকে রাত্রি এবং একসাথে রাত্রিবাস। শহরের প্রত্যেকটি ওয়ার্ডে-মহল্লায়-বস্তিতে-গ্রামে এই লংমার্চ এগিয়ে চলেছিল শহরবাসীর কথা শুনতে শুনতে। কাগজের ঠোঙা করা হয়েছিল চাল-ডাল-সবজি সংগ্রহের জন্য আর কুপন করা হয়েছিল গণসংগ্রহের জন্য। প্রায় সাড়ে চার লক্ষ টাকা সংগৃহীত হয়েছিল। লংমার্চ চলাকালীন মোট ১১ বেলা বাড়িতে বাড়িতে নিয়ে গিয়ে লংমার্চের পদযাত্রীদের খাইয়েছেন শহরের মানুষ, আর বাদবাকি দিন ঠোঙাতে সংগৃহীত চাল ডাল সবজি দিয়ে রান্না করে খাইয়েছেন এলাকার মানুষ। প্রতিদিন রাত্রে যে এলাকায় লংমার্চ হবে সেই এলাকার মানুষ অপেক্ষা করতেন কখন তাদের আপনজনকে ঘরে নিয়ে যাবেন, খাওয়াবেন। প্রায় ২২০০ পরিবার এই দায়িত্ব নিয়েছিল শহরজুড়ে। বন্ধ কারখানার শ্রমিক, উদ্বাস্তু এলাকার মানুষ, গ্রামের মানুষ, শিল্পের সাথে যুক্ত আধিকারিক থেকে ঠিকাকর্মী সবাই লংমার্চের পদযাত্রীদের ঘরে নিয়ে

খাইয়ে আত্মীয়তার পরম বন্ধনে আবদ্ধ করেছেন। আরও প্রায় ৭০০ পরিবার প্রস্তুত ছিলেন লংমার্চের পদাযাত্রীদের খাওয়ানোর জন্য। অভিমান হয়েছে, আমরা খেতে যেতে পারিনি বলে। খাওয়ার পরে সবাই গল্প করেছেন, গান করেছেন, কবিতা লিখেছেন। পরের দিন সময়ের আগেই স্নান করে প্রস্তুত হয়ে যাচ্ছেন। হাঁটতে হবে যে! যত এগিয়েছে লংমার্চ ততো আলোড়িত হয়েছে শহর। ফুল জল নিয়ে উপস্থিত পাড়ার মোড়ে মোড়ে সবাই। সন্ত্রাসের ব্যারিকেড ছিন্ন করতে করতেই এক বুথ থেকে আর এক বুথে এগিয়ে চলেছে লংমার্চ। কর্মসূচিটির প্রশাসনিক অনুমতি দেওয়ার পরেও শুরুর আগের দিন মধ্যরাত্রে পুলিশ কমিশনারেট থেকে জানানো হল—'সরি! চাপ আছে। বাতিল করা হল কর্মসূচির অনুমতি।' তার আগেই পুলিশের মদতে শুরু হয়ে গিয়েছিল প্রবল সন্ত্রাস। জেমুয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের পরানগঞ্জ গ্রামে শুরু হয় লংমার্চ। আগের দিন ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়া হল সব। লংমার্চের প্রতিনিধিদের মুড়ি, শসা খাওয়াবেন বলে গ্রামেই মুড়ি ভাজার চাল, মুড়ি, শসা সংগ্রহ করেছিলেন কৃষকসভার সংগঠকরা। দুই মহিলা মুড়ি ভেজেছিলেন। বীভৎস হুমকি আসে—''কাল বের হবি না।'' মুখের ওপর জবাব দিয়েছিলেন বীরাঙ্গনারা— ''একবারই মরব—কাল বের হব। কাল আমাদের গাঁ থেকেই শুরু হবে লংমার্চ।'' তাণ্ডব চলল সারা রাত। পুরুষশূন্য করে দেওয়া হল বাউরিপাড়া। ১৩ নভেম্বর, লংমার্চের দিন সকালেই লংমার্চের উদ্বোধন স্থানে জমায়েত করল শাসক দল, শুরু হল শাসানি, হুমকি, শারীরিক বলপ্রয়োগ করে বাধা দান। অবশেষে শুরু হল প্রতিরোধ। ''রক্ষা কর আমার শহর-তোমার শহর দুর্গাপুর''—শ্লোগান নিয়ে নামা সেনানিদের জেদ তখন প্রতিরোধের মানসিকতায়। পিছু হটল ঠ্যাঙাড়েবাহিনী। শুরু হল শহর রক্ষার মার্চপাস্ট। গৃহবধূ থেকে গৃহকর্ম সহায়িকা—সবাই লংমার্চে নিজেদের খুঁজে নিয়েছিলেন। ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় ছাত্রছাত্রীরা মোবাইলে ছবি তুলেছেন, দৌড়ে এসে লংমার্চের সাথে সেলফি তুলেছেন। আবার বাসের জানালা দিয়ে আধুনিক যুবতীরাও লংমার্চে হাঁটা প্রতিনিধিদের প্রতি ভালোবাসা-সমর্থনের ইঙ্গিত ছুঁড়ে দিয়েছেন। প্রতিষ্ঠিত চিকিৎসক গাড়ি থামিয়ে সমর্থনের ইঙ্গিত দিয়েছেন। পদযাত্রা এগিয়েছে, বেড়েছে প্রতিরোধও। ১৫ নভেম্বর এমএএমসি স্কুলের প্রধান শিক্ষক বিমল দাশগুপ্তর শহিদ দিবস। দুর্গাপুর গভর্নমেন্ট কলেজের মোড়ে স্যারের শহিদবেদিতে মালা দিয়ে লংমার্চ প্রায় ৯-১০ কিমি এগিয়েছে। খবর এল শহিদবেদিতে ২-৩ জন মদ্যপ ছাত্র লাথি মেরে ফুলমালা ফেলে দেয়, এসএফআই-এর পতাকা ছিঁড়ে দিয়ে তৃণমূল ছাত্রপরিষদের পতাকা লাগিয়েছে। স্যারের খুনিদের যোগ্য উত্তরসূরি এরা। লংমার্চ থামেনি। চলতে চলতে প্রথমে মৌখিক এবং তারপর লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়।

১৬ নভেম্বর দ্বিতীয়ার্ধে ডিপিএল-এর এসবিএসটিসি গ্যারেজ, লেবার হাট, নেপালিপাড়া, কালীপুর গ্রামে লংমার্চ যাওয়ার কথা। রাস্তায় নেমে পড়ে তৃণমূলী গুণ্ডারা। এলাকাগুলো নাকি তাদের মুক্তাঞ্চল। ওখানে যাওয়া যাবে না। দল বেঁধে মহকুমা শাসকের দপ্তরে অভিযোগ জানানো হল। আক্রান্ত হতে পারে লং মার্চ এই খবর দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়তেই হাজার হাজার নতুন মানুষ উপস্থিত। মুক্ত বাতাসের সন্ধান পেলেন সেই অঞ্চলের মানুষজন। লংমার্চের শেষে রাতে বিভিন্ন অঞ্চলে অনুষ্ঠিত হয় বাউল, ঝুমুর, ব্যান্ড, সমবেত নৃত্য, আবৃত্তি, গণসঙ্গীত ইত্যাদি। ১৮ নভেম্বর দুর্গাপুরের প্রাচীন গ্রাম নডিহাতে ঢল নামে মানুষের। দেখানো হয় ম্যাক্সিম গোর্কির 'মা' সিনেমা। লং মার্চের সমগ্র পথে কর্মসূচির আহ্বায়ক মঞ্চের ১৩টি গণসংগঠনের পতাকার পাশাপাশি ডা. বিধানচন্দ্র রায়, জ্যোতি বসু, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, নজরুল ইসলামের ছবি সম্বলিত পতাকা ছিল।

২১ নভেম্বরের শেষ দিনে দুর্গাপুর নগর নিগমের সামনে আছড়ে পড়ে 'লাল ঢেউ'। দুর্গাপুরের পশ্চিমপ্রান্তে শুরু হয় ওয়ার্ডভিত্তিক পদযাত্রা। বেনাচিতির বিভিন্ন সম্ভ্রস্ত অঞ্চলের ওয়ার্ডেও পদযাত্রা হয়। ঠিক তেমনি সিটি সেন্টার সহ সংলগ্ন অঞ্চলেও পদযাত্রা হয়। তারপর উন্নয়ন এবং সম্প্রীতির দাবি নিয়ে ভিড়িঙ্গি থেকে প্রান্তিকা হয় মহামিছিল। কিছু ঠ্যাঙাড়েবাহিনীর মাতব্বরিকে উড়িয়ে দিয়েই মহামিছিল শেষ হয় প্রান্তিকাতে।

□

সাম্প্রতিককালে তৃণমূলী অপশাসনে অপহরণ, মারধোর, মিথ্যা মামলায় কারাবাস কিছুই বাদ যায়নি। অগ্নিসংযোগ, ভাঙচুরের ঘটনা ঘটেছে হিন্দুস্থান স্টিল এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন অফিস, আশিস জব্বর ভবন, শহিদ বিমল দাশগুপ্ত ভবন, কালীগঞ্জের কৃষকসভার অফিস। দুর্গাপুরের বামপন্থী বহু ইউনিয়ন অফিস, গণসংগঠনের দপ্তর আক্রান্ত হয়, দখল হয়। আবার দখলমুক্তও হয়েছে অনেকগুলি। ছাত্রসংসদ, সমবায় থেকে শুরু করে পৌরসভা পর্যন্ত—কোনো নির্বাচনই হতে দেয়নি বর্তমান শাসক দল। হাইকোর্টের রায়কে অগ্রাহ্য করে পুলিশ এবং কয়েক হাজার বহিরাগত দাগি অপরাধী দিয়ে ওরা কোনো ওয়ার্ডেই ভোট করতে দেয়নি ২০১৭ সালে। এমনকি তৃণমূলের প্রার্থী, নেতারাও অনেক জায়গায় ভোটকেন্দ্রে যেতে পারেনি। ফলস্বরূপ শপথগ্রহণ অনুষ্ঠান বয়কটের ডাক দিতে হয়নি বামপন্থীদের, ভোটলুঠ করে জেতা বোর্ডের এই শপথ অনুষ্ঠানে গ্যালারিশূন্য স্টেডিয়ামই ছিল গোটা শহরের 'শরীরী ভাষা'।

২০ নভেম্বর, ২০১৭ দুর্গাপুর ব্যারেজের লকগেট ভেঙে যাওয়া এবং মেরামতিতে রাজ্য সরকারের গাফিলতির ফলে দুর্গাপুরে দীর্ঘস্থায়ী জলসংকট তৈরি হয়। ১৩টি গণসংগঠনের আহ্বানে গত বছরের ২৭ নভেম্বর দুর্গাপুর স্টেশন সংলগ্ন সেচ দপ্তরের সামনে ডেপুটেশন-বিক্ষোভ কর্মসূচি নেওয়া হয়। দাবি জানানো হয় তিনটি—(১) লকগেট ভাঙার উপযুক্ত তদন্ত করে দোষীদের শাস্তি দান, (২) দ্রুত মেরামতির ব্যবস্থা এবং (৩) শহরে নিরবচ্ছিন্ন পানীয় জল সরবরাহের ব্যবস্থা করা। বিক্ষোভের পরে দুর্গাপুর স্টেশন চত্বরের সিপিআই(এম) পূর্ব ২নং এরিয়া কমিটির অফিসে আক্রমণ চালানো হয়। আক্রান্ত হন নেতা-কর্মীরা। ক্ষোভ-বিক্ষোভে ফেটে পড়ে শিল্পশহর। দুদিন পরেই মহকুমা শাসকের অফিসে ব্যাপক বিক্ষোভ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়।

দ্বিতীয়ত, সমগ্র রাজ্যেই এই সময় বিদ্যুৎ মাশুল বেড়েছে কয়েকগুণ। ডিপিএল-এও বেড়েছে। তার সাথে ডিপিএল যুক্ত করেছে সিকিউরিটি ডিপোজিট-এর নামে অতিরিক্ত বোঝা। এর প্রতিবাদে স্বাক্ষর সংগৃহীত হয় ১০হাজার ২৮৫টি। ডিপিএল কর্তৃপক্ষ ডেপুটেশন কর্মসূচির অনুমতি দেয় ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৮। ১৩টি গণসংগঠনের প্রতিনিধিরা যখন ডেপুটেশনে, তখন বাইরে বিক্ষোভ সভায় বিধায়ক তথা সিপিআই(এম) নেতা সন্তোষ দেবরায় সহ অসংখ্য মানুষ উপস্থিত ছিলেন। বর্তমান প্রতিবেদক যখন বক্তব্য রাখছিলেন তখন ঝাঁপিয়ে পড়ে তৃণমূলী গুণ্ডারা। মাইকের সংযোগ বিদ্যুৎ সংযোগ

বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয়, রড-হকিস্টিক দিয়ে এলোপাথাড়ি মারধোর শুরু করে। কয়েক মুহূর্ত লেগেছিল প্রত্যাঘাতের জন্য। ২০১১-র পরে দুর্গাপুরে প্রতিরোধ প্রত্যাঘাতের ইতিহাসে এই ঘটনা অমলিন হয়ে থাকবে। দু-পক্ষের অনেকেই আহত হয়। বিধায়ক সন্তোষ দেবরায়, যুবনেতা জয় সিং, সঞ্জীব দে, মানিক পাসোয়ান সহ ১২ জন আহত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হন। ২৫ ফেব্রুয়ারি সিপিআই(এম)-এর পক্ষ থেকে দুর্গাপুর কোকওভেন থানা ঘেরাও-বিক্ষোভ কর্মসূচি সংগঠিত হয়। ব্যাপক চাপের মুখে পড়ে আক্রমণকারী তৃণমূল নেতাদের গ্রেপ্তার করতে বাধ্য হয় পুলিশ। বিধানসভার পরিষদীয় দলনেতা সুজন চক্রবর্তীর নেতৃত্বে বিধায়কদের প্রতিনিধিদল দুর্গাপুরে আসেন। কথা বলেন দুর্গাপুরের মানুষজনের সঙ্গে, হাসপাতালে যান অসুস্থদের দেখতে।

২০১১-র পর সন্ত্রাসের বেড়া ডিঙিয়েই অনেক আন্দোলন, বড় বড় সমাবেশ সংঘটিত হয়েছে। আশিস-জব্বরের ৫০তম শহিদ দিবস পালিত হয়েছে। আক্রমণ, হামলা-মামলা যেমন চলছিল ঠিকই, তেমনি প্রতিবাদ-প্রতিরোধ আন্দোলনও হয়েছে বামপন্থীদের পক্ষ থেকে।

৭ জুলাই, ২০১৫ দুর্গাপুরের শিল্প রক্ষা করার দাবি, ডিএসপি সহ বিভিন্ন শিল্পে উৎখাত হওয়া ঠিকা শ্রমিকদের চাকুরি পুনর্বহালের দাবিতে ডিপিএল-এর কোক ওভেন প্ল্যান্ট কুলিং ডাউন করার বিরুদ্ধে জেলা কমিটির গান্ধী মোড়ে বিক্ষোভ এবং এনএইচ-২ অবরোধ কর্মসূচি হয়। পুলিশ বাধা দিলে ব্যাপক ধস্তাধস্তি হয়। কিছু ঘটনাও ঘটে। বিক্ষুব্ধ জনতা দীর্ঘক্ষণ জাতীয় সড়ক অবরোধ করে। শ্যামল চক্রবর্তী, দীপক দাশগুপ্ত, অমল হালদার, অচিন্ত্য মল্লিক, আভাস রায় চৌধুরী, গৌরাঙ্গ চ্যাটার্জি, বংশগোপাল চৌধুরী, বিনয়েন্দ্র কিশোর চক্রবর্তী, পঙ্কজ রায় সরকার, রুনু দত্ত, পার্থ মুখার্জি, সুশান্ত ব্যানার্জি, মহাব্রত কুণ্ডু, বিপ্রেন্দু চক্রবর্তী, মনোজ দত্ত, তাপস কবি, শেখ সাইদুল হক, সুবীর সেনগুপ্ত, শ্যামা ঘোষ, রাকেশ শর্মা, বিভিন্ন রাজ্য জেলা নেতৃত্ব সহ সিদ্ধার্থ বসু, ললিত মিশ্র, সুপ্রিয় রায়, সঞ্জয় প্রসাদ, আজাদি প্রসাদ, সুজিত দত্ত, শ্যামল কোড়া, কমল হেমব্রম, পবন রুইদাস, অলোক মজুমদার, রঞ্জিত শর্মা, মনোজ হাজরা, প্রফুল্ল মণ্ডল, হীরা সাউ, ধ্রুব চৌধুরী, সুশীল চৌধুরী, পাজন, মতি সুর্দি, রঘু মণ্ডল, মনিলাল চৌধুরী, চিনা কোড়া, সুন্দর যোশী, বুলবুল বাউরি, কলিমুদ্দিন আনসারি সহ ৪৫ জনের বিরুদ্ধে মারাত্মক সব জামিন-অযোগ্য ধারায় মামলা রুজু করা হয়।

২০১৭-এর ২৮ জানুয়ারি কৃষি বাঁচাও, কৃষক বাঁচাও শিল্প বাঁচাও, শ্রমিক বাঁচাও দাবি নিয়ে অবিভক্ত বর্ধমান জেলা কমিটির পক্ষ থেকে মিছিল— জনসভার আহ্বান জানানো হয়। সিটি সেন্টারে দুর্গাপুর সিনেমা হলের সামনে থেকে শুরু মিছিলি জনজোয়ারে পরিণত হয়। জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ এবং পুলিশের অনমনীয় মানসিকতাকে অতিক্রম করেই জনজোয়ার এগোতে থাকে। সমাবেশের জন্য পলাশডিহাতে ডা. বিধানচন্দ্র রায়ের মূর্তির পাদদেশে অনুমতি নেওয়া হয়েছিল। সংগ্রামী শ্রমিক- কৃষকদের ভিড় উপচে পড়ে জাতীয় সড়ক এবং সিটি সেন্টারে। একটি ভিডিও বিবৃতিতে পুলিশ বলেছে, ৩০ হাজারের বেশি সিপিআই(এম) সমর্থক জড়ো হয়েছিল বিশৃঙ্খলা করার জন্য। কারখানা খোলার দাবি, কৃষকদের আত্মহত্যার বিরুদ্ধে কথা বলতে গেলে ওদের কাছে যে 'বিশৃঙ্খলা' হবে তা তো স্বাভাবিক। বর্ধমানের জেলা শাসকের গাড়ি সহ হাজার হাজার গাড়ি আটকে যায়। বিভিন্ন ঘটনা এড়াতে সিপিআই(এম) নেতা-কর্মী-সমর্থকদেরই উদ্যোগী ভূমিকা নিতে দেখা যায়। পুলিশ ছিল দর্শক। সমাবেশ শেষ হওয়ার পরই পুলিশ অতি সক্রিয় হয়ে ওঠে। দায়িত্বপ্রাপ্ত পুলিশ আধিকারিক স্বতঃপ্রণোদিত মামলা রুজু করে পঙ্কজ রায় সরকার, গৌরাঙ্গ চ্যাটার্জি, পার্থ মুখার্জি, কবি ঘোষ, মহাব্রত কুণ্ডু, সুবীর সেনগুপ্ত সহ ২০০০ সিপিআই(এম) কর্মীর বিরুদ্ধে।

দুর্গাপুরের রাজনৈতিক ইতিহাসে একসাথে এতজনের নামে মামলা আগে হয়েছে বলে মনে হয় না। দুপুর থেকেই শুরু হয় চিরুনি তল্লাশি। সিপিআই(এম)-এর জেলা নেতৃত্ব একটি প্রেস বিজ্ঞপ্তি দিয়ে প্রতিরোধের আহ্বান জানান। ৩০ জানুয়ারি ছিল ১৩টি গণসংগঠনের যৌথমঞ্চের ডাকে সম্প্রীতি দিবস। নাগালে না পাওয়া কর্মীদের গ্রেপ্তারের উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠানস্থল কার্যত ঘিরে ফেলে পুলিশবাহিনী। কিন্তু হাজার হাজার মানুষের উপস্থিতিতে সেদিন আর গ্রেপ্তার করতে সাহস করেনি। ৩১ জানুয়ারি কাজোড়ার কর্মস্থল থেকে গ্রেপ্তার করা হয় বর্তমান প্রতিবেদককে। শারীরিকভাবে হেনস্থা করে শাসকদলের সশস্ত্র গুণ্ডাবাহিনী। তৃণমূলের জেলা নেতৃত্ব এবং পার্শ্ববর্তী শহরের এক নেতার নির্দেশেই গুরুতর ঘটনা ঘটানোর লক্ষ্যেই এই আক্রমণ সংঘটিত হয়। তীব্র প্রতিরোধ গড়ে ওঠে এই আক্রমণের বিরুদ্ধে। বিকালে গ্রেপ্তার বরণ করতে সিপিআই(এম) নেতৃত্ব সহ হাজার হাজার মানুষ মিছিল করে থানায় উপস্থিত হলে গ্রেপ্তার করার মতো লক-আপ দুর্গাপুরে ছিল না। পিছিয়ে যায় রাষ্ট্রীয় গুণ্ডারা।

দুর্গাপুর মানে সংগ্রামের ঐতিহ্য। এই ঐতিহ্যের ব্যাটন যোগ্যতার সঙ্গে বহন করাই দুর্গাপুরের নবপ্রজন্মের কাছে আজ অগ্নিপরীক্ষা।

শারদ অভিনন্দন গ্রহণ করুন

তেলিনওপাড়া জনকল্যাণ সেবা সমবায় সমিতি লি.

তেলিনওপাড়া, পারুলিয়া, পূর্ব বর্ধমান

কৃষি ঋণ এবং ব্যবসায়িক ঋণ দেওয়া হয়।
ব্যাঙ্কিং পরিষেবা দেওয়া হয়।

Sl. No. 3

কালনায় পাশ্চাত্য শিক্ষার বিস্তার ও মহারাজের স্কুল

প্রবাল সেনগুপ্ত

বর্ধমান জেলার কালনা শহর ইতিহাস প্রসিদ্ধ। ব্যান্ডেল-কাটোয়া রেলপথে অবস্থিত আজকের এই ক্ষুদ্র মহকুমা শহরটি প্রাচীন কাল থেকেই বাংলার শিক্ষা ও সংস্কৃতির অন্যতম পীঠস্থান হিসেবে পরিচিত। কালনার প্রকৃত প্রাচীন নাম অম্বিকানগরী। মধ্যযুগে এই অঞ্চলটি একটি নদীবন্দর হিসেবে রাঢ়বাংলার অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের কেন্দ্রবিন্দু স্বরূপ ছিল। মধ্য-পূর্ব যুগেও কালনা ছিল শিক্ষা ও সংস্কৃতির কেন্দ্র। এখানকার সংস্কৃত পণ্ডিতদের খ্যাতির সৌরভ সারা দেশময় ছড়িয়ে পড়েছিল। চৈতন্য-পরবর্তী যুগে বৈষ্ণব আন্দোলন ও বৈষ্ণব সাহিত্য, সংস্কৃতি ও সৃজনশীলতার অন্যতম কেন্দ্র ছিল কালনা। ঔপনিবেশিক যুগের ঊষাকালেও তারানাথ তর্কবাচস্পতির মতো মহাপণ্ডিতের কর্মকেন্দ্র ছিল এই শহরটি। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সঙ্গেও কালনার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল।

মুঘল যুগের শেষ পর্বে ও ব্রিটিশ শাসনকালে অঞ্চলটি বর্ধমান মহারাজের জমিদারির অন্তর্ভুক্ত ছিল। তাঁদের পৃষ্ঠপোষকতায় কালনার রাস্তাঘাট ও নাগরিক সুযোগসুবিধা বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছিল। প্রচুর মন্দিরও তাঁরা নির্মাণ করেছিলেন কালনায়। বর্ধমানের মহারাজারা কালনার সংস্কৃত টোল এবং পণ্ডিতদেরও পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। বলা যায়, তাঁদের উৎসাহেই শহরটির বিদ্যাচর্চার প্রাচীন প্রবাহ, ঔপনিবেশিক যুগেও যথেষ্ট বেগবান ছিল। এখানকার বিদ্যাবাগীশ পাড়ার সংস্কৃত পণ্ডিতদের কাছে তখন দেশ-বিদেশ থেকে ছাত্ররা পড়তে আসত। তারানাথ তর্কবাচস্পতি ছাড়াও শ্রীরাম ন্যায়বাগীশ,

দুর্গাদাস ন্যায়রত্ন, অযোধ্যারাম তর্কবাচস্পতি সেই সময় সারা বর্ধমানের মুখ উজ্জ্বল করেছিলেন। তারনাথের এক পূর্বপুরুষের বিদ্যাবত্তায় মুগ্ধ হয়ে বর্ধমানের মহারাজা তিলকচন্দ (অভিষেক ১৭৪৪ খ্রি.) পরিবারটিকে তাঁদের পূর্বপুরুষের ভিটে যশোহর থেকে কালনায় প্রতিষ্ঠিত করেন। পূর্ববাংলা থেকে আসার কারণে পরিবারটি আজ অবধি 'বাঙাল ভট্টাচার্যদের পরিবার' বলে এই অঞ্চলে খ্যাত।

ইংরাজ ভারতের রাজদণ্ড হাতে নেবার পর, বিদ্যাচর্চার এই পরিবেশের আমূল পরিবর্তন সংগঠিত হয়। ১৮৭১ খ্রিস্টাব্দে কোলকাতায় হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার পরে, পাশ্চাত্য ধাঁচের বিদ্যাই আদর্শ শিক্ষার ধারা হিসেবে পরিগণিত হয়। পাশ্চাত্য যুক্তিবাদ, বিচারবাদ, খ্রিস্টবাদের জোয়ারে ভেসে যেতে থাকে বাংলার বিদ্বজ্জনেরা। এরপরে ঔপনিবেশিক সরকার, সরকারি প্রশাসনিক চাকুরি এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট পেশা অর্থাৎ ওকালতি, ডাক্তারি বা শিক্ষকতার ক্ষেত্রে ইংরেজি শিক্ষাকে অতি আবশ্যিক বলে ঘোষণা করলে, এতদিনকার পাঠশালা-টোল কেন্দ্রিক শিক্ষাব্যবস্থা বিপন্ন হয়ে পড়ে।

কলকাতার অনতিদূরে কালনায়ও এর প্রভাব পড়ে বৈকি। এখানেও ছাত্রযুবর দল নিজেদের কৃষ্টিগত এবং বৃত্তিগত উন্নয়নের জন্য পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রতি আগ্রহ দেখাতে শুরু করে। খ্রিস্টান ধর্মযাজকেরা তখন বাংলার অন্যান্য প্রান্তের মতো কালনাতেও আসেন। তাঁদের উদ্যোগেই কালনায় স্থাপিত হয়েছিল স্কট মিশন বিদ্যালয় বা কালনা এফ-সি ব্রাঞ্চ স্কুল। মিস্টার উইলিয়াম ডিকসন নামে একজন মিশনারি এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পিছনে মূল উদ্যোক্তা ছিলেন। বিখ্যাত খ্রিস্টান ধর্মবেত্তা রেভারেন্ড লালবিহারী দে ছিলেন ওই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক। খ্রিস্টান ধর্মপ্রচারকদের এই উদ্যোগ কালনায় পাশ্চাত্য জ্ঞানালোকের দীপ্তি প্রথম এনে দিয়েছিল, একথা অনস্বীকার্য। একথা মেনে নিয়েও বলতে হয়, তাঁদের বিদ্যাবিস্তার কার্যাবলীর পিছনে দেশীয় মানুষজনের খ্রিস্টান ধর্মে দীক্ষা দেবার একটা সুপ্ত ইচ্ছা সবসময়েই কাজ করত।

মিশনারীদের স্কুল স্থাপন করার পর কালনার 'বাঙাল ভট্টাচার্য' পরিবারের দুই তরুণ, যহারা এই বিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন, মিশনারিদের প্ররোচনায় খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করেন। এর ফলে সমগ্র অঞ্চলে প্রবল চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। স্থানীয় জনসাধারণ মিশনারি স্কুলকে 'খ্রিস্টান করার ফাঁদ' হিসেবে গণ্য করে। তাঁদের বিরুদ্ধে প্রবল

গণবিক্ষোভও সংগঠিত হতে থাকে। তৎকালীন কালনা সমাজের অন্যতম 'মাথা' নীলাম্বর চক্রবর্তী এই অবস্থার প্রতিবিধান কল্পে, কালনারই সুসন্তান, বর্ধমানের তৎকালীন 'সদরালা' বা জজ্‌পণ্ডিত তারাকান্ত ভট্টাচার্যের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। এদিকে কালনার কোনো কোনো পণ্ডিত তখন খ্রিস্টান ধর্মের সম্ভাব্য প্রভাব রুখবার জন্য পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রথা বন্ধ করার পক্ষে মত দিলেও ইংরেজি-শিক্ষিত তারাকান্ত বুঝতে পারেন, মিশনারিদের ওপর ক্রোধান্বিত হয়ে ইংরেজি শিক্ষা ত্যাগ করা চোরের ওপর রাগ করে মাটিতে ভাত খাওয়ার সামিল হবে। তিনি বুঝেছিলেন উদ্দেশ্যপ্রণোদিত মিশনারি শিক্ষার একমাত্র বিকল্প হচ্ছে দেশীয় লোকদের পরিচালনাধীন পাশ্চাত্য শিক্ষাদানের প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা। তাদের ধর্ম হারাবার ভয় নেই, অথচ ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণের সুফলও মিলবে।

যাই হোক, শেষ পর্যন্ত খ্রিস্টান মিশনারিদের বাধা, রক্ষণশীল কিছু সমাজপতির বিরোধিতা ও সরকারি অনীহা—সব কিছু কাটিয়ে তারাকান্ত ভট্টাচার্যের অক্লান্ত চেষ্টায় কালনায় একটি দেশীয় ব্যক্তিদের পরিচালনাধীন ইংরেজি স্কুল স্থাপন করা সম্ভব হয়েছিল। সাধারণ মানুষও সোৎসাহে অর্থদান করে এই বিদ্যালয়ের জন্য একটি কাঁচা বাড়ি নির্মাণ করে দিয়েছিলেন। স্কুলটি নির্মাণের প্রাথমিক পর্বে স্থানীয় কবিরাজ পরিবার 'সেন'-দের অবদানের কথা এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়। বিদ্যালয়টির প্রথম প্রধান শিক্ষক পদ অলংকৃত করেন চুনীলাল বসু নামে এক বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তি।

ক্রমশ এই বিদ্যালয় কালনা অঞ্চলে বিশেষ জনপ্রিয় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ক্রমবর্ধমান ছাত্রসংখ্যার জন্য পূর্বে নির্মিত কাঁচাবাড়িতে স্থান সংকুলানের অসুবিধা হচ্ছিল। প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল পাকা বাড়ি নির্মাণের। এদিকে ১৮৭০ নাগাদ স্কুলটি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন লাভের জন্য আবেদন জানায়। ঠিক হয়, স্কুলটি অনুমোদনযোগ্য কিনা তা নির্ধারণের জন্য ডিভিশনাল ইন্সপেক্টর অব স্কুলস বিদ্যালয়টি পরিদর্শন করবেন। সেই সময় বিদ্যালয়ের ছাত্রসংখ্যা একশো ছাড়িয়ে গেলেও বেশিরভাগই নিম্নবিত্ত পরিবারভুক্ত হবার জন্য তারা নিয়মিত বিদ্যালয়ের বেতন দিতে অপারগ ছিল। এদিকে স্কুল কর্তৃপক্ষের পক্ষে তখন বিদ্যালয়ের তৎকালীন সাত/আট জন শিক্ষকের বেতন ও অন্যান্য ব্যয় হিসেবে ধার্য তিনশো/সাড়ে তিনশো টাকাও সংকুলান করা অসম্ভব হয়ে পড়েছিল। এদিকে বিশ্ববিদ্যালয় অনুমোদন দানের প্রাক্-শর্ত হিসেবে বিদ্যালয়টিকে আর্থিকভাবে স্বনির্ভর হতে হবে—এরকমটাই জানায়। এছাড়া বিদ্যালয়ের নিজস্ব পাকা ভবন থাকার শর্তও তারা রাখে।

জনসাধারণ কিছু অর্থ যোগালেও মূলত তারাকান্ত ভট্টাচার্যের সানুগ্রহ দানের উপরই তখন বিদ্যালয়ের ব্যয়ভার নির্বাহ হত। তিনি প্রত্যক্ষভাবে বিদ্যালয় পরিচালনায় অংশগ্রহণ করতেন। ঠিক সেই সময়েই ওড়িশার জজ্ পণ্ডিতের পদে তাঁর বদলির সম্ভাবনা দেখা দিলে বিদ্যালয়ের অনুমোদনের সম্ভাবনা তো বাধাপ্রাপ্ত হলই, এর অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে পড়বারও আশঙ্কা দেখা দিল।

এই রকম পরিস্থিতিতে তারাকান্তের নেতৃত্বে কালনার বিদ্যোৎসমাজ একত্রে তৎকালীন বর্ধমানাধিপতি মহাতবচন্দ্ বাহাদুরের শরণাপন্ন হন। স্কুলটির আর্থিক ও অন্যান্য সমস্যার কথা তাঁরা মহারাজাকে জানান। মহারাজাও তাঁর 'লয়্যাল সাবজেক্ট' কালনার বিদ্বজ্জনদের ডাকে সাড়া দিয়ে সত্বর স্কুলটির আর্থিক দায়দায়িত্ব গ্রহণের অঙ্গীকার করেন এবং কালনায় মহারাজা প্রদত্ত ভূমিখণ্ডেই স্কুলের নতুন ভবন গড়ে ওঠে। বিদ্যালয়ের নবপর্যায় উদ্বোধনের দিন মহারাজা মহতাবচন্দ্ স্বয়ং কালনায় উপস্থিত হয়ে বিদ্যালয়ের দ্বার উদ্‌ঘাটন করেন। মহারাজার সম্মানে স্কুলটির নামকরণ হয় 'কালনা মহারাজা উচ্চবিদ্যালয়'।

কালনার মানুষের শিক্ষার প্রতি অনুরাগ দর্শনে আপ্লুত বর্ধমানরাজ স্কুলটিকে সম্পূর্ণ অবৈতনিক বলে ঘোষণা করেন। কিন্তু তারাকান্ত ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে কালনাবাসী বিনীতভাবে মহারাজকে জানান যে স্কুল সম্পূর্ণ অবৈতনিক হলে, কালনাবাসীর স্কুলের প্রতি দায়বদ্ধতার হানি ঘটতে পারে। শেষ পর্যন্ত মহারাজের সম্মতিক্রমে ঠিক হয় যে স্কুল ছাত্রদের কাছ থেকে ন্যূনতম অর্থ বেতন হিসেবে নেবে এবং দরিদ্র ছাত্রেরা সম্পূর্ণ বিনা বেতনে পড়তে পারবে।

এদিকে মহারাজার বদান্যতায় সমস্ত শর্ত পূরণ করার পরিপ্রেক্ষিতে 'রাজ স্কুল' শীঘ্রই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন লাভ করতে সমর্থ হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের নথিপত্রে স্কুলের নাম রাখা হয় 'Culna Maharaja's H.E. School')। ইতোমধ্যে চুনীলাল বসু প্রধান শিক্ষকের পদ থেকে অব্যহতি নিলে কালনারই বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ সাগরচন্দ্র চক্রবর্তী স্কুলের প্রধান শিক্ষক নিযুক্ত হন। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই সরকারি শিক্ষা বিভাগে চাকরি পেয়ে তিনি কালনা ত্যাগ করেন এবং অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রধান শিক্ষকের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। তিনি প্রায় দু-বছর স্কুলটির প্রধান শিক্ষকের পদে ব্রতী ছিলেন। পরবর্তী প্রধান শিক্ষক হিসেবে বিদ্যালয়েরই পূর্বতন শিক্ষক বিধুভূষণ মুখোপাধ্যায় মনোনীত হন। স্কুলের প্রাক্তন ছাত্র আই.সি.এস. সত্যেন্দ্রচন্দ্রের স্মৃতি-নির্ভর আলোচনা থেকে জানা যায়, বিধুভূষণবাবুর আমলে সাত জন মাস্টারমশাই বিদ্যালয়টিতে নিযুক্ত ছিলেন। বিশেষ করে 'থার্ড মাস্টার' সুরেশচন্দ্র সান্যালের ছাত্রদরদি আচরণের কথা তিনি তাঁর লেখায় তুলে ধরেছেন। সত্যেন্দ্রচন্দ্রের স্মৃতিচারণে তৎকালে স্কুল-প্রাঙ্গণেরও একটি সুন্দর চিত্র ফুটে উঠেছে।

বিধুভূষণবাবু একাদিক্রমে প্রায় ছত্রিশ বছর কালনার স্কুলটির দায়িত্বভার নির্বাহ করেছিলেন। তাঁর সময়েই ১৮৭১ খ্রিস্টাব্দে বিদ্যালয়ের প্রথম ব্যাচের ছাত্ররা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। উত্তীর্ণ দুই ছাত্র ছিলেন বরদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ও রাধাপ্রসন্ন গুপ্ত। পরবর্তী বছরে অর্থাৎ ১৮৭২-এ শিশির ভট্টাচার্য, জ্ঞানেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় এবং প্রিয়নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এই স্কুল থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

বিধুভূষণ বাবুর ছত্রিশ বছর ব্যাপী প্রধান শিক্ষকতার সময়ে কালনা মহারাজা স্কুল উন্নতির চরম সীমায় পৌঁছায়। স্কুলের শৃঙ্খলা ও মান এতটাই ছিল যে, অভ্যন্তরীণ পরীক্ষায় উপযুক্ত ফল না করার জন্য ১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দে বিধুবাবু স্কুল থেকে কোনো ছাত্রকেই প্রবেশিকা পরীক্ষায় বসার অনুমতি দেননি। শ্রেণিকক্ষে শিক্ষক হিসেবেও তিনি ছিলেন অনবদ্য। স্কুলের প্রাক্তন ছাত্র গণেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কথায়, ''শ্রদ্ধেয় বিধুভূষণ মুখোপাধ্যায় তখন প্রধান শিক্ষক। তাঁর আকর্ষণীয় পড়ানোর বিশেষ ভঙ্গিটি আজও মনে আছে। বিশেষ করে, যখন তিনি ম্যাপ পয়েন্টিং করাতেন তখন তাঁর সঙ্গে আমরাও যেন বিশ্বপরিক্রমায় বের হতাম।'' বিধুবাবুর আমলে ডিভিশনাল ইন্সপেক্টর অব স্কুলস্ মিস্টার এথরো মহারাজার বিদ্যালয়টি পরিদর্শনে আসেন। বিধুবাবুর শেক্সপিয়র পড়ানো শুনে এতটাই মুগ্ধ হন যে এরপর প্রথামাফিক ছাত্রদের কোনো প্রশ্ন করতে তিনি অস্বীকার করেন। কারণ জানতে চাইলে তিনি বলেছিলেন, যেখানে শিক্ষক সুন্দর পড়ান, সেখানে ছাত্রদের প্রশ্ন করা

অবান্তর। সেই সময়কার অন্যান্য মাস্টারমশাইদের মধ্যে প্রসন্নকুমার সরকার (সেন), কাঙালী মুখোপাধ্যায়, প্যারিলাল তেওয়ারিরও শিক্ষক হিসেবে সুনাম ছিল। সুরেশচন্দ্র সান্যালের কথা তো আমরা আগেই বলেছি।

স্কুলের প্রথম যুগের ছাত্ররাও পরবর্তীকালে বৃহত্তর সমাজে যথেষ্ট খ্যাতি প্রতিপত্তি অর্জন করেছিলেন। এঁদের মধ্যে আইসিএস সত্যেন্দ্রচন্দ্র মল্লিক, কাটোয়া কলেজের এক সময়ের অধ্যক্ষ হরিমোহন মুখোপাধ্যায়, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচীন ভারতের ইতিহাসের অধ্যাপক ড. জিতেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, বাংলা সরকারের অর্থ দপ্তরের রেজিস্ট্রার হরিসাধন মুখোপাধ্যায় প্রমুখের নাম উল্লেখ করা যায়। ক্রমশ বিভূতিবাবুর চেষ্টায় ও বর্ধমান মহারাজার অর্থানুকূল্যে স্কুলে ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে একতল-বিশিষ্ট বিদ্যালয় গৃহ ১৮০৯ খ্রিস্টাব্দে দ্বিতল ভবনে পরিণত হয়েছিল।

বিভূতিবাবুর অবসর গ্রহণের পর ১৯০৮ থেকে ১৯২১—এই ক-বছরের মধ্যে স্কুলের প্রধান শিক্ষক পদের পদাধিকারী দ্রুত পরিবর্তন হয়। এই সময়কালে মোট ছয় জন প্রধান শিক্ষক বিদ্যালয়ের কর্ণধার হিসেবে কাজ করেন। এঁরা হলেন নিত্যগোপাল গোস্বামী, সুরেন্দ্রনাথ নন্দী, মন্মথনাথ গুঁই, আনন্দচরণ মিত্র, কমলেন্দু লাহিড়ী এবং নিত্যবিহারী ভট্টাচার্য। সেই সময়কার বিদ্যার্থী জিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় স্মৃতিমন্থন করে বলেছেন, ''(প্রধান শিক্ষক) মন্মথনাথ গুঁই মহাশয়ের নিকট আমরা ইংরাজি পাঠ লইতাম... ইংরাজির যেটুকু জ্ঞান লাভ করা গিয়াছিল, তাহা তাঁহারই কৃপায়।'' এছাড়া তাঁর লেখায় 'সেকেন্ড মাস্টার' শচীন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর ইতিহাস পাঠদানের প্রণালীর ভূয়সী প্রশংসা আমরা পাই।

১৯২১ খ্রিস্টাব্দে স্কুলের প্রাক্তন ছাত্র শচীন্দ্রকুমার চক্রবর্তী রাজ স্কুলের প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এই পদ পাওয়ার আগে তিনি স্কুলের 'সেকেন্ড মাস্টার' ছিলেন। তাঁর সময়েই ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দে জয়ন্ত কুমার চক্রবর্তী এবং ননীগোপাল দাস জেলা পর্যায়ে ছাত্র স্কলারশিপ লাভ করে। ১৯৩৯-এ ছাত্র ভূপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য ডিভিশনাল স্কলারশিপ পেয়ে কালনার মুখ উজ্জ্বল করেন। স্কুলের এই সময়ের শিক্ষকদের মধ্যে বসন্তকুমার ওঝা, রাখালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, বিষ্টুচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও আদ্যনাথ বিদ্যারত্নের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

শচীন্দ্রকুমার চক্রবর্তীর কার্যকালে সারা দেশে অহিংস অসহযোগ ও আইন অমান্য আন্দোলনের প্রভাব পড়েছিল। আবার তাঁর কার্যকালের শেষ পর্যায়ে ঘটেছিল '৪২-এর সর্বাত্মক আন্দোলন। এই আন্দোলনের ঢেউ কালনার বুকেও আছড়ে পড়েছিল। কিন্তু 'প্রো-গভর্নমেন্ট' বর্ধমান মহারাজার নির্দেশে শচীন্দ্রবাবু এই আন্দোলনের তরঙ্গকে স্কুলের দ্বারপ্রান্ত থেকেই ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। আজকের দৃষ্টিতে এই কাজ সমালোচনার ঊর্ধ্বে না হলেও তৎকালে বিদ্যালয়ের শৃঙ্খলার প্রশ্নে এই তৎপরতা ছাত্রদের ওপর তাঁর অগাধ প্রভাবেরই পরিচায়ক ছিল।

স্বাধীনতার পরেও ১৯৫১ অবধি তিনিই ছিলেন বিদ্যালয়টির কর্ণধার। তখনও অবধি বর্ধমান মহারাজের এস্টেটের পৃষ্ঠপোষকতাতেই কালনা মহারাজা স্কুলটি চলত। স্বাধীনতা লাভের পর জমিদারি প্রথা উচ্ছেদের আগে রাজ অনুগ্রহ থেকে বঞ্চিত হয় এবং স্কুলটির অস্তিত্বের সংকট দেখা দেয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, জমিদারি প্রথার আনুষ্ঠানিক উচ্ছেদ হয় ১৯৫৪ সালে। এ বছর থেকেই কালনা রাজ স্কুল রাজ্য সরকারের 'গ্র্যান্ট ইন এইড' প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত হলে এই সংকট দূরীভূত হয়। পরবর্তীকালে কলা-বাণিজ্য-বিজ্ঞান বিভাগ সম্পন্ন উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পরিণত হয় স্কুলটি। সে অন্য ইতিহাস—অন্য প্রসঙ্গ।

কালনা রাজস্কুল সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহে সাহায্য করেছেন ড. দেবাশিস নাগ ও শ্রীতপন পোদ্দার।

শারদ শুভেচ্ছা জানাই

শ্রীপল্লী নার্শারি

প্রোঃ পরেশ মিত্র

সকল প্রকার ফুল, ফল ও বৃক্ষজাতীয় চারা পাওয়া যায়।
বিঃদ্রঃ এখানে বাগান তৈরির যাবতীয় সরঞ্জাম সরবরাহ করা হয়।

সগড়াই বাজার, পূর্ব বর্ধমান, ফোন : ৯৭৩৫৮৩৩৭৬৮, ৮১৪৫৪৩৩৯৮৮

Sl. No. 6

SHYAM
METALICS
ORE TO METAL
SEL SEL SEL
"S S CHAMBERS", 5, C. R. AVENUE
KOLKATTA-700072
PHONE: +91 33 40111000
FAX: +91 33 40111031
E-MAIL: seltmt@shyamgroup.com

৪২-এর বর্ধমান

সর্বজিৎ যশ

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জাপানি সৈন্যবাহিনী যখন বার্মা ও সিঙ্গাপুর পেরিয়ে ভারতের সীমান্তে পৌঁছেছে, তখন আতঙ্কিত ব্রিটিশ সরকার যুদ্ধের পরে ভারতে ডমিনিয়ন স্ট্যাটাস দেবার লোভ দেখিয়ে স্বাধীনতা-আন্দোলনকারীদের এই যুদ্ধে সামিল করার জন্য ক্রিপ্‌স মিশনকে ভারতে পাঠায়। কিন্তু ক্রিপ্‌স মিশনের প্রয়াস ব্যর্থ হয়। তার ছলনাময় এই উদ্যোগে সারা ভারত ক্রোধে ফেটে পড়ে। এই পরিস্থিতিতে স্বাধীনতা অর্জনের লক্ষ্যে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের নেতা গান্ধীজি 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনের ডাক দেন। ৮ আগস্ট ১৯৪২ আন্দোলনের এই ডাক দেবার সাথে সাথে সমস্ত উচ্চস্তরের নেতৃত্ব গ্রেপ্তার হন। তবুও জনগণ স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েন। ভারতের বিভিন্ন স্থানের মতো বর্ধমান জেলাতেও আন্দোলন সংগঠিত হয়।

সাংগঠনিক দুর্বলতার দরুন বর্ধমান জেলায় ভারত ছাড়ো আন্দোলন প্রত্যাশিত ব্যাপ্তি এবং গভীরতা অর্জন করেনি। তবে এই জেলার ছাত্র সম্প্রদায়ের মধ্যে আন্দোলন সম্পর্কে প্রভূত উৎসাহ এবং উদ্দীপনা ছিল। বিজয়কুমার ভট্টাচার্য পূর্বেই আসন্ন ভারত ছাড়ো আন্দোলন নিয়ে জেলার গ্রামীণ এলাকায় প্রচারাভিযান চালান। দেশব্যাপী আন্দোলন শুরু হওয়ার অনতিবিলম্বে পুলিশ বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়, অসীম ঘোষ, নারায়ণ দাস হাজরা, বিশ্বনাথ চক্রবর্তী প্রমুখ রাজনৈতিক নেতা ও বিশিষ্ট কর্মীদের গ্রেপ্তার করে। এই পরিস্থিতিতে আন্দোলন সংগঠিত করার ক্ষেত্রে বিশেষ প্রতিবন্ধকতা কৃষ্টি হয়। ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দের ১৩, ১৬, ১৭ এবং ১৮ আগস্ট বর্ধমান শহরে ধর্মঘট পালিত হয়। ১৭ আগস্ট শহরের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে জনমিছিল বর্ধমান কোর্টের কাছে উপস্থিত হয় এবং পিকেটিং শুরু করে দেয়। পুলিশ নিরস্ত্র জনতার ওপর নির্দয়ভাবে লাঠ চালনা করলে কয়েকজন আহত হন। ইতিমধ্যে শহরের নেতৃবৃন্দের গ্রেপ্তারের খবর পেয়ে বিক্ষুব্ধ জনতা বর্ধমান রেল স্টেশনে আক্রমণ চালায়। ২৬ আগস্ট বর্ধমান কোর্ট এবং অন্যান্য সরকারি দপ্তরের সামনে জনগণ পিকেটিং করে। ২৯ আগস্ট বর্ধমান জেলা বোর্ডের প্রতিবাদসভা অনুষ্ঠিত হয়। ১৩ সেপ্টেম্বর কালনা, ১৯ সেপ্টেম্বর জামালপুর, ২৯ সেপ্টেম্বর ভাণ্ডারহাটি ও পলাসন, ১৩ সেপ্টেম্বর কাশিয়াড়া, ২৩ সেপ্টেম্বর উচালন এবং মণ্ডলগ্রাম ডাকঘরগুলির আসবাব ও নথিপত্র জনগণ পুড়িয়ে দেয়। ১৩ সেপ্টেম্বর জনতার আক্রমণে কালনার ডাকবাংলো এবং রেলস্টেশনের দারুণ ক্ষতি হয়। ১৬ সেপ্টেম্বর কালনার সরকারি আদালতে আন্দোলনের কর্মীরা জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে। ২৬ সেপ্টেম্বর বিপ্লবী জনতা বামুনিয়া দামোদর ক্যানাল অফিস ধ্বংস করে দেয়। ১৯ সেপ্টেম্বর জামালপুরের পুলিশ থানার আসবাব ও জরুরি নথি, আবগারি দোকান গণ-আক্রমণে বিধ্বস্ত হয়ে যায়। ৬ সেপ্টেম্বর পুলিশ বর্ধমান শহরে জেলা কংগ্রেসের সদর কার্যালয় এবং ১১ অক্টোবর কাটোয়া মহকুমা কংগ্রেস কার্যালয় সিল করে দেয়। ৭ অক্টোবর জনগণ সগড়াই-এর ৭টি শরণার্থী শিবির ধ্বংস করে। ২১ অক্টোবর কুসুমগ্রাম ডাকবাংলো, ২৫ নভেম্বর বেড়ুগ্রাম ডাকঘর, ২৯ নভেম্বর রায়না ডাকঘর জনরোষে অগ্নিদগ্ধ হয়। তাছাড়া নভেম্বর ও ডিসেম্বরে বর্ধমানের কয়েকটি অঞ্চলে আরও কয়েকটি অন্তর্ঘাতের ঘটনা ঘটে।

কাটোয়ায় ভারত ছাড়ো আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন ডা. গুণেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, যতীশচন্দ্র সিংহ, হরেরাম মণ্ডল, মহিমারঞ্জন ঘটক, স্বামী নির্মলানন্দ সরস্বতী, কামাখ্যা মজুমদার, বসন্ত চট্টোপাধ্যায়, আনন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়, নরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, ভক্তভূষণ সোম, নিত্যগোপাল সামন্ত, দেবেশ কুণ্ডু, নির্মলানন্দ ঠাকুর প্রমুখ। গোরাচাঁদ সাহার বাড়িতে একটি গোপন বৈঠক ডাকা হয়েছিল। কিন্তু সে খবর ছড়িয়ে পড়ায় নেতাজি সুভাষ আশ্রমের কাছাকাছি কোনো একটি বাড়িতে বৈঠক হয়। সেই বৈঠকে হাজির ছিলেন যাদবেন্দ্রনাথ পাঁজা, বিজয় ভট্টাচার্য, আব্দুস সাত্তার প্রমুখ নেতৃবৃন্দ। আলোচনা অনুযায়ী কাটোয়া রেলস্টেশনে আগুন লাগানো হয়। প্রদ্যোৎ চৌধুরীর নেতৃত্বে কাটোয়া কোর্ট দখলের চেষ্টা হয়। অজয় ব্রিজ উড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টাও করা হয়েছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা ব্যর্থ হয়। কাটোয়া থানার পলসোনা গ্রামকে কেন্দ্র করে আশপাশের কয়েকটি গ্রাম মুক্তাঞ্চলে পরিণত হয়েছিল। ২০-২৫ টি ধানের গাড়ি চারজন পুলিশ প্রহরায় নিয়ে যাবার সময় মেঝিয়ারি ও কুরচি গ্রামের মাঝামাঝি স্থানে আন্দোলনকারীরা ধান লুঠ করে। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে মন্তেশ্বর গ্রামের ভবানন্দ রায়কে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। পলসোনা গ্রামের ভক্তভূষণ সোম, কালীপদ রায়, নিরঞ্জন রায়, সাতকড়ি সামন্ত, পুটশুড়ির রামনারায়ণ দত্ত, কালনার গৌরীশংকর চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ ভবানন্দ রায়কে পুলিশের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেয়। ভাতাড়ে এই আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন ষষ্ঠী চৌধুরী, ধনঞ্জয় চৌধুরী প্রমুখ। বড়বেলুনে এই আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ও জলধর মণ্ডল। মন্তেশ্বর থানা এলাকায় এই আন্দোলনে যাঁরা নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তাঁরা হলেন পুটশুড়ি গ্রামের কালীকৃষ্ণ মিশ্র, প্রভাস চক্রবর্তী, ধর্মদাস মল্লিক, শৈলেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, রণজিৎ সামন্ত, রমেশচন্দ্র গণ প্রমুখ। করুই গ্রামে দাশরথি তা সভা করেন। পুলিশ আসতে পারে, এই ভেবে আগে থেকেই রটিয়ে দেওয়া হয়েছিল সুদপুরেসভা হবে। পুলিশ সুদপুরে পৌঁছে যায়। দাশরথি তা করুই-এ সভা করে চলে যান।

মানকরের তৎকালীন জমিদার রাজকৃষ্ণ

দীক্ষিত ছিলেন দুর্গাপুর মহকুমার প্রথম জমিদার, যিনি ইংরেজ শাসনব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে স্বদেশী আন্দোলনে যোগ দেন ও কারাদণ্ড ভোগ করেন। তাঁর পুত্র রাধাকান্ত দীক্ষিত ছিলেন বর্ধমান জেলার তৎকালীন কংগ্রেসের অন্যতম নেতা। দুর্গাপুরের টালি কোম্পানির পরিচালক ভোলানাথ রায় ছিলেন দুর্গাপুরের স্বদেশী আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা। তাঁর নেতৃত্বে এখানে একটি কালী মন্দির প্রতিষ্ঠা হয় এবং রথযাত্রা উৎসব পালিত হয়। তিনি কালীমন্দিরকে কেন্দ্র করে এখানে একটি স্বদেশী কেন্দ্র স্থাপন করেন। গোপালপুর গ্রামে স্বাধীনতা আন্দোলনের পথিকৃৎ ছিলেন গোবিন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। ছাত্রজীবনে বৈপ্লবিক কবিতা লেখার জন্য তিনি স্কুল থেকে বিতাড়িত হয়েছিলেন। পরে গোপালপুর স্কুলে শিক্ষকতা গ্রহণ করে স্থানীয় জনসাধারণ ও ছাত্রসমাজকে জাতীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। এখানে শিক্ষালাভের সময় যাঁরা স্বাদেশিকতায় অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন তার মধ্যে অন্যতম ছিলেন কুলডিহা গ্রামের সুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর পিতা ডা. রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ও ছিলেন সেকালের বিশিষ্ট সমাজসেবী এবং স্বদেশানুরাগী ব্যক্তি। শিক্ষক ও পিতা উভয়ের নিকট থেকে অনুপ্রেরণা লাভ করে সুকুমারবাবু কৈশোরেই স্বাধীনতা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। বর্ধমান রাজ কলেজে শিক্ষালাভের সময় তিনি ছিলেন ছাত্র ফেডারেশনের ছাত্র। এই সময়েই তিনি রানিগঞ্জের বল্লভপুরস্থিত বেঙ্গল পেপার মিল ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের সহযোগী সম্পাদকের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। ২৯ কার্তিক, মঙ্গলবার (১৫.১১.১৯৩৮) উক্ত পেপার মিলের এক শ্রমিক ধর্মঘটে নেতৃত্ব দিতে গিয়ে তিনি জীবন বিসর্জন দেন। ঘটনার বিবরণে প্রকাশ যে শ্রমিক ধর্মঘটকে উপেক্ষা করে উক্ত মিলের চিফ্ ইঞ্জিনিয়ার মি. ব্রাউন ভাড়াটে কিছু লোক নিয়ে একটি লরিতে করে আসছিলেন। সেই সময় সুকুমারবাবু সমেত অন্যান্য কর্মীরা এই লরিটি আটক করেন। উক্ত ইঞ্জিনিয়ার এই প্রতিরোধ উপেক্ষা করে গাড়ি চালিয়ে দেন। সুকুমারবাবু ছিলেন আন্দোলনের পুরোভাগে। গাড়িটি তাঁর বুকের ওপর দিয়ে চলে যায়। এই ঘটনার পর রানিগঞ্জের সমস্ত দোকানপাট তৎক্ষণাৎ বন্ধ হয়ে যায় এবং পরদিন হরতাল পালন করা হয়। তাঁর স্মৃতির উদ্দেশ্যে বল্লভপুরে একটি আবক্ষ মর্মরমূর্তি ও গ্রন্থাগার স্থাপন করা হয়েছে। ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দে আসানসোল-দুর্গাপুর ডেভেলপমেন্ট অথরিটি কুলডিহায় সুকুমার জলাধার প্রকল্প নির্মাণ করে তাঁর স্মৃতিরক্ষার ব্যবস্থা করেছেন।

আগস্ট আন্দোলনের তৃতীয় পর্যায়ে, অর্থাৎ ১৯৪২-এর সেপ্টেম্বর/ অক্টোবর থেকে এই আন্দোলন বিপ্লবীদের নিয়ন্ত্রণে চলে যাওয়ায় তা পুরোপুরি জঙ্গি চরিত্র লাভ করে। দিল্লিতে অরুণা আসফ আলি ও সুচেতা কৃপালনীর নেতৃত্বে 'স্বাধীন ভারত সরকার' গঠিত হয়। এই সরকারের অধীন সারা বাংলা স্বাধীন সরকারের অধিনায়ক নির্বাচিত হন অন্নদা চৌধুরী। সতীশ সামন্ত ও অজয় মুখার্জির পরিচালনায় তমলুকের চারটি থানায় জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়।

সুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের অন্যতম সহযোগী ছিলেন কুলডিহার শক্তিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং বিজয় বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর মৃত্যুর পরও এঁরা কংগ্রেস নেতৃত্বাধীনে স্বদেশী আন্দোলন পরিচালনা করেন। সুকুমারবাবুর আর এক সহযোগী ছিলেন ধবনী গ্রামের হাজারীলাল মুখোপাধ্যায়। বর্ধমান জেলা কংগ্রেস কার্যালয় থেকে তাঁর ওপর ভার ছিল এই অঞ্চলে মাদকদ্রব্য বর্জন ও বিলাতি দ্রব্য বর্জন নীতি কার্যকর করা। পিকেটিং করার অপরাধে এবং কাঁথিতে 'লবণ আইন' অমান্য করার অপরাধে তিনি একাধিকবার সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করেছেন। স্বাধীনোত্তর আমলে (১৯৭৩ খ্রি.) তাঁকে তাম্রপত্র ও স্বাধীনতা সংগ্রামী ভাতা দিয়ে সম্মানিত করা হয়। হাজারীলালবাবুর অন্যতম সহকর্মী ছিলেন কাঁকসা থানার প্যারীগঞ্জের কামাক্ষা চট্টোপাধ্যায়। ধবনী গ্রামের বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে আর একটি স্বাধীনতা আন্দোলনের দল গড়ে ওঠে। এই দলের অন্যান্য কর্মীদের মধ্যে অন্যতম হলেন নারায়ণদাস মুখোপাধ্যায়, জীতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, নারায়ণদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, জানকীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিজয়কৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, পঞ্চানন মুখোপাধ্যায়, ভোলানাথ মুখোপাধ্যায় এবং দুর্গাদাস মুখোপাধ্যায়। এই দলের অন্যতম কাজ ছিল স্বাধীনতার গান গেয়ে প্রভাতফেরি করা এবং মিছিল করা। সদস্যদের মধ্যে কিছু গুপ্ত কাজকর্মেরও প্রস্তুতি চলছিল এবং এই উদ্দেশ্যে কয়েকটি আগ্নেয়াস্ত্রও সংগৃহীত হয়েছিল। কিন্তু পার্শ্ববর্তী গ্রামের জনৈক দারোগা খবরটি থানায় জানিয়ে দেন। ফলে আগ্নেয়াস্ত্রগুলি বাজেয়াপ্ত হয়। ভিড়িঙ্গী গ্রামের স্বদেশী আন্দোলনের পরিচালক ছিলেন সত্যগোপাল মুখোপাধ্যায় এবং ত্রৈলোক্যনাথ ইনস্টিটিউশনের প্রধান শিক্ষক রামবন্ধু পট্টনায়ক। রামবন্ধুবাবু স্বদেশী ভাবধারায় কাব্যগ্রন্থ ও নাটক রচনা করেন এবং ছাত্রদের অভিনয় করিয়ে ছাত্র ও যুব সমাজে স্বাধীনতার বাণী প্রচার করেছিলেন।

আসানসোল এলাকায় নেতৃত্ব দেন কালুরাম আগরওয়াল, দুর্গাদাস হালদার, অমূল্যরতন ঘোষ, প্রভাত মুখোপাধ্যায় প্রমুখ। রানিগঞ্জ শহরে এই আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন চিরঞ্জীব লাল কেজরিওয়াল। উখড়া অঞ্চলে নেতৃত্ব দেন সুশীল ঘটক, বিমলকুমার বাজপেয়ী, সুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ রায়, ভারতচন্দ্র গাঙ্গুলী, অসীম ঘোষ, আশুতোষ মিত্র, বলাই মুখার্জি, নন্দদুলাল গাঙ্গুলী প্রমুখ।

আগস্ট আন্দোলনের তৃতীয় পর্যায়ে, অর্থাৎ ১৯৪২-এর সেপ্টেম্বর/অক্টোবর থেকে এই আন্দোলন বিপ্লবীদের নিয়ন্ত্রণে চলে যাওয়ায় তা পুরোপুরি জঙ্গি চরিত্র লাভ করে। দিল্লিতে অরুণা আসফ আলি ও সুচেতা কৃপালনীর নেতৃত্বে 'স্বাধীন ভারত সরকার' গঠিত হয়। এই সরকারের অধীন সারা বাংলা স্বাধীন সরকারের অধিনায়ক নির্বাচিত হন অন্নদা চৌধুরী। সতীশ সামন্ত ও অজয় মুখার্জির পরিচালনায় তমলুকের চারটি থানায় জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। নিজস্ব গেরিলা বাহিনী, সংবাদ আদান-প্রদান বিভাগ, বিচার ও শাসন বিভাগ, আর্তদের সেবার জন্য স্বতন্ত্র বিভাগ এবং নিজস্ব বুলেটিন, ডাক ও অর্থদপ্তর নিয়ে গঠিত তমলুক জাতীয় সরকারের কাজকর্ম সারা বাংলায় বিশেষ আলোড়ন সৃষ্টি করে।

বর্ধমান জেলাতেও অনুরূপ কর্মসূচি রূপায়ণে বিশিষ্ট গান্ধিবাদী নেতা বিজয় ভট্টাচার্যের আহ্বানে কলকাতার শক্তি প্রেসে রায়নার দাশরথি তা, শক্তি মল্লিক, কালনার ভক্ত রায়, গৌরাঙ্গগোপাল সরকার, গৌরীশংকর চট্টোপাধ্যায়, ভবানন্দ রায়, কাটোয়ার ভক্তভূষণ সোম, বিভূতিভূষণ দত্ত প্রমুখের উপস্থিতিতে যে গোপন সভা অনুষ্ঠিত হয়, তাতে সমগ্র বর্ধমান জেলার জন্য একটি 'সংগ্রাম পরিষদ' গঠিত হয়।

বিজয় কুমার ভট্টাচার্য ছিলেন এর মুখ্য নির্দেশক। জেলার ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে ছিলেন শক্তি মল্লিক, সংযোগ রক্ষাকারীর ভূমিকায় গৌরগোপাল সরকার, ফিল্ড-এ সর্বাধিনায়ক হন রায়নার দাশরথি তা, প্রতি মহকুমার জন্য নির্বাতি হন দু-জন করে অধিনায়ক। কাটোয়া মহকুমার জন্য ঠিক হয় সিভিলে বিভূতিভূষণ দত্ত এবং ফিল্ড অ্যাকশনে ভক্তভূষণ সোমের নাম। সদর মহকুমার জন্য মনোনীত হন রাধারমণ সেন, কালনা মহকুমার জন্য ভক্ত রায় ও গৌরীশংকর চট্টোপাধ্যায়। ঠিক হয় কাটোয়া মহকুমায় বিভূতিভূষণ দত্ত গ্রেপ্তার বরণ করলে ভক্ত সোম হবেন মহকুমার অধিকর্তা। আরও ঠিক হয়, ভবানন্দ রায় প্রত্যক্ষ সংগ্রাম এড়িয়ে বিভিন্ন অঞ্চলের সংগ্রাম পরিষদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে চলবেন। প্রত্যেক বিপ্লবী ছদ্মনামে নিজ নিজ এলাকায় 'মুক্তাঞ্চল' ঘোষণা করে যতদূর সম্ভব জনগণের মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টি না করে গ্রেপ্তার এড়িয়ে সংগ্রাম পরিষদের কাজ চালিয়ে যাবেন। কাটোয়া মহকুমার জন্য কাটোয়া থানার পলসোনা এবং কেতুগ্রামের মাসুন্দী হল গোপন যোগাযোগ কেন্দ্র। বুলেটিন ছাপানোর জন্য সংগৃহীত হয় সাইক্লোস্টাইল মেশিন এবং অন্যান্য সরঞ্জাম। অনেকের মতে পলসোনা থেকে যে বুলেটিন ছাপানো হত, তার সাজসরঞ্জাম নাকি কাটোয়া লোকাল বোর্ডের অফিস ভেঙে সংগৃহীত হয়। বর্ধমানে শুরু হল নিয়মিত 'সাপ্তাহিক সত্যাগ্রহ' প্রকাশনার কাজ। ছদ্মনামে কাজ চালাতে লাগলেন এডিটর বিমল কুণ্ডু, ব্যবস্থাপক শক্তি ঘোষ, প্রিন্টার শম্ভুনাথ চট্টোপাধ্যায়, ক্যাশিয়ার হৃষিকেশ মণ্ডল। 'এককড়ি রায়' বা 'একদা' ছদ্মনামে ভবানন্দ রায় হলেন নিয়মিত কালনা কাটোয়ার সংবাদ সংগ্রাহক। তমলুক ও কলকাতার মধ্যে গোপনে বুলেটিন সরবরাহ এবং কলকাতায় বর্ধমান জেলার সংযোগ কেন্দ্রের অধিকর্তা রমা চৌধুরীর (রমা তা-এর ছদ্মনাম) সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করার দায়িত্বও তাঁর ওপর ছিল। কেন্দ্রীয় সংগঠন থেকে মুক্তাঞ্চল সরকারের জন্য মাসে মাসে এককালীন টাকার ব্যবস্থা করা হয়।

তমলুকের মতো বর্ধমান জেলারও কিছু কিছু অঞ্চল স্বাধীন মুক্তাঞ্চল হিসেবে ঘোষিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বর্ধমান জেলার দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্বাংশেও ব্যাপক পুলিশি তৎপরতা শুরু হয়ে যায়। বিপ্লবীদের খোঁজে চিরুনি তল্লাশির নামে গ্রামবাসীদের ওপর শুরু হয় হয় অকথ্য পুলিশি নির্যাতন। কালনার অ্যাকশনের পর জামালপুর, ভাতাড় প্রভৃতি থানা দখলকে কেন্দ্র করে পুটশুড়ি সমেত কালনা মহকুমার বিভিন্ন এলাকা, জামালপুরের মণ্ডলগ্রাম, রায়না প্রভৃতি অঞ্চলের জনগণের ওপর পাইকারি হারে জরিমানা আরোপ করা হয়। পুলিশি অত্যাচারের ফলে এলাকার জনগণ বিপ্লবীদের সম্পর্কে আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে ওঠে। জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বিপ্লবীদের পক্ষে কাজকর্ম পরিচালনা এবং আত্মগোপন অসম্ভব হয়ে পড়ে। এই পরিস্থিতিতে ১৯৪২-এর অক্টোবরের প্রলয়ংকরী প্রাকৃতিক দুর্যোগ (বন্যা ও ঝঞ্ঝা) মুক্তাঞ্চল সরকারের পক্ষে আশীর্বাদ হিসেবে দেখা দেয়। সমস্ত বিপ্লবীদের আপাতত রিলিফের কাজে লাগিয়ে যেমন জনগণের আস্থা অর্জন ও আত্মগোপন সম্ভব হয়, তেমনি মুক্তাঞ্চলের ভৌগোলিক সীমানার পরিবর্তন ঘটিয়ে যতদূর সম্ভব পুলিশি নির্যাতনের হাত থেকে নিষ্কৃতি লাভের চেষ্টা চলতে থাকে।

বর্ধমান সদর ও কালনা এলাকায় বিপ্লবীদের কাজকর্ম অসম্ভব হয়ে পড়ায় সর্বসম্মতিক্রমে নিরীহ স্কুল-মাস্টারের আবরণে ভক্তভূষণ সোমকে অধিনায়ক নির্বাচন করে মুক্তাঞ্চলের সীমানা পরিবর্তন করা হয়। কড়ুই, গীধগ্রাম, সিঙ্গি ও শ্রীবাটী—এই চারটি ইউনিয়নকে মন্তেশ্বরের ধেনুয়া, গলাতুন এবং পূর্বস্থলী থানার কিয়দংশের সঙ্গে জুড়ে দিয়ে মুক্তাঞ্চলের নতুন সীমানা গঠিত হয়। উপরোক্ত অঞ্চলটির ভৌগোলিক অবস্থানের সুযোগ-সুবিধার কথা চিন্তা করে এবং সে-সময়ে কাটোয়ার মহকুমা শাসক বিপ্লবীদের কাজকর্মে আপাতত কোনো বিঘ্ন ঘটাচ্ছেন না—এই সুযোগে, অঞ্চলটি আদর্শ স্থান হিসেবে বিবেচিত হয়। স্বাধীনতা সংগ্রামী ভক্ত সোমের স্মৃতিকথা থেকে জানা যায়, এই সময় থেকেই কাটোয়া থানার পলসোনা গ্রামই হয় বর্ধমান জেলার সর্বাধিনায়কের নতুন হেড কোয়ার্টার।

দাশরথি তা-এর কলকাতায় আত্মগোপনের পর কাটোয়া এবং মন্তেশ্বর থানার তিনটি বিরাট এলাকা নিয়ে গঠিত মুক্তাঞ্চলের কর্মীরা পলসোনাকে কেন্দ্র করে তাঁদের কাজকর্ম শুরু করেন। এতদুপলক্ষে কর্মীদের তিনটি দলে ভাগ করা হয়। প্রত্যক্ষ 'অ্যাকশনে' রইলেন গৌরীশঙ্কর চট্টোপাধ্যায়, রামনারায়ণ দত্ত, অচ্যুতানন্দ চৌধুরী, গোলক রায়, মণি চট্টোপাধ্যায়, ভৈরব তা, কালিদাস রায় প্রমুখ। দ্বিতীয় দলে ভবানন্দ রায় (প্রচার ও সংযোজক), শম্ভু চট্টোপাধ্যায়, এককড়ি দত্ত, ধর্মদাস সেন, মহানন্দ সোম প্রমুখ; তৃতীয় দলে কুরচির হৃষিকেশ মণ্ডলের নেতৃত্বে রিলিফ ও জনসেবার দায়িত্বে গোবিন্দ সরকার, দেবেন কুণ্ডু, শক্তি ঘোষ, নরহরি হোড়, সুধীর রায়, সদানন্দ রায়, গুহক ঘোষ, অরবিন্দ মুখার্জি প্রমুখ। প্রচ্ছন্ন সহযোগী হিসেবে ছিলেন কড়ুই-এর তৎকালীন পোস্ট মাস্টার সবিতা রায়, প্রাথমিক শিক্ষকদের মধ্যে কড়ুই-এর নলিনী বন্দ্যোপাধ্যায় (ওরফে কেনারাম পণ্ডিত), কালী চক্রবর্তী (গীধগ্রাম), দেবনারায়ণ অধিকারী (শ্রীবাটী), রাধিকা মাস্টার (কুয়ারা), রামরঞ্জন পাঁজা (পোস্ট মাস্টার, জামড়া) প্রমুখ।

মুক্তাঞ্চলের কর্মীগণ ত্রাণসামগ্রী বন্টনের মতো গঠনমূলক কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন মুখ্যত আত্মগোপনের উদ্দেশ্যে। কিন্তু এই ধরনের কাজ প্রকারান্তরে ব্রিটিশের সঙ্গে সহযোগিতারই নামান্তর। তাই কেন্দ্রীয় নির্দেশে মুক্তাঞ্চলের বিপ্লবীরা যতদূর সম্ভব নিজ এলাকার বাইরে ব্রিটিশ-বিরোধী 'অ্যাকশনে' হাত দিলেন। নাশকতামূলক কাজকর্মে তমলুক ও আরামবাগকেও ছাড়িয়ে যেতে হবে—এই ছিল তাদের মনোবাসনা। এতদুদ্দেশ্যে পলসোনার শম্ভু চট্টোপাধ্যায়ের বাড়িতে 'প্রত্যক্ষ অ্যাকশন'-এর পরিকল্পনা রচিত হল। শ্রীখণ্ডে বড়ডাঙার মেলায় লোক জমায়েতের সুযোগ শ্রীখণ্ড এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের সরকারি সংস্থাগুলির ওপর একসঙ্গে আঘাত হানার সিদ্ধান্ত হল। সে-সময় কড়ুই এলাকা ছিল মোটামুটি নিরুপদ্রব। ঠিক হল, বিপ্লবীরা নিজ নিজ কর্তব্য সমাধা করে প্রয়োজনবোধে কড়ুই-এর বহিরাগত শিক্ষিকা মনোরমা খাঁ, পোস্তার সবিতা রায় এবং প্রাথমিক শিক্ষক নলিনী বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে আশ্রয় গ্রহণ করবে। আপাতদৃষ্টিতে ব্রিটিশ-বিরোধী না হলেও, এঁরা ছিলেন মুক্তাঞ্চলের বিপ্লবীদের সমর্থক, বিপদের দিনে বিপ্লবীদের আশ্রয়দাতা।

১৯৬২-এর অগ্রহায়ণ মাসের রাত্রি। শ্রীখণ্ডের বড়ডাঙার মেলা সবে জমে উঠেছে। মধ্যরাত্রিতে শুরু হল বিপ্লবীদের ডাইরেক্ট অ্যাকশন। সঙ্গে সঙ্গে জ্বলে উঠল মঙ্গলকোট থানার বাজার বনকাপাসি ইউনিয়ন বোর্ড, ঋণ সালিশি বোর্ড, আবগারি দোকান ও শ্রীখণ্ড ডাকবাংলো। লুঠ হল শ্রীখণ্ড পোস্ট অফিস। বিপ্লবীদের এই কাজকর্ম পুলিশ ঘুণাক্ষরে টের পেল না। ফলে এই অ্যাকশনে আপাতত কোনো বিপ্লবী ধরা পড়লেন না। খবরটা সংবাদপত্রে বড় বড় হরফে প্রকাশিত হতেই মুক্তাঞ্চলের কর্মীদের

মনোবল বেড়ে গেল। ইতিপূর্বে প্রথম পর্যায়ের অ্যাকশনে তাঁরা ব্যর্থ হলেও, এবারের সাফল্যে তাঁরা সত্যিই গর্বিত। এখন থেকে সংবাদপত্রের পাতায় কোন অঞ্চলের নাম সর্বাগ্রে স্থান পাবে, সেই নিয়েই শুরু হল প্রতিদ্বন্দ্বিতা।

ভারত ছাড়ো আন্দোলনে মহিলারাও ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। সুরম্য মুখোপাধ্যায়, নির্মলা সান্যাল, রমারানি তা প্রমুখ এ বিষয়ে উল্লেখযোগ্য। স্বাধীনতা আন্দোলনে বর্ধমান জেলার নারী জাগরণের পথিকৃৎ সুরমা মুখোপাধ্যায় ছিলেন কাটোয়ার জননেতা ডা. গুণেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের সহধর্মিনী। স্বামীর সাহচর্যে সুরমাদেবীর মধ্যে দেশপ্রেম ও স্বাদেশিকতার আদর্শ সঞ্চারিত হয়। গান্ধিজির অসহযোগ আন্দোলন পর্যন্ত স্বামীকে গৃহান্তরালে স্বদেশীর কাজে সহযোগিতা করলেও, ১৯৩০-এর আইন অমান্য আন্দোলনের সময় থেকে তিনি প্রত্যক্ষ আইন অমান্য আন্দোলনে যোগ দেন। তাঁরই সম্পাদনায় ১৯৩০-এর জুন মাসে 'কাটোয়া মহকুমা রাষ্ট্রীয় মহিলা সমিতি' প্রতিষ্ঠিত হয়। মহকুমার নারী জাগরণের ক্ষেত্রে এই সমিতির অবদান অসামান্য। অগ্নিকন্যা নির্মলা সান্যাল ময়মনসিংহ জেলার নেত্রকোণার এক স্বাধীনতা-সংগ্রামী পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। ঝাউডাঙা নিবাসী ভোলানাথ সান্যালের সহধর্মিনী ছিলেন তিনি। ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে গান্ধিজির আইন অমান্য আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে তিনি স্বাধীনতা সংগ্রামে জড়িয়ে পড়েন। এই সময় তিনি কাটোয়া মহকুমা রাষ্ট্রীয় মহিলা সমিতির সহ-সম্পাদিকা ছিলেন। ১৯৩০-এর আন্দোলনে কাটোয়া মহকুমায় কংগ্রেস কর্মীদের গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে মহিলাদের দ্বারা আয়োজিত প্রতিটি শোভাযাত্রা, পিকেটিং ও জনসমাবেশের নেতৃত্বে ছিলেন তিনি। কাটোয়া মহকুমার বিভিন্ন গ্রামের মহিলা সমিতিতে তিনি ছিলেন প্রধান বক্তা। ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দে পুলিশি নিষেধাজ্ঞা অবমাননার দায়ে তার ওপর ১৪৪ ধারা জারি করা হয়। এই সময় বর্ধমান জেলা থেকে বহিষ্কারের আদেশ দেওয়া হয়। ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দে তিনি বর্ধমান জেলা কংগ্রেসের সহসভাপতি নির্বাচিত হন। ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দে অনুষ্ঠিত বহরমপুর প্রাদেশিক রাজনৈতিক সম্মেলনে নির্মলা সান্যাল তাঁর কাজে বাগ্মিতায় সম্মেলনে উপস্থিত স্বাধীনতাকর্মীদের মধ্যে বিশেষ উদ্দীপনার সঞ্চার করেছিলেন। ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দের ১০ মার্চ কাটোয়া থানা দখলের অপরাধে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। ১৯৩৩-এর ৯ সেপ্টেম্বর হেলারাম চট্টোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে হাটগোবিন্দপুরে সর্বপ্রথম বর্ধমান জেলা কৃষক সমিতির যে কার্যনির্বাহক কমিটি গঠিত হয়, নির্মলা সান্যাল ছিলেন তার একমাত্র মহিলা সদস্য। আর এক নারী স্বাধীনতা-সংগ্রামী রমারানি তা ১৯১০ খ্রিস্টাব্দে খণ্ডঘোষের কৃষ্ণপুর-কুকুরাতে জন্মগ্রহণ করেন। মাত্র ১৪ বছর বয়সে তাঁর সাথে বিবাহ হয় বিপ্লবী দাশরথি তা-এর। কলকাতায় আহিটিটোলায় মুক্তারাম বাবু স্ট্রিটে স্বামীর সাথে আত্মগোপন করে থাকতেন। বর্ধমান, বাঁকুড়া ও হুগলি জেলার বিপ্লবীরা এই বাড়িতে আশ্রয় নিতেন। রমারানি তাঁদের খাওয়ানোর ব্যবস্থা করতেন। দাশরথি তা সম্পাদিত 'দামোদর' পত্রিকা প্রকাশের পর বিপ্লবীদের হাত দিয়ে তা বিভিন্ন স্থানে পাঠানোর ব্যবস্থা করতেন রমারানি। ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দে রায়না থানার আনগুনা গ্রামে মহিলা বিপ্লবীদের সভা হয়, তাতে সম্পাদিকার কাজ করেন রমারানি। ১৯৪২-এর আন্দোলনে খণ্ডঘোষ, রায়না ও জামালপুর থানার বিপ্লবীরা দক্ষিণ দামোদরে জাতীয় সরকার গড়ার উদ্যোগ নিয়েছিল। তার পুরোভাগে ছিলেন রমারানি ও দাশরথি। ২০১২ খ্রিস্টাব্দের ৯ ডিসেম্বর রমারানির মৃত্যু হয়। এছাড়াও বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য স্বাধীনতা-সংগ্রামী হলেন গোলাপসুন্দরী দেবী, কুঞ্জনলিনী দাসী, হেমনলিনী দেবী, গিরিবালা দেবী, সরোজবাসিনী চৌধুরী, অনিলা দেবী, কিরণবালা দেবী, বাসন্তীবালা দেবী, সিন্ধুবালা দেবী, মনোরমা দেবী, যোগমায়া দেবী, বিধুমুখী সরকার, সরলাবালা দেবী, সরোজিনী দেবী প্রমুখ।

বহু আন্দোলনকারী গ্রেপ্তার হন। উল্লেখযোগ্য হলেন নরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, অম্বুজা ভূষণ বসু, প্রাণতোষ বসু, প্রিয়গোপাল মুখোপাধ্যায়, রতনমণি বন্দ্যোপাধ্যায়, গৌরগোপাল সরকার, নারায়ণ চৌধরী, যাদবেন্দ্রনাথ পাঁজা, আব্দুস সাত্তার, ফকিরচন্দ্র রায়, অন্নদাপ্রসাদ মণ্ডল প্রমুখ। ফকিরচন্দ্র রায় দুই বছর কারাদণ্ড ভোগ করেন।

তথ্যসূত্র

১. অমলেন্দু দে, *বাংলায় ভারত* ছাড়ো আন্দোলন, কলকাতা, ২০০৩
২. প্রবোধ মট্টোপাধ্যায়, দুর্গাপুরের ইতিহাস, কলকাতা, ১৯৯১
৩. সর্বজিৎ যখ (স.), *বর্ধমান জেলার নারী ইতিহাসের সন্ধানে*, বর্ধমান, ২০১১
৪. রতনলাল দত্ত, স্বাধীনতা আন্দোলনের দিকদিগন্ত : পটভূমি বর্ধমান
৫. মানবেন্দ্র পাল, কালনার স্বাধীনতা আন্দোলন যতটুকু দেখেছি, অম্বুকণ্ঠ, একবিংশ বর্ষ, শারদ সংখ্যা, ১৪০৪
৬. পূর্ণেন্দু সিংহ, স্বাধীনতা আন্দোলনে রানিগঞ্জের বীর সংগ্রামীরা, 'আজকের যোধন', শারদ সংখ্যা, ১৯০৬
৭. বিভূতিভূষণ দত্ত, স্বাধীনতা আন্দোলনে কাটোয়া মহকুমা, কাটোয়া দর্পণ, শারদ সংকলন।
৮. প্রবীর চট্টোপাধ্যায়, শ্রদ্ধাঞ্জলি : স্বাধীনতা সংগ্রামী রাধারানি তা, বর্ধমান উৎসব স্মরণিকা, সম্পাদনা : সর্বজিৎ যশ ও অনির্বাণ বিশ্বাস

শারদ শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন

নিউ মা মনসা ইন্ডাস্ট্রি

পোঃ সুরেশ দেবনাথ

প্রসিদ্ধ লুঙ্গি প্রস্তুতকারক

গ্রাম : ভাণ্ডারটিকুরী, পোঃ পূর্বস্থলী, থানা : নাদনঘাট, পূর্ব বর্ধমান

Sl. No. 1

গ ল্প

দুর্গের শেষ প্রহরী

গৌতম চট্টোপাধ্যায়

কাজলদা, কাজল ঢালি। আমার চেয়ে বয়সে চার-পাঁচ বছরের বড়ো। শুনেছিলাম, খুব মন দিয়ে পড়াশুনো করত না। কৃষ্ণনগরের কোথায় একটা, ছিল তার বাড়ি। থাকত দেশবন্ধু হস্টেলে। খেতে খুব ভালোবাসত আর দেহচর্চা করে চেহারাটা বেশ 'বাঁটুল দি গ্রেট'-এর মতো বানিয়েছিল। এও শুনেছিলাম, ওরা খুবই গরিব পরিবারভুক্ত। ওর এক মেশোমশাই ওকে ডাক্তারিতে ভর্তি করিয়েছিলেন। প্রথম তিন বছর মন দিয়েই পড়াশুনো করে সব কটা পরীক্ষা ভালোভাবেই পাশ করেছিল কাজলদা। যারা ওর সহপাঠী তাদের কাছেই এও শুনেছিলাম ওর মেশোমশাই এক পথ-দুর্ঘটনায় মারা যান। কাজলদা অসহায় অবস্থায় সব দেখেছিলেন। বন্ধু-বান্ধবেরা চাঁদা তুলে সৎকারের ব্যবস্থা করেছিল। নিঃসন্তান মেশোমশাইয়ের মুখে আগুন দিয়ে পুত্রের কাজ করেছিল কাজলদা। আন্তঃকলেজ দেহসৌষ্ঠব প্রতিযোগিতায় বার-কয়েক প্রথম পুরস্কার জেতা কাজলদা এরপরই নিজেকে গুটিয়ে নেয়। নিদারুণ অর্থকষ্ট তাকে তাড়া করে ফিরতে শুরু করে। পড়াশুনোর খরচ জোগাড় করা, খাই-খরচার ব্যবস্থা করা যেখানে দুঃসহ বোঝা, সেখানে দেহ-চর্চা বিলাসিতা মনে করে কাজলদা ব্যায়াম করা ছেড়ে দেয়। কাজলদার বন্ধুদের মধ্যে ছিলো সৌরাংশুদা, অ্যাডভোকেট স্নেহাংশু কান্ত আচার্য চৌধুরীর ছেলে। সৌরাংশুদা শুধু বড়ো ঘরের ছেলেই নয়, তার হৃদয় ছিলো বিরাট বড়ো।

কাজলদার এই খারাপ সময়ে সৌরাংশুদা দুহাত বাড়িয়ে ওকে আগলে রাখতে শুরু করল। ওকে ওই বদ্ধ পরিবেশ থেকে সরিয়ে ওর মনটাকে অন্যত্র স্থাপন করার কাজে লেগে পড়ল সৌরাংশুদা। ওকে নিয়ে কাস্টমস্ ক্লাবে গুরুবক্স সিং-এর কাছে গেল। কাজলদা তো হকি কোনোদিন খেলে নি। গুরুবক্স সিং দয়াপরবশত ওকে 'গোলকিপার' খেলাতে রাজি হলেন। ওকে খেলার নিয়মকানুন শিখিয়ে দিলেন। তখন অফ সিজন। প্রতি রবিবার সৌরাংশুদা কাজলদাকে নিয়ে ময়দানে কাস্টমস্ টেন্টে যেতেন। সকাল-সকাল গোলকিপার সেজে ধরাচূড়ো পরে গোলপোস্টের নিচে দাঁড়িয়ে পড়তো কাজলদা। হাতের হকিস্টিক প্রথম প্রথম ব্যবহার ঠিক মতো করতে পারতো না কাজলদা। গুরুবক্স সিং অর্ডার দিয়ে ময়দান মার্কেটের দাশু গুপ্তদের দোকান থেকে ওর জন্য একজোড়া গোলকিপার হকি বুট কিনে দেন। হাতদুটির প্রকৃত ব্যবহার শেখান। প্রতি রোববার ঘণ্টাখানের প্র্যাকটিশ্। সৌরাংশুদা নিজে হকি খেলতে পারতেন। একবার সৌরাংশুদা আর পরের বার গুরুবক্স সিং 'ডি'-এর বিভিন্ন কোণ থেকে জোরে জোরে 'হিট', 'স্কুপ', 'পুশ' করে যেতেন আর কাজলদা সেগুলিকে আটকাতো। কাস্টমস্

টেন্টেই চান্-টান্ সেরে টিফিন খেয়ে সৌরাংশুদার সাথে কাজলদা চলে আসত দেশবন্ধু হস্টেলে। শর্ত অনুযায়ী প্রতি প্র্যাকটিশে হাজির থাকার জন্য পঞ্চাশ টাকা কাজলদাকে দেওয়া হত। টাকাটা অবশ্য সৌরাংশুদাই জমা রাখত। বাকি কাজের দিনগুলোতে ওকে নিয়ে 'ক্লিনিকস' ক্লাসে যেত সৌরাংশুদা। আগলে আগলে রাখত। এই অভিভাবকত্বের জন্যই কাজলদার মনের মেঘ কেটে গেল। পরে গল্প শুনেছিলাম, সিজনে প্রতি ম্যাচে দুশো টাকা কাজলদা পেত, যথারীতি সৌরাংশুদার কাছে জমা। একটা মোহনবাগান ম্যাচে ইনামুর রহমানের পেনাল্টি স্ট্রোক পাখির মতো উড়ে সেভ্ করে কাজলদা তাক্ লাগিয়ে দেয়। কাস্টমস্ জিতেছিল ২-১ গোলে। গুরুবক্স সিং শিশুর মতো উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে নিজের পকেট থেকে দু হাজার টাকা উপহার দিয়েছিলেন কাজলদাকে সেদিন। সেবার সিজন শেষে কাজলদা গুরুবক্স সিং-কে প্রণাম জানিয়ে চলে এসেছিল ফাইনাল পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্য অফ্ সিজন প্রকেটিশে ছুটি নিয়ে। থিওরেটিক্যাল পরীক্ষায় ওকে পাশ করানো হয়েছিল। প্র্যাকটিক্যাল কিছু অংশে নম্বর বাড়িয়ে ওকে উতরে দেবার কাণ্ডারী ছিলেন অধ্যাপক বিমলেন্দু মুখোপাধ্যায়।

ইনটার্নশিপে, সেইকালে যারা বাড়ি থেকে যাতায়াত করে কাজ করত তারা পেত তিনশ তিন টাকা। কাজলদা দেশবন্ধু হস্টেলে থাকত, তাই পেত দুশ পচাত্তর টাকা। খাই-খরচা সৌরাংশুদাই দিতেন প্রতি মাসে। ওর টাকাটা জমতো। কিন্তু ওর প্রয়োজন সেই সময় অনেক টাকার।

বিলেত যাত্রার টাকা জোগাড় করার জন্য বিধান রায়ও একসময় কোলকাতায় ফাঁকা সময়ে 'বেবীট্যাক্সি' চালাতেন। গুরুবক্স সিং তার ভবানীপুরের দেশওয়ালি ভাই-বেরাদরের কাছে সুপারিশ করে ওকে অ্যাম্বাসাডর ট্যাক্সি চালানোর ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। ওর মাথায় ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন জীবনের মূলমন্ত্র, 'তুমি গোলকিপার— দুর্গের শেষ প্রহরী। আমৃত্যু তোমার লড়াই দুর্গরক্ষার। তোমাকে তোমার শেষবিন্দু রক্ত শরীরে থাকা ইস্তক লড়াই করে যেতে হবে, মনে রেখো। কাজেই কোনো কষ্টই কষ্ট নয়।' শুনেছিলাম, ইন্টার্নশিপ শেষে সৌরাংশুদার কাছ থেকে জমানো টাকা, প্রায় বারো হাজার টাকায়, কাজলদা তার ভীষণ আদরের ছোটো বোনের বিয়ে দিয়েছিল কাটোয়াতে। সমুদ্রগড়ের কাছে কোথাও।

সৌরাংশুদা ছমাস সার্জারি, ছমাস মেডিসেন হাউসস্টাফশিপ করে বিলেত যাবার জন্য প্রস্তুত। আর কাজলদা এক বছর মেডিসিনে হাউসস্টাফ। ইমারজেন্সিতে জুনিয়ার ও.ডি.-র কাজ করতে খুব ভালোবাসত। কারণ, ওই অর্থনৈতিক ইনজুরি রিপোর্ট করলে ষোল টাকা পাওয়া যেত। চার টাকা সরকারের ঘরে জমা দিয়ে বাকি বারো টাকা যে রিপোর্ট দিয়েছে তার। কাজলদা হাউসস্টাফশিপের মাসিক চারশো টাকা ছাড়াও আরো দু-একশো টাকা উপরি রোজগার করতো। স্নাতকোত্তর পড়াশুনোর দুঃস্বপ্ন সে দেখেনি। কিন্তু এভাবে চিরকাল তো চলে না।

অধ্যাপক বিমলেন্দু মুখোপাধ্যায় একখানা সুপারিশপত্র লিখে কাজলদাকে পাঠিয়ে দিলেন স্বাস্থ্যসচিবের কাছে। কাজলদার ইতিহাস-ভূগোল সব লেখা ছিলো নিশ্চয়ই সেই চিঠিতে। স্বাস্থ্যসচিব কাজলদাকে বর্ধমানে ভাতার স্বাস্থ্যকেন্দ্রে 'ইমারজেন্সি এম.ও.' পদে সরকারি ডাক্তার হিসেবে বহাল করলেন। কাজলদা নাচতে নাচতে চাকরিতে যোগ দিল। মাইনে সাড়ে সাতশো টাকা। কাছেই, একটু দূরে বোনের বাড়ি। আরামসে যোগাযোগ রাখা যাবে। বাবা-মা দুজনেই গত হয়েছেন, সুতরাং তার দেশের বাড়ি, কৃষ্ণনগরের পাট তো আগেই গুটানো হয়ে গেছে।

গঙ্গা দিয়ে জল বয়ে গেছে। সময় গড়িয়ে গেছে। আমরাও যার যার নিজস্ব জীবনযুদ্ধে জড়িয়ে গিয়েছি। কাজলদার খোঁজও রাখিনি। সৌরাংশুদা এম.আর.সি.পি করে বিলেতেই রেজিস্ট্রার।

আশি সালের গোড়ায় আর এক দাদার কাছ থেকে, হেমন্ত শাঁসমল, খবর পেলাম যে কাজল ঢালিকে উন্মত্ত জনতার হাতে প্রাণ দিতে হয়েছে। বিনা মেঘে বজ্রপাত!

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, কাজলদা ইমারজেন্সিতে কর্মরত ছিলেন। কোনো এর রোগীর আত্মীয়স্বজনরূপী উন্মত্ত জনতা যখন হাসপাতালে ভাঙচুর চালাতে শুরু করে, কাজলদা তাদের প্রতিরোধ করে একাই হাসপাতালের মেন গেটের বাইরে বের করে দেন, তারপর কোলাপসিবল গেট টেনে, দুহাতে শক্ত করে আঁকড়ে ধরেন, যাতে কেউ খুলতে না পারে। কোথায় দারোয়ান, কোথায় তালা খোঁজ করার সময় ছিল না।

প্রতিহত হবার প্রতিশোধ নিতে উন্মত্ত জনতা লাঠির দমাদম আঘাতেও কাজলদার হাতের বন্ধন আলগা করতে পারেনি। অতি উৎসাহী গুণ্ডার দল তখন কাজলদার দেহে পরপর কয়েক জায়গায় কোলাপসিবলের ফাঁক দিয়ে ছুরি চালিয়ে পেট ফাঁসিয়ে দেয়। কাজলদা মেঝেতে তাঁর নিজের রক্তের স্রোতে পড়ে যাবার আগে তাঁর হাতের বন্ধন খোলেন নি। দুষ্কৃতীরা পগারপার। কোলাপসিবল বন্ধ। কাজলদা রক্ত মাখামাখি মৃত কোলাপসিবলের ভেতরে। 'দুর্গের শেষ প্রহরী তার শেষ বিন্দু রক্ত দিয়ে দুর্গের রক্ষায় প্রাণ দিয়েছে।'

With best compliments from

SANKAR MAHADEV NURSERY

Accredited by National Horticulture Board (NHB), Ministry of Agriculture, Govt. of India

Purbasthali Rail Station (South Railgate), Purbasthali, Purba Bardhaman
E-mail : sankarmahadevnursery@gmail.com

Prop. Sankar Dutta

Sl. No. 8

স্টোরি রাইটার

গৌরী সেনগুপ্ত

তখনও খবরটা ঠিক মতো পৌঁছয়নি। গরফার বাই-লেনগুলো কেমন থমথমে। আলোক ঠিক ভোর পাঁচটায় বেরিয়ে পড়ে। চিত্রা ঘুম জড়ানো চোখে দরজাটা বন্ধ করতে এসে বলল—দেখো বেশি কিছু করতে যেওনা, তাড়াতাড়ি ফিরো। মুন্নির জ্বরটা এখনও আছে। আমি আজ একবার যাদবপুরের বাড়িতে যাব। মুন্নিটা কাল থেকে পিপিন পিপিন করে চলেছে। প্রিয়া মানে আলোকের বোন যাকে মুন্নি পিসি বলতে আটকে যেত তাই সে ওকে পিপিন বলে ডাকে। আলোক একটু হাসে, তারপর আবার মুন্নির কাছে গিয়ে কপালে হাত দিয়ে জ্বরটা বুঝতে চেষ্টা করে। অঘোরে ঘুমোচ্ছে ছ বছরের মেয়েটা। জেগে থাকলে দৌড়ে বেড়াত। যেন পৃথিবীটা ওর হাতের মুঠোর মধ্যে। যা চাইবে তাই যেন ও মুহূর্তে পেয়ে যাবে। এ দুদিন জ্বরে একটু ক্লান্ত। গভীর স্নেহে আলোক আলতো করে চুমু খায় ওর কপালে। তারপর চিত্রার দিকে তাকিয়ে বলে—ফেরার সময় ডাক্তারের কাছে হয়ে আসব। তুমি আজ আর বেরিও না।

তিনতলার ফ্ল্যাট থেকে আলোক নেমে আসে। নীচের গ্যারেজে রাখা স্ট্রিটটাকে নিয়ে বেরিয়ে যায়। সোজা চলে আসে ভবানীপুরে। সেখানেই জানতে পারে বছর কুড়ির তরতাজা মেয়েটাকে শ্বাসরোধ করে অর্ধমৃত অবস্থায় ফেলে গেছে দুষ্কৃতীরা, প্রাথমিক রিপোর্টে এমনটাই জানা গেছে। খবরটা সংগ্রহ করে আলোক সোজা অফিসে চলে যায়। সেখানে কিছু প্রয়োজনীয় কাজকর্ম সেরে চলে যায় লালবাজার। পুলিশ কমিশনার অশোক রায়ের ঘরে গিয়ে ঢোকে। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশ জানতে পারে মেয়েটা গতকাল ভবানীপুর থেকে টিউশন পড়ে ফেরার পথে কিছু মস্তান ছেলের কবলে পড়লে তাকে তারা ঘিরে ধরে। জোর করে তাকে একটা নির্জন স্থানে নিয়ে গিয়ে অত্যাচার করে, তারপর তাকে রাস্তার ধারে ফেলে দিয়ে চলে যায়। পুলিশ মেয়েটির পড়ার কোনো ব্যাগ খুঁজে পায় নি, তবে একটা ছেঁড়া ডায়েরি পেয়েছে, ডায়েরিতে কিছু পায় নি। মেয়েটির নামও জানা যায় নি। পুলিশের অনুমান মেয়েটি যাদবপুরের বাসিন্দা।

বেলা বারটায় আলোক লালবাজার থেকে বেরিয়ে আসে। গেটের মুখেই সুরেশ দত্তর সঙ্গে দেখা হয়। সুরেশ দত্ত যাদবপুর এলাকার একজন কাউন্সিলার। ভদ্রলোক নিজেই একগাল হাসিমুখে সামনে এসে দাঁড়াল। —কী স্যার, খবরটা তো আজ বেরিয়ে যাবে।

আলোক একটু হেসে পাশ কাটিয়ে চলে যেতে চাইল। কিন্তু সুরেশ দত্ত হাত দেখিয়ে বলতে লাগল—দাঁড়ান ব্রাদার, দাঁড়ান। কেস হিস্ট্রি তো অনেক আগেই জমা পড়ে গেছে বাবুদের কাছে। আর স্টোরিটা? ওটার মালিক তো আপনারা তাই না?

মুখের মধ্যে একটা ভাবলেশহীন ভঙ্গি। আলোক হাসতে হাসতে বলে—আরে সুরেশদা কী যে বলেন! আপনাদের দাক্ষিণ্যে তো আমরা বেঁচে আছি। ঠিক আছে ও নিয়ে আপনারা ভাববেন না।

সামনে এগিয়ে এসে সুরেশ দত্ত একটু

চাপা গলায় বলে—আরে না না ভাবছি না। তারপর একটু স্পষ্ট করে বলে—সামনের সপ্তাহে আপনাদের সিলেকশনটা বেরিয়ে যাবে। এবারেও দুজনকে বিদেশ পাঠাচ্ছি। আপনি তো আছেনই। চেক রেডি আছে।

আলোক একবার পেছনে ফিরে দেখে নেয়। তারপর হাত দেখিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে যায়।

২

নীচে এসে ভাবে—একবার যাদবপুরের বাড়িতে গেলে হতো। দিন দুয়েক হল মা বেনারস গেছে। গত সপ্তাহে আলোক দেখা করে এসেছে মায়ের সাথে। বাবার শরীরটা ভালো ছিল না। তারপর আর যাওয়া হয় নি। ছোটো বোন প্রিয়া ফোন করেছিল—বলেছিল, দাদা, এদিকে আসলে একবার ঢুকিস তো। আমার মোবাইলটা চুরি হয়ে গেছে, ডায়েরি করেছি। উত্তরে আলোক বলে—আমি কালকে নতুন একটা সেট নিয়ে যাব, তুই কিনিস না।

আলোক বাইকে স্টার্ট দেয়। সঙ্গে সঙ্গে হাউস থেকে থেকে কল আসে—কী, আসছেন তো মিস্টার মুখার্জি? জমা দিয়ে যান বিপোর্টটা।

—ও.কে—বলে আলোক ফোনটা নামায়। সেন্টারে পৌঁছে আলোক দেখে, সেখানে খুব ভীড়। ভীড়ের মধ্যে দূরে দাঁড়িয়ে আছে সাধন কর। বীভৎস ভীড়ের মধ্যে ওর কাছে যাওয়া অসম্ভব মনে করে আলোক সোজা চিফ রিপোর্টারের ঘরে গিয়ে ঢোকে। সাধন কর ওর পাড়াতুতো বন্ধু। দেখে মনে হল ওর চোখে-মুখে একটা উদ্‌ভ্রান্ত ভাব। কিন্তু আলোকের এখন রিপোর্টের দিকে মন। একটা এক্সক্লুসিভ খবর। রিপোর্টের স্টোরিটা ওদের মনের মতো করে জম্য দিতে পারলেই কেল্লা ফতে।

সেবার সাংবাদিক সম্মেলনে তথ্য সম্প্রচার মন্ত্রীর সাথে একান্তে কথা হচ্ছিল। —মি. মুখার্জি আপনাদের নিউজ চ্যানেলটা বেশ ভালো, খবরও বেশ এক্সক্লুসিভ, পরিবেশনাও ভালো হচ্ছে। এসবের দাম তো দিতে হবে। ঠিক আছে আপনারাও খাটুন, রিস্ক নিন, আমরা তো আছি আপনাদের জন্য।

মন্ত্রীর এহেন বাক্য আলোক ভালোভাবেই স্মরণে রেখেছে। একবার যদি সাংবাদিক নিধি বা সংবাদরত্ন জাতীয় একটা একটা খেতাব জুটে যায়। বড় হতে, নাম পেতে বা দু-একটা পুরস্কার পেতে কে না চায়।

সামনের চুলগুলো একটু এলোমেলো রেখে, দু-গালে রেখাঙ্কিত চাপ-দাড়িতে বেশ একটা টেকনিক্যাল ব্যক্তিত্বে ঘুরে ঘুরে ক্যামেরায় অনেক খবরের টেক্সচার গোছায় আলোক। সাংবাদিক দুলাল ঘোষ পাশ দিয়ে বেড়িয়ে যাচ্ছিল। ওকে বাইরেই বেশি যেতে হয়। কেননা বাইরে যাবার মতো একটা মানসিকতা ওর ভেতরে আছে। তাই ওকে কো-একসিকিউটিভ হিসাবে খুব একটা এক জায়গায় পাওয়া যায় না।

আলোক ডাক দিল—কী ঘোষ সাহেব, তুমি কি আবার টরেন্টো যাচ্ছো? আরে তোমার কেরলের বন্যার বিপর্যয় তো খুব ভালো কভার করেছ। বেশ এক্সক্লুসিভ ছবিও তুলেছিলে। ছবি তোলার সাহসও নিয়েছিলে।

ঠোঁটের কোণে একটু মৃদু হাসি নিয়ে দুলাল ঘোষ বলে—হ্যাঁ মুখার্জি, একটু রিস্ক ছিল বটে। জলের তোড়ে ধস নামছিল। তারপর খানিকটা দম নিয়ে দুলাল ঘোষ বলে—আচ্ছা মুখার্জি, কাল তো তোমার ভবানীপুর স্পট ছিল—না? তুমি কি অন স্পট স্টোরি সাজালে?—খুব প্যাথেটিক ঘটনা, মেয়েটার বাড়ি গিয়েছিলে? আমাকে ইন্টারভিউ নিতে বলেছিল। আমি দেখলাম তুমি আছ, ব্যাপারটা গুছিয়ে দেবে।

আলোক সঙ্গে সঙ্গে বলে—স্পটভিজিট করেছি। লালবাজারেও ঘুরে এসেছি। তবে ছবি তো সেভাবে নিতে পারিনি। দেখি হাউস কী বলে। মেয়েটা শুনলাম হসপিটালে ভর্তি আছে।

দুলাল ঘোষ কিছুটা অর্থপূর্ণ হাসি হাসতে হাসতে বলে—পেছনে দাদারা আছে—কিছু ভূষণ, রত্ন নিয়ে।

তারপর খানিক নিচু গলায় বলে—এডিটিং সাহেব তো দীপঙ্কর সেন, এ মানুষটাকে বশ করা সহজ।—উইশ ইউ গুড লাক। বলে বেরিয়ে যায় দুলাল ঘোষ।

ইতিপূর্বে আলোক অনেক সংবাদ সংগ্রহ করেছে। কিছু রিস্ক যেমন নিয়েছে আবার নেতাদের খুশি করে কিছু দক্ষিণাও পেয়েছে। এই খবরটা সংগ্রহের সময়ে আলোকের অসুবিধা হয়েছে এই যে হাউস থেকে।

৩

ফোন করা মাত্রই সে স্পট ভিজিট করতে পারেনি। তাই ওকে লালবাজার থেকে ঘটনার বিবরণ মিলিয়ে নিতে হয়েছে। আরও অসুবিধা হয়েছে কিছু মুখচেনা প্রভাবশালী লোক ঘটনাটা চাপা দিতে চাইছে। তাই সংবাদ স্টোরিটা অনেকটা নিজের দায়িত্বে থেকে যাচ্ছে। এইসব সাত-পাঁচ ভাবতে ভাবতে আলোক চিফ রিপোর্টার বাসু-সাহেবের ঘরে ঢোকে।

বাসু সাহেব মাথা নিচু করে কাজ করছিলেন। আলোক সামনে গেলে বাসু সাহেব ওকে দেখে বসতে বলেন। আলোক তার রিপোর্টটা জমা দেয়। ঘটনার বিবরণ জানায় এবং সেই সঙ্গে প্রভাবশালী ব্যক্তিদের চাপের কথাও বলে।

বাসু সাহেব মাথা নিচু করে কাজ করতে করতেই বলেন—মি. মুখার্জি, আমাদের একটা কথা সিরিয়াসলি মনে রাখতে হবে। আমরা আগে ব্যবসায়ী, পরে রিপোর্টার। তাই স্টোরির মধ্যে কতটা অন্ধকার রাখবো কতটা আলোকপাত করবো ভাবতে হবে বৈকি।

আলোক বলে—স্যার, যতটা জেনেছি তাতে মনে হচ্ছে ক্রিমিনালরা প্রভাবশালী ছত্রছায়ায় আছে, তবু যতটা সামলানোর সামলে নিয়েছি। আজ দুপুরে 'দৃষ্টি' চ্যানেলে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা হয়েছে। আলোচকরা তাঁদের মতামত জানিয়েছেন। শুনলাম আজই প্রতিবাদ-মিছিল ডাকবে বলেছে। আমি স্যার আমার কালেকশন জমা দিলাম, বিকেলের দিকে ফ্ল্যাশ হয়ে যাবে নিশ্চয়ই।

টেবিলের ফোন বেজে উঠল। বাসু সাহেব কলিংবেল টিপলেন, জনার্দন ঢুকে খাতা দিয়ে গেল।

বাসু সাহেব মৃদু হেসে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন, বাইরের দিকে এগিয়ে গেলেন। আলোক পেছন পেছন হাঁটতে শুরু করল।

বাসু বলতে বলতে চললেন—দেখুন মুখার্জি, আমরা এমন কিছু বলবো না যাতে কেবল পাবলিক গসিপ হয়। নিপাট সত্যকে হাইলাইট করা হয়ত পুরোপুরি সম্ভব হয় না, তবে এমনভাবে আড়াল করবো না যাতে আমরাই বে-আব্রু হয়ে পড়ি। অতএব—অর্থপূর্ণ দৃষ্টিকে হাসতে হাসতে করিডোর পার হয়ে চলে গেলেন মি. বাসু।

স্কুল থেকে ফিরে চিত্রা একটু ক্লান্ত ছিল। দুপুরে আলোকের বাড়ি আসার কথা ছিল, আসতে পারেনি। ফোন করে জানিয়েছে দুপুরে আসা হবে না। মুন্নিটা দিন-তিনের জ্বরে ভোগার পর আজ বিছানায় বসে কথা বলছে।—মাম স্কুলে যাব না? দেবীদিদি তো এসেছে।

দেবী বাড়ির সারাদিনের কাজের মেয়ে।

মুন্নির দেখাশোনা করে। রাতে ওর দিদি এসে ওকে নিয়ে যায়—ওর দিদি জবা চিত্রাদের ওপরের ফ্ল্যাটে কাজ করে। জবাকে বলেই চিত্রা মুন্নিকে দেখাশোন করার জন্য ওকে বহাল করেছে। দেবী মুন্নিকে পার্কে নিয়ে যাওয়া, স্কুলে পৌঁছানো, বাসে তোলা ইত্যাদির কাজ করে। মুন্নি দেবীকে একজন পরম বান্ধবী হিসাবে ধরে নিয়েছে। তাই দেবীও ওকে ছেড়ে থাকতে পারে না। মুন্নির বয়স সাত, আর দেবীর হয়তো তেরো। ওরা পরস্পরের খুব ঘনিষ্ঠ। চিত্রাও নিশ্চিন্ত দেবীর দিক থেকে মুন্নির।

৪

কোনো ক্ষতি হবার সম্ভাবনা নেই। দেবী গত দুদিন আসেনি। কোথায় ধর্মরাজের পূজো ছিল, সেখানে গিয়েছিল। সকালে এসেছে আর মুন্নিও ওকে দেখে স্কুলে যেতে চাইছে। চিত্রা মেয়েকে কেনোমতে নিরস্ত করে খাবার তৈরি করতে চলে গেল। টিভি সুইচ অন করে দিয়ে গেল, কার্টুন দেখতে মুন্নি খুব ভালোবাসে। মুন্নি নকলও করে সেগুলো সুন্দর। বেশ লাগে চিত্রার। এই মেয়ে বড় হবে, মানুষ হবে তারপর ভবিষ্যৎ তৈবি হবে—এইসব ভেবে মাঝে মাঝে উৎকণ্ঠা হয় চিত্রার। এ সময়ে পরিবেশ, পরিস্থিতি এবং এক অংশের মানুষের চরিত্র যা হচ্ছে তা এখন সাধারণকে শুধু ভাবাচ্ছে না, হতাশার অন্ধকারে ডুবিয়ে দিচ্ছে। সেদিন আলোককে তাই বলছিল চিত্রা—হ্যাঁ গো, মুন্নির পড়াশোনার ব্যাপারে এখন থেকে সিরিয়াস হও। তা না হলে তো মুস্কিল।

আপাতত চিত্রা মুন্নিকে সিটির মধ্যে টাইনিটস নামে একটা ইংলিশ মিডিয়ামে ভর্তি করেছে। এখন পাল্লা দিতে গেলে যেসব তথাকথিত বড় বড় স্কুলগুলো আছে সেখানে নয়-দশ লাখ টাকা খরচ করে ভর্তি করতে হবে। দিন যত যাচ্ছে পরিস্থিতি ক্রমেই জটিল হয়ে উঠছে। বাইরে কলিং বেল বেজে উঠল। চিত্রা দেওয়ালের দিকে তাকাল—সাতটা বেজে গেছে। দরজা খুলে দিল। আলোক প্রতিদিনকার মতো হাতে একটা প্যাকেট নিয়ে সোফায় বসে পড়ে। তারপর ডাকে—সোনা মা—। অমনি মুন্নি ছুটে এসে ওর প্রাপ্যটা বুঝে নেয়, সেই সঙ্গে কিছু আর্জিও জানায়। আজ যেমন বলল—বাবাই, পিপিনের কাছে যাব।

আলোক মুন্নির গায়ে হাত দিয়ে জ্বরটা চেক করে। বলে—না, জ্বরটা ছেড়ে গেছে। তারপর বলে—আজ আর হল না, পিপিনের পড়ার ডেট, কালকে দেখবো'খন। তারপর চিত্রাকে বলে—ও বাড়িতে যোগাযোগ করেছিলে? চিত্রা বলে—না না ফোন কে ধরবে? বাবার তো ওঠা-বসার শক্তি নেই। মা গেছে মামাবাড়ি বেনারস। প্রিয়া আর রান্নার মাসি। প্রিয়া পড়তে গেছে। রান্নার মাসি রান্না করে চলে গেছে।

আলোক একটু চিন্তায় পড়ল।

একটু পরেই মোবাইল বেজে উঠল। চিত্রাই কলটা রিসিভ করল—হ্যালো মা, এই তো তোমাদের কথা হচ্ছিল তুমি কদিন বেনারসে থাকবে? মামাকে নিয়ে ফিরবে তো। এখানেই চলে আসবে সোজা। মুন্নির জ্বর তাই ও-বাড়িতে যোগাযোগ করতে পারছি না—প্রিয়া ল্যান্ডফোন ধরছে না। ওর মোবাইলটা হারিয়ে ফেলেছে। মা, তুমি একবার ফোন করে দেখ না। আমার এখানে টাওয়ারের গণ্ডাগোল। কোনো ফোনই ঠিক মতো পাচ্ছি না।

ওপার থেকে কথা এল—আমি দিন পাঁচেকের জন্য এসেছি। পরশুদিন ফিরব। তোমরা দিন-দুয়েকের জন্য চলে আসবে।

—ভাবলাম প্রিয়ার পরীক্ষা, ও ব্যস্ত আছে। আসবার সময় অন্নকে বলেছিলাম, ওকেও ফোনে পাইনি। একটু আগে পেলাম—ও বলল—রাতের রান্না করে দুপুরেই চলে এসেছে। কি যে করি! খুব চিন্তা হচ্ছে। তোমাদের বাবার কাছে কে আছে কে জানে। সকালে আলোক যেন একবার যায়। গিয়ে আমাকে ফোন করে খবরটা যেন দেয়। এখন রাখলাম।

আলোক চিন্তা নিয়ে একটু টোস্ট আর চা খেয়ে শুয়ে পড়ল।

৫

খুব সকালেই তৈরি হয়ে আলোক ছুটে যায় যাদবপুরের ফ্ল্যাটে। ফ্ল্যাটের নীচে কেয়ারটেকার দয়ারাম শুয়ে থাকে। আলোক ওকে ডেকে দরজা খোলায়। সোজা ওপরে উঠে দেখে দরজা ঠেলতেই খুলে গেল। ভেজানো ছিল মনে হয়। বাবা মাটিতে পড়ে আছে। প্রিয়ার কোনো সাড়া পেল না। বাবাকে টেনে বিছানায় শোয়ায়। অস্পষ্ট কথায় বাবা ডুকড়ে কেঁদে ওঠেন—প্রিয়া কাল টিউশন পড়ে রাতে বাড়ি ফেরেনি। বাবা সারারাত চিৎকার করে অনেক ডেকেছেন। ফ্ল্যাটের কেউ শুনতে পায়নি। ইমিডিয়েট পাশের ফ্ল্যাটের লোকেরা অবশ্য কাল বাইরে ছিল।

আলোক বাইরে বেরিয়ে প্রথমেই থানায় ফোন করে। থানার আই সি গতকালের ঘটনার সাথে মিলিয়ে এস এস কে এমে খবর নিতে বলে—ওখানে বছর কুড়ির একটা মেয়ে রেপ্‌ড হয়ে ভর্তি হয়েছে। আলোক আর দাঁড়ায় না, সোজা হাসপাতালে চলে আসে। এমার্জেন্সিতে খবর নিয়ে ওয়ার্ডে ঢুকতে যায়। সাংবাদিক পরিচয় দিলেও সিস্টার ঢুকতে দেয় না—এক রকম জোড় করেই আলোক ঢুকে পড়ে।

চমকে উঠে দ্যাখে প্রিয়ার মুখটা কাপড়ে বাঁধা, চোখদুটো শুধু খোলা। কিছুক্ষণের জন্য আলোক জ্ঞানশূন্য হয়ে যায়। প্রায় হিতাহিত চিন্তা না করে আলোক চিৎকার করে ওঠে—ডক্টর আমি ওর দাদা। ও আমার একমাত্র বোন।

ওর আর্তনাদ শুনে ডাক্তার মাথা নিচু করে—দেখুন এই অবস্থায় কিছু লোক হাসপাতালে গতকাল গভীর রাতে মেয়েটিকে নিয়ে আসে। আপনি কোথায় ছিলেন? সারা রাতের পর এই ভোরবেলায় আপনি—একটা জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে অদ্ভুতভাবে তাকিয়ে থাকেন ডাক্তার।

অদ্ভুত একটা গোঙানি বিড়বিড়িয়ে বলতে থাকে আলোক—কার দল এর সাথে জড়িয়ে—কারা অপরাধীকে আড়াল করতে চাইছে—সব জানি। আমি তাদের সন্তুষ্ট করে গতকালই হাউস-এ স্টোরি জম্য দিয়েছি। এ জাতীয় অপরাধ আমি অনেকদিন ধরেই করে আসছি। আমার তো ক্ষমা নেই ডাক্তার।

আলোকের গলা শুনে চিনতে পেরেছে প্রিয়া। একটা প্রবল হেঁচকিতে গলার স্বর জড়িয়ে যায় মেয়েটার। তার মধ্যেই খুব অস্পষ্টভাবে বলতে থাকে—দাদা, তুই তো চিনিস সেই দালাল প্রলয় মণ্ডলকে। ছেড়ে দিস না দাদা, ছেড়ে দিস না।

দাঁতে দাঁত ঘসে আলোক বলে—দালাল পোষা প্রলয় মণ্ডল।

কর্তব্যরত ডাক্তার থমকে ওঠেন—একটু বাইরে যান প্লিজ। যা ঘটবার নয় তা ঘটে গেছে। শেষ অবস্থায় আর কিছুই করবার নেই...

আলোক কিংবর্তব্যবিমূঢ় হয়ে গেছে, কান্নাও আসছে না। গলার ওপরে চেপে ধরেছে কাউন্সিলার সুরেশ দত্তর থাবা। স্বগতোক্তিতে বলে চলেছে—আসল অপরাধী তো সে নিজেই। সত্যকে আড়াল করতে অনেক রকম মিথ্যাকে সাজাতে সাজাতে কখন যেন রাত নেমে গেছে। এক বড় রক্তাক্ত সূর্য কখন যে জিজ্ঞাসা করে চলে গেছে—আলোক, এত অন্ধকারে তুমি সঠিক স্টোরি লিখতে পারবে তো?

সকলকে শারদ শুভেচ্ছা জানাই

সকলের জন্য খাদ্য চাই,
যুদ্ধ নয়, শান্তি চাই।
জাত নয়, ধর্ম নয়, সম্প্রীতি বজায় রাখুন।

প্রশান্ত মণ্ডল

সম্পাদক, ডিলার অ্যাসোসিয়েশন

জামুড়িয়া ব্লক, চলভাষ : ৯০০২৪৬৬৪১৯

Sl. No. 117

আয়ুধ

কাকলি ঘোষ

ফিতে ছেঁড়া হাওয়াই চটিটা কোনো রকমে টানতে টানতে বাড়ি পর্যন্ত আসে বিকাশ। বাজারের মালটা রান্নাঘরের সামনে একফালি বারান্দায় নামিয়ে হাঁকে—কই গো বাজারটা নাও।

কলতলায় হাতের কাজ সারছিল বিমলা। সেখান থেকেই চেঁচিয়ে ওঠে—এনেছ তো কটা বুড়ো পটল আর কুমড়ো, তার আবার বাজার। এক মাস হয়ে গেল একটা মাছের আঁশও পেটে পড়ে নি।

—হ্যাঁ, চাল জোটে না আর মাছ খাবে! যাও না, বাপের বাড়ি গিয়ে মাছ খাওনা যত খুশি।

—আমি খাব না। তোমার ছেলেদুটো তো খেতে পারবে। কিন্তু সে পাট কি রেখেছ? গুষ্টিসুদ্ধ লোকের সঙ্গে ঝগড়া করে রেখেছ।

—হ্যাঁ আমি তো আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশীর সঙ্গে সদ্ভাব রাখিনে। তুমি তো সদ্ভাব রেখেছ। যাও না কোনো একটা কাজ জুটিয়ে নাও না। দিনরাত খোঁটা না দিয়ে সংসারের কিছু সুরাহা কর।

রাগে জ্বলে ওঠে বিমলা—হ্যাঁ, অমন চলতি বই-এর দোকান ঘোচালে, এবার বউ-এর রোজগারে খাবে।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ আমি আর কী খাই, তোমাদের হাঁ মুখ ভরতেই আমার দিন চলে যায়।

বিকাশ গামছাখানা নিয়ে কলঘরে চলে যায়। দাদুর আমলের একতলা বাড়ি। দেওয়ালের পলেস্তারা খসে গেছে জায়গায় জায়গায়। রান্নাঘরের মেঝেতে বড় বড় গর্ত। কোণের ঘরটা বই-এ ঠাসা। পুরনো নতুন বইয়ের মেলা। মন খারাপ লাগলে বিকাশ মাঝে মাঝে এই ঘরটায় এসে দাঁড়ায়। পুরনো বই-এর গন্ধ, এখানে ওখানে মাকড়সার জাল কাঠি দিয়ে সরিয়ে সরিয়ে বই-এর মলাট দেখে বিকাশ। ঐ তো রথে আরূঢ় কৃষ্ণ—পাঞ্চজন্য। ঐ তো হলুদ মলাটের কেরী সাহেবের মুন্সি, ঐ তো রাজনগর, ধূলোমাটি, গণদেবতা। ধুলো ঝেড়ে হাতে তুলে নেয় পথের পাঁচালি। এখানে এই ঘরে গভীর তমোনাশ জ্ঞানভাণ্ডার চোখ বুজে অপেক্ষা করে আছে স্বপ্নের রাজকুমারের, যে রূপোর জিয়নকাঠি এনে ছুঁইয়ে দেবে, আবার তার বইগুলো ঝকঝকে কাঁচের আলমারিতে সারি সারি হয়ে হেসে উঠবে। বইগুলোর ধুলো ঝাড়তে ঝাড়তে বিকাশ ভাবে—কত বছর হলো তার দোকানটা বন্ধ। তা প্রায় দশ বছর হবে। কাকাদের সাথে আইনের লড়াই চালাতে চালাতে সর্বস্ব গেছে। বউ-এর গয়না, দেশের বাড়ির আট বিঘে জমি, এমনকি এই বসত বাড়িও বন্ধক পড়েছে।

—বাবা, এই বই-এর ঘরে রোজ এসে তুমি কী কর গো। আট বছরের পল্টু দরজার বাইরে থেকে উঁকি দেয়।

—আয়, ভেতরে আয়। দেখবি এখানে একটা আলাদা পৃথিবী লুকিয়ে আছে। এখানে এলে আলাদা একটা দেশে চলে

আসবি।

—কোন দেশ বাবা—ব্যাঙ্গমা, ব্যাঙ্গমী, স্পাইডার ম্যানের দেশ?

—হ্যাঁরে এক জাদুর দেশ। দুই মলাটের ভেতরে ভরা এক আশ্চর্য রসে টইটুম্বুর দেশ।

—বাবা, এই বইয়ের ঘরে তুমি সব সময় তালা দিয়ে রাখ কেন? আমার খুব ইচ্ছে করে এঘরে আসতে।

—তোর ভালো লাগে এই ঘরটায় আসতে? বেশ আমার সঙ্গে আসিস।

—না বাবা, আমি একা একা আসব। বইদের সঙ্গে গল্প করব।

—না রে পল্টু। তুই বড়ো হতে হতে নিশ্চয়ই আমরা আমাদের দোকানটা খুলতে পারব। তখন তুই কাউন্টারে বসবি। দোকানের ভিড় সামলাবি। যেমন আমি সামলাতাম।

ছেলের চুলগুলো এলোমেলো করে বিকাশ ঘর থেকে বেরিয়ে আসে। এক চোখ স্বপ্ন বাসাবাঁধা থাকে মনে।

□

বৈশাখের চড়া রোদে আর বসে থাকা যায় না। তিনটে বেজে গেছে তবুও রোদ এখনও কত চড়া। সামনের কাপড়ের চাঁদোয়াটা আর একবার ঠিক করে দেয় বিকাশ। বন্ধ দোকানের শাটারটা দেখে চোয়াল শক্ত হয়ে ওঠে বিকাশের। দোকানের সাইনবোর্ডে 'জাগরী' নামটা আবছা হয়ে আসছে। ফুটপাতে বইগুলোর ধুলো আর একবার ঝেড়ে নেয়। আজ দশ বছর এই বন্ধ দোকানের সামনে ফুটপাতে বসে বই বেচছে। প্রতিদিন হাজার যন্ত্রণার মধ্যে নতুন করে প্রতিজ্ঞা করে হার না মানার। পাঁচটার মধ্যে দোকান তুলে নিতে হবে, আজ উকিলের কাছে যেতে হবে। পাঁচ হাজার টাকা জোগাড় করতে হবে। বিয়ের যৌতুক দেওয়া ঘড়িটা বিক্রি করে হাজার দুয়েক টাকা হয়েছে, বাকি তিন হাজার এখন কোথায় পাবে কে জানে?

পশ্চিম আকাশে মেঘ দেখে বইগুলো ব্যাগে ভরে বিকাশ। এখুনি ঝড় উঠবে। বলতে বলতে প্রবল ধুলোর ঝাপটা এসে লাগল বিকাশের চোখে মুখে। রাস্তা শুনশান। বড় বড় ফোঁটার সঙ্গে শিল পড়তে শুরু করেছে। বিকাশ বইগুলো ব্যাগে ভরে সামনের কাপড়ের দোকানে ঢুকে পড়ে।

বৃষ্টির ফোঁটাগুলো এক এক করে রুক্ষ মাটির বুকে ঝরে পড়ছে। মাটির ভিজে সোঁদা গন্ধ বিভোর করে দেয় বিকাশকে। মনে হয় ওর রুক্ষ বুকে যদি এরকম আশার কণা ঝরে পড়ত।

—বিকাশ, ভেতরে এসে বোস।

সুধীরবাবু হাঁক পাড়েন।

—বইয়ের ব্যাগটা ভেতরে রাখ।

বিকাশ জামার হাতায় মাথা মুছতে মুছতে দোকানের ভেতরে আসে।

—বোস, বোস। এক কাপ চা খাও। তোমরা কী ছিলে আর কী হলে? এত বড় বইয়ের দোকান বন্ধ হয়ে গেল। নতুন বাড়ি করলে তাও মামলা চালাতে গিয়ে বিক্রি করে দিতে হলো।

—আর দাদা, সবই অদৃষ্ট। কাকারা হলেন গিয়ে পিতৃতুল্য, তাঁরাও ভাইপোর ভাতের থালায় হাত দিলেন। বিষয় সম্পত্তি এমনই এক জিনিস।

—হ্যাঁ ভাই, ও থাকলেও জ্বালা না থাকলেও জ্বালা। আজ উকিলের কাছে যাবে বলছিলে না? তা এই বৃষ্টি বাদলায় যাবে কী করে?

—নাঃ যেতে তো হবেই। মামলার দিন পড়েছে, কিছু তো দিয়ে আসতে হবে।

—কিছু সুরাহা হবে? না টাকাগুলো উকিলের পেটেই যাবে?

—জানি না দাদা। যুদ্ধে নেমে পড়েছি যখন লড়াই তো করতেই হবে।

বৃষ্টিটা ধরে গেছে। বিকাশ সন্ধের মুখে উকিলের বাড়ি পৌঁছায়। সাহাবাবু কোনো আশার কথা শোনাতে পারলেন না। এবারেও ওদের পক্ষে রায় যায় নি। উচ্চ আদালতে আপিল করতে হবে। অনেক টাকা লাগবে। এক মুহূর্তে বিকাশের পৃথিবীটা কেঁপে ওঠে। তারপর ভাবে, নাঃ সে হারবে না। এর শেষ সে দেখবে।

বাড়ির পথ ধরে বিকাশ। কী ভেবে গলির মুখে রতনদের বাড়িতে ঢুকে পড়ে। বস্তির এই অংশটা রাস্তার আলোয় আলো-আঁধারির খেলা খেলছে। আজ বোধ হয় পূর্ণিমা। ভাঙাচোরা টিনের চালের ঘরগুলোকেও চাঁদের আলোয় কেমন মায়াবী লাগছে। রতনদের বাড়ির গায়ে লাগোয়া পেয়ারা গাছটায় জ্যোৎস্না আর ল্যাম্পপোস্টের আলো লুকোচুরি খেলছে। হলদেটে আলোটা চাঁদের আলোয় যেন ভেসে যাচ্ছে। সাদা আলোয় গাছটা যেন একাই অন্ধকারের সঙ্গে লড়াই করছে।

—রতন, রতন বাড়িতে আছিস?

বিকাশের ডাক শুনে রতন বেরিয়ে আসে।

—দাদা, আপনি! আসুন আসুন। গরিবের ঘরে তাহলে পায়ের ধুলো পড়ল।

—রতন, তোমাকে একটা কথা বলতে এলাম। তোমার কথায় আমি রাজি। কাল থেকে বইয়ের ঝোলা কাঁধে তোমার মতো ট্রেনে ঘুরব। কেস লড়ব। আমি আমার স্বপ্নের 'জাগরী' আবার খুলব।

রতন আনন্দে বিকাশের হাত জড়িয়ে ধরে।

□

বাড়ি ঢুকতে ঢুকতে রাস্তা থেকে ডাক পাড়ে বিকাশ—কই রে পল্টু, মিলি কোথায় গেলি সব...

বিমলা রান্নাঘর থেকে চেঁচায়—কী এমন রাজকর্ম করে এলে যে বাড়ি মাথায় করে চেঁচাচ্ছ?

—রাজকার্য করে এলাম না। কাল থেকে রাজকার্য করব। দাও তো হারিকেনটা দাও তো। ও ঘরটা একটু খুলি। আমার বই-এর ঘরে তো একটা বিজলি বাতিও দিলে না।

—হ্যাঁ, ইলেকট্রিকের বিল দিতে পারেন না আবার বইয়ের ঘরে বাতি জ্বালাবেন? তা আলো নিয়ে কী করবে শুনি?

—বই বাছব, বই। কালকে ট্রেনে হকারি করতে নিয়ে যাব।

—কী, তুমি হকারি করবে? আর কত নিচে নামবে? কত সাধ ছিল... বাবা কত কষ্ট করে বিয়ে দিলেন...। কী ছেলের হাতেই পড়লাম বাবা।

পল্টু, মিলি বিকাশের সাথে সাথে বই-এর ঘরে ঢোকে। বাবা, এই নাও—চাঁদের পাহাড়, পথের পাঁচালি..., গ্যাংটকে গণ্ডগোল...

ধুলো মাখা বইগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে উল্লাসে ফেটে পড়ে বিকাশ—না, সে হারেনি। হারতে পারে না। এই তো যুদ্ধক্ষেত্রে সে নিরস্ত্র নয়। এই তো ঝকঝকে শত শত আয়ুধ। সে জিতবে। হাজার বছরের ইতিহাস নিয়ে, অজস্র অনুভব নিয়ে, তীক্ষ্ণ জিজ্ঞাসা নিয়ে জেগে আছে তার আয়ুধ। বাঁচবে তার 'জাগরী'। বাঁচবে। নিশ্চয়ই বাঁচবে।

আঁধার পেরিয়ে

অনিল মাইতি

বাড়ি ফেরার বাস ধরার জন্য দাঁড়িয়ে আছি বাসস্ট্যান্ডে। ঘড়ি দেখলাম। তখন প্রায় দুপুর বারোটা। বুঝলাম, আমার বাস স্ট্যান্ডে ঢুকতে এখনো প্রায় এক ঘণ্টা দেরি। একটু দূরে পরিচিত একজনকে দেখতে পেয়ে ডাকলাম তাকে। সে এলো। দুজনে গল্প করতে লাগলাম।

সামনে দাঁড়িয়ে একটা বাস। যাবে কাটোয়া। বোধহয় বাসটা ছাড়তে দেরি আছে। তাই দু-চারজন প্যাসেঞ্জার ছাড়া কেউ নেই বাসে। ওই বাসের জানালার ধারে বসে এক ভদ্রলোক, বৃদ্ধ। মাথার চুল সাদা, সাদা দাড়ি। একটা সাদা চাদড় তাঁর মাথার খানিকটা ঢেকে সামনের দিকে ঝুলছে। ভদ্রলোক আমার দিকে তাকিয়ে আছেন একদৃষ্টে। যেন আমার সারা শরীরটা তিনি জরিপ করছেন। হঠাৎই তিনি নেমে এলেন বাস থেকে। দাঁড়ালেন আমার সামনে। আমি কিছুটা অবাক হলাম। ভদ্রলোক আমার মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি আমাকে চিনতে পারলেন না ছোটোভাই?

'ছোটোভাই' শব্দটা আমার যেন খুব পরিচিত মনে হল। বললাম, আপনি—

মনে করে দেখুন, আমি আপনার সেই জেলখানার ফালতু আবদুল্লা। বললেন তিনি।

আমার মনে পড়লো বেশ কয়েক বছর আগের কথা। তার হাত দুটো ধরে পূর্বের সম্বোধনে ফিরে গিয়ে বললাম, তুমি আমাকে চিনলে কেমন করে?

কথায় মুর্শিদাবাদ জেলার টান মিশিয়ে সেও পূর্বের সম্বোধনে আবেগ জড়িত কণ্ঠে বললো, তোমাকে কি সহজে ভোলা যায় ছোটোভাই। তোমার পরামর্শেই তো বেঁচেছি আমি, বেঁচেই আমার সংসার।

বললাম, আমি!

অত্যন্ত জোরের সাথে সে বললো, হ্যাঁ তুমি। অনেকদিন পর আজ যখন তোমার দেখা পেয়েছি, তখন সব বলবো। আমি কিছুই ভুলিনি ছোটোভাই।

বললাম, আমি অবাক হচ্ছি এতবছর পরও তুমি কী করে চিনতে পারলে আমাকে।

তা পারবো না, একসঙ্গে ছিলাম প্রায় একমাস। কত কথা হয়েছে, গল্প হয়েছে। তা কি সহজে ভোলা যায়। বললো সে।

সে আরও বললো, তুমি যখন এই ভদ্রলোককে ডাকলে, তখন তোমার গলার স্বর শুনে নিশ্চিত হলাম, এ তুমি ছাড়া কেউ হতে পারে না। তাইতো নেমে এলাম তোমার কাছে। তবে এখন তোমার চেহারার অনেক পরিবর্তন হয়েছে। অবশ্য আমারও হয়েছে। এখন তোমার সেই পাত্‌লুনের পরিবর্তে পরনে ধুতি। মাথায় সেই একরাশ ঘন কালো চুলের পরিবর্তে পাতলা কাঁচা পাকা চুল। তোমার অনেক কিছু পাল্টে গেলেও পাল্টে যায়নি তোমার সেই গলার স্বর আর ডাগড় দুটি চোখ। যা আমার মনের মাঝে ছবির মতো আঁকা আছে।

তারপর সে আফসোস করে বললো, দুঃখ কী জানো ছোটোভাই, তোমার নামটাই আমি ভুলে গেছি। আসলে তোমার নাম ধরে তো কোনোদিন ডাকিনি।

আমি বললাম আমার নামটা।

এবার সে আমাকে জড়িয়ে ধরে বললো, আর কোনোদিন ভুলবো না তোমার নামটা।

তারপর আমার একটা হাত ধরে নিয়ে গেল চা খাওয়াতে। আমার সঙ্গে থাকা ব্যক্তিকেও।

চা খেতে খেতে সে বললো, জেলখানায় বসেই তোমার কাছে জেনেছিলাম, এই থানাতেই তোমার বাড়ি। কতবার গেছি এখান দিয়ে। নেমেছি এখানে। এদিক ওদিক তাকাতাকিও করেছি, যদি তোমার দেখা পাই। কিন্তু না, দেখা পাই নি। কাউকে যে জিগ্যেস করবো তারও তো উপায় ছিল না। কারণ তোমার নামটাইতো ভুলে গিয়েছিলাম।

জানতে চাইলাম, কোথায় গিয়েছিলে।

নাতনির বিয়ে হয়েছে জামালপুরে। গিয়েছিলাম সেখানে। আজ ফিরছি। সে জানালো।

১৯৬৭ সালে খাসজমির আন্দোলনে উত্তাল পশ্চিমবঙ্গ। সেই আন্দোলনের জেরে সাজানো মিথ্যা মামলায় গ্রেপ্তার হই আমরা চারজন। সেটা ১৯৬৮ সালের মার্চ মাস। আমাদের পাঠানো হয় বর্ধমান জেলে। তখনকার দিনে রাজনৈতিক বন্দিদের ফাইফরমাইস খাটার জন্য সাধারণ কয়েদিদের মধ্যে থেকে এক একজন এগিয়ে আসতো। (সরকারি কোনো নির্দেশ থাকতো কিনা জানিনা।) জেলখানার ভাষায় তাদের বলা হতো 'ফালতু'। আমাদের চারজনের জন্যও চারজন এগিয়ে আসে। আমার জন্য আসে ওই আবদুল্লা। আমার চেয়ে প্রায় দশ বছরের বড় ছিল বলে আমি ডাকতাম 'আবদুল্লাভাই' বলে। আর আমাদের চার জনের মধ্যে বয়সে আমি ছোটো ছিলাম বলে ও আমাকে ডাকতো 'ছোটোভাই' বলে।

অত্যন্ত নিরীহ গোবেচারা মানুষ ছিল আবদুল্লাভাই। কম কথা বলতো, সর্বদাই ও যেন কী ভাবতো, আর দীর্ঘশ্বাস ফেলতো মাঝে মাঝে।

জেলে আসার পর একজন রাজনৈতিক বন্ধু আমাদের জামা-কাপড়, লুঙ্গি, গামছা ও কিছু প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র দিয়ে যান। প্রতিদিন রাতে শোবার আগে এবং ভোরবেলায় ঘুম থেকে উঠে গলা ছেড়ে আমরা চারজন গান গাইতাম। আমাদের মধ্যে একজনের গানের গলা ছিল খুব ভালো। সে গাইতো—'কারার ওই লৌহ কপাট—ভেঙে ফেল কররে লোপাট...।' আমরা গলা মেলাতাম তার সাথে।

জেলখানায় কেটে গেল প্রায় একমাস। আজ সকাল থেকেই মায়ের কথা বারবার মনে পড়ছে। মনে পড়ছে, বাইরে থাকা সহযোদ্ধাদের কথা। তাই সকাল থেকেই মনটা কেমন উদাস হয়ে আছে। দিনটা ছিল চৈত্রমাসের অপরাহ্ন বেলা। বাইরে কোথাও ফুটেছে শিরিশ ফুল। দখিনা বাতাসে ভেসে আসছে তার মিষ্ট সুবাস। জেলখানার বাইরে একটা বড় শিমুল গাছে ফুটেছে ফুল। লাল ফুল। ভেতর থেকে তা দেখা যাচ্ছে। ভেতরেই টাঙানো হয়েছে ভলি খেলার নেট। অন্যদিন খেলতে গেলেও আজ গেলাম না। ওখান থেকে বেশ কিছুটা দূরে সরে গিয় বসলাম একটা গাছতলায়। গাছের ডালে বসে একটা কোকিল ডাকছিল আপন মনে। আবদুল্লাভাই এসে দাঁড়ালো আমার সামনে। বসতে বললাম তাকে। বসলো সে।

কদিন থেকেই ভাবছিলাম, আবদুল্লাভাই-এর কাছে জানতে চাইবো, তার মতো একজন নিরীহ মানুষ কী এমন অপরাধ করেছে, যার জন্য জেল হয়েছে তার? সেই কারণটা জানতে চাইলাম তার কাছে। প্রশ্ন শুনে সে তাকালো আমার মুখের পানে। তারপর মাথা হেঁট করে একটা ছোট্ট কাঠি কুড়িয়ে নিয়ে মাটিতে আঁচড় কাটতে কাটতে সে জানালো, আমাদের এক লপ্তে বিঘে তিনেক চাষের জমি আছে। আর আছে দশ বারো কাঠা ভিটে। ওই জমির ফসল থেকেই আমাদের সংসার চলে। আমি যখন ক্লাস নাইনে পড়ি তখন হঠাৎই বাবা মারা যায়। তারপর আর আমার লেখাপড়া হয়নি। বাবা বেঁচে থাকতেই দিদি আবিদার বিয়ে হয়ে গিয়েছিল। আমার বয়স যখন কুড়ি বছর, তখন মা আমার বিয়ে দিয়ে দেয়। একটি মেয়ে ছাড়া আর কোনো সন্তানাদি হয়নি আমাদের। মেয়ের বয়স যখন দশ এগারো তখন আবার আমার সংসারে নেমে এলো বিপর্যয়। মাত্র কয়েক দিনের জ্বরে মা মারা গেল।

এই পর্যন্ত বলে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে আবার সে আমার মুখের পানে তাকালো। তাকালো আকাশের পানে। তারপর আবার বলতে লাগলো, আমাদের গ্রামের এক সময়ের জমিদারের ছেলে যামিনী রায় ও তার সাঙাত রহমান সেখ এলো একদিন আমাদের বাড়িতে। তারা বললো, আমার ওই তিন বিঘে জমি তাকে বিক্রি করতে হবে। ওখানে সে রাইসমিল করবে। তার জন্য আমার জমির পাশেই সাধন দাসের দু বিঘে জমিও নাকি সে কিনেছে। আমার মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়লো। বললাম, ও জমি আমার মায়ের মতো। ও জমি আমায় ভাত জোগায়। আমি বেচতে পারবো না ও জমি। এই কথা শুনে যামিনী রায় তেলে বেগুনে জ্বলে উঠে হুঙ্কার দিয়ে বলে যায়, কোনো কথা সে শুনতে রাজি নয়। ও জমি তার চাই। আর কেমন করে জমি নিতে হয় তা সে জানে। আবার থামলো সে।

বললাম, থামলে কেন, বলো।

আবার সে বলতে লাগলো, তারপর কেটে গেছে বেশ কটা দিন। হঠাৎ একদিন সকাল বেলায় এলো যামিনী আর রহমান। সঙ্গে জন্য কয়েক ভাড়া করা লেঠেল। যামিনী একটা দলিল বার করে আমায় সই করতে বললো। আমি রাজি হলাম না। তখনই আমার ওপর লেলিয়ে দিল লেঠেলদের। তারা আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে বেধরক মারতে লাগলো। বাধা দিতে ছুটে এলো স্ত্রী সখিনা আর মেয়ে রাবেয়া। লেঠেলরা তাদের ওপর চালালো লাঠি। তারা দুজনই রক্তাক্ত হয়ে লুটিয়ে পড়লো মাটিতে। আমি চিৎকার করে তাদের দিকে যেতে চাইলে যামিনী ও তার দলবল আমায় টানতে টানতে নিয়ে গিয়ে তুললো একটা জিপে। জিপটা আগে থেকেই রাখা ছিল। আমায় নিয়ে গেল থানায়। সেখানে জানালো আমি নাকি আমার স্ত্রী ও মেয়েকে খুন করতে চেয়েছিলাম। তাই তারা আমায় ধরে এনেছে। থানার দারোগা কোনো কথা বলতে দিল না আমায়। উল্টে তার হাতেও জুটলো বেদম মার। তারপর আমাকে মার্ডার কেসের আসামি করে পাঠালো জেলে। আমি জানতেও পারলাম না আমার স্ত্রী ও মেয়ের কী হল। আজও জানিনা।

এই পর্যন্ত বলে সে হাউ হাউ করে কেঁদে উঠে বললো, আমার স্ত্রী আর ফুলের মতো মেয়েটা বোধহয় বেঁচে নেই ছোটোভাই।

আমি তার পিঠে হাত দিয়ে সান্ত্বনা দিলাম। বললাম, তোমার স্ত্রী এবং মেয়ে নিশ্চয় ভালো আছে।

তাই যেন হয় ছোটোভাই, আমি দিনরাত খোদার কাছে সেই মোনাজাতই করি।

জিজ্ঞাসা করলাম, কেউ তোমার খোঁজ

নিতে আসেনি?

কী করে আসবে, কেউতো জানেই না আমি কোন জেলে আছি।

আমি আবার তাকে প্রশ্ন করলাম, আমি অবাক হচ্ছি, তুমি এই জেলে কেন? তোমার তো তোমাদের জেলার জেলে থাকার কথা।

সে অনেক কথা। আমায় যখন জেলে পাঠালো তখন আমি খুবই আহত। আমায় ভর্তি করলো জেলের হাসপাতালে। কিছুটা সুস্থ হতেই দিল সেলে। কিছুদিন পর একদল কয়েদিকে পাঠালো এখানে। সেই দলে আমাকেও। কেন জানিনা। এই বলে সে একটা দমকা নিঃশ্বাস ফেললো।

মনে মনে ভাবলাম ওর স্ত্রীকে একটা খবর পাঠাতেই হবে।

ঘণ্টা বেজে গেল জেলখানার। দাঁড়ালাম লাইনে। গুনতি হয়ে গেল। গেলাম যে যার ঘরে। সে রাতে ভালো করে ঘুমোতে পারলাম না। চোখের পাতা জুড়তেই সামনে যেন ভাসছিল আবদুল্লভাইয়ের স্ত্রী ও মেয়ের রক্তাক্ত শরীরের না দেখা দুটি কাল্পনিক মুখ।

পরদিন সকালে ঘরের দরজা খুলে গেল। আবার লাইনে দাঁড়ানো, আবার গুনতি। গুনতির পর টিফিন খেয়ে সোজা গেলাম জেলারসাহেবের ঘরে। চেয়ে আনলাম একটা পোস্টাকার্ড। তারপর আবদুল্লাভাইকে পাশে বসিয়ে তার জবানীতে তার স্ত্রীকে লিখে দিলাম একটা চিঠি। লিখলাম, সে এখন কোন জেলে আছে, এখানে আসতে গেলে কীভাবে আসতে হবে। লিখে দিলাম চিঠি পাওয়া মাত্র সে যেন সত্বর তার সাথে দেখা করতে আসে। চিঠিটা দিলাম তার হাতে। সে পড়লো। তারপর তার কাছ থেকে তার স্ত্রীর ঠিকানা জেনে লিখে দিয়ে বললাম জেলারসাহেবের হাতে দিয়ে আসতে। তিনি সই করে স্ট্যাম্প দিয়ে পোস্ট অফিসে পাঠিয়ে দেবেন। সে যেন একটা আশার আলো দেখতে পেল।

ওদের জেলার গণ-আন্দোলনের নেতা যদুবাবুর সাথে এক সম্মেলনে এক ঘরে একদিন ও একরাত থাকার সুযোগ হয়েছিল আমার, সুযোগ হয়েছিল তাঁর অসাধারণ আলোচনা শোনার। মুগ্ধ হয়েছিলাম তাঁর আলোচনা শুনে। মনে পড়ছিল তাঁর কথা।

চিঠিটা জেলারসাহেবের হাতে দিয়ে এসে সে আবার বসলো আমার পাশে। আমি যদুবাবুর সমস্ত পরিচয় তাকে দিলাম। বললাম, তোমার স্ত্রী যখন তোমার সাথে দেখা করতে আসবেন, তখন তুমি তাঁকে যদুবাবুর সব পরিচয় দিয়ে তাঁর সাথে দেখা করে তোমার সব ঘটনা বলতে বলবে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস তিনি নিশ্চয় তোমাকে সাহায্য করবেন। তাঁকে কোথায় পাওয়া যেতে পারে তার সম্ভাব্য ঠিকানাও তাকে বললাম।

সে বললো, আমার স্ত্রী কি চিঠি পাবে?

বললাম, তুমি যদি ঠিক ঠিকানা বলে থাকো, তিনি নিশ্চয় পাবেন।

দিন কয়েক পর আমাদের তুললো কোর্টে। আমাদের জামিন মঞ্জুর হল, কিন্তু আমাদের রিলিজ অর্ডার জেলখানায় আসতে দেরি হওয়ায় সে রাতটাও আমাদের থাকতে হল ওখানে।

আমাদের জামিন হয়ে গেছে শুনে আবদুল্লাভাই হতাশ হল। ধরা গলায় সে বললো, আবার আমাকে এখানকার চোর-ডাকাতদের হাতে মার খেতে হবে। আমার হাত-দুটো ধরে জলভরা চোখে তার কাতর অনুরোধ, এখনো পর্যন্ত আমার খোঁজ নেবার তো কেউ নেই, তুমি যেন আমার খোঁজ-খবরটা নিও ছোটোভাই। ভুলে যেওনা যেন।

কথা দিলাম তাকে।

পরদিন সকালে একজন জেলকর্মী এসে আমাদের চারজনের নাম ডেকে বললেন, আমাদের রিলিজ অর্ডার এসে গেছে, এখনই বেরিয়ে যেতে হবে। আমরা আগের রাতেই আমাদের জামা-কাপড় গুছিয়ে রেখেছিলাম। ঘর থেকে বেরিয়ে আসতেই দেখি আবদুল্লাভাই দাঁড়িয়ে। তাকে একটা লুঙ্গি ও গামছা দিয়ে সান্ত্বনা দিলাম। আমরা বেরিয়ে আসছি, আমাদের পেছনে সেও আসছে। সেন্ট্রির তাড়া খেয়ে থমকে দাঁড়ালো সে। বেরিয়ে এলাম জেলের বাইরে। পেলাম মুক্ত বাতাস। ফিরে দেখলাম, গেটের অনেকটা পেছনে সে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে আছে আমাদের দিকে। একটু দাঁড়ালাম। দেখি সে চোখ মুছছে। জেল থেকে মুক্তির আনন্দ যেন নিমেষে ম্লান হয়ে গেল। এবার সেন্ট্রির তাড়া আমাকে। চলে আসতে হল সেখান থেকে। জেলখানার সীমানা-গেটের কাছে এসে আবার তাকালাম। দেখি, তখনও সে দাঁড়িয়ে আছে গরাদের ওপারে কিছুটা দূরে।

জেল থেকে ফিরে আবার জড়িয়ে পড়লাম আন্দোলনে। তার কথা বারবার মনে পড়লেও আন্দোলনের চাপে যাওয়া হচ্ছিল না। বড় অপরাধী মনে হচ্ছিল নিজেকে।

প্রায় মাস দেড়েক পর আমাদের মামলার দিন পড়লো। গেলাম কোর্টে। ঠিকই করেছিলন, আজ তাকে দেখতে যাবই। কোর্টের কাজ মিটিয়ে গেলাম জেল গেটে। নিয়ে গেলাম কিছু শুকনো খাবার। তার সাথে দেখা করার আবেদন জমা দিলাম। প্রায় আধঘণ্টা পর একজন জেলকর্মী এসে জানালেন, দিন দশেক আগে তার জামিন হয়ে গেছে। এই খবর শুনে আনন্দে বুকটা ভরে গেল আমার। ভাবলাম, নিশ্চয় ওর স্ত্রী চিঠি পেয়েছিলেন। নিশ্চয় তিনিই জামিনের ব্যবস্থা করেছেন। একদিন বিষাদভরা যে মন নিয়ে জেলগেট ছেড়েছিলাম, আজ সেখান থেকেই ফিরলাম এক অনির্বচনীয় আনন্দ নিয়ে।

তারপর কেটে গেছে প্রায় পঁচিশ বছর। এতদিন পর এই দেখা। ভেবে অবাক হচ্ছিলাম। এতদিন পরও কী করে ও আমাকে মনে রাখলো! আমি তো ওকে কিছু পরামর্শ আর একটা চিঠি লিখে দেওয়া ছাড়া কিছুই করি নি। তবু ও আমাকে—ভাবলাম কিছুক্ষণ।

আবার সে গড়গড় করে বলতে লাগলো—জেলখানা থেকে তুমি যে চিঠি লিখে দিয়েছিলে সেই চিঠি পেয়েই স্ত্রী এবং মেয়ে আমায় দেখতে আসে। আমি তাকে তোমার কথামতো যদুবাবুর সব পরিচয় দিয়ে তাঁর সাথে যে-ভাবেই হোক দেখা করে আমাদের সব কথা বলতে বলেছিলাম। বাড়ি ফিরে অনেক খোঁজাখুঁজির পর তাঁর দেখা পায় স্ত্রী সখিনা। সব শুনে যদুবাবুই আমার জামিনের ব্যবস্থা করেন।

তারপর একটু থামলো সে। তারপর সে জানালো, পাড়ার লোকজনই চিকিৎসা করিয়ে তার স্ত্রী ও মেয়েকে সুস্থ করে তুলেছিল।

এবার আমি জিজ্ঞাসা করলাম—তোমার জমির কী হল?

খুবই আনন্দের সঙ্গে সে বললো, সব ফিরে পেয়েছি ছোটোভাই, সব ফিরে পেয়েছি।

জানতে চাইলাম, কীভাবে?

সে বললো, জেল থেকে জামিন পেয়ে বাড়ি ফিরে দেখি আমার সব জমিটাই বেড়া দিয়ে ঘিরে ফেলেছে যামিনী রায়। দাঁড়ালাম জমির ধারে। চোখে জল

এলো আমার। তারপর পাড়ার লোকদের সাথে পরামর্শ করে আবার আমরা স্বামী-স্ত্রী দুজনই গেলাম যদুবাবুর কাছে। তিনি আমাদের দুজনকে পাশে বসিয়ে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে শুনলেন আমার কথা। তিনি ভরসা দিয়ে বললেন, খুব শিঘ্রই আমার বাড়ি আসবেন। বাড়ি ফিরে পাড়ার সকলকে জানালাম। তিনি যে আমার বাড়ি আসবেন, তা অনেকেই যেন বিশ্বাস করতে পারছিল না। কিন্তু তিনি এলেন পাঁচ দিনের মাথায়। সঙ্গে আরও দু-তিনজন। বসলেন আমার বাড়িতে। দেখলেন আমার জমির কাগজপত্র। তারপর পাড়ার দরগাতলায় বসলেন লোকজনদের নিয়ে। অন্য পাড়া থেকেও এলো কিছু মানুষ। সবার সাথে তিনি আলোচনা করলেন। আমার জমি যে যামিনী রায় অন্যায়ভাবে দখল করেছে, আমায় যে মিথ্যা মামলায় জড়িয়েছে, তা একবাক্যে সবাই স্বীকার করলো। সবাই এর প্রতিকার চাইলো। যদুবাবু বললেন, ওই জমি উদ্ধার করতে হবে। সবাই 'হ্যাঁ' বললো। দিন ঠিক হল। সেইদিন খুব সকালে এলেন তিনি। সঙ্গে আরও কিছু মানুষ। তাঁর ডাকে আশপাশের গ্রাম থেকেও এলো শ' খানেক লোক। পাড়ার যারা যামিনীকে ভয় পাচ্ছিল, লোকজন দেখে ভরসা পেয়ে সবাই সামিল হল সবার সাথে। এমনকি সেদিন যে লেঠেলরা আমার বিরুদ্ধে লাঠি ধরেছিল, তাদের কজনও এসে যদুবাবুর পায়ের কাছে লাঠি নামিয়ে রেখে অন্যায় স্বীকার করলো। সকলে মিলে জমির বেড়া ভাঙলো। জমির দখল পেলাম আমি। যদুবাবু এবার বললেন, এ জয় শুধুমাত্র আবদুল্লা সেখের নয়, এ জয় সমস্ত গরিব মানুষের জয়, জোট বাঁধা মানুষের জয়।

এই পর্যন্ত বলে একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে থামলো সে।

আমি বললাম, এবার নিশ্চয় খুশি হয়েছ তুমি?

একটা দম্‌কা নিঃশ্বাস ফেলে সে বললো, নিশ্চয় খুশী হয়েছি, কিন্তু যে ছিল আমার প্রধান শাক্তি ও সাহস সেই স্ত্রী সখিনা মারা গেছে বছর দুয়েক আগে। তার মৃত্যুর খবর পেয়েই ছুটে এসেছিলেন যদুবাবু। তার কবরে মাটি দিয়ে যান তিনি। সখিনাকে তিনি ছোটোবোনের মতো দেখতেন। প্রতি সন্ধ্যায় আমি মোমবাতি জ্বালাই তার কবরে।

সমবেদনা জানালাম তাকে।

ও যেন আমায় ছাড়তেই চাচ্ছিল না। বাস ছাড়তে যেটুকু সময় আছে সে উজাড় করে যেন সব বলে নিতে চাইছে। তাই সে আবার জানালো, গ্রামেই বিয়ে দিয়েছে মেয়ের। জামাই খুব ভালো। তার সংসারেই থাকে সে। বর্তমানে এক নাতি, এক নাতনি। নাতনির বিয়ে হয়ে গেছে। নাতি এখন যুবক। যদুবাবুই তার নাম রেখেছেন বরকত। ভাষা আন্দোলনের শহিদের নামে। সে এখন যদুবাবুর খুব কাছের সঙ্গী। তাদের এলাকার সব মানুষ এক ডাকে চেনে তাকে। সকলের আপদে-বিপদে, যে-কোনো সমস্যায় ঝাঁপিয়ে পড়ে সে। যেকোনো লড়াই-আন্দোলনের সামনের সারিতে থাকে সে। যদুবাবু খুব ভালোবাসেন তাকে।

নাতির বর্তমান ভূমিকার কথাগুলো খুব গর্বভরে জানালো সে। খুবই আবেগজড়িত কণ্ঠে সে জানালো, যদুবাবু আমাদের হিন্দু-মুসলমান সবারই যেন ঘরের মানুষ, আপনজন। এখন তাঁরও বয়স বেড়েছে, কিন্তু মনের জোড় তাঁর কমেনি সামান্যতম। এই বয়সেও তিনি বেশিরভাগ সময় ঘোরেন সাইকেলে। প্রায় দিনই সঙ্গে থাকে নাতি বরকত। তাঁকে আসতে দেখলে কাজ ফেলে মাঠ থেকে ছুটে আসে মানুষ। তাঁকে দাঁড় করিয়ে কুশল জিজ্ঞাসা করে, কোনো সমস্যা থাকলে তা জানায়। তিনিও সব শোনেন, পরামর্শ দেন। সবাই যেন তাঁর কাছে নতুন কিছু শুনতে চায়। অনেক কিছুর পরিবর্তন হয়েছে কিন্তু তিনি আছেন আগের মতোই। সবার বাড়িতেই তাঁর অবাধ যাতায়াত। আমার বাড়িতে এসে সেই আগের মতোই গুড়-মুড়ি খান, চা খান। কোনোদিন যদি দুপুরে এসে যান, ভাত না খাইয়ে যেতে দেয়না মেয়ে রাবেয়া।

বাস ছাড়বে, সময় হয়ে এলো। এবার প্রসঙ্গ পাল্টে সে বললো, ছোটোভাই, তোমার কথা আমি আমার মেয়ে, জামাই, নাতি এবং পাড়ার সবার কাছে বহুবার বলেছি, এখনও বলি। তুমি একবার অন্তত আমার বাড়িতে এসো। তুমি এলে সবাই খুব খুশি হবে, আনন্দ পাবে। তুমি যাবার আগে আমায় একটা চিঠি দিও, আমি তোমার জন্যে বাসস্ট্যাণ্ডে অপেক্ষা করবো।

এই বলে পকেট থেকে কাগজ বার করে আমার থেকে কলম চেয়ে নিয়ে লিখে দিল তার ঠিকানা। মুখে বলে দিল, কোন বাসে চেপে কোথায় নামতে হবে।

এবার বাস ছাড়বে। ধীরে ধীরে গিয়ে উঠলো বাসে। বসলো সিটে। জানালা দিয়ে মুখ বার করে বারবার সেই অনুরোধ, তুমি অবশ্যই যাবে ছোটোভাই। আমি তোমার আশায় পথের পানে চেয়ে বসে থাকবো।

বললাম, হ্যাঁ যাবো।

বাস ছেড়ে দিল। তখনও সে জানালা দিয়ে হাত বার করে নাড়তে লাগলো। আমিও হাত নেড়ে বিদায় জানালাম তাকে। দেখলাম, তার চোখে জল। আমার চোখের পাতাও গেল ভিজে।

এরপরও কেটে গেছে প্রায় কুড়ি বছর। না, আমি রাখতে পারিনি আমার কথা। আমি যেতে পারিনি তার বাড়ি। নানান ঘটনা-প্রবাহের জেরে আমার যাওয়া হয়নি। আজ ভাবলে নিজেকে বড় অপরাধী মনে হয়।

জানিনা আজও বেঁচে আছে কিনা আবদুল্লাভাই। আজকের এই ঝোড়ো হাওয়ায় তার তরতাজা জোয়ান নাতি বরকত নিশ্চয় সমস্ত প্রতিবন্ধকতাকে দুপায়ে মাড়িয়ে জনতার জোয়ারের সামনে শিরদাঁড়া সোজা করে নেতৃত্বের সারিতেই আছে। জানিনা, 'পরিবর্তনের' আবহে তাদের সেই জমি আবার বেদখল হয়ে গেছে কিনা।

আজও যখন তার কথা মনে পড়ে, তখনই যেন কানে বাজ তার সেই কাতর অনুরোধ, তুমি অন্তত একবার আমার বাড়ি এসো ছোটোভাই। তুমি অন্তত একবার...।

টোটকা

স্বপন ঘোষচৌধুরী

গণ্ডা গণ্ডা মাস্টার বদল হচ্ছে। রেশনের দোকানের লাইনের মতো মাস্টার আসছে আর যাচ্ছে। কেউ যদি দশ দিনও টেকে!

রজত পড়ল মহা বিপদে। এতো ভারি মুসকিল! মাস্টার ছাড়া লেখাপড়াই বা হবে কী করে! এতো ফাঁকিবাজ ছেলে, একা তো বাড়িতে পড়তেই বাসে না। এতবড় ছেলেকে তো আর মারধর করা যায় না।

চিন্তায় চিন্তায় রজতের মাথায় টাক পড়ে গেল। কেশবতী বলে মাধবীর একটা গর্ব ছিল, তারও মাথার চুল পাতলা হতে শুরু করেছে। একটা মাত্র ছেলে বিশাল, সে যদি মুর্খ হয়ে থাকে, এর চেয়ে বড় দুঃখ আর কী হতে পারে।

মাথায় টাক পড়ার সঙ্গে সঙ্গে রজতের চোখের ঘুমও চলে যাচ্ছিল।

শুনে নবীন বলল, আমার একজন জানাশোনা মাস্টারমশাই আছে, খুব পণ্ডিত এবং বেশ নরম আর গরম। নরম গরম মানেটা বুঝিয়েও বলেছিল, নরম হচ্ছে বুঝিয়ে সুঝিয়ে পড়ানো, আর গরম হচ্ছে চোখ রাঙানো।

রজত অকূলে কূল পেয়ে বলেছিল, যোগাযোগ করে দে না ভাই, বেঁচে যাই।

তা নবীন রজতকে বাঁচাল।

মাস্টারমশাই অনন্ত খুব একটা বয়স্ক নয়, বছর চল্লিশ হবে মেরেকেটে। গায়ের রঙ মাজা ঘষা। মাথায় ঝাঁকড়া চুল, না হাসি না গম্ভীর মুখ, খুব ফিটফাট থাকে।

মাস্টারমশাইকে দেখে বিশালের কোনো হেলদোল নেই। যেন কাকে না কাকে দেখছে। দেখতে দেখতে স্বভাব মতো চোখ পিটপিট করছিল।

এই চোখ পিটপিট করাটা অনন্তর চোখে ধরা পড়ে গেল। মাত্র বি.এ. পাশ আর তাতেই তার অভিজ্ঞতা কিছু কম নয়। যত বখাটে ছেলে ওর কপালেই জোটে।

একটা ছেলে ছিল তার নম্বরের বহর দেখে তার বাবা মা চোখ কপালে তুলে ফেলত। অঙ্কে ছয়, বাংলায় দশ, ইংরাজিতে দুই, ভূগোলে সাত—এবং কোনোটাতেই দশের ঘর পার হয়নি।

এসব দেখে দেখে অনন্ত সিজিন্ড হয়ে গেছে। ও আর চমকায় না, বরং ভাবে, দেখা যাক গাধাটাকে ঘোড়া তো কোনোদিনই করা যাবে না, যদি একটু ভালো গাধা করা যায়।

—এই আমার ছেলে। ছেলের দুকাঁধে

হাত রেখে খুব বিনয়ের সঙ্গে বলল রজত।

ছেলের জ্ঞান টনটনে। হুস করে মাথা নিচু করে নতুন স্যারের দু-পা ছুঁয়ে প্রণাম করে ফেলল।

অনন্ত বুঝল, ছেলে ধুরন্ধর। মনে মনে ভাবল—তা বাবা তুমি যত ধুরন্দরই হও, আমার কাছে পোষা কেউটে হয়ে যাবে। একেবারে কেউটে থেকে হেলে সাপটি বানিয়ে ছাড়ব। আর এই তোমার নম্বরের বহর আর ওই রকম থাকবে না। কিছু না হোক পাঞ্চাশটা ছেলে এই হাতে মানুষ হয়ে গেল। কুকুরের ল্যাজ সোজা হয় কিনা দেখা যাবে।

দুটো থিনঅ্যারারুট বিস্কুট চায়ে ডুবিয়ে সুড়ুৎ সুড়ুৎ শব্দে পান শেষ করে মাইনে পত্র ঠিক করে বলে দিল, কাল থেকে পড়াবে।

বিশাল খুব একটা খুশি হয়নি। আবার এই মাস্টার। মাস্টার মানে রোজ সকাল অথবা সন্ধ্যে বেলা বাঁধা ধরা দুঘণ্টা গোঁজ হয়ে বসে থাকা। অঙ্ক করো, রচনা লেখ, অ্যানালিসিস করো—চোখে জল এসে যায়।

আপাতত চোখের জল চোখে রেখে বিশালকে সব কিছু মেনে নিতে হল।

পরদিন সন্ধে বেলা যখন বাড়িতে বাড়িতে শাঁখ বাজছে, অনন্ত রজতের বাড়িতে এল।

গুটিগুটি পায়ে বইয়ের পাহাড় নিয়ে বিশাল এসে দাঁড়াল একটা জিজ্ঞাসার চিহ্ন হয়ে।

অনন্ত বিশালের চোখে চোখ রাখল, হাতের এবং আঙুলের ইশারায় বই নামাতে বলল এবং বসতে বলল।

বিশাল থতমত খেল। বইগুলো টেবিলের ওপর রেখে সামনের চেয়ারে ধপাস করে বসে পড়ল।

অনন্ত রজতকে বলল, আপনি যান, বিশালকে নিয়ে আমি ভাবব।

রজত চলে যেতে অনন্ত বলল, তোমার সম্পূর্ণ নামটা কি বিশাল?

—বিশাল মিত্র।

—বাবার নাম?

—রজতকুমার মিত্র।

—বাড়ির ঠিকানা বলো।

—বত্রিশ নম্বর যদুলাল ঘোষ লেন, কলকাতা সাত শূন্য শূন্য শূন্য শূন্য নয়।

—সাত লক্ষ, তাই তো?

—হ্যাঁ স্যার।

—তোমার ইস্কুলের নাম?

—ভবতারিণী উচ্চ মাধ্যামিক বিদ্যালয়।

—হেড মাস্টারমশায়ের নাম জানো?

—জানি স্যার। অশোককুমার ঘোষাল।

—তোমাদের ক্লাসটিচার কে?

—সুধীর রঞ্জন দত্ত।

—ভেরি গুড, ভেরি গুড! তুমি তো বেশ বুদ্ধিমান ছেলে। খেলাধুলো করো?

—করি স্যার। পাড়ার পার্কের মাঠে ফুটবল খেলি। আর স্যার ক্রিকেটও খেলি।

—বাঃ বাঃ। নিয়মিত পড়াশুনা, সঙ্গে নিয়মিত খেলা, দুয়ে মিলে বড় হতে হয়। এমন কিছু করতে হবে যাতে লোকে তোমায় ধন্য ধন্য করে।

—আমায় কেউ ধন্য ধন্য করে না স্যার, প্রায় বছর ফেল করি বলে সবাই কেমন যেন নিন্দে করে।

—ওই নিন্দে যাতে আর না করে তার জন্যে তোমাকেই চেষ্টা করতে হবে। তোমার ভালো তোমাকেই বুঝতে হবে। ঠিক আছে। আজ প্রথম দিন তুমি অতি সহজ একটা রচনা লিখে দেখাও। বাংলায় লেখো গরুর রচনা।

—স্যার একটা কথা বলব?

—বলো বলো!

স্যার আমাদের বাড়িতে একটা বই ছিল এখন খুঁজে পাচ্ছি না। স্যার, ওই বইতে সম্রাট অশোক নিয়ে রচনা আছে। আমি স্যার দুটোই লিখে আপনাকে দেখাব। রচনাগুলো স্যার আমার মুখস্থ।

—বেশ বেশ। লিখে ফ্যালো!

এই সময় বিশালের মা চা নিয়ে এল। দুবার চা! অনন্ত একটু কিন্তু কিন্তু করছিল।

বিশালের মা বলল,—আপনার দাদা আর একবার চা করতে বলল, দুবার চা খেলে কোনো ক্ষতি হবে না।

অনন্ত ধীরে সুস্থে চা খেল। টেবিলের ওপর থেকে বিশালের ইতিহাস বইটা উল্টে পাল্টে দেখল। প্রায় আধঘণ্টা পর বিশাল জোরে শব্দ টেনে হাসি মুখে বলল,—হয়ে গ্যাছে স্যার।

অনন্ত খাতাটা নিল। পড়তে লাগল।

'গরু' শিরোনামের পর লিখেছে, গরু দুই প্রকার। গরু দেখিতে কেউ কেউ মনোরম আবার কেউ কেউ ভয়ঙ্কর। বিশেষত ষাঁড় গরুরা অতীব ভয়ঙ্কর হয়ে থাকে।

পুনরুল্লেখ করি, গরু দুই প্রকার—হরিণঘাটা পালিত এবং হিন্দুস্থানী পালিত। হরিণঘাটা পালিত গরুরা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ফ্ল্যাটে থাকে, দুইবেলা চান করে, পেট ভর্তি রাজকীয় খাবার খায়। ইহারা ফ্ল্যাটে থাকিয়া ভাড়ার বদলে দুধ দেয়।

হিন্দুস্থানী পালিত গরুরা খাটালে থাকে। খাটালে যত্রতত্র কাদা মাখামাখি হইয়া থাকে। গোময় এবং গোমূত্র মিলিয়া মিশিয়া যচ্ছেতাই অবস্থা হয়। ইহাদের গোবর প্রায়শই ল্যাজে লাগিয়া থাকে। ইহাকে ল্যাজে গোবরে অবস্থা বলে। মানুষও মাঝে মধ্যে ল্যাজেগোবরে হইয়া থাকে।

এই পর্যন্ত পড়ে অনন্তর মাথার চুল খাড়া হয়ে গেল। কী করে যে হাসি চেপে রেখেছে সেই জানে।

পরের রচনা 'সম্রাট অশোক'। লিখেছে—অশোক খুবই ভদ্রলোক নৃপতি ছিলেন। প্রজাদের দুঃখ কষ্ট তিনি সহ্য করিতে পারিতেন না। সেজন্য তিনি পথিমধ্যে বৃক্ষ রোপণ করিয়াছিলেন ও কূপ খনন করিয়া ছিলেন। তিনি হাতে একটি চারা লইয়া ভ্রমণ করিতেন। ইহা অশোকচক্র বলিয়া সকলে জানে।

অনন্ত বলল, বাঃ চমৎকার হয়েছে। একেবারে নতুন করে ভাবা। দ্যাখো, তোমার মধ্যে প্রতিভা আছে কিন্তু তুমি সেটা কাজে লাগাচ্ছো না। ঠিক মতো পড়াশুনা করলে, একটু বুদ্ধি খাটালে তুমি কিন্তু ক্লাসের বেস্ট বয় হয়ে উঠবে।

বিশাল সবকটা দাঁত বের করে গদগদ গলায় বলে উঠল—বেস্ট বয় হলে কী হয় স্যার?

অনন্ত ঢোক গিলল, বড় কঠিন প্রশ্ন করেছে ছেলেটা। বেস্ট বয় হলে কী হয় অনন্ত নিজেই তা জানেনা। খুব করে একটু কেশে বলল—বেস্ট বয় হলে তোমার ওই মনে প্রফুল্লতা জাগে, মনে খুব আনন্দ হয়, সবাই যাতে ভালো বলে এই কথা ভাবতে হবে।

—কিন্তু স্যার, বিশাল ভারি গলায় বলল, আমায় না সবাই খারাপ ছেলে বলে। আমি স্যার খুব ফেল করি। পড়তে চাইনা। বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে যখনতখন ঝগড়া করি। কেন স্যার?

—কেন? অনন্ত বলল—ঝগড়া তুমি করো না। তোমার ভেতরে একটা দুষ্টু লুকিয়ে আছে যে সব সময় তোমার ক্ষতি চায়। তাকে তুমি ঠিক দেখতে পাও না। সে তোমাকে তার খেয়াল খুশি মতো চালনা করছে।

—চালনা কী স্যার?

—তার মানে তোমাকে চালাচ্ছে। তোমার ভেতরের সেই দুষ্টুটাকে জব্দ করতে হবে। সে তোমাকে যে কাজটা

করতে বলবে তুমি তার উল্টোটা করবে। সে যদি বলে সকাল সন্ধে পড়বে না। তুমি পড়তে বসবে। সে যদি পড়ায় অমনোযোগী হতে বলে তুমি তত বেশি পড়ায় মনযোগ দেবে। সে যদি বলে আজ স্কুলে যেতে হবে না, তুমি ঠিক তার উল্টোটা করবে, স্কুলে যাবে এবং মন দিয়ে প্রতিটি ক্লাসের পড়া শুনবে।

—আমার দ্বারা হবে না। আমায় খারাপ ছেলে বললেও আমি স্যার আপনার কথামতো ভালো ছেলে হতে পারব না।

—তাহলে আর কী করা যাবে। সারা জীবন খারাপ হয়েই থাক। ভালো ছেলে হলে আমি তোমায় যা একখানা জিনিস দিতাম, দেখে তোমার চোখ টেরিয়ে যেত। যাক, যা ভালো বুঝছো করছো।—অনন্ত উঠে দাঁড়াল। আজ তাহলে আসি।

অনন্ত আর এল না। বিশাল 'স্যার এল না স্যার এল না' বলে বাড়ি মাত করছে। রাজীবকে অনন্ত আগেই সবকিছু বলে রেখেছিল। এখন রাজীব বুঝতে পারল, ওষুধ ধরেছে। ছেলেকে বলল, তোর এই স্যার আর কোনো দিন আসবে না বলেছে। বলেছে খারাপ ছেলেদের পড়াবে না। খারাপ ছেলেরা কোনো জিনিসও পায় না।

বিশাল ভ্যাঁ জুড়ে দিল, স্যার আমাকে দারুণ একটা জিনিস দেবে বলেছিল।

—পাবি না। পড়াশুনা করিস না, জিনিস জিনিস করে লাফালে হবে? ভালো জিনিস পেতে গেলে ভালো করে পড়াশুনা করতে হয়, ভালো ছেলে হতে হয়। তুই ভালো ছেলেই নয়, ভালো জিনিস পাবি কী করে?

বিশাল তিড়িং করে লাফিয়ে উঠল—আমি ভালো ছেলে হব। সত্যি সত্যি ভালো ছেলে হব। মাস্টার মশাইকে বলো গিয়ে, দুবেলা পড়তে বসব, এতটুকু ফাঁকি দেব না। জিনিস পাব তো?

রজত বাইরে এসে অনন্তকে ফোন করল, রজত বলছি, ছেলে ওষুধ গিলেছে, আপনার টোটকা মতো হাতে হাতে ফল। জিনিস পাওয়ার লোভে ভালো ছেলে হবার সাধ হয়েছে।

অনন্ত বলল—জানতুম কিস্তিমাত হবে। ছেলেকে বলুন, কাল থেকে পড়াতে যাব।

With best compliments from

ALLIED ELECTRICALS & SWITCH FUSES

(An ISO 9001:2000 Certified Company)
ENGINEERS : MANUFACTURERS : FABRICATORS
• LT SWITCHGEAR • CONTROL PANEL • STEEL FABRICATED ITEM

OFFICE
62/1A, Netaji Subhas Road
2nd Floor, Room No. 16
Kolkata-700 001
Ph : 033-22689556 / 65251544

WORKS
Baidyapur, Purba Bardhaman
West Bengal
Ph : (03454) 245234 / 245108

Fax : 033-22689556, E-mail : allied1963@yahoo.co.in

Pulak Ghosh, M : 9830358135

Sl. No. 115

শারদ শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন

নিত্যানন্দপুর-বলগোনা এফ.এস.সি.এস লিমিটেড

রেজি. নং : ৩০৮

কৃষি ঋণ দাদন, রাসায়নিক সার, বিক্রয়ের মাধ্যমে কৃষি কাজে এবং বিভিন্ন সরকারি কর্মসূচি বাস্তবায়নে সার্বিক সহায়তা করা হয়।

Sl. No. 32

শারদ শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন

পেপসিকো ইন্ডিয়া হোলডিংস প্রা. লি.

সংযোগে আলু চাষ করে লাভবান হোন

ভেন্ডার : সৈয়দ মহঃতকি

বুলবুলিতলা, ফালিলপুর, পূর্ব বর্ধমান, যোগাযোগ : ৯৪৩৪৬৬৯৯২৪

Sl. No. 37

শারদ শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন

মেসার্স কুমার ব্রাদার্স

আলু, ধানের কমিশন এজেন্ট

অনুপমা বস্ত্রালয়

উৎসবে উপহারে নিত্য প্রয়োজনে পোশাকের বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান

যোগাযোগ : ৯৭৩২৩৩১৮৩৩, ৯৭৩২২৪৯০১৭, সুলতানপুর বাজার (হাইস্কুলের নিকট), পূর্ব বর্ধমান

Sl. No. 36

শারদ শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন

বিবাহ, অন্নপ্রাশন সহ সমস্ত উৎসব অনুষ্ঠানে পরিতৃপ্তির শেষ কথা

ফ্রেন্ডস্ ক্যাটারার

ধাত্রীগ্রাম, পূর্ব বর্ধমান ।। যোগাযোগ : ৯০৯৩৬০৯০৪৮, ৯৪৩৪৫৭৬৪২৯

Sl. No. 41

শারদোৎসব সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি অটুট থাক

Keya Builders & Construction

CONTRACTOR AND SUPPLIER

Mousa-Denur, Purba Bardhaman

Pro. ***Yeir Mohammad Sk.*** *(Laltu)*

Sl. No. 11

শারদ শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন

পারুলডাঙা এস.কে.ইউ.এস. লি.

পোঃ নসরতপুর, পূর্ব বর্ধমান

গোপালচন্দ্র ঘোষ
সম্পাদক

হামজার সেখ
সভাপতি

Sl. No. 13

শারদ শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন

ইসলামপুর সমবায় সেবা সমিতি লিঃ

রেজি. নং ৪৬বি. তারিখে : ৩১-০৩-১৬

ইসলামপুর, পোঃ নাদনঘাট, পূর্ব বর্ধমান

চাষিদের সেবায় নিয়োজিত

Sl. No. 12

শারদ শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন

আউশগ্রাম ১নং ব্লক ল্যাম্পস লি.

গ্রাম : শোকাডাঙ্গা, পোঃ করটিয়া, পূর্ব বর্ধমান ।। অফিস : আউশগ্রাম

কার্যবিবরণী

১. ডিপোজিট মবিলাইজেশন স্কিম (মিনি ব্যাঙ্ক); ২. সদস্যদের মধ্যে টি.এস.পি., এম.জি.এল., দিশা প্রকল্পের মাধ্যমে লোন দেওয়া হয়; ৩. অ্যাজবেসটস সুলভ মূল্যে বিক্রয় করা হয়; ৪. সকলের জন্য রেশন প্রদান; ৫. কম্পিউটার ট্রেনিং এবং ডাটা এনট্রির কাজ।

রূপলাল সরেন
ম্যানেজার

কার্তিক মুর্মু
হিসাবরক্ষক

বাদল হাঁসদা
সেলস্‌ম্যান

Sl. No. 10

শারদ শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন

শ্রীমা হাস্কিং মিল

একলক্ষ্মী, পূর্ব বর্ধমান

Sl. No. 7

With best compliments from

Vidyasagar Teacher Training College

[B.Ed + B.P.Ed]

VIDYASAGAR ENGLISH ACADEMY

Manab Kumar Ghosh
Secretary

Sl. No. 111

শারদ শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন

Kalna-II CADP Farmers Service Co-Operative Society Ltd.

রেজি. নং ১৩, কাটোয়া, তারিখ : ২৭.০৭.১৯৭৬ ।। পাতিলপাড়া, বৈদ্যপুর, পূর্ব বর্ধমান

KIICF বীজ আলু ও ধানের জন্য যোগাযোগ করুন

লালু জুঁই
সভাপতি-৯৭৩২০৭০৯৪৯

তুষারকান্ত রায়
সম্পাদক, ৯৭৩২৩১৩০৬৯

Sl. No. 112

শারদ শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন

লোহাচুড়-বড়গাছি সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লি.

অফিস : বড়গাছি, পোঃ মোয়াইল, বর্ধমান ।। যোগাযোগ : ৮৯০০৫০২৪৩৪

এখানে এলাকার চাষিদের স্বল্প সুদে কৃষিঋণ দাদন করা হয়। ১৯টি সাবমার্সিবল দ্বারা জলসেচের ব্যবস্থা আছে। এখানে সকল প্রকার আমানতের ব্যবস্থা আছে এবং আমানতের ওপর সুদ অন্যান্য বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক অপেক্ষা ০.৫ শতাংশ বেশি। রাজ্য সরকার সমিতির অন্যতম অংশীদার।

বাবলু মাহাতো
সম্পাদক

প্রকাশচন্দ্র ঘোষ
সভাপতি

Sl. No. 9

শারদ শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন

মুস্তাক আহমেদ

বিশের পাড়, মণ্ডলগ্রাম, 'বর্ষা কৃষি ভাণ্ডার', গয়েশপুর পাকা রাস্তার ধার

কীটনাশক ঔষধ, রাসায়নিক সার, ধান্য ক্রয় ও সুলভ মূল্যে চাল বিক্রয় করা হয়। চারা পোনা সরবরাহের ব্যবস্থা আছে।

Sl. No. 18

শারদ শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন

হামুনপুর এস.কে.ইউ.এস. লি.

গ্রাম : হামুনপুর, পোঃ বোহার, মেমারি-২, পূর্ব বর্ধমান ।। বিক্রয় কেন্দ্র : রায়বাটী বাজার

এলাকার কৃষি উন্নয়নে অত্র সমিতি বহুমুখী পরিষেবা প্রদান করে

দীনবন্ধু হালদার
ম্যানেজার

Sl. No. 21

শারদ শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন

কালেশ্বর এস.কে.ইউ.এস. লি.

রেজি নং ৫৪ তারিখ : ১৪-০৪-১৯৩০ ।। পোঃ কুচুট, বর্ধমান, ফোন : ০৩৪২- ২৭১৯২৭০

আমাদের কার্যসমূহ

সার, কীটনাশক, বন্ধকী, ট্রাক্টর, কুটিমাড়া মেশিন, ১৮টি সাবমার্সিবল পাম্পের মাধ্যমে জমিতে সেচ দেওয়া। এছাড়া ব্যাঙ্কিং, এস.বি., আর.ডি., টি.ডি. করা হয় এবং যে-কোনো ব্যাঙ্কের চেক ভাঙানো হয়। টি.ডি বন্ধক রেখে লোন দেওয়া হয়।

Sl. No. 20

শারদ শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন

পূর্বস্থলী এস.কে.ইউ.এস. লি.

পূর্বস্থলী, পূর্ব বর্ধমান

সমিতি থেকে কৃষকদের কে.সি.সি., মধ্যমেয়াদী, পাওয়ার টিলার, ট্রাক্টর, এন.এস.সি., কে.ভি.পি. ঋণ দেওয়া হয়। জমা টাকার ওপর শতকরা ০.৫ হারে বেশি সুদ দেওয়া হয়। ইফকো সার, সরকারি মূল্যে সমিতি থেকে পাওয়া যায়।

রণকালী মোদক
সভাপতি

বারীন্দ্রনাথ রায়
সম্পাদক

দুর্গাদাস গুহ
ম্যানেজার

Sl. No. 33

শারদ শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন

দে পেপার অ্যান্ড প্রেজেন্টেশন সেন্টার

সাতগাছিয়া (কালনা রোড), পূর্ব বর্ধমান, চলভাষ : ৯২৩৩৫৭৯৭০৬, ৯৩৩৩১৫৫০৮৮

সকল প্রকার স্কুল, পঞ্চায়েত সমিতি এবং অন্যান্য অফিসের খাতা, রেজিস্টার, পেন, ফাইল ও অফিস উপকরণ সামগ্রী সহ বিবাহ ও যে-কোনো উৎসবের কার্ড ও উপহার সামগ্রী এবং অঙ্কন সামগ্রী পাইকারি বিক্রির বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান

Sl. No. 19

With best compliments from

S.N. ENTERPRISE

All kinds of PVC pipe, Fittings, Submersible pumps & Hardware goods
Trading & General Order Supplier

Prop. Ibrahim Sk.
Malamba Bazar, Memari Road, Purba Bardhaman
Mob. No. 9734222220, 9933869552, E-mail : snenterptise3351@gmail.com

Sl. No. 15

With best compliments from

PRAGATI ASSOCIATES

Manteswar, Purba Bardhaman

Sl. No. 16

শারদ শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন

যোগাদ্যা ফার্টিলাইজার

প্রতিষ্ঠাতা : ভরতচন্দ্র ঘোষ

প্রোঃ তোতন ঘোষ
মালম্বা, পূর্ববর্ধমান, যোগাযোগ : ৯৭৩২০৯৬৭০৩
এখানে সকল প্রকার রাসায়নিক সার পাওয়া যায়।

যোগাদ্যা হার্ড ওয়ার

প্রোঃ খোকন ঘোষ
মালম্বা, পূর্ববর্ধমান

এখানে সকল প্রকার হার্ডওয়্যার সামগ্রী পাওয়া যায়।

Sl. No. 17

শারদ শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন

সরস্বতী অ্যাগ্রো প্রোডাক্ট

প্রোঃ অশোক বিশ্বাস

কাঁকড়বিহীন সরস্বতী মার্কা সর্টেক্স এবং সিল্কি চাল প্রস্তুতকারক

SARASWATI BRAND

STONELESS

MFG by S.A.P.

Khandaghosh, Mob. 8768688695, 9474015782

Sl. No. 79

শারদ শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন

মহাশক্তি কোল্ড স্টোরেজ

পাকড়েপাড়া, চকদিঘি, জামালপুর, পূর্ব বর্ধমান

Sl. No. 76

শারদ শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন

সোমনাথ কোল্ড স্টোরেজ (প্রা.) লিমিটেড

ইটলা, পর্বতপুর, পূর্ব বর্ধমান

আলু সংরক্ষণের বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান

Sl. No. 78

শারদ শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন

সমাজসেবামূলক প্রতিষ্ঠান ও সর্বদা মানুষের পাশে

গলসী নবদিগন্ত সোস্যাল ফাউন্ডেশন

গলসী, পূর্ব বর্ধমান

Sl. No. 73

শারদীয়ার প্রীতি ও শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন

LOOK

LADIES AND GENTS WEAR

Burdwan Road, Satgachia, Mob. 9832920749

Prop. Samrat Sil

Sl. No. 29

শারদ শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন

অগ্রসেন হিমঘর

সাতগেছিয়া, পূর্ব বর্ধমান

আলু সংরক্ষণের বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান

আলু চাষের জন্য উন্নত মানের বীজ পাওয়া যায়

Sl. No. 30

With best compliments from

PRESKAR ALI SK.

Member of the Chairman's Club and ACE

Agent : **All India L.I.C.**

Kalna Branch, Code : 03295/471, Gram Kalna, Purba Bardhaman, Mob. 9734825786

Sl. No. 39

সমস্ত দর্শকবন্ধুদের জানাই

শুভ শারদীয়ার প্রীতি ও শুভেচ্ছা

মফঃস্বলের একমাত্র নির্ভরযোগ্য সিনেমা হল

উর্বশী সিনেমা

ধাত্রীগ্রামী রেলগেট, পূর্ব বর্ধমান

Sl. No. 40

শারদ শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন

সেখ জমালউদ্দিন

শশঙ্গা, গলসী, পূর্ব-বর্ধমান

Sl. No. 47

শারদ শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন

নিরঞ্জন খাদি গ্রাম উদ্যোগ সেবা সমিতি

সোন্দলপুর, আটঘড়িয়া, পূর্ব-বর্ধমান

খাদি শাড়ি, পাঞ্জাবি, কুর্তা, কেটে, মটকা, তসর, মসলিনের বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান

(বি.দ্র. : কেন্দ্রীয় সরকারি রিবেট অনুমোদিত)

Sl. No. 38

With best compliments from

Well Wishers of Sreedharpur Village

Sl. No. 28

শারদ শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন

শ্রীদুর্গা খেলাঘর

প্রোঃ কৌশিক চক্রবর্তী

এখানে ব্যাট, বল, জার্সি, বুট, ট্রফি ও খেলাধূলার বিভিন্ন সরঞ্জাম পাওয়া যায়

ভেদিয়া, স্টেশন রোড, পূর্ব বর্ধমান, যোগাযোগ : ৯৪৭৪৪০৯৩৭৩

Sl. No. 46

With best compliments from

RADHAKRISHNA AGRO PRODUCTS

(A RICE MILL INDUSTRY)

Brand name of our product : 'RADHASHREE RICE'
Vill & P.O. Belari (Bonpas Station Road)
Purba Bardhaman, Mob. 7797278671, 7797278672

Sl. No. 45

শারদ শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন

পশ্চিমবঙ্গ সরকার (যুবকল্যাণ দপ্তর অনুমোদিত)

গলসী ব্লক যুব কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

নীলকণ্ঠ ভবন, পুরাতনচটি, গলসী বাজার, পূর্ব বর্ধমান

Sl. No. 75

শারদ শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন

সনাতনী ফুড ইন্ডাস্ট্রিজ প্রা. লিমিটেড

বোলপুর, পারাজ, বর্ধমান, যোগাযোগ : ৯৪৩৪৩১৮২৯০

Sl. No. 49

With best compliments from

M/s. Baba Kalu Ray Heemghar Pvt. Ltd.

Vill. & P.O. Jaragram, Dist. Purba Bardhaman

Ph : 03213-258556

Sl. No. 57

শারদ শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন

সমবায় আন্দোলন দীর্ঘজীবী হোক

গুসকরা পৌর কর্মচারী সমবায় ঋণদান সমিতি

প্রসাদ ঘোষ
সভাপতি

উত্তম পাত্র
সম্পাদক

Sl. No. 42

With best compliments from

We Care for Your Health

BHADRESWAR'S

LALBABA RICE

Paraj More, NH2, M : 9434002270

Sl. No. 53

With best compliments from

MBA BRICK FIELD

Owners' Association

Nutnanhate (Mongolkote), Purba Bardhaman, Ph : 9434028755

Sl. No. 43

শারদ শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন

কৃষ্ণেন্দু রায়

ইট, বালি, সিমেন্ট, রড বিক্রেতা
বিল্বগ্রাম, পূর্ব বর্ধমান

Sl. No. 44

শারদ শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন

দক্ষিণেশ্বর রাইস মিল

গলিগ্রাম, গলসী, পূর্ব বর্ধমান

এখানে 'জয়বাবা' মার্কা কাঁকড়বিহীন রেশমি চাল প্রস্তুত ও সরবরাহ করা হয়।

পরীক্ষা প্রার্থনীয় ।। সততাই আমাদের মূলধন

Sl. No. 60

শারদীয়ার প্রীতি ও শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন

চণ্ডীপুর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেড

স্থাপিত : ১৯-১২-২৭ রেজি নং : ২০২ ।। চণ্ডীপুর, মেড়তলা, পূর্ব বর্ধমান

সমিতির কাজকর্ম

(১) স্বল্পমেয়াদি কৃষি ঋণ প্রদান, (২) এস.এইচ.জি. ঋণ প্রদান, (৩) মধ্যমেয়াদি ঋণ প্রদান এবং (৪) ব্যাঙ্কিং পরিষেবা

সুফলচন্দ্র ঘোষ	**উদয় মণ্ডল**	**সমরেশ ঘোষ**
সভাপতি	সম্পাদক	ম্যানেজার

Sl. No. 66

With best compliments of

ASTHA FILLING STATION

BHOTAR MORE, BURDWAN-KATWA ROAD, PURBA BARDHAMAN

Sl. No. 80

With best compliments from

SREE BISHNU RICE MILL

SUPER FINE SILKY SORTEX EXPORT QUALITY RICE

Our Brand : ***Narayan Bhog, Narayan Bhog Gold***

Contact No. 08436990638, 08629992188

Sl. No. 61

শারদীয়ার প্রীতি ও শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন

তিরুপতি কোল্ড স্টোরেজ প্রাইভেট লিমিটেড

বিষ্ণুপুর, রসুলপুর, পূর্ব বর্ধমান

Sl. No. 68

শারদীয়ার প্রীতি ও শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন

তিরুপতি রেফ্রিজারেশন প্রাইভেট লিমিটেড

কালড়া, জামালপুর, পূর্ব বর্ধমান

Sl. No. 77

শারদীয়ার প্রীতি ও শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন

অভয়া মা দুর্গার বরে
মোতিয়ান চাল বাংলার ঘরে ঘরে

মেসার্স আর.এস. অ্যাগ্রো ইন্ডাস্ট্রিজ

গলিগ্রাম, গলসী, পূর্ব বর্ধমান

Sl. No. 59

শারদীয়ার প্রীতি ও শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন

হাফিজুর রহমান

গ্রামকালনা, ধাত্রীগ্রাম, পূর্ব বর্ধমান

Sl. No. 81

With best compliments from

SHYAMALI COLD STORAGE (P) LTD.

Surul, Galsi, Dist. Purba Bardhaman

Sl. No. 70

With best compliments from

SARADAMAYEE RICE MILL

Vill. Rokona, P.O. Jharul, Dist. Purba Bardhaman

Sl. No. 38

With best compliments from

HOTEL PRABHU

Malanchapara Road, (Near Bishnupriya Railway Station) Nabadwip, Nadia
Phone : 9734272272, 9732555015, Web. hotelprabhu.in, E-mail : infor@hotelprabhu.in

AC, Non A.C. Rooms, Tourist spot visit by car (rental), Automated Lift, 24 Hours. Hot and Cold Water, Generator, Fire Safety Accessories, Car Parking, Intercom, Cellphone, Wi-Fi facilities

Sl. No. 65

With best compliments from

BANERJEE BROTHERS CONSTRUCTION

Vill. & P.O. Nandi, Dist Paschim Bardhaman
Asansol, Ward No. 1, PIN : 7133344, Mob. 8906958843

Sl. No. 55

শারদ শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন

বগপুর ইউনিয়ন আদিবাসী সমবায় সেবা সমিতি

গ্রাম : চণ্ডীপুর, পোঃ রাইপুর, পূর্ব বর্ধমান

Sl. No. 64

শারদ শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন

নতুন খবর **নতুন খবর** **নতুন খবর**

টিস্যু কালচার পদ্ধতিতে সম্পূর্ণ রোগমুক্ত ও সমপ্রজাতির, সমগুণসম্পন্ন উন্নত মানের G-9 প্রজাতির কলাগাছের চারা ও বিভিন্ন প্রজাতির আলংকারিক উদ্ভিদ ও ফুল-ফলের চারাগাছ প্রস্তুতকারক পলিহাউস ও নেট হাউসের মাধ্যমে প্রাইমারি হার্ডেন্ড ও সেকেন্ডারি হার্ডেন্ড এবং টেম্পারড্ চারাগাছ 'রেডি টু প্ল্যান্টেশান' সরবরাহ করা হয়।

অ্যাবডস্ অ্যাগ্রো ইন্ডাস্ট্রিজ

মাধবপুর, জামালপুর, পূর্ব বর্ধমান, ফোন : ৮৫৩৮৮০৮৮২৮

Sl. No. 58

With best compliments from

SETHIA JAIN & CO. LTD.

Debipur, Memari, Dist. Purba Bardhaman
Phone : (0342) 2263270

Sl. No. 69

শারদ শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন

ইসমাইল মণ্ডল

শিকেরপুর, মেমারি, পূর্ব বর্ধমান

Sl. No. 63

শারদ শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন

সুবর্ণ রাইস মিল

খেতুরা, গলসি, বর্ধমান

যোগাযোগ

৯৪৩৪১২৪৭১২, ৯৭৩২১৮৯২৬৬, ৯৭৩২২৪৯১৭৫

Sl. No. 71

শারদ শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন

Sl. No. 52

শারদ শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন

Sl. No. 51

শারদ শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন

পারুলিয়া বেলগাছি সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লি.

গ্রাম বেলগাছি, পোঃ থানা : পূর্বস্থলী, পূর্ব বর্ধমান

যোগাযোগ : ৯৫৬৪১৮৭৫৫৫/৯৬৩৫২১৩৭৭৫

অত্র সমবায় সমিতি এলাকাবাসীদের সমস্ত ধরনের ঋণ ও কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক পরিষেবা ও চাষিভাইদের জন্য ট্রাক্টর ও ১০৭ গাড়ির মাধ্যমে ন্যায্য মূল্যে পরিষেবা প্রদান করে।

ব্রজেন্দ্রচন্দ্র দাস	**হিল্টন রায়**	**তাপস দাস**
সভাপতি	সম্পাদক	ম্যানেজার

Sl. No. 56

With best compliments from

SONAI BUILDERS

GOVT. CONTRACTOR & GENERAL ORDER SUPPLIER

Galsi, Purba Bardhaman, PIN : 713406, Contact : 8016847009

Sl. No. 74

শারদ শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন

সবার আশীষে

প্রোঃ সেখ তাজউদ্দিন

তীরীঙ্গা মোড়, বর্ধমান, যোগাযোগ : ৯৮৩২১৮৫৪১১

Sl. No. 72

শারদ শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন

কুবাজপুর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লি.

গ্রাম ও পোঃ কুবাজপুর, থানা : ভাতাড়, পূর্ব বর্ধমান, যোগাযোগ : ৮৯৬৭০৭৯৬৫৬

রেজি. নং. ৩৪১২ তাং : ২০-০৮-৬৯

আমাদের পরিষেবা সমূহ : **১. ব্যাঙ্কিং পরিষেবা, ২. কৃষকদের মধ্যে স্বল্প সুদে কে.সি.সি. খাতে ঋণ দাদন, ৩. বিভিন্ন কোম্পানির রাসায়নিক সার ও কীটনাশক পাইকারি ও খুচরা বিক্রয়।**

সমিতির পক্ষে

শাহাজামাল মণ্ডল

Sl. No. 62

শারদ শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন

দেউলিয়া সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লি.

দেউলিয়া, আঝাপুর, থানা মেমারি, পূর্ব বর্ধমান

রাসায়নিক সার ও কীটনাশক ঔষধ বিক্রেতা। এছাড়াও ব্যাঙ্ক পরিষেবা আছে।

সেখ গোলাম মুর্তোজা	**আব্দুল আলিম মণ্ডল**	**আব্দুল মজিদ মল্লিক**
সভাপতি	সম্পাদক	ম্যানেজার

Sl. No. 67

শারদ শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন

সুন্দর ও মজবুত ইটের জন্য যোগাযোগ করুন

মেমারি ব্রিক ফিল্ড

(মেমারি মার্কা ইট)

পাঁচখেয়া, ঘোষ, পূর্ব বর্ধমান, যোগাযোগ : ৯৪৭৪৮৫৮৭২০, ৯৭৭৫২৫০৩৯১

Sl. No. 126

Happy Puja Greetings from

Magra Brick Field & Co.

Vill. Denha Magra, P.O. Ghosh, Dist. Purba Bardhaman

Phone : (0342) 2250639

Sl. No. 127

শারদ শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন

আপনার স্বপ্নের ইমারত গড়তে ইঞ্জিনিয়ারদের প্রথম পছন্দ

'D.B.F.' মার্কা পগমিল ইট ব্যবহার করুন

দামোদর ব্রিক ফিল্ড

শম্ভুপুর, পোঃ চক্ষণজাদি, পূর্ব বর্ধমান, যোগাযোগ : ৮০০১৭৬৯১৫০, ৯৭৩২১৬১২০৬

Sl. No. 121

Happy Puja Greetings from

United Agri Tech. Pvt. Ltd.

Galsi (East), NH-2, Dist. Purba Bardhaman

Sl. No. 120

With best compliments from

R.B. CONSTRUCTION & ENGINEERS

459 P, Majumdar Road, Kolkata-700078

Sl. No. 119

শারদ শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন

পশ্চিমবঙ্গ আদিবাসী উন্নয়ন সমবায় নিগম লি.

আদিবাসী জনগোষ্ঠীর সার্বিক উন্নয়নের জন্য পশ্চিমবঙ্গের আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চলগুলিতে আদিবাসী জনগোষ্ঠীকে নিয়ে বৃহদাকার বহুমুখী সমবায় সমিতি পশ্চিমঙ্গের বিভিন্ন জেলায় বর্তমানে অবস্থিত ১৫৪টি। ল্যাম্পস-এর বহুমুখী কর্মধারার মাধ্যমে আদিবাসীদের কাছে স্বনির্ভরতার আলোকবার্তা পৌঁছে দিতে এই নিগম সচেষ্ট।

ল্যাম্পস-এর মাধ্যমে আমাদের রূপায়িত প্রকল্পগুলি হল :

● স্বনির্ভর গোষ্ঠী গঠন। ● আদিবাসী মহিলা সশক্তিকরণ যোজনা। ● শস্যগোলা প্রকল্প। ● আয়মূলক প্রকল্প। ● বিশেষ অংশগত মূলধন অনুদানের সাহায্যে উন্নয়নমূলক কর্মসূচি রূপায়ণ। ● ক্ষুদ্র বনজ সম্পদ সংগ্রহ ও বিপণন। ● ল্যাম্পস ও ব্যাঙ্কের মাধ্যমে কৃষি ঋণের ব্যবস্থা। ● স্থানীয় চাহিদার ভিত্তিতে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মসূচি রূপায়ণের জন্য স্বল্প সুদে ঋণ দান। ● অফিসগৃহ সহ গুদামঘর নির্মাণ। ● বিভিন্ন কারিগরি ও অকারিগরি প্রশিক্ষণ দান। ● WBCS প্রস্তুতির জন্য প্রশিক্ষণ।

এই সকল কর্মসূচি রূপায়ণের মাধ্যমে আদিবাসী জনগণের আর্থসামাজিক উত্তরণের গুরুদায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালনের জন্য এবং ল্যাম্প সমিতিগুলিকে আর্থিক, ব্যবসায়িক ও প্রশাসনিক সাহায্য ও পরামর্শ দানের জন্য শীর্ষ প্রতিষ্ঠান হিসাবে আমরা আন্তরিকভাবে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি।

ওয়েস্ট বেঙ্গল ট্রাইবাল ডেভেলপমেন্ট কো-অপারেটিভ কর্পোরেশন লি

সিধু কানু ভবন, কেরি-১৮, সেক্টর-৩, বিধাননগর, কলকাতা-৭০০০৯৮

দূরভাষ : ২৩৩৫-১৯১৮/১৮৩২, ফ্যাক্স : ২৩৩৫-১৯৩৫

Sl. No. 72